কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

আবদুল মতীন জালালাবাদী

www.amarboi.org

কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

আবদুল মতীন জালালাবাদী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১/৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২৮৪

১ম প্রকাশ

রমযান	১৪২২
অগ্রহায়ণ	১৪০৮
নভেম্বর	২০০১

স্বত্ব ঃ গ্রন্থকারের

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১২২.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

QURANER SHIKSHA O SONSKRITI (Teachings and Culture of The Quran) by Abdul Matin Jalalabadi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka. 122.00 Only.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

উবায়দুল হক
খতীব, বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ, ঢাকা
প্রাক্তন হেড মওলানা, মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
OBAIDUL HOQUE
Khatib, Baitul Mukarram Mosque, Dhaka,
Ex-Head Maulana, Madrasah-E-Alia, Dhaka,
Bangladesh.

عبيد الحق
خطيب المسجد الوطني بيت المكرم . ڈاکا.
رئيس الأساتذة سابقا للمدرسة العالية . ڈاکا
بنغلاديش

Ref. :   الاشارة :

Date :   التاريخ :

حامدا و مصليا و مسلما

হাদীসে বর্ণিত আছে, لا تنقضي عجائبه ولا تخلق بالرد অর্থাৎ "কুরআনের বৈচিত্র্যময় ও বিস্ময়কর তত্ত্বাদি কখনো ফুরিয়ে যাবে না এবং বার বার পড়া ও আলোচনা-পর্যালোচনার পরও তা কখনো পুরাতন বা সেকেলে হবে না।"

আমাদের বন্ধু জনাব আবদুল মতীন জালালাবাদী প্রণীত 'কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি' শীর্ষক পাণ্ডুলিপিটি মোটামুটিভাবে পঠন ও শ্রবণের পর উপরোক্ত শাশ্বত বাণীর সত্যতা ও যথার্থতা যেন নতুন করে মানসচোখে ভেসে উঠলো।

প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে কুরআনে হাকীম নিয়ে প্রচুর চিন্তা-গবেষণা হয়েছে, এর বিভিন্ন দিক নিয়ে লক্ষাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে, এতে বর্ণিত বিষয়াদির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হয়েছে, আলোচনা-পর্যালোচনা হয়েছে– তা সত্ত্বেও এখনো এর এমন অনেক দিক রয়ে গেছে যা সরাসরি সাধারণ মানুষের গোচরে আসে নি। তাই তো কুরআন নিয়ে এখনো অহরহ চিন্তা-গবেষণা চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে। আর এর প্রতি খোদ আল্লাহ্ তাআলাও মানুষকে উৎসাহিত করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে। كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون অর্থাৎ "এভাবে আমি আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি তাদের জন্য যারা চিন্তা-গবেষণা করে (১০ : ২৪)।"

অতএব যারা কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন তারা যেমন আল্লাহ্ তাআলার প্রিয় বান্দা তেমনি সাধারণ মানুষেরও পরম শ্রদ্ধেয় জন। কেননা তাদেরই গবেষণার মাধ্যমে কুরআনে হাকীম থেকে একের পর এক এমন সব তথ্য বেরিয়ে আসতে থাকবে যা মানুষকে প্রতিটি যুগে উদ্ভূত প্রতিটি নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান বাতলে দেবে।

জনাব আবদুল মতীন জালালাবাদী হচ্ছেন এই সব শ্রদ্ধাভাজন গবেষকদেরই একজন। তার 'কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি' হচ্ছে তাঁর গবেষণার একটি সার্থক ফসল।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, সংস্কৃতির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে মানবজীবনকে সুন্দর ও সফল করে গড়ে তোলা। যে সংস্কৃতিতে মানবজীবনের কোন মূল্য দেওয়া হয় না, মানবতার উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না, সেটা অন্য কোন সংস্কৃতি হতে পারে কিন্তু কুরআনী সংস্কৃতি মোটেই নয়। কেননা কুরআনী সংস্কৃতিতে মানুষের স্থান, মানুষের মর্যাদা সব কিছুর উপরে। যে নীতি অবলম্বন করলে মানুষের জীবন সুখ-শান্তিতে ভরে উঠবে, যে সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি অনুসরণ করলে তাদের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকবে, তাদের মান-মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পাবে– এক কথায় তাদের মানবজীবন সফল ও সার্থক হবে তা-ই কুরআনের শিক্ষা এবং তা-ই কুরআনের সংস্কৃতি। লেখক এ বিষয়টির প্রতি নানাভাবে ও নানা ভঙ্গিতে পাঠক-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস পেয়েছেন। আশা করি এ থেকে সকল পাঠক-বিশেষ করে নবীন যুগের আমাদের নবীন প্রজন্ম তাদের জীবনকে পূত-পবিত্র ও সফল করে গড়ে তোলার সঠিক দিক-নির্দেশনা পাবে।

আমি লেখকের এই মহৎ প্রচেষ্টাকে মুবারকবাদ জানাই এবং তার মহান সৃষ্টি 'কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি'র বহুল প্রচার কামনা করি।

উবায়দুল হক
৫-৬-২০০৩
(উবায়দুল হক)

Residence: 131/A Azimpur Road, Dhaka-1205, Bangladesh.
☎ 501890 Ph. No-8621724
منزل : ١٣١/اى عظيم فور رود، ڈاکا-١٢٠٥، بنغلاديش

www.amarboi.org

ASIAN UNIVERSITY OF BANGLADESH

Date ৩১. ০৫. ২০০৫

Dr. Quzi Din Muhammad
Pro-Vice-Chancellor

বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, পণ্ডিত, লেখক, প্রীতি ভাজন আব্দুল মতীন জালালাবাদী বহুদিন যাবত আমাদের দেশের সাংবাদিকতা ও সাহিত্যকর্মের সঙ্গে জড়িত। আমাদের আকীদা বিশ্বাস ধর্ম সংস্কৃতি ও আচার অনুষ্ঠান– এসব সম্বন্ধে তিনি সারা জীবন চিন্তা করেছেন, চর্চা করেছেন এবং প্রচুর লিখেছেন। 'কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি' তারই ফসল। তিনি এদেশের বুদ্ধিজীবী মহলে সুলেখক হিসেবে পরিচিত। প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে লিখিত বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত ইসলাম, কুরআন, আল্লাহ, রাসূল, সাহাবা-ই-কিরাম, মানুষের নৈতিক-চারিত্রিক-মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলী, মুসলিম সংস্কৃতি ও পর্বাদি সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এ গ্রন্থখানির পাতায় পাতায় বিধৃত। প্রবন্ধগুলি কুরআন হাদীসের আলোকে পরিশ্রুত তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ। অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে ইসলাম, আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কিত মতবাদ এবং আমাদের সমাজে পালিত পর্বাদি বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। গ্রন্থখানি বিদ্বান পণ্ডিতদের জন্য যেমন সুখপাঠ্য হবে তেমনি ইসলাম-আগ্রহী সাধারণ পাঠকের জ্ঞান সমৃদ্ধিরও সহায়ক হবে। আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের নানা সমস্যা ও তার সমাধানের প্রচেষ্টা এ প্রবন্ধগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

সংক্ষিপ্ততা লেখকের অন্যতম প্রধান গুণ। তাঁর পরিবেশনা সহজ ও স্বচ্ছ এবং ভাষা সাবলীল। বক্তব্য বিষয় অল্প কথায় পেশ করে এবং সংক্ষেপে ইতি টেনে পাঠকের মন জয় করতে পারেন। বক্তব্য বিষয়ে নিঃসংকোচ প্রকাশের মাধ্যমে গ্রন্থকারের অন্তর্নিহিত বহুদিন প্রোথিত ধারণা সহজ সরল প্রকাশতায় বিম্বিত।

পাণ্ডুলিপিখানি আমি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছি। গ্রন্থখানি বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যে একটি মূল্যবান সংযোজন। আমি লেখককে খোশ আমদেদ জানাই এবং গ্রন্থখানির বহুল প্রচার ও প্রসার কামনা করি।

তাঁর এ নিঃস্বার্থ পরিশ্রম আল্লাহর দরবারে কবুল হোক। আমিন।

কাজী দীন মুহম্মদ

Main Campus : House-9, Road-5, Sector-7, Uttara Model Town, Dhaka-1230, Tel : 896116, 892366, Fax : 880-2-896521
Dhanmondi Campus : House-72, Road-12 / A (New), Dhanmondi R/A, Dhaka-1209, Tel : 9132256

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

Dr. Muhammad Mustafizur Rahman
Ph. D (London), M. A., B. A. Hons. (Dhaka), M. F. (Dhaka)
PROFESSOR
DEPARTMENT OF ARABIC
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : (Off.) 9661900/4292
(Res.) 502784

الدكتور محمد مستفيض الرحمن
استاذ القسم العربي، جامعة داكا
داكا-١٠٠٠، بنغلاديش
التليفون : مكتب ٩٦٦١٩٠٠/٤٢٩٢
منزل ٥٠٢٤٨٣

"কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি" শীর্ষক পাণ্ডুলিপিটি আমি পড়েছি। মাওলানা আবদুল মতীন জালালাবাদী সাহেব দীর্ঘদিন ধরে নানা বিষয়ে বিশেষতঃ ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখে আসছেন। এটি তাঁর প্রকাশিত রচনাবলীর একটি সংকলন। দু'টি অধ্যায়ে ও সাতটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এ গ্রন্থটি তত্ত্ব ও তথ্য-সমৃদ্ধ একটি অনুপম সংযোজন। মানুষ জানতে চায়। জানার আগ্রহ অদম্য। এ আগ্রহ থেকেই জন্ম নেয় নব নব সৃষ্টি। জানার আগ্রহের পরিতৃপ্তির জন্যই চলছে নানা ধরনের প্রচেষ্টা অহরহ। আদিকাল থেকে এ ধারা অব্যাহত। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উপায়, উপকরণ ও উপাত্তের অপ্রতুলতা জানার আগ্রহকে করে স্তিমিত।

জালালাবাদী সাহেব এ সংকলনে এমন সব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যা সাধারণতঃ সহজলভ্য নয়। তাঁর সাবলীল ও আকর্ষণীয় রচনারীতি অবশ্যই পাঠকদের কাছে গ্রন্থটিকে করবে সুখ-পাঠ্য। বর্ণাঢ্য বিষয়বস্তুর সমাহার গ্রন্থটির একটি বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পরিচ্ছেদ হল "আল্লাহ্"। আল্লাহ্‌র পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা প্রণিধানযোগ্য। পুরা কুরআনের নির্যাস যেন তিনি তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে আল্লাহ্‌র বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এ এক অসাধারণ কৃতিত্ব। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি যদি আরো উদার হতেন এবং কুরআনে আল্লাহ্ যেভাবে নিজেকে বিভিন্ন নামের আবরণে, উদাহরণের অবয়বে ও বক্তব্যের ব্যঞ্জনায় প্রকাশ করেছেন, তা পরিবেশন করা হত, তাহলে তা হতো আরো অধিক শিক্ষণীয়।

জীবন ও জগত সম্পর্কিত অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর কুরআন ও হাদীসের নিরিখে এতে বিধৃত হয়েছে। জিজ্ঞাসু হৃদয়ের অনেক প্রশ্নেরই জবাব এতে বিদ্যমান। তাই একে বলা যায় "একের মধ্যে অনেক"। আল্লাহ্ লেখককে কবুল করুন, তাঁর লেখাকে কল্যাণকর করুন।

ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

www.amarboi.org

প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
বি. এ. (অনার্স) এম. এ. (ঢাকা)
এম. এ. (মিশিগান স্টেট [illegible])
পিএইচ. ডি. (লন্ডন)

মহাপরিচালক

বাংলা একাডেমী
৩ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ ঢাকা ১০০০
টেলিফোন ও অফিস: [illegible] বাসা: [illegible]
ফ্যাক্স: [illegible]
ই-মেইল : bacademy@citechco.net

পত্র সংখ্যা :

তারিখ : ২০-৩-১৪০৭
০৫-৭-২০০০

অভিমত

'কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি' একটি চমৎকার গ্রন্থ। দুটি অংশে বিভক্ত এ গ্রন্থটির প্রথম অংশে কুরআনের পরিচিতি এবং দ্বিতীয় অংশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয় গুরুত্বসহ স্থান পেয়েছে। লেখকের ভাষায় "কুরআনের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ। কিসে মানুষের কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ বিভিন্নভাবে তারই আলোচনা করা হয়েছে কুরআনে।"

কুরআন আল্লাহ্‌র বাণী। লেখক এই কুরআন অধ্যয়নের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন এবং সেই সাথে জর্জ বার্নার্ড শ'-এর উক্তি উদ্ধৃত করে বিষয়টিকে সহজবোধ্য করে দিয়েছেন। এটা পড়ে অনেকেই কুরআন অধ্যয়নে আগ্রহী হয়ে উঠবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় অংশের ৭টি পরিচ্ছেদে কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়সমূহ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়েছে, যাতে আল্লাহ তাআলার মহামূল্যবান বাণীর যথার্থতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হযরত মুহাম্মদ (সা:)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তাআলার বাণীটি হলো, "আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি এই কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছি (১৬:৮৯)।"

কুরআনের মূল শিক্ষা হলো আল্লাহ্কে চেনা, তার ওয়াহ্দানিয়াত বা একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া এবং তার আদেশ-নির্দেশ সম্পর্কে সচেতন থাকা। মূলত এটাই ঈমান এবং এটাই তাকওয়া। এ বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে লেখক সর্বত্রই চমৎকার মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। যে মহামানবের ওপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং যিনি ছিলেন কুরআনী আদর্শের বাস্তব রূপ এবং ক্ষমা ও করুণার মূর্তপ্রতীক, লেখক সেই মুহাম্মদ (সা:)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করে শুধু মুসলিমদের দৃষ্টিতে নয় বরং অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতেও যে মহানবী (সা:) বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব সে বিষয়টি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরেছেন।

ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানুষে মানুষে যে ভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয়েছিল তার মূলোৎপাটন করে ইসলাম মানুষকে নৈতিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলী অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছে। মানব সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, পরোপকার, শালীনতা, হিতাকাংক্ষা প্রভৃতি গুণাবলী অর্জনের আজ বড় বেশি প্রয়োজন, প্রয়োজন সারা বিশ্বের সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যথাযোগ্য ভূমিকা রাখার। 'কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি' এ ক্ষেত্রে একটি চমৎকার গাইডবুকের ভূমিকা পালন করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। শুধু মানবিক গুণাবলী নয়, কৃষি, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি-এসব ক্ষেত্রেও কুরআনের যে মানবতা-ভিত্তিক বিরাট অবদান রয়েছে তা লেখক অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

হারাম-হালাল, জিসমানী ও রূহানী খাদ্য, বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, মানুষ ও পশু, প্রভৃতি শিরোনামে বিষয়গুলোর ওপর কুরআনের দৃষ্টিতে সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ আলোচনার পর লেখক একের পর এক গুপ্তচর বৃত্তি, তাসাওউফ প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে 'জীবন-মৃত্যু পরকাল'-এ গিয়ে আলোচনার ইতি টেনেছেন। এই আলোচনা শুধু পাণ্ডিত্যপূর্ণ নয়; এর মধ্যে চিন্তার খোরাক ও শিক্ষার উপাদান রয়েছে জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য।

গ্রন্থটি পড়ে পাঠকবর্গ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

(ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন)
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

www.amarboi.org

সবিনয় নিবেদন

এ পুস্তকের সব ক'টি প্রবন্ধই ইতিপূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অতপর সাধারণ্যে ব্যাপক প্রচারের জন্য এর একাধিক প্রবন্ধ কোনো কোনো ধর্মীয় ও মানবতাবাদী সংস্থা কর্তৃক পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে। কোনো কোনো প্রবন্ধের উপর ভিত্তি করে প্রায় এক যুগ আগে বড় আকারের পুস্তকও রচিত হয়েছে এবং তা একাধিক বার প্রকাশিতও হয়েছে। তাই প্রবন্ধগুলো সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই অনেক পণ্ডিতজনের মতামত জানতে পেরেছি এবং সে অনুযায়ী এতে আরেক দফা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা সংক্ষেপণের সুযোগ পেয়েছি। ফলে স্বাভাবিকভাবে সবগুলো প্রবন্ধই আরো পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ হয়েছে।

পঞ্চাশ দশকের শেষপাদে অধুনালুপ্ত দৈনিক ইত্তেহাদে সাংবাদিকতায় আমার হাতে খড়ি। সর্বপ্রথম ঐ পত্রিকায়ই এ পুস্তকের একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অতপর অনিবার্য কারণে বেশ কিছুকাল বিরতির পর কিছুটা ধীর লয়ে দৈনিক আজাদ (অধুনালুপ্ত), মাসিক সওগাত (অধুনালুপ্ত), মাসিক মোহাম্মদী (অধুনালুপ্ত), মাসিক শান্তিদূত (অধুনালুপ্ত), মাসিক সমাজকল্যাণ (অধুনালুপ্ত), মাসিক ডিটেকটিভ (অধুনালুপ্ত), মাসিক আল ইসলাহ, মাসিক কৃষিকথা, সাপ্তাহিক প্রবাসীর ডাক (বর্তমানে সিলেটের ডাক) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় এর বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। অতপর পেশাগত এবং কিছুটা আর্থিক কারণেও আমাকে বেশ কিছুদিন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখালেখি করতে হয়। তাই এ পুস্তকের প্রবন্ধের সংখ্যা ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত খুব একটা উল্লেখযোগ্য ছিল না।

এটাকে পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, ১৯৭৩ সালের কোনো এক সময়ে আমি মুজাদ্দিদে যামানা হযরত মাওলানা আযানগাছী সূফী মুফতী সাহেব (রহঃ)-এর মিশন সম্পর্কে অবহিত হই। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রাঃ)-এর বংশধর এবং কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের উপর গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ও বিভিন্ন তরীকায় ফায়যপ্রাপ্ত এ সিদ্ধপুরুষ বিংশ শতাব্দীর সূচনায় আপন পিতা থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিরাট জমিদারী ও যাবতীয় ধন-সম্পদ, আল্লাহর রাহে উৎসর্গ করে দেন এবং কোনোরূপ পারিশ্রমিক না নিয়ে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানানোর কাজে ব্রতী হন। তাঁর আহ্বান, 'বিনা পয়সায় দ্বীন-দুনিয়ার শান্তি ও মঙ্গলের আহ্বান' নামে খ্যাত। তিনি সকল মানুষকে—বিশেষ করে অধঃপতিত মুসলিম

www.amarboi.org

উম্মাহকে কুরআন চর্চার প্রতি আহ্বান জানান এই বলে যে, "পবিত্র কুরআন হলো মানুষের ইহ-পরকালীন যাবতীয় মঙ্গলের চাবিকাঠি। অতএব এতে কি আছে তা জানা এবং বুঝা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। এটা প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার পয়গাম বা চিঠি। এ কুরআনেরই হেদায়াত ও আলো পেয়ে তৎকালীন বিশ্বের সবচেয়ে মূর্খ ও পশ্চাৎপদ বেদুইন আরবরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সমগ্র বিশ্বের ইমাম ও পথপ্রদর্শক হতে পেরেছিল। কুরআনের অর্থ ও মর্ম বুঝতে পারলে এ যুগের মানুষও ঐ একই মর্যাদা লাভ করতে পারবে। মানুষের যাবতীয় জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব রয়েছে পবিত্র কুরআনে। আপনি যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হোন না কেন, কুরআন খুলে পড়তে থাকুন এবং তার অর্থের দিকে খেয়াল করুন—কিভাবে ও কোন্ পদ্ধতিতে আপনার সমস্যার সমাধান করতে হবে তা ইশারা-ইঙ্গিতে হলেও অনায়াসে জেনে নিতে পারবেন।"

মাওলানা আযানগাছীর এ আশাব্যঞ্জক আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত তাবলিগী প্রতিষ্ঠান 'হাক্কানী আনজুমান'-এ যোগদান করি এবং নতুন উদ্যমে কুরআন অধ্যয়ন ও গবেষণায় মনোনিবেশ করি।

অতপর আশির দশকের প্রথম দিকে, বলতে গেলে আল্লাহ্ তাআলার এক গায়বী ইশারায় হযরত মাওলানা আযানগাছী (রহঃ)-এর যবান মুবারক-নিঃসৃত কুরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যা, হিকমতপূর্ণ বাণী ও ফাতওয়াসমূহের বেশ কয়েকটি হস্তলিখিত নোট আমার হস্তগত হয়, যা সরাসরি তাঁরই নিকট থেকে তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য মরহুম সূফী খান বাহাদুর আবূ নসর মুহাম্মদ আলী সাহেব লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এ নোটগুলো পাওয়ার পর তারই উপর ভিত্তি করে হাক্কানী আনজুমানের 'কুরআন ক্লাস', যার দায়িত্ব ইতিমধ্যে আমার উপর অর্পিত হয়েছিল, বেশ সুচারুরূপে পরিচালনা করতে থাকি। সেই সাথে কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন বৈঠক-মজলিসে বক্তৃতা দিই এবং বেশ কিছু প্রবন্ধও রচনা করি, যা উপরোক্ত পত্র-পত্রিকা ছাড়াও আমার সম্পাদিত মাসিক দ্বীনে হানীফে প্রকাশিত হতে থাকে। যে মাসে একাধিক প্রবন্ধ তৈরী হয়ে যেত, সাধারণত সম্পাদকীয়রূপে অথবা স্বনামে অথবা বিভিন্ন ছদ্মনামে তা প্রায় সংগে সংগেই প্রকাশের ব্যবস্থা করতাম। ঐ সমস্ত প্রবন্ধের বেশীর ভাগই এ পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন অযত্নে ও অরক্ষিত অবস্থায় থাকার ফলে মাঝে মাঝে কিছুটা অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া এবং আরবী, উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী ভাষার মিশ্রণে লিখিত মরহুম খান বাহাদুর সাহেবের নোটগুলো নেহাত সংকেতমূলক

www.amarboi.org

হলেও আমি তা থেকে যে ফায়য ও বরকত লাভ করি তা নিসন্দেহে আমার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

প্রসঙ্গত আরো উল্লেখ্য, আজ থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে ঢাকাস্থ ইসলাম প্রচার সমিতি কর্তৃক পরিচালিত 'ডাকযোগে কুরআন অধ্যয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ে আমি পবিত্র কুরআন অবলম্বনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বেশ কিছু প্রবন্ধ রচনা করি। তা থেকে কিছু প্রবন্ধ 'ডাকযোগে কুরআন অধ্যয়ন'-এর 'পত্র-পাঠ' হিসাবে মুদ্রিত আকারে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রেরণ করা হয় এবং তা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল পাঠকের কাছেই সমাদর লাভ করে। পরবর্তী সময়ে কিছু প্রবন্ধ কথিকা হিসাবেও বেতারে প্রচারিত হয়। কিছু প্রকাশিত হয় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক অগ্রপথিক, মাসিক সবুজ পাতা, সীরাত স্মরণিকা ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায়, যার অধিকাংশই এই পুস্তকে সংকলিত হয়েছে।

এখানে আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ না করলেই নয়। আর সেটি হলো, খানকা-ই-সিরাজিয়ার বাংলাদেশ শাখার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ডঃ সাইয়িদ মুহাম্মদ আলী কর্তৃক ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির উপর উর্দু ভাষায় সুলিখিত একটি পাণ্ডুলিপি, যা খানকা-ই-সিরাজিয়ার বর্তমান পরিচালক ও মাসিক দ্বীনে হানীফের প্রধান পৃষ্ঠপোষক পরম শ্রদ্ধেয় ভাইয়া হান্নান নব্বই দশকের প্রথম দিকে আমাকে 'হাদিয়া স্বরূপ' দান করেছিলেন। এ পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে আমি বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করি যা আমার সম্পাদিত মাসিক দ্বীনে হানীফে প্রকাশিত হয়। ঐসব প্রবন্ধের কিছু কিছু এই গ্রন্থেও সংকলিত হয়েছে।

এ পুস্তক রচনা করতে গিয়ে আমি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে আরো অনেক বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি, যার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে।

ইতিমধ্যে আমার লিখিত অথবা অনূদিত কুড়িটিরও অধিক পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে এবং ডজনখানেক প্রকাশের পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু এ পুস্তকটি লিখতে গিয়ে আমি যে মানসিক শান্তি ও তৃপ্তি পেয়েছি তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই।

ইসলামের ফারায়িয, আহকাম, আরকান এবং হালাল ও হারামের উপর গতানুগতিক আলোচনা-সম্বলিত কোনো পুস্তক এটি নয়। কেননা ঐ ধরনের প্রচুর বই-পুস্তক বাজারে পাওয়া যায়। আমি বরং এমন সব বিষয়কে এর

www.amarboi.org

আলোচ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছি যেগুলো সম্পর্কে খুব একটা বই-পুস্তক লেখা হয়নি, অথচ মানব জীবনকে সফল করার জন্য ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই এগুলো সম্পর্কে জানার ও চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

পবিত্র কুরআনের উপর আমি এ যাবৎ যে পড়াশুনা ও চিন্তা-গবেষণা করেছি তার উপর ভিত্তি করে কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে নতুন নতুন আরো অনেক কিছু লেখার বাসনা আছে। যদি আরো দু' চার বছর আয়ু পাই এবং আল্লাহ্ তাআলা তাওফীক দেন তাহলে এ বিষয়ের উপর নিশ্চয়ই আরো কিছু প্রবন্ধ লিখবো এবং তা এ পুস্তকের পরবর্তী সংস্করণে অথবা পৃথক শিরোনামের কোনো পুস্তকে প্রকাশের ব্যবস্থা করবো।

অবশেষে একটি বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধেয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর তাহলো, কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বলতে আল্লাহ্, রাসূল ও 'উলূল আমর'-প্রদর্শিত শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেই বুঝায়। আর এ শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অনুসরণ করার জন্যই কুরআনের নির্দেশ-"তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহর, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে 'উলূল আমর' (রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত, মানব জীবনের উদ্ভূত সমস্যার সমাধানদাতা ইমাম ও মুজতাহিদ এবং ব্যাপক অর্থে সৎপথ-প্রদর্শনকারী যে কোনো মুমিন ও মুসলিম)।" উপরোক্ত তত্ত্বটি মনে রেখেই আমি এ পুস্তকের নাম 'কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি' রেখেছি।

এ পুস্তক রচনা করতে গিয়ে আমি বরাবরের মত আমার সহধর্মিণী বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক বেগম বুলবুল চৌধুরী ও তিন মেয়ে তামান্না চৌধুরী (নীলা), তাবকিয়া চৌধুরী (মিতা) ও আসফিয়া চৌধুরী (মিলা)-এর সক্রিয় সহযোগিতা পেয়েছি।

এ দেশের প্রখ্যাত চারজন মুসলিম মনীষী, যারা দেশে-বিদেশে স্বনামখ্যাত, সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও স্ব স্ব ক্ষেত্রে এক একজন দিকপাল—নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও নিজেদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমার পেশকৃত বিরাট পাণ্ডুলিপিটি পড়ে নিজেদের যে সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করেছেন, তা একেবারে হুবহু, পুস্তকের সূচনায় সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে পুস্তকটির শুধু সৌন্দর্যই বৃদ্ধি পায়নি, এর নগণ্য লেখক হিসাবে আমিও যারপর নেই অনুগৃহীত হয়েছি।

পুস্তকটি প্রকাশের ব্যাপারে আধুনিক প্রকাশনীর কার্যকরী কমিটির সম্মানিত সদস্যবর্গ এবং এর কম্পোজ, প্রুফ রিডিং, মেক-আপ, কভার ডিজাইন, বাইন্ডিং

www.amarboi.org

ও এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবৃন্দ—বিশেষ করে সুযোগ্য পাবলিকেশন্স ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হুসাইনের কাছ্ থেকে যে আন্তরিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি তা আজীবন মনে থাকবে।

আল্লাহ্ তাআলা এ পুস্তকটিকে আমার, আমার মরহুম পিতামাতা ও উপরে উল্লেখিত সকলের দ্বীন-দুনিয়ার শান্তি ও মঙ্গলের 'যারীআহ্' করুন। আ-মী-ন।

আহ্‌কার

আবদুল মতীন জালালাবাদী
৩২/১, এনায়েত গঞ্জ লেন,
ঢাকা-১২০৫
তারিখ ঃ ....

www.amarboi.org

www.amarboi.org

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ কুরআন পরিচিতি	২১
১. আভাষ	২২
২. খোদ আল্লাহর বাণী	২৪
৩. জীবন্ত মুজিযা	৫০
৪. সাম্য ও শান্তির পয়গাম	৫৩
৫. অধ্যয়নের ধারা	৫৬
৬. সংকলনের ইতিহাস	৫৮
৭. টুকিটাকি তথ্য	৬১
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি	৬৪
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ	৬৭
১. আল্লাহর পরিচয়	৬৭
২. আত্মার স্বীকারোক্তি	৭০
৩. তাওহীদের স্বরূপ	৭৩
৪. জীবন পথের অবলম্বন	৭৬
৫. আল্লাহর আনুগত্য	৭৮
৬. একত্ববাদের গুরুত্ব	৮২
৭. তাক্ওয়া	৯০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)	৯৪
১. রাসূল জীবন অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা	৯৪
২. পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ	১০২
৩. দু'আর ফসল ও ভবিষ্যদ্বাণীর নিদর্শন	১০৫
৪. ক্ষমা ও করুণার মূর্তপ্রতীক	১১১
৫. কথা ও কাজে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)	১২৫
৬. সঠিক জীবন পদ্ধতি	১২৮
৭. বিশ্বজগতের রহমত	১৩১
৮. রাসূল (সাঃ)-এর হিজরত	১৩৩
৯. অন্যের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)	১৩৭

www.amarboi.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম ১৭১
১. ইসলামের বুনিয়াদ ১৭১
২. প্রকৃতির ধর্ম ১৭২
৩. ইসলাম-প্রচার-পদ্ধতি ১৭৫
৪. ইসলামের নামকরণ ১৮১
৫. ইসলাম ও মানবীয় সম্বন্ধ ১৮৩
৬. ভেদ বৈষম্যের মূলোৎপাটনে ইসলাম ১৮৬
৭. সহজাত বিচারশক্তি ১৮৯
৮. ইসলামের কতিপয় বৈশিষ্ট্য ১৯২
৯. ধর্ম সবচেয়ে বড় নি'মাত ১৯৫
১০. ইসলামের জীবন দর্শন ১৯৭
১১. ইসলাম ও সিয়াসাত ২০০
১২. ইসলাম-নির্দেশিত ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও স্বাধীনতা ২০৬
১৩. ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার ও মর্যাদা ২১১
১৪. আরব কেন ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি ? ২৩৬
১৫. ত্রিধর্ম ঐক্য ২৫১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ সাহাবা কিরাম ও উম্মতে মুসলিমা ২৫৪
১. সাহাবা কিরাম (রাঃ) ২৫৪
২. উম্মতে মুসলিমার বৈশিষ্ট্য ২৬০
৩. মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব ২৬২

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ নৈতিক, চারিত্রিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলী ২৭৪
১. মানবতা ২৭৪
২. সালাম ২৮৫
৩. ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধ ২৯০
৪. শান্তি-শৃঙ্খলা ২৯৩
৫. আমানত প্রত্যর্পণ ২৯৬
৬. সৎকর্মে প্রতিযোগিতা ২৯৯
৭. সদাচরণ ৩০১
৮. ন্যায়-বিচার ৩০৫
৯. জনসেবা ৩০৮
১০. আদাবে মুআশারাত ৩১৭
১১. গোপনীয়তা রক্ষা ৩১৯

www.amarboi.org

১২. অঙ্গীকার পালন ৩২১
১৩. শালীনতা ৩২৬
১৪. ইবাদাত ও আখলাক ৩৩১
১৫. কথা বলার রীতি ৩৩৩
১৬. মিতব্যয়িতা ৩৩৫
১৭. আল্লাহর পথে ব্যয় ৩৩৮
১৮. পানাহারে সংযম ৩৪১
১৯. শোক্‌র ৩৪৪
২০. সব্‌র ৩৪৬
২১. হিতাকাঙ্খা ৩৪৯
২২. আত্মীয়তার বন্ধন ৩৫১
২৩. দু'আ ৩৫৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ কৃষি-কৃষ্টি-সংস্কৃতি ৩৫৮
১. কৃষি ৩৫৮
২. ইসলামের পর্ব ৩৬৫
৩. মুহাররম ও আশূরা ৩৭০
৪. রাবীউল আউয়াল ৩৭২
৫. ইস্‌রা ও মিরাজ ৩৭৪
৬. শবে বরাত ও শবে কদর ৩৭৭
৭. ঈদুল আযহা ৩৮০
৮. জন্মবার্ষিকী পালন ৩৮৩
৯. সংস্কৃতি ৩৮৬

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ বিবিধ ৩৯৬
১. ভয় ও দুঃখ ৩৯৬
২. ইল্‌ম ও আমল ৩৯৯
৩. স্বাধীনতার মর্মকথা ৪০১
৪. মুমিন ও মুসলিম ৪০৪
৫. হালাল ও হারাম ৪০৭
৬. একটি চমৎকার আচরণবিধি ৪১০
৭. ইবাদাতের উদ্দেশ্য ৪১২
৮. জিসমানী ও রূহানী খাদ্য ৪১৪
৯. বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী ৪১৭

www.amarboi.org

১০. মানুষ ও পশু ৪১৯
১১. শান্তির ঠিকানা ৪২২
১২. সময়ের সদ্ব্যবহার ৪২৪
১৩. প্রশ্নপত্র ফাঁস ৪২৬
১৪. আত্মহত্যা ৪২৮
১৫. অন্যায় সুপারিশ ৪৩০
১৬. মিথ্যাচার ৪৩২
১৭. গুপ্তচর বৃত্তি ৪৩৫
১৮. শ্রমের মর্যাদা ৪৩৯
১৯. জীবিকা অর্জনের পন্থা ৪৪৪
২০. তাসাওউফ ৪৪৮
২১. জীবন মৃত্যু পরকাল ৪৫৫

www.amarboi.org

প্রথম অধ্যায়

কুরআন পরিচিতি

www.amarboi.org

১. আভাষ

কুরআন একটি ঐশী গ্রন্থ। বিশ্বময় আলোড়ন সৃষ্টিকারী এ গ্রন্থ অবতীর্ণ হয় শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর উপর।

মানব জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান রয়েছে কুরআনে। একটি অনুন্নত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও দিশেহারা জাতিকে উন্নতি ও প্রগতির দিকে ধাপে ধাপে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়, কুরআনে রয়েছে তার পরিষ্কার দিক-নির্দেশ। মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে কিভাবে সুখ-শান্তিতে ভরে তোলা যায় তার সুন্দর ব্যবস্থাপত্র রয়েছে কুরআনে।

কুরআনের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে মানুষ। কিসে মানুষের কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ—বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন ভংগীতে তারই আলোচনা করা হয়েছে কুরআনে।

কুরআনে কল্পনাপ্রসূত একটি উক্তিও নেই। এমন কোনো বাক্য নেই যা অনুমানভিত্তিক বা অর্থহীন। মানুষের উদ্দেশ্যে প্রেরিত তাদের সৃষ্টিকর্তার এ পয়গামের প্রত্যেকটি শব্দ এবং প্রত্যেকটি বাক্য সত্য ও সুন্দরের প্রতীক।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদ, সামূদ, লূত প্রভৃতি জাতির উত্থান-পতনের নিখুঁত ইতিহাস রয়েছে কুরআনে। কুরআনে বর্ণিত ঐ সমস্ত ঘটনাকে এক কালে নিছক কিস্‌সা-কাহিনী বলে মনে করা হলেও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান তার অধিকাংশকেই ইতিমধ্যে নির্ভেজাল সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। কুরআনে বর্ণিত যে সমস্ত ঘটনার সত্যতা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাছে এখনো ধরা পড়েনি, কালের অগ্রগতিতে তাও যে একদিন সত্য বলে প্রমাণিত হবে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

সেই আদিকাল থেকে ক্ষণস্থায়ী ধন ও জনের গর্বে গর্বিত বিভিন্ন দেশের কিছু সংখ্যক অপরিণামদর্শী ও অকৃতজ্ঞ মানুষ বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন সময়ে কিভাবে তিলে তিলে সীমালংঘন তথা অধপতনের শেষ স্তরে নেমে গিয়েছিল এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছিলেন ও তাদের জুলুম-নির্যাতন থেকে তাঁর নিরীহ নিরপরাধ অনুগত বান্দাদেরকে কিভাবে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত পন্থায় রক্ষা করেছিলেন তার চমকপ্রদ বর্ণনা রয়েছে কুরআনে।

www.amarboi.org

সংক্ষেপে বলতে গেলে, একজন মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে এবং একটি জাতি, দেশ ও রাষ্ট্রের মধ্যে যত রকম সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, কুরআন সেসব সমস্যার সার্বিক সমাধানের মূলসূত্র তুলে ধরেছে মানবজাতির সামনে।

বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত ঐশী গ্রন্থ আল কুরআনের গুণ এবং বৈশিষ্ট্য বলে শেষ করার মত নয়। কুরআন যে একটি অতুলনীয় গ্রন্থ তা অনেক অমুসলিমও এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। যেমন ঃ

ঐতিহাসিক লেনপোল বলেন, "শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দুনিয়ার উপর পাপাচারের যেসব আচ্ছাদন পড়েছিল, কুরআন সে সবের মূলোৎপাটন করলো। কুরআন বিশ্বকে উন্নত মানবিক চরিত্র, নাগরিক আইন এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করলো। অত্যাচারীদের হৃদয়বান এবং বর্বরদের ধার্মিক বানিয়ে ছাড়লো। এই পবিত্র গ্রন্থ দুনিয়ায় না এলে মানবিক চরিত্র সমূলে ধ্বংস হয়ে যেত, আর দুনিয়ার মানুষ হত 'নামকা ওয়াস্তে' মানুষ।"

ঐতিহাসিক রেভারেণ্ড বসওয়ার্থ বলেন, "মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন এমন এক ব্যক্তি, যিনি না লিখতে পারতেন আর না পড়তে জানতেন, অথচ তিনি এমন একটি গ্রন্থ উপহার দিলেন, যা একাধারে ছিল পদ্যগ্রন্থ, গদ্যগ্রন্থ, আইনগ্রন্থ ও উপাসনাগ্রন্থ। আজ বিশ্বের এক-ষষ্ঠাংশ অধিবাসী কুরআনের বর্ণনাভঙ্গী, সত্যতা এবং জনপ্রিয়তাকে একটি জীবন্ত মুজিযা (অলৌকিক বস্তু) বলে মনে করে। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক এই একটি মাত্র মুজিযারই দাবী করেছিলেন এবং একে একটি জীবন্ত মুজিযা রূপে প্রতিষ্ঠিতও করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি মুজিযাও বটে।"

ফরাসী ভাষায় কুরআনের অনুবাদক ডক্টর মরিস বুকাইলী বলেন, "কুরআনের যদি কোনো নিখুঁত বৈশিষ্ট্য থেকে থাকে, তো সেটা হলো তার অপরূপ প্রকাশ ভংগী ও অদ্বিতীয় বর্ণনাশৈলী। বিষয়বস্তুর পরিপাট্যে এবং ভাবের গাম্ভীর্যে কুরআন সমস্ত ঐশী গ্রন্থকে ছাড়িয়ে গেছে। বরং আমরা এও বলতে পারি যে, অনাদি অনন্ত প্রভু তার অসীম অনুগ্রহে মানুষের জন্য যেসব গ্রন্থ দিয়েছেন, কুরআন সে সবের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। মানুষের মংগল সাধনের ক্ষেত্রে কুরআনের সুর গ্রীকদর্শনের সুর হতেও অনেক উর্ধে। হযরত দাউদের যুগ হতে জন তালমুসের যুগ পর্যন্ত যে সমস্ত আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছে তার কোনোটিই কুরআনের একটি ছোট্ট সূরার সাথেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে উঠতে পারেনি। এর সত্য-সনাতন ও অনবদ্য ভাব-ব্যঞ্জনা—যা দিনের পর দিন মানুষের মনোজগতে উদ্ভাসিত হচ্ছে, এর অপরূপ তথ্য-রহস্য যা কোনোদিনই

www.amarboi.org

সেকেলে হবার নয়—প্রত্যক্ষ করে মুসলিম পাঠক মাত্রেই একে একটি গর্বের বস্তু বলে মনে করে।"

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও দার্শনিক টলস্টয় বলেন, "কুরআন মানব জাতির একটি শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক। এর মধ্যে আছে শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, জীবিকা অর্জন ও চরিত্র গঠনের নিখুঁত দিক-দর্শন। দুনিয়ার সামনে যদি এই একটি মাত্র গ্রন্থ থাকত এবং কোনো সংস্কারকই না আসতেন তবু মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য এটিই ছিল যথেষ্ট।"

সাহিত্যিক দার্শনিক কারলাইল বলেন, "কুরআনকে এমন এক সময়ে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরা হয় যখন পূর্ব হতে পশ্চিম এবং উত্তর হতে দক্ষিণ—তথা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে ছিল ধর্মহীনতার অবাধ রাজত্ব। মুছে গিয়েছিল মানবতা, সৌজন্যতা এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির নাম-নিশানা, দিকে দিকে ছিল অশান্তি ও অরাজকতার আধিপত্য এবং ব্যক্তিপূজার ঘনঘটা। কুরআন মানুষকে বাত্লে দিল শান্তির পথ, তাদের অন্তর ভরে দিল প্রেম-ভালবাসায়। ফলে কেটে গেল ফিতনা-ফাসাদের কালো মেঘ, প্রতিহত হলো জুলুম-অত্যাচারের দুর্বার গতি। পথভ্রষ্টরা পথে এলো, আর বর্বররা সভ্য হলো। এ গ্রন্থ পাল্টে দিল দুনিয়ার কায়া। কুরআন মূর্খকে জ্ঞানী, অত্যাচারীকে হৃদয়বান এবং খোদাদ্রোহীকে আল্লাহভীরুতে পরিণত করলো। এই সেই গ্রন্থ, যা আজ চল্লিশ কোটি মানুষের মনোরাজ্যের অধিপতি এবং তাদের পরম শ্রদ্ধার বস্তু।"

সত্যি কথা বলতে গেলে, কুরআনের দৃষ্টান্ত সে নিজেই। যে যত গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করবে, তার চোখে ততবেশী ধরা পড়বে কুরআনের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য।

২. খোদ আল্লাহর বাণী

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর রিসালতকে জানার জন্য আজ আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় মাধ্যম হচ্ছে এ গ্রন্থ—যে গ্রন্থকে রাসূল (সাঃ) এই বলে সর্বসমক্ষে পেশ করেছিলেন যে, এটা খোদ আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে অবতীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু এ গ্রন্থের তথা কুরআনের এমন কী বৈশিষ্ট্য আছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এটা খোদ আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে? হ্যাঁ, এর অনেক বৈশিষ্ট্য আছে বৈ কি! আমরা নীচে অতি সংক্ষেপে এর মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করছি।

www.amarboi.org

সর্বপ্রথম কুরআনের যে বৈশিষ্ট্যটি তার পাঠককে প্রভাবিত করে তাহলো তার সেই চ্যালেঞ্জ, যা সে চৌদ্দশ' বছর আগে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কারো পক্ষেই এ চ্যালেঞ্জের মুকাবালা করা সম্ভব হয়নি। কুরআনে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে, যারা কুরআনের, 'আল্লাহর গ্রন্থ' হওয়া সম্পর্কে সন্দিহান এবং এটাকে স্রেফ মনুষ্যরচিত একটি গ্রন্থ বলে মনে করে, তারা সামর্থ্য থাকলে যেন এমনি একটি গ্রন্থ, বরং এর যে কোনো সূরার মত একটি সূরা রচনা করে নিজেদের দাবীর যথার্থতা প্রমাণ করে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ص وَادْعُوْا شُهَدَاۤءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○(البقرة : ٢٣)

"আমি আমার বান্দার (দাসের) প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি তাতে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকলে তোমরা তার অনুরূপ কোনো সূরা নিয়ে আস এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের সকল সাক্ষীকে আহ্বান করো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩)

এটা এমন একটা বিস্ময়কর দাবী, যা মানব-ইতিহাসে কোনো গ্রন্থকারই নিজের গ্রন্থের পক্ষে করেননি এবং জ্ঞানবুদ্ধি থাকা অবস্থায় কেউ এমন দাবী করার সাহসও পাবেন না। কেননা কোনো ব্যক্তির পক্ষেই এটা সম্ভব নয় যে, তিনি এমন এক গ্রন্থ রচনা করে ফেলবেন যার সমতুল্য গ্রন্থ অন্য কোনো মানুষই রচনা করতে পারবে না। কেননা প্রত্যেকটি মনুষ্য-রচনার সমতুল্য রচনা তৈরী করা অবশ্যই সম্ভব। কুরআনের এই দাবী যে, সে এমন একটি বাণী, যার সমতুল্য বাণী তৈরী করা মনুষ্য-প্রতিভার পক্ষে সম্ভব নয়—এবং দেড় হাজার বছর পর্যন্ত কোনো মানুষের পক্ষে এরূপ করতে সক্ষম না হওয়াটা—নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে, এটা কোনো মানুষের ভাব ও ভাষা থেকে নয়, বরং ঐশী উৎস (Divine Origin) থেকে বেরিয়ে এসেছে। আর যে জিনিস ঐশী উৎস থেকে বের হয় তার জবাব কি মানুষ দিতে পারে ?

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এ চ্যালেঞ্জ ইতিমধ্যে কেউ কেউ গ্রহণ করেছেও। কিন্তু সফলকাম হতে পারেনি। সর্বপ্রথম ঘটনা লাবীদ বিন রাবী'আর, যিনি তার শক্তিশালী ভাষা ও তেজোদীপ্ত ভাবের জন্য সমগ্র আরবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কুরআনের চ্যালেঞ্জের জবাবে একটি কবিতা রচনা করেন, যা কা'বা শরীফের চৌকাঠের উপর ঝুলিয়ে রাখা হয়। তখনকার দিনে শুধুমাত্র অতি মর্যাদাসম্পন্ন কবিদের কবিতার প্রতিই অনুরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হতো। কিন্তু

www.amarboi.org

এ ঘটনার পর পরই কোনো একজন মুসলমান কুরআনের একটি সূরা লিখে ঐ কবিতার পাশেই ঝুলিয়ে দেয়। লাবীদ (যিনি তখনও মুসলমান হননি) যখন পরের দিন কা'বার দরজায় এলেন এবং ঐ সূরা পাঠ করতে শুরু করলেন তখন তার প্রথম কয়েকটি আয়াত (পংক্তি) পাঠ করার পরই তার মধ্যে এমন এক অস্বাভাবিক ভাবান্তর দেখা দিল যে, তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন, 'নিসন্দেহে এটা কোনো মানুষের কথা নয় এবং আমি এর উপর ঈমান আনলাম।' শুধু এখানেই শেষ নয়, আরবের ঐ বিখ্যাত কবি কুরআনের ভাব ও ভাষা থেকে এতবেশী প্রভাবিত হন যে, সেদিন থেকে তার কবিতা রচনারও পরিসমাপ্তি ঘটে। পরবর্তী সময়ে একদা হযরত উমর (রাঃ) তাকে কবিতা রচনার প্রতি আহ্বান জানালে তিনি উত্তরে বলেন, 'যখন আল্লাহ তাআলা আমাকে 'সূরা আল বাকারাহ' ও 'সূরা আলে ইমরান'-এর মত বাণী দিয়েছেন তখন কবিতা রচনা আমার জন্য আর শোভা পায় না।

দ্বিতীয় ঘটনা হলো ইবনে মুকাফ্ফা-এর। এ ঘটনা প্রথমটির চাইতেও চাঞ্চল্যকর। এ সম্পর্কে জনৈক প্রাচ্যবিদ (Wollaston) বলেন ঃ

"That Muhammad's boast as to the literary excellence of Quran was not unfounded, is further evidence by a circumstance, which occurred about a century after the establishment of Islam."

অর্থাৎ "কুরআনের অলৌকিক বাণী হওয়া সম্পর্কে মুহাম্মদ (সাঃ) যে দম্ভোক্তি করেছিলেন তা যে ভুল ছিল না, তা এ ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, যা ইসলামের আবির্ভাবের একশ' বছর পর ঘটেছিল।"

আর ঘটনাটি হলো, ইসলাম বিরোধীদের একটি দল যখন দেখলো, কুরআন মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে—তখন তারা সিদ্ধান্ত নিল, এর সমমানের একটি গ্রন্থ তারা রচনা করবেই। তারা এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইবনে মুকাফ্ফার (ইং৭২৭ সন) শরণাপন্ন হলো, যিনি ছিলেন ঐ যুগের সাতিশয় জ্ঞানী, প্রখ্যাত সাহিত্যিক এবং বিস্ময়কর প্রতিভা ও ধীশক্তির অধিকারী। ইবনে মুকাফ্ফা-এর তার নিজের উপর এতবেশী আস্থা ছিল যে, তিনি তাতে রাজী হয়ে যান এবং কথা দেন যে, এক বছরের মধ্যেই তিনি এ কাজ সমাধা করে দেবেন। অবশ্য এ ব্যাপারে তিনি এ মর্মে একটি শর্ত আরোপ করেন যে, এ পুরো সময়টায় তার যাবতীয় সাংসারিক প্রয়োজনাদি পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তিনি পুরো মনোনিবেশ সহকারে নিজেকে এ কাজে নিয়োজিত রাখতে পারেন।

www.amarboi.org

নির্দিষ্ট সময়ের অর্ধেকটা অতিবাহিত হওয়ার পর তার সংগীরা কি পরিমাণ কাজের অগ্রগতি হয়েছে তা জানার জন্য তার কাছে গেল। কিন্তু তারা দেখতে পেল যে, ইরানী বংশদ্ভূত বিখ্যাত ঐ আরবী সাহিত্যিক অত্যন্ত ধ্যানমগ্ন অবস্থায় হাতে একটি কলম নিয়ে বসে আছেন। তার সামনে রয়েছে একটি সাদা কাগজ। আর তার আসনের আশেপাশে এবং কক্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছিড়া-ফাড়া কাগজের স্তূপ আর স্তূপ। অসীম প্রতিভাধর এবং যাদুকরী ভাষার অধিকারী ঐ ব্যক্তি এতদিন আপন সর্বশক্তি ব্যয় করে কুরআনের অনুরূপ একটা কিছু রচনার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। তিনি অত্যন্ত লজ্জাবনত অবস্থায় নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন যে, স্রেফ একটি পংক্তি রচনার পিছনেই তিনি ছয় মাস কাটিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তাতেও সফলকাম হননি। যা হোক, শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত লজ্জিত ও নৈরাশ্য মনে তিনি তার ঐ সংকল্প পরিত্যাগ করেন।

কুরআনের ঐ চ্যালেঞ্জ এখনো যথারীতি বিদ্যমান। শতাব্দীর পর শতাব্দী গত হয়েছে। কিন্তু কেউই এ চ্যালেঞ্জের মুকাবালা করতে পারেনি। কুরআনের এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা নিসন্দেহে প্রমাণ করে যে, এটি হচ্ছে এমন একটি সত্তার বাণী যিনি সবার উপরে এবং সবকিছুর উর্ধে। যদি মানুষের মধ্যে চিন্তাশক্তি থাকে তাহলে আল্লাহ্‌র উপর তার ঈমান আনার জন্য শুধুমাত্র এ একটি ঘটনাই যথেষ্ট।

এটা ছিল কুরআনের ভাষারই যাদুকরী প্রভাব যে, আরবের লোক, যারা নিজেদের অলংকারসমৃদ্ধ ভাষাশৈলীর কারণে জগদ্বিখ্যাত ছিল এবং এ প্রেক্ষিতে যারা আরব ছাড়া বাকি বিশ্বকে 'আজম' (মূক) বলে আখ্যায়িত করত—সেই তারাও কুরআনের অপরূপ বাণীর কাছে হার মানতে বাধ্য হয়, নতমস্তকে স্বীকার করে নেয় এ ভাষার শ্রেষ্ঠত্বকে। যামাদ আযদী নামক জনৈক আরব একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসে। তখন পর্যন্ত সে ইসলাম গ্রহণ করেনি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করে শুনান। সে এটা শুনে একেবারে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে এবং তার মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে পড়ে একটি পংক্তি, যার অর্থ হলো—

"খোদার শপথ, আমি জ্যোতিষীদের কথা, যাদুকরদের মন্ত্র এবং কবিদের কবিতা শুনেছি। কিন্তু তোমার কথা যেন অন্য আরো কিছু—এটা সমুদ্রকে পর্যন্ত প্রভাবিত করবে।"

www.amarboi.org

দ্বিতীয় জিনিস, যার কথা আমরা এ প্রসংগে উল্লেখ করতে চাই—তাহলো কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী। কুরআনের সব ভবিষ্যদ্বাণীই বিস্ময়করভাবে হুবহু সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

ইতিহাসে আমরা এমন অনেক প্রতিভাবান ব্যক্তির সাক্ষাত পাই, যারা নিজেদের বা অন্যদের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার দুঃসাহস দেখিয়েছেন। কিন্তু আমরা জানি যে, কালচক্রের নির্দয় চাকায় পিষ্ট হয়ে এমন ব্যক্তিদের কোনো ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য প্রমাণিত হয়নি। অনুকূল অবস্থা, বিস্ময়কর যোগ্যতা, সংগী-সাথীদের সংখ্যাধিক্য এবং প্রাথমিক সাফল্য বেশীর ভাগ লোককে এই ধোঁকায় ফেলেছে যে, তারা ভবিষ্যৎ পরিণামের যে আশা অন্তরে পোষণ করছেন তা নিশ্চিতভাবেই বাস্তব রূপ নেবে। আর এ পটভূমিতে তারা কিছু কিছু নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণীও করে বসেছেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাদের এ ধরনের কোনো ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য প্রমাণিত হয়নি। অপরদিকে যাবতীয় অবস্থা ও পরিবেশ সম্পূর্ণ প্রতিকূল থাকা সত্ত্বেও কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ এমনভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, এর ব্যাখ্যা প্রদানে মানুষের যাবতীয় জ্ঞান ও যুক্তি আগাগোড়া ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। আমরা আমাদের মানবিক অভিজ্ঞতার আলোকে এর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সম্পূর্ণ অপারগ। অতএব এর একটি মাত্র ব্যাখ্যা হলো, ঐসব ব্যাপার এমন একটি সত্তার এখতিয়ারাধীন, যিনি সবার উপরে, যিনি সর্বশক্তিমান।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন তার যুগের একজন মহান সেনাপতি। তার প্রাথমিক সাফল্যসমূহ এই ইঙ্গিত প্রদান করছিল যে, তিনি বীরত্বে ও বিজয়ে সিজার ও আলেকজাণ্ডারকেও ছাড়িয়ে যাবেন। এর ফলশ্রুতি হয় এই যে, নেপোলিয়নের অন্তরে এ ধারণা প্রতিপালিত হতে শুরু করে যে, তিনি স্বয়ং তার ভাগ্যের মালিক। নিজের উপর তার আস্থা এই পরিমাণ বৃদ্ধি পায় যে, তিনি কোনো কাজ শুরু করার পূর্বে সে সম্পর্কে আপন একান্ত উপদেষ্টাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেও অনীহ হয়ে উঠেন। তিনি বলতে শুরু করেন, 'পরিপূর্ণ বিজয় ছাড়া আমার অন্য কোনো পরিণাম হতেই পারে না।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার যে পরিণাম হয়েছিল তা সবারই জানা। ১২ জুন, ইং ১৮১৫ সন নেপোলিয়ন তার সর্ববৃহৎ সেনাবাহিনী নিয়ে প্যারিস থেকে এই উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন যে, শত্রুকে পথের মধ্যেই খতম করে দেবেন। কিন্তু এর ঠিক ছয় দিন পর ওয়াটারলু (বেলজিয়াম)-এর রণক্ষেত্রে ডিউক অব ওয়েলিংটন (Duke of Wellinton) যিনি তখন বৃটেন, হল্যাণ্ড এবং জার্মানীর সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন —নেপোলিয়নকে এমনভাবে পরাজিত ও বিপর্যস্ত করেন যে, তার ভবিষ্যতের

www.amarboi.org

সব আশা শূন্যে মিলিয়ে যায়। তিনি তার সিংহাসন ছেড়ে আমেরিকার উদ্দেশ্যে পালাতে শুরু করেন ; কিন্তু সমুদ্র উপকূলে পৌঁছতে না পৌঁছতেই শত্রুবাহিনী তাকে ধরে ফেলে এবং তাকে বাধ্য করে একটি বৃটিশ জাহাজে আরোহণ করতে। অতপর তাকে দেশান্তরী জীবন যাপনের জন্য আটলান্টিকের সেন্ট হেলিনা দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তিনি স্বজনহীন, বান্ধবহীন অবস্থায় অত্যন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ৬ মে, ইং ১৮২১ সনে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এডলফ হিটলার ১৪ মার্চ, ইং ১৯৩৬ সনে তার মিউনিখের বিখ্যাত বক্তৃতায় বলেছিলেন, "আমি আমার পথে এগিয়ে চলেছি এই অবস্থা নিয়ে যে, বিজয় আমার ভাগ্যে নির্ধারিত হয়ে আছে।"

কিন্তু সমগ্র বিশ্ব জানে জার্মানীর এ মহান একনায়কের ভাগ্যে যে জিনিস নির্ধারিত ছিল তা হচ্ছে পরাজয় এবং অপমানের জ্বালা থেকে মুক্তিলাভের জন্য শেষমেষ আত্মহত্যা।

এখানে আমরা কুরআনের শুধুমাত্র দুটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করবো। একটি খোদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিজয়লাভ সম্পর্কিত এবং অন্যটি রোমানদের পুনরায় বিজয় লাভ সংক্রান্ত।

ক মুহাম্মদ (সাঃ) যখন ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন প্রায় সমগ্র আরবই তার বিরোধিতা করতে থাকে। একদিকে পৌত্তলিক গোত্রসমূহ তার প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ায় ; অন্যদিকে পূঁজিপতি ইয়াহুদীরা যে কোনো মূল্যে তার মিশনকে ব্যর্থতায় পর্যবশিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। উপরন্তু মুনাফিকরা, বাহ্যতঃ ইসলাম গ্রহণ করে তাঁর দলে ঢুকে আভ্যন্তরীণভাবে ইসলামকে দুর্বল করে দেয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগে। মোটকথা, দেশের জনশক্তি, ধনশক্তি, আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র—এ ত্রিমুখী চাপ মুহাম্মদ (সাঃ)-কে একেবারে অতিষ্ট করে তোলে। তখন তার সাথী ও সাহায্যকারী বলতে ছিল মাত্র কিছু কৃতদাস ও দরিদ্র নিঃস্ব কিছু লোক। মক্কার নেতৃস্থানীয় সামান্য যে কয়েকজন লোক তার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে ছিলেন তারাও তাদের আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক চরম সংকটের সম্মুখীন হন এবং তাদের গোত্রের লোকেরা ঠিক মুহাম্মদ (স)-এর মত তাদেরকেও শত্রুজ্ঞান করতে থাকে।

আন্দোলন এভাবেই চলছিলো। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমনি শ্বাসরুদ্ধকর হয়ে দাঁড়ালো যে, তাঁকে এবং তার সংগীদেরকে নিজেদের মাতৃভূমি ছেড়ে অন্যান্য দেশে গিয়ে আশ্রয় নিতে হলো। এভাবে তিনি এবং তার সাথীরা, যারা প্রথম থেকেই দুর্বল এবং নিঃস্ব ছিলেন, এমন অবস্থায় মদীনায় গিয়ে সমবেত হন যে,

www.amarboi.org

নিজেদের মাতৃভূমিতে সামান্য যা কিছু তাদের অধিকারে ছিল তাও তাদের শত্রুরা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। মদীনায় ঐ সমস্ত লোকেরা এমনি নিঃস্ব অবস্থায় পৌঁছে যে, সেখানে তাদের কারো কারো মাথা গোঁজার মত নির্দিষ্ট কোনো জায়গা না থাকায় তারা একটি খোলা ছাপড়ার মধ্যেই দিন গোজরান করতেন। এ কারণেই ওরা 'আসহাবে সুফ্‌ফা' (ছাপড়ার অধিবাসী)–এ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ঐ ছাপড়ায় বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত লোক কালাতিপাত করেছিলেন তাদের সংখ্যা আনুমানিক চারশ ছিল বলে কথিত আছে। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, 'আমি আসহাবে সুফ্‌ফার সত্তর জন লোককে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তাদের কাছে হয় শুধু একটি লুঙ্গি ছিল, নয়ত শুধু একটি চাদর। তারা সেটাকে ঘাড়ের উপর বেঁধে নিতেন এবং তা হাঁটু ও গুল্‌ফসন্ধির মধ্যবর্তী স্থানে ঝুলতে থাকত। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) সে সময়কার নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমি মসজিদে নববীতে চুপচাপ পড়ে থাকতাম এবং লোকেরা মনে করত যে, আমি মূর্চ্ছা গেছি ; অথচ প্রকৃত অবস্থা ছিল এই যে, অনবরত উপোস করার কারণে আমি অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়তাম এবং অনুরূপভাবে মসজিদে শুয়ে থাকতাম।'

গুটিকয়েক লোকের এ সহায়-সম্বলহীন কাফেলা মদীনা ভূমিতে এমনভাবে অবস্থান করছিল যে, চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা দুশমনদের, যে কোনো মুহূর্তে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আশংকা ছিল। কিন্তু এ অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের কাছে বার বার এ মর্মে সুসংবাদ আসছিলো যে, তোমরা আমার প্রতিনিধি এবং তোমাদেরকে কেউ পর্যুদস্ত করতে পারবে না। যেমন বলা হয়েছেঃ

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغْلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىْ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيْزٌo (المجادلة : ٢١)

"আল্লাহর সিদ্ধান্ত এই যে, তিনি এবং তার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হবেন। আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী।"–(সূরা মুজাদালা ঃ ২১)

অর্থাৎ বিরোধিতা যতই তীব্র হোক না কেন, আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে অবশ্যই জয়ী করবেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ ط وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ

كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَo (الصف : ٩-٨)

"ওরা আল্লাহর আলো ফুৎকারে নিভাতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তার আলো পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীরা এটা অপছন্দ

www.amarboi.org

করে। তিনিই তার রাসূলকে প্রেরণ করেছেন পথনির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ সকল দ্বীনের উপর ওটাকে শ্রেষ্ঠত্বদানের জন্য, যদিও অংশীবাদীরা এটা অপছন্দ করে।"–(সূরা আস সফ ঃ ৮-৯)

সত্যি সত্যি কিছুকালের মধ্যেই সমগ্র আরব ভূখণ্ড আল্লাহর রাসূলের অধিকারে এসে গেল। সামান্য কয়েকজন নিঃস্ব গরীব লোক, ঐ সমস্ত লোককে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে পরাজিত করল যারা সংখ্যায় ছিল অধিক, সময় ও পরিবেশ ছিল যাদের অনুকূলে এবং যাদের কাছে ছিল উন্নত সমরাস্ত্র ও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি (সাঃ) আরব এবং আরবের পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের উপরও কিভাবে এতবড় বিজয় লাভ করলেন, জড়বাদী দৃষ্টিতে এরও কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হতে পারে না। এর একমাত্র ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, তিনি ছিলেন আল্লাহর প্রতিনিধি এবং আল্লাহই তাঁকে তাঁর শত্রুদের উপর এমনভাবে জয়ী করেন যে, একদা কট্টর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তারা তার অন্তরঙ্গ মিত্রে পরিণত হয়।

প্রবল পরাক্রমশালী শত্রুদের বিরুদ্ধে নিরক্ষর নবীর, আপন দাবী অনুযায়ী এভাবে জয়ী হওয়া একথারই স্পষ্ট প্রমাণ যে, তিনি ছিলেন সৃষ্টিজগতের স্রষ্টারই প্রতিনিধি। যদি তিনি একজন সাধারণ মানুষ হতেন তাহলে এটা কখনো সম্ভব হতো না যে, তার কথা বাস্তব ইতিহাসে পরিণত হবে—এমন এক ইতিহাস, যার একটি দৃষ্টান্তও সমগ্র মানবীয় ঘটনাবলীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। জে. ডব্লিউ. এইচ. স্টোবার্ট (J. W. H. Stobart)-এর ভাষায় ঃ

"তাঁর কাছে, উপাদান-সামগ্রীর যে স্বল্পতা ছিল এবং তিনি যে বিরাট ও বিস্ময়কর কাজ সম্পাদন করেছেন সে অনুপাতে বিচার-বিবেচনা করা হলে, সমগ্র মানব ইতিহাসে এমন একটি উজ্জ্বল নাম দৃষ্টিগোচর হবে না যেমনটি ছিল আরবী নবীর।"

এটা তাঁর, আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়ার এমন একটি বিস্ময়কর প্রমাণ যে, স্যার উইলিয়াম মুইর (William Muir)-এর মত ব্যক্তিকেও পরোক্ষভাবে স্বীকার করতে হয়েছে ঃ

"মুহাম্মদ তাঁর শত্রুদের যাবতীয় পরিকল্পনাকে বানচাল করে দেন ; হাতেগোনা সামান্য কয়েকজন লোক নিয়ে তাঁর রাতদিন সাফল্যের প্রতীক্ষায় থাকা ঠিক তেমন, যেমন বাঘের মুখে বীরত্ব প্রদর্শন। এর তুলনা যদি কোথাও

www.amarboi.org

থাকে তাহলে বাইবেলের সেই জায়গায়, যেখানে একজন নবী সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, তিনি একবার আল্লাহকে বলেছিলেন—'শুধুমাত্র আমিই বাকি রয়ে গেছি।'

(খ) কুরআনের অপর ভবিষ্যদ্বাণী—যার উল্লেখ আমরা এখানে করতে চাই—তাহলো, ইরানীদের উপর রোমানদের বিজয়। কুরআনের ৩০তম সূরায় (সূরা রূমে) বলা হয়েছে ঃ

غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۝ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۝

"রোমানরা পরাজিত হয়েছে, নিকটবর্তী অঞ্চলে, কিন্তু ওরা ওদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে কয়েক বছরের মধ্যেই।"-(সূরা আর রূম ঃ ২-৩)

আরব উপদ্বীপের পূর্বে এবং পারস্য উপসাগরের পূর্ব-উপকূলে ছিল ইরান সাম্রাজ্য। আর পশ্চিমে লোহিত সাগরের উপকূল থেকে শুরু করে কৃষ্ণসাগর পর্যন্ত যে সাম্রাজ্য ছিল তা ইতিহাসে রোমান সাম্রাজ্য বলে পরিচিত। প্রথমোক্ত সাম্রাজ্যকে সাসানী সাম্রাজ্য এবং শেষোক্ত সাম্রাজ্যকে বাইজেন্টাইনী সাম্রাজ্যও বলা হতো। এ দু' সাম্রাজ্যের সীমান্ত মিলিত হয়েছিল আরবের দক্ষিণে ইরাকের বিখ্যাত দু' নদী দজলা ও ফুরাতে। সে যুগে এ দু'টি সাম্রাজ্য ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী। ঐতিহাসিক গিবন-এর বর্ণনা মতে, খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে রোমান সাম্রাজ্যের সূচনা এবং এটা ছিল সে যুগে সভ্যতা-ভব্যতায় সবার শীর্ষে।

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের উপর যত লেখালেখি হয়েছে তা অন্য কোনো সভ্যতার ক্ষেত্রে হয়নি। যদিও এমন কোনো গ্রন্থ নেই, যা পাঠ করলে অপর কোনো গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন থাকে না—তবু মোটামুটিভাবে উল্লেখিত বিষয়ের উপর সর্বাধিক বিস্তৃত ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon)-লিখিত "The History of the Decline and fall of the Roman Empire"। এই গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে, সুযোগ্য গ্রন্থকার ঐ যুগের যে ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করেছেন তা-ই এখন আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। রোমের কনস্টানটিন নামক জনৈক সম্রাট ইং ৩২৫ সনে খ্রীস্টমত গ্রহণ করে সেটাকে সরকারী ধর্মের মর্যাদা দান করেন। অতপর রোমান সাম্রাজ্যের বেশীর ভাগ অধিবাসীই খ্রীস্টমতের অনুসারী হয়ে পড়ে। অপরদিকে ইরানীরা ছিল সূর্যদেবতার পূজারী। নবী (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে যিনি রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন তাঁর নাম ছিল মরিস (Maurice)।

www.amarboi.org

মরিসের অযোগ্যতা ও অব্যবস্থার কারণে তারই সেনাবাহিনী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নুবুওয়াত প্রাপ্তির আট বছর পূর্বে ইং ৬০২ সনে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ঐ বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন 'ফোকাস' (Phocas) নামক জনৈক সেনাপতি। বিদ্রোহ সফল হয় এবং ফোকাস রোম-সম্রাটের সিংহাসন দখল করে নেন। তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে মরিস এবং তার পরিবার-পরিজনকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করেন।

ফোকাস দূত মারফত প্রতিবেশী রাষ্ট্র ইরানকে আপন সিংহাসনে আরোহণ সম্পর্কে অবহিত করেন। তখন ইরানের সম্রাট ছিলেন মহামতি নওশেরওয়ানের পুত্র খসরু পারভেজ (Chosroes II)। কিন্তু খসরুকে ইং ৫৯০-৯১ সনে আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র এবং বিদ্রোহের কারণে আপন দেশ থেকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। তখন রোম-সম্রাট মরিস তাকে আপন এলাকায় আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং পুনরায় ক্ষমতা দখলের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করেছিলেন। এটাও বলা হয়ে থাকে যে, কন্‌স্টান্টিনোপলে অবস্থানকালে খসরু, মরিসের মেয়ের সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন এবং সেই সূত্র ধরে তিনি মরিসকে 'পিতা' বলে সম্বোধন করতেন। অতএব মরিসের পতন এবং আত্মীয় পরিজনসহ অতি নির্মমভাবে তার নিহত হওয়ার সংবাদ শুনে খসরু অত্যন্ত রুষ্ট হন। তিনি ফোকাসের দূতকে বন্দী করেন এবং ফোকাসকে নতুন সম্রাট বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন।

এর পরপরই তিনি আপন সেনাবাহিনী নিয়ে রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। ইং ৬০৩ সনে তার বাহিনী ফুরাত নদী অতিক্রম করে সিরিয়ার শহরসমূহে ঢুকে পড়ে। ফোকাস তার অযোগ্যতার কারণে এ অপ্রত্যাশিত আক্রমণ প্রতিরোধে ব্যর্থ হন। ইরানী বাহিনী এগিয়ে চলে এবং ক্রমে ক্রমে ইনতাকিয়া জয় করার পর তারা জেরুজালেমের উপর নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ফলে ইরান সাম্রাজ্যের সীমা ফুরাত থেকে নীল নদ উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে। প্রাক্তন রোমান সাম্রাজ্যের ধর্মীয় হস্তক্ষেপের কারণে চার্চের বিরোধী গ্রুপ—নাসতূরী ও ইয়াকূবী এবং সেই সাথে ইয়াহুদীরাও প্রথম থেকে রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল। এবার তারা সরাসরি ইরানী বিজেতাদের পক্ষাবলম্বন করে। তাদের ঐ আচরণ খসরুর বিজয় লাভকে আরো সহজ করে দিয়েছিল।

ফোকাসের এ পরাজয় লক্ষ্য করে সাম্রাজ্যের কিছুসংখ্যক উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি রোম-অধিকৃত আফ্রিকা অঞ্চলের রোমান শাসকের কাছে গোপনে অনুরোধপত্র পাঠান, যেন তিনি ইরানীদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার চেষ্টা

৩—

www.amarboi.org

করেন। তিনি (শাসক) আপন পুত্র হিরাক্লিয়াস (Heraclius)-কে একটি সেনাবাহিনীসহ প্রেরণ করেন। হিরাক্লিয়াস সমুদ্রের রাস্তা ধরে আপন বাহিনী নিয়ে আফ্রিকা থেকে রওয়ানা হন। এ সমস্ত কর্মকাণ্ড এমন গোপনীয়ভাবে আনজাম দেয়া হয় যে, ফোকাস ততক্ষণ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেননি, যতক্ষণ না তিনি আপন প্রাসাদ থেকে সমুদ্রপথে আফ্রিকা থেকে আগত নৌবহরটি দেখতে পান। হিরাক্লিয়াস সামান্য সংঘর্ষের পর রাজধানী দখল করে নেন এবং ফোকাসকে হত্যা করেন।

হিরাক্লিয়াস ফোকাসকে খতম করলেও ইরানী বাহিনীর প্রবল স্রোত রুখতে পারেননি। ইং ৬১৬ সন পর্যন্ত রাজধানীর বাইরের সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চল তার হাতছাড়া হয়ে যায়। ইরাক, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, মিসর—সর্বত্রই ক্রুশ পতাকার স্থলে ইরানী পতাকা উড়তে থাকে। মোটকথা, রোমান সাম্রাজ্য চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। ইরানী ঘেরাওয়ের কারণে সকল রাস্তা ছিল বন্ধ। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কারণে জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। মহান রোমান সাম্রাজ্য-বৃক্ষের শুধুমাত্র কাণ্ডটি বাকি ছিল—তাও আবার যাচ্ছিলো শুকিয়ে। খোদ রাজধানীতে শত্রু অনুপ্রবেশের আশংকা সমগ্র শহরবাসীকে এমনভাবে আতংকিত করে তুলেছিলো যে, সব কাজ-কারবার একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। যে সমস্ত স্থানে একদা দিবারাত্র মানুষের ভিড় লেগে থাকতো সে সমস্ত স্থান যেন এক একটি নির্জন শ্মশানে পরিণত হয়।

অগ্নিপূজারীরা রোমান সাম্রাজ্য দখল করার পর সেখান থেকে খ্রীস্টধর্মকে মুছে ফেলার জন্য অমানুষিক যুলুম-অত্যাচার শুরু করে। ধর্মীয় পবিত্র স্থানসমূহ অপবিত্র করা হয়, গির্জা ও উপাসনালয়সমূহ ধ্বংস করা হয় এবং এক লক্ষ নিষ্পাপ খ্রীস্টানকে হত্যা করা হয়। অতপর সর্বত্র পবিত্র (?) অগ্নিকুণ্ড তৈরী করা হয় এবং জবরদস্তিমূলকভাবে হযরত ঈসার ধর্মের পরিবর্তে অগ্নি ও সূর্য-উপাসনা-রীতির প্রচলন করা হয়। সেই পবিত্র ক্রুশের আসল কাষ্ঠখণ্ড, যার সম্পর্কে খ্রীস্টানদের বিশ্বাস ছিল যে, এর উপরই হযরত ঈসা (আঃ) প্রাণ দিয়েছেন—এখান থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মাদায়েনে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

ঐতিহাসিক গিবন এর ভাষায়—"খসরুর উদ্দেশ্য যদি মহৎ হত তাহলে তিনি বিদ্রোহী ফোকাসকে খতম করার পর রোমানদের সাথে তার বিবাদের মীমাংসা করে ফেলতেন এবং আফ্রিকা থেকে আগত বিজয়ী হিরাক্লিয়াসকেও অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতেন এজন্য যে, তিনিই তো তার শত্রু মরিসকে হত্যা করে তার শুভাকাংখী হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছেন। মূলতঃ তিনি যুদ্ধকে অব্যাহত রেখে তার আসল চেহারাই সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন।"

www.amarboi.org

সে সময় ইরানী সম্রাটের দাপট কি পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল এবং তিনি রোমান সম্রাটের মুকাবালায় নিজেকে কতবেশী শক্তিশালী ভাবছিলেন, তা হিরাক্লিয়াসকে লিখা তার (খসরূ পারভেজের) নিম্নোক্ত চিঠি থেকে অনায়াসে বুঝা যায়। তিনি লিখেছিলেন ঃ

"সব খোদার বড় খোদা ও সমগ্র বিশ্বের মালিক খসরূর পক্ষ থেকে তার ইতর, অভদ্র ও গণ্ডমূর্খ দাস হিরাক্লিয়াসের নামে—

তুই বলিস যে, নিজের খোদার উপর তোর ভরসা রয়েছে। (এই যদি হয়) তাহলে তোর খোদা কেন জেরুজালেমকে আমার হাত থেকে রক্ষা করতে পারল না ?"

এসব পরিস্থিতি রোমান সম্রাটকে একেবারে নিরাশ করে দেয়। এমনকি, তিনি কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করে সমুদ্রপথে নিজের আফ্রিকাস্থ উপকূলীয় আবাস কার্থেজে (Carthage)—যা বর্তমান তিউনিসিয়ায় অবস্থিত—চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এখন তার সামনে দেশকে রক্ষার চাইতে নিজেকে রক্ষার প্রশ্নই বড় হয়ে উঠে। রাজকীয় নৌযানসমূহে প্রাসাদের মূল্যবান রত্নরাজি বোঝাই করা হয়ে গেছে, ঠিক এমনি মুহূর্তে রোমান গির্জার প্রধান পুরোহিত ধর্মের দোহাই দিয়ে তাকে (হিরাক্লিয়াসকে) তার ঐ সংকল্প থেকে নিরস্ত রাখতে সক্ষম হন। অতপর তিনি (পুরোহিত) তাকে নিয়ে সেন্ট সুফিয়ার 'উৎসর্গস্থলে' যান এবং তাকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতিদানে সম্মত করান যে, তিনি তার এ প্রজাদের সাথে হয় জীবিত থাকবেন, না হয় মৃত্যুবরণ করবেন—ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, কিন্তু তিনি দেশ ছেড়ে কোথাও যাবেন না।

এ সময়ে ইরানী সেনাপতি সেইন (Sain) হিরাক্লিয়াসের কাছে প্রস্তাব দেন, যেন তিনি একজন সন্ধি-দূত ইরানের সম্রাটের দরবারে প্রেরণ করেন। হিরাক্লিয়াস এবং তার উপদেষ্টারা এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। কিন্তু যখন ইরান-সম্রাট খসরূ পারভেজের কাছে এই সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি বলেন ঃ

"না, এতে চলবে না, বরং আমি খোদ হিরাক্লিয়াসকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আমার সিংহাসনের নীচে দেখতে চাই। আমি ততক্ষণ পর্যন্ত রোমান শাসকদের সাথে কোনো সন্ধি করতে চাই না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের ক্রুশের খোদাকে ছেড়ে আমার সূর্যদেবতার পূজা করে।"

যাহোক, শেষ পর্যন্ত ছয় বছর ব্যাপী অবিরাম যুদ্ধ ইরানী শাসককে আপাততঃ কয়েকটি শর্তের উপর সন্ধি স্থাপনে বাধ্য করে। শর্তগুলো ছিল—

www.amarboi.org

"এক হাজার টলেন্ট স্বর্ণ, এক হাজার টলেন্ট রৌপ্য, এক হাজার রেশমী থান, এক হাজার ঘোড়া এবং এক হাজার কুমারী মেয়ে।"

গিবন এ সমস্ত শর্তকে যথার্থই অপমানকর শর্ত (Ignominious Terms) আখ্যা দিয়েছেন। হিরাক্লিয়াস নিশ্চিতভাবে এ সমস্ত শর্ত কবুল করে নিতেন, কিন্তু যে অল্প সময়ের মধ্যে এবং যে এলাকা থেকে এ সাংঘাতিক শর্তগুলো তাকে পূরণ করতে হবে—তার চেয়ে তার কাছে অধিক শ্রেয় ছিল যে, তিনি ঐ সমস্ত সম্পদকে শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বশেষ হামলার প্রস্তুতিতেই ব্যয় করবেন।

একদিকে এসব ঘটনা ঘটছিলো এবং অন্যদিকে ইরান ও রোমের মধ্যবর্তী স্থান মক্কায় এ নিয়ে বেশ একটা রগড়া-রগড়ির সৃষ্টি হয়েছিল। ইরানীরা সূর্য দেবতাকে মানত এবং অগ্নির পূজা করত, আর রোমানরা বিশ্বাস করত অহী ও রিসালাতে। অতএব মনস্তাত্বিক দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যকার যুদ্ধে মুসলমানরা ছিল রোমান খ্রীস্টানদের প্রতি সহানুভূতিশীল, আর মুশরিকরা ছিল ইরানী অগ্নি উপাসকদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। অতএব রোম ও ইরানের সংঘর্ষকে মক্কার মুসলিম ও মুশরিক তাদের ভবিষ্যৎ-ভাগ্যের একটি প্রতীক হিসাবেই বিবেচনা করতে শুরু করলো। ইং ৬১৬ সনে যখন ইরানীদের জয় জয়কার অবস্থা এবং রোমানদের সমগ্র প্রাচ্য এলাকা তাদের হাতের মুঠোয় তখন মক্কার মুশরিকরা বলতে শুরু করলো, দেখ, আমাদের স্বধর্মীরা (জড় পূজারী ইরানীরা) যেভাবে তোমাদের মত ধর্মবলম্বীদের (খ্রীস্টান রোমানদের) উপরে জয়লাভ করেছে ঠিক তেমনি আমরাও তোমাদের উপর জয়লাভ করবো এবং তোমাদের ধর্মকে আমাদের মাতৃভূতি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেব। মক্কার মুসলমানরা তখন যেরূপ দুর্বল ও নিঃস্ব অবস্থায় ছিল তাতে এ সমস্ত তীর্যক বাক্যবাণ তাদের দগদগে ঘায়ে যেন লবণ ছিটাচ্ছিলো। ঠিক এ অবস্থায় পয়গাম্বরে খোদার মুখ দিয়ে নিঃসৃত হয় নিম্নোক্ত বাণী ঃ

غُلِبَتِ الرُّومُ ۝ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۝ بِنَصْرِ اللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ وَعْدَ اللَّهِ ۖ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (الروم : ٢-٦)

www.amarboi.org

"রোমানরা পরাজিত হয়েছে—নিকটবর্তী অঞ্চলে, কিন্তু ওরা ওদের এ পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে, কয়েক বছরের মধ্যেই। অগ্র ও পশ্চাতের সিদ্ধান্ত আল্লাহরই। সেদিন বিশ্বাসীরা হর্ষোৎফুল্ল হবে আল্লাহর সাহায্যে। তিনি যাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। এটা আল্লাহরই প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ তার প্রতিশ্রুতি ভংগ করেন না, কিন্তু অধিকাংশ লোক বুঝে না।"–(সূরা আর রূম ঃ ২-৬)

গিবন বলেন, "যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তখন এর চাইতে অবিশ্বাস্য আগাম সংবাদ আর কিছুই হতে পারতো না ; কেননা হিরাক্লিয়াসের শাসনামলের প্রথম কয়েক বছর, অনবরতঃ তার সাম্রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছিলো।" কিন্তু এ ভবিষ্যদ্বাণী যে এমন এক সত্তার পক্ষ থেকে করা হয়েছিল যিনি যাবতীয় বস্তু ও যাবতীয় মাধ্যমের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী এবং সমগ্র মানুষের অন্তর যার হাতের মুঠোয় রয়েছে। তাই তো দেখা যায়, একদিকে খোদার ফিরিশতা একজন নিরক্ষর ব্যক্তির ভাষায় এ সংবাদ দিলেন এবং অন্যদিকে হিরাক্লিয়াস (রোম-সম্রাট)-এর সাম্রাজ্যে একটি বিপ্লব ঘটতে শুরু করলো। গিবন লিখেছেন ঃ

"ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর একটি অস্বাভাবিক ঘটনা আমরা হিরাক্লিয়াসের মধ্যে পাই। আপন সুদীর্ঘ শাসনামলের প্রারম্ভিক ও প্রান্তিক বছরগুলোতে এ সম্রাটকে আলস্য, আরামপ্রিয়তা এবং খেয়ালীপনার মধ্যে বন্দী দেখা যায়। এমন মনে হয়, যেন তিনি আপন প্রজাকুলের বিপদাপদের একজন নির্বাক ও ব্যর্থ দর্শক, কিন্তু যেরূপ ভোর বেলার কুয়াসার অন্ধকার, দুপুরের সূর্য কিরণে বেশ কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায় সেরূপ হিরাক্লিয়াস—রাজমহলের আরকেডিস (Arcadius)—হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রের সিজারে রূপান্তরিত হন এবং আপন দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে রোমান সাম্রাজ্যের সম্মান ও প্রতিপত্তি পুনরায় উদ্ধার করেন। রোমান ঐতিহাসিকদের কর্তব্য ছিল এ ঘটনার রহস্য উধঘাটন করা এবং হিরাক্লিয়াসের নিদ্রা ও জাগরণের কারণ বর্ণনা করা। এত দীর্ঘ কাল পর আমরা এটাই অনুমান করতে পারি যে, এর পিছনে কোনো রাজনৈতিক কারণ ছিল না, বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এটা ছিল ব্যক্তিগত আবেগ-উচ্ছ্বাসের ফলশ্রুতি। এরই প্রভাবে তিনি তার রিপুর তাড়নারও ইতি টানেন, এমন কি আপন সেই ভ্রাতুষ্পুত্রী (Martina)-কেও মুক্ত করে দেন যার সাথে তার এত গাঢ় সম্পর্ক ছিল যে, কাজটি আইন-বিরুদ্ধ ও অবৈধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন।"

সেই হিরাক্লিয়াস যার সাহস কুঞ্চিত ও মস্তিষ্ক অকেজো হয়ে পড়েছিল—এবার একটি অতি সফল পরিকল্পনা তৈরী করলেন। কনস্টান্টিনোপলে

www.amarboi.org

অত্যন্ত উৎসাহ-উপদ্দীপনা ও গুরুত্বের সাথে যুদ্ধ-প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল —এতদসত্ত্বেও তখন অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল যে, ইং ৬২২ সনে যখন হিরাক্লিয়াস তার সেনাবাহিনী নিয়ে কনস্টান্টিনোপল থেকে রওয়ানা হন তখন লোকেরা মনে করলো, বিশ্ব যেন রোমান সাম্রাজ্যের সর্বশেষ বাহিনীটিকেই দেখছে।

হিরাক্লিয়াস জানতেন যে, ইরানী সামাজ্য নৌশক্তিতে দুর্বল। তাই তিনি তার নৌবাহিনীকে পশ্চাৎ আক্রমণের জন্য ব্যবহার করেন। তিনি তার নৌবাহিনীকে কৃষ্ণ সাগরের রাস্তা দিয়ে আর্মেনিয়ায় অবতরণ করান এবং ঠিক সেই জায়গায় ইরানীদের উপর তীব্র আক্রমণ পরিচালনা করেন যেখানে মহান আলেকজাণ্ডার তখনকার ইরানী বাহিনীকে পরাজিত ও পর্যুদস্ত করেছিলেন, যখন তারা সিরিয়া থেকে মিসর পর্যন্ত পদানত করে ফেলেছিল। ইরানীরা হিরাক্লিয়াসের এ অভাবনীয় হামলায় আতংকিত হয়ে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। কিন্তু তখনও এশিয়া মাইনরে তাদের বিরাট বাহিনী ছিল এবং সে বাহিনীর সাহায্যেই তারা পুনরায় রোমান বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাত যদি না হিরাক্লিয়াস অতপর সমুদ্রের দিক থেকে তাদের উপর দ্বিতীয় অভাবনীয় আক্রমণ পরিচালনা করতেন। যাহোক, হিরাক্লিয়াস সমুদ্রের রাস্তা ধরেই কন্স্টান্টিনোপলে ফিরে আসেন। তিনি আওয়ারীদের (Avars) সাথে একটি আপোষ চুক্তি করেন এবং তাদের সাহায্যে ইরানীদেরকে তাদের রাজধানীর ধারেকাছেই রুখে রাখেন। এ দু'টি আক্রমণের পর তিনি অতিরিক্ত আরো তিনটি আক্রমণ পরিচালনা করেন। যথাক্রমে ইং ৬২৩-৬২৪ ও ৬২৫ সনে তিনি কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ উপকূল থেকে এ তিনটি আক্রমণ পরিচালনা করে ইরান-সীমান্তে ঢুকে পড়েন এবং একেবারে মেসোপটেমিয়া পর্যন্ত পৌঁছে যান। ফলে ইরানী বর্বরশক্তির কোমর ভেংগে যায় এবং ইরানী বাহিনী সমগ্র রোমান এলাকা ছেড়ে চলে যায় এবং হিরাক্লিয়াস স্বয়ং ইরানী সাম্রাজ্যের বুকের উপর চড়ে বসার মত অবস্থায় পৌঁছে যান। যাহোক রোমান ও ইরানী শক্তির মধ্যকার চূড়ান্ত যুদ্ধ, দজলা তীরে নেনভয়ে ডিসেম্বর, ইং ৬২৭ সনে সংঘটিত হয়।

এবার খসরু এতই দিশেহারা হয়ে পড়েন যে, তিনি তার বিখ্যাত 'দাস্তগিরদ' প্রাসাদ থেকে পলায়নের প্রস্তুতি শুরু করে দেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হলো এবং তাকে তার আপন পুত্র শেরভিয়া বন্দী করে একটি অন্ধ প্রকোষ্ঠে আটকিয়ে রাখলো, যেখানে তিনি পঞ্চম দিনে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তার ১৮জন পুত্রকে তারই চোখের সামনে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। কিন্তু তার এ হত্যাকারী পুত্রও মাত্র ৮ মাস রাজত্ব

www.amarboi.org

করে। অতপর অন্য রাজপুত্র তাকে হত্যা করে রাজ সিংহাসন দখল করে নেয়। এভাবে রাজবংশের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হলো এবং মাত্র চার বছরের মধ্যে মোট ৯জন সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করল। এমতাবস্থায় ইরানীদের উপর রোমনাদের নতুন করে হামলা পরিচালনার আর কোনো প্রয়োজনই বাকী ছিল না। খসরু পারভেজের পুত্র দ্বিতীয় কুবাদ রোম অধিকৃত অঞ্চলসমূহের দাবী পরিত্যাগ করে হিরাক্লিয়াসের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। পবিত্র ক্রুশের কাঠখণ্ডটি ফেরত দেয়া হয় এবং মার্চ, ইং ৬২৮ সনে বিজয়ী হিরাক্লিয়াস এমন জাঁকজমকের সাথে কনস্টান্টিনোপল প্রত্যাবর্তন করেন যে, বিরাট ৪টি হাতী তার রথ টানছিলো এবং অসংখ্য লোক রাজধানীর বাইরে প্রদীপ এবং যায়তুন শাখা হাতে নিয়ে তাদের মহান বীরের অভ্যর্থনায় দাঁড়িয়েছিল।

এভাবে কুরআন রোমানদের পুনর্বিজয় সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল তা ঠিক সময়েই (দশ বছরের মধ্যে) পূর্ণ হলো।

এখানে আমরা কুরআনের আর একটি বৈশিষ্ট্যকে তার সত্যতার তৃতীয় প্রমাণ হিসাবে পেশ করতে চাই। আর তা এই যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির অনেক পূর্বে কুরআন অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর একটি কথাও আজ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়নি। যদি এটা মানব-রচিত গ্রন্থ হতো তাহলে এমনটি হওয়া কখনো সম্ভব হতো না।

কুরআন এমন এক যুগে অবতীর্ণ হয় যখন মানুষ প্রকৃতিজগত সম্পর্কে খুব কমই জানত। তখন বৃষ্টি সম্পর্কে এ ধারণা ছিল যে, আকাশের কোথাও একটি সমুদ্র রয়েছে যেখান থেকে পানি প্রবাহিত হয়ে পৃথিবীর উপর ঝরে পড়ছে। পৃথিবী সম্পর্কে মনে করা হতো যে, এটি বিস্তৃত বিছানার মত সমতল, আর আকাশ হচ্ছে এর ছাদ, যা পর্বত শৃঙ্গের উপর স্থাপন করা হয়েছে। তারকা সম্পর্কে এ ধারণা ছিল যে, এগুলো হচ্ছে রৌপ্যের উজ্জ্বল পেরেক যা আকাশের গম্বুজের মধ্যে জুড়ে দেয়া হয়েছে, কিংবা এগুলো ছোট ছোট প্রদীপ যা রাতের বেলা রশির সাহায্যে আকাশের ছাদে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। প্রাচীন ভারতীয়রা মনে করত যে, পৃথিবী একটি গাভীর শিংয়ের উপর স্থাপিত এবং যখন গাভী পৃথিবীকে এক শিং থেকে অপর শিংয়ে স্থানান্তরিত করে তখন তার মস্তক হেলনে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিক কোপার নীকাস (ইং ১৪৭৩-১৫৪৩) পর্যন্ত এ ধারণা প্রচলিত ছিল যে, সূর্য সম্পূর্ণ স্থির এবং পৃথিবী তার চারদিকে ঘুরছে।

অতপর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে, মানুষের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, যার কারণে অগণিত নতুন নতুন জ্ঞান অর্জিত হয়েছে।

www.amarboi.org

জীবনের এমন কোনো দিক এবং জ্ঞানের এমন কোনো অধ্যায় নেই যাতে প্রাথমিক যুগের ধারণা পরবর্তী যুগে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়নি। এর অর্থ হচ্ছে, দেড় হাজার বছর পূর্বেকার মানুষের প্রকৃতি-বিজ্ঞান সম্পর্কিত এমন কোনো কথা নেই, যা আজ পর্যন্ত নিজের বিশুদ্ধতাকে বজায় রাখতে পেরেছে। কেননা মানুষ সমসাময়িক জ্ঞানের আলোকেই কথা বলে। সচেতনভাবে বলুক অথবা অবচেতনভাবে—তা-ই বার বার বলবে যা সে আপন যুগে পেয়েছে। কিন্তু কুরআনের ব্যাপার এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কুরআন দেড় হাজার বছর পূর্বে যেরূপ সত্য ছিল এখনো সেরূপ সত্যই রয়ে গেছে। এ ঘটনা একথারই স্পষ্ট প্রমাণ যে, এটা এমন একটা সত্তা থেকে নির্গত হয়েছে যার দৃষ্টি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সবকিছুকে ঘিরে রেখেছে, যা সবকিছুকে তার আসল চেহারায় চেনে, যার জ্ঞান সর্বকাল ও সর্বপরিস্থিতির উর্ধে। অতএব যদি এ কুরআন সীমিত দৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষের কথা হতো তাহলে পরবর্তী যুগে এটা ঠিক সেভাবে ভ্রান্ত প্রমাণিত হতো যেভাবে প্রত্যেকটি মানবিক কথা পরবর্তী যুগে ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়।

কুরআন নিছক কোনো বিজ্ঞান গ্রন্থ নয়। তবু আমরা বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কিত এমন কিছু দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করবো, যার দ্বারা অনুমিত হবে যে, কোনো একটি বৈজ্ঞানিক বিষয়কে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করতে গিয়েও কুরআন কী বিস্ময়করভাবে ঐ সমস্ত সত্যকে পরিবেশন করেছে, যা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় মানুষের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং অনেক অনেক পরে তারা তা জানতে পেরেছে।

এ সম্পর্কে কুরআনে যেসব বর্ণনা রয়েছে সেগুলোকে আমরা দু' ভাগে ভাগ করতে পারি। এক ঃ ঐ সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা যেগুলো সম্পর্কে কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় মানুষের কোনো জ্ঞানই ছিল না। দুই ঃ ঐ সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা যেগুলো সম্পর্কে মানুষ তখন বাহ্যিক তথা ভাসাভাসা জ্ঞান রাখতো।

বিশ্ব জগতের এমন অনেক বস্তু আছে, যেগুলো সম্পর্কে অতীত যুগের মানুষ কিছু না কিছু জ্ঞান রাখত। কিন্তু তাদের ঐ জ্ঞান এ সত্য উদ্ভাবনের মুকাবালায় অত্যন্ত অপরিপক্ক ছিল, যা পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানুষের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে। অতএব কুরআন যদি ঐ যুগে বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে ঐ যুগের মানুষের সামনে আধুনিক যুগের নানা বিস্ময়কর তথ্যাদি পেশ করতে শুরু করত তাহলে তারা তাদের জ্ঞানের অপরিপক্কতা হেতু এ সমস্ত জিনিসকে কেন্দ্র করে নানা তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়তো। আর এতে কুরআনের আসল উদ্দেশ্য তথা আত্মার শুদ্ধি ও মন-মানসিকতার সংস্কার

www.amarboi.org

স্বাভাবিকভাবেই ব্যাহত হতো। এতদসত্ত্বেও এটা কুরআনের একটা অলৌকিকতা ছাড়া কিছু নয় যে, সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির বহু পূর্বেই অনেক অজ্ঞাত বিষয়ের উপর কথা বলেছে, তবে সে কথায় এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছে, যেগুলোর মধ্যে জ্ঞানের অপরিপক্বতা সত্ত্বেও প্রাচীন যুগের লোকদের জন্য বিস্ময়াভিভূতির কোনো কারণ ছিল না, অথচ সেসব শব্দ পরবর্তী যুগের যাবতীয় উদ্ভাবনীকেও পুরোপুরি অন্তর্ভুক্ত রেখেছে।

ক কুরআনের দুটি জায়গায় পানির একটি বিশেষ প্রকৃতি-নীতি বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে সূরা ফুরকানে, অতপর সূরা আর রাহমানে। যেমন ঃ

وَهُوَ الَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا

بَرْزَخًا وَّحِجْرًا مَّحْجُوْرًا ○ (الفرقان : ٥٣)

"তিনিই দুই দরিয়াকে প্রবাহিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় এবং অপরটির পানি লোনা, খর ; উভয়ের মধ্যে তিনি রেখে দিয়েছেন এক অন্তরায়, এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।"–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৫৩)

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ○ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ○ (الرحمن : ١٩-٢٠)

"তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া যারা পরস্পর মিলিত হয়, কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না।"
–(সূরা আর রহমান ঃ ১৯-২০)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে প্রকৃতির যে বহিঃপ্রকাশের উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রাচীনতম যুগ থেকেই মানুষের জানা ছিল। আর তা হলো দুই দরিয়ার পানি যখন পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে প্রবাহিত হয় তখন একটি অপরটির সাথে একেবারে মিশে যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ) থেকে শুরু করে আরাকান (বার্মা) পর্যন্ত দু'টি দরিয়া পরস্পরের সাথে একত্রিত হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, কিন্তু এ পুরো দূরত্বটাই একটির পানি অপরটি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক থেকে যাচ্ছে। উভয়ের মধ্যে একটি রেখাসদৃশ আগাগোড়া প্রলম্বিত রয়েছে। একটি দরিয়ার পানি মিষ্ট এবং অন্যটির লোনা। এভাবে সমুদ্রের উপকূল এলাকায় যে সমস্ত দরিয়া (নদী) প্রবাহিত হচ্ছে সেগুলোতে সমুদ্রের প্রভাবে সবসময় জোয়ার-ভাটা আসতে থাকে। জোয়ারের সময় যখন সমুদ্রের পানি নদীতে আসতে থাকে তখন মিঠা পানির পৃষ্ঠে লোনা পানি সবেগে চড়ে বসে ; এতদসত্ত্বেও কিন্তু দুই পানি পরস্পরের সাথে মিশে যায় না, বরং শুধু উপরের পানি লোনা থাকে এবং নীচের পানি সেই পূর্বের ন্যায় মিঠা।

www.amarboi.org

অতপর যখন ভাটা আসে তখন উপরস্থ লোনা পানি নেমে চলে যায় এবং মিঠা পানি যেমন ছিল তেমনই থাকে।

একথা প্রাচীনতম যুগ থেকেই মানুষের জানা। কিন্তু এ ঘটনা প্রকৃতির কোন্ নীতির অধীনে ঘটে চলেছে তা অতি সম্প্রতি জানা গেছে। আধুনিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, তরল পদার্থের মধ্যে পৃষ্ঠ-প্রসারণ (Surface Tension)-এর একটি বিশেষ নিয়ম রয়েছে এবং এ নিয়মই উভয় প্রকার পানিকে পৃথক পৃথক রাখে। যেহেতু উভয় প্রবাহের প্রসারণ (Tension) বিভিন্ন হয়ে থাকে, তাই তা উভয় পানিকে নিজ নিজ সীমানায় রুখে রাখে। এ নিয়মটি বুঝতে পেরে আধুনিক বিশ্ব বিভিন্নভাবে লাভবান হচ্ছে। কুরআন, 'ওদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল, যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না'—এ শব্দগুলো বলে এ ঘটনার এমন ব্যাখ্যা দিয়েছে, যা প্রাচীন পর্যবেক্ষণ মতেও যেমন যথাযথ আধুনিক উদ্ভাবন মতেও তেমনি যথার্থ। কেননা আমরা বলতে পারি যে, অন্তরাল (বারযাখ) অর্থ সেই পৃষ্ঠ-প্রসারণ (Surface Tension) যা উভয় প্রকার পানির মধ্যে পাওয়া যায় এবং এটাই উভয় পানিকে নিজ নিজ সীমানায় ধরে রাখে।

পৃষ্ঠ-প্রসারণ-নীতিকে একটি সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝানো যেতে পারে। যদি আপনি গ্লাসের মধ্যে পানি ভরতে থাকেন তাহলে তা উপরের কিনারা পর্যন্ত পৌছার পর তৎক্ষণাৎ নীচের দিকে ভাসতে শুরু করে না, বরং এক সূতা বরাবর উপরে উঠে গ্লাসের চতুষ্পার্শ্বের গোলাকার আয়তনের মধ্যে থেমে যায়।

গ্লাসের চতুষ্পার্শ্বের উপর যে পানি থাকে তা থামে কি করে ? উত্তর এই যে, তরল পদার্থের পৃষ্ঠবর্তী পরমাণুর (Molecules) পর যেহেতু আর কোনো বস্তু থাকে না তাই সেগুলোর গতি অন্তরমুখী হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরমাণুর মধ্যে সংযোগ-আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং সংযোগ (Cohesion)-নীতির প্রক্রিয়ার কারণে পানিপৃষ্ঠের উপর এক ধরনের স্তিতিস্থাপক আবরণ (Elastic Film)-এর সৃষ্টি হয় এবং তার মধ্যে পানি এমনভাবে জড়িয়ে যায়, যেমন জড়িয়ে যায় প্লাষ্টিকের শুভ্র থলের মধ্যে পেষণকৃত লবণ। পৃষ্ঠোপরি এ আবরণই উপরে উত্থিত পানিকে ধরে রাখে। এ আবরণ এতই শক্তিশালী হয় যে, যদি এর উপর একটি সুঁচও নিক্ষেপ করা হয় তবু তা ডুববে না, বরং পানি পৃষ্ঠে ভাসতে থাকবে। একেই বলে পৃষ্ঠ-প্রসারণ। আর এ কারণেই তেল ও পানি পরস্পরের সাথে মিশে যায় না। এটাই সেই প্রতিবন্ধক যার কারণে লোনা পানি ও মিঠা পানির দরিয়া একত্রিত হয়ে প্রবাহিত হয়, কিন্তু একটির পানি অন্যটির সাথে মিশে যায় না।

www.amarboi.org

খ কুরআন বলে ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ـ(الرعد : ٢)

"আল্লাহই উর্ধদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ছাড়া—যা তোমরা দেখছ।"–(সূরা আর রাআদ ঃ ২)

প্রাচীন যুগের মানুষের জন্য এ শব্দগুলো তাদের বাহ্যিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ীই ছিল। কেননা তারা প্রত্যক্ষ করত যে, তাদের মাথার উপর সূর্য, চন্দ্র এবং তারকারাজির একটি বিশ্ব দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু কোথাও এর স্তম্ভ বা খুঁটি নজরে পড়ে না। এতে আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তির জন্যও পরিপূর্ণ অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে। কেননা আধুনিক পর্যবেক্ষণ বলে যে, মহাশূন্যের গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজি একটি সীমাহীন মহাশূন্যে, কোনো কিছুর উপর ভর না করেই অবস্থান করছে এবং একটি 'অদৃশ্য স্তম্ভ' অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি (Gravitational pull) সেগুলোকে শূন্যে ধরে রেখেছে।

গ এভাবে সূর্য ও সমগ্র তারকারাজি সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

كُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ٥(الانبياء : ٣٣)

"প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করে।"–(সূরা আম্বিয়া ঃ ৩৩)

প্রাচীনযুগেও মানুষ গ্রহ-নক্ষত্রকে সঞ্চরণশীল দেখত। তাই এ সমস্ত শব্দের মধ্যে তাদের অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। কিন্তু আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এ সমস্ত শব্দকে আরো বেশী অর্থপূর্ণ করে তুলেছে। 'সুবিস্তৃত ও সূক্ষ্ম মহাশূন্যে গ্রহ-নক্ষত্রের আবর্তন বিবর্তন'–এর ব্যাখ্যা বা ভাব সম্প্রসারণের জন্য 'সন্তরণ'-এর চাইতে উৎকৃষ্ট শব্দ আর কিছুই হতে পারে না।

ঘ রাত ও দিন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ ـ(الاعراف : ٥٤)

"তিনিই দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওদের এক অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৫৪)

এ সমস্ত শব্দ প্রাচীন যুগের মানুষের কাছে রাতদিনের বাহ্যিক আগমন-নির্গমনের কথা বলতো। অথচ এর মধ্যে পৃথিবীর, আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণের একটি অতি সুন্দর ইঙ্গিত রয়েছে, যা আধুনিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী রাত ও দিন পরিবর্তনের মূল কারণ। এখানে আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, রাশিয়ার

www.amarboi.org

প্রথম মহাশূন্যচারী মহাশূন্য থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নিজের যেসব অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন তার মধ্যে একটি ছিল এই যে, তিনি মহাশূন্য থেকে পৃথিবীকে এরূপে দেখেছেন যে, আপন কক্ষের উপর আবর্তিত হওয়ার কারণে সূর্যের উপর আলো ও আধারের আগমন-নির্গমনের একটি দ্রুত ধারাবাহ (Rapid Succession) অব্যাহত রয়েছে।

কুরআনে এ ধরনের বর্ণনা প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। দ্বিতীয় ধরনের দৃষ্টান্ত হলো ঐ সমস্ত জিনিসের, যেগুলো সম্পর্কে প্রাচীন যুগের লোক কোনো জ্ঞানই রাখতো না। কুরআনে এ সমস্ত জিনিসেরও উল্লেখ রয়েছে। আর এ জাতীয় কথা আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বিস্ময়করভাবে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এখানে আমরা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করছি।

মহাশূন্য

১. কুরআন জড়জগতের সূচনা ও পরিণামের একটি বিশেষ ধারণা দিয়েছে। এ ধারণা একশ বছর পূর্বেও মানুষের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ; আর কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় তো কেউ এ সম্পর্কে কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে এটাকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে। সৃষ্টিজগতের সূচনা সম্পর্কে কুরআন বলে ঃ

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا○(الانبياء : ٣٠

"সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী মিশেছিল ওতপ্রোতভাবে ; অতপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম।"
–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৩০)

আর এর পরিণাম সম্পর্কে বলে ঃ

يَوْمَ نَطْوِى السَّمَآءَ كَطَىِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ط-(الانبياء : ١٠٤)

"সেই দিন আকাশ মণ্ডলীকে গুটিয়ে ফেলব যেভাবে গুটানো হয় লিখিত দফতর।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৪)

এ সমস্ত শব্দ অনুযায়ী সৃষ্টি জগত প্রথম প্রথম গুটানো অবস্থায় ছিল, অতপর তা সম্প্রসারিত হতে শুরু করে। এ সম্প্রসারণ সত্ত্বেও তার মূল উপাদান এত অল্প যে, সামান্য জায়গার মধ্যেই তা পুনরায় গুটানো যেতে পারে।

সৃষ্টিজগত সম্পর্কে আধুনিকতম ধারণাও তাই। বিভিন্ন কার্যকারণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, সূচনাকালে সৃষ্টি

www.amarboi.org

জগতের উপাদান জমাট এবং নিস্পন্দ অবস্থায় ছিল। আর তা ছিল একটি অতি উষ্ণ গ্যাস-নির্যাস। আনুমানিক ৫০ বিলিয়ন বছর পূর্বে এক ভয়ানক বিস্ফোরণে তা ফেটে যায় এবং সাথে সাথে তার বিদীর্ণ-বিচ্ছিন্ন অংশসমূহ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। যখন একবার সম্প্রসারণ শুরু হলো তখন তা অব্যাহত থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক। কেননা মৌলিক পদার্থের অংশ যতই দূরে যাবে ততই তাদের পরস্পর আকর্ষণের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকবে। সূচনায় সৃষ্টি জগতের যে উপাদান ছিল তার স্থানগত আয়তনের পরিমাণ ছিল আনুমানিক এক হাজার মিলিয়ন আলোকবর্ষ। আর এখন অধ্যাপক এডিংটনের অনুমান মতে তা প্রাক্তন আয়তনের অনুপাতে দশ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রসারণের এ প্রক্রিয়া এখনো অব্যাহত রয়েছে। এডিংটনের কথায়-

"তারকারাজি এবং ছায়াপথসমূহের দৃষ্টান্ত হচ্ছে এমন এক রাবার বেলুনের পৃষ্ঠচিহ্নের মত যা (বেলুন ফুলার সাথে সাথে) অনবরত বেড়ে চলেছে। এভাবেই আপন সত্তাগত সঞ্চরণের মাধ্যমে সমগ্র আকাশগোলক বিশ্বজগতকে বিস্তৃত করে প্রতিমুহূর্তে অনবরত দূরে সরে যাচ্ছে।"

দ্বিতীয় কথাটিও অত্যাধুনিক পর্যবেক্ষণের দ্বারা বিশ্বজগতের গঠনাকৃতির সাথে হুবহু মিলে গেছে। প্রাচীনযুগের মানুষ মনে করত যে, তারকারাজি পরস্পর থেকে ঠিক ততটুকু দূরত্বে রয়েছে যতটুকু বাহ্যতঃ নজরে পড়ে। কিন্তু এখন জানা গেছে যে, এগুলো আমাদের থেকে অনেক অনেক দূরে থাকার দরুন পরস্পরের নিকটবর্তী দৃষ্টিগোচর হয় ; প্রকৃতপক্ষে ওদের পরস্পরের মধ্যে অপরিসীম দূরত্ব বিরাজ করছে। শুধু এ পর্যন্তই নয়, বরং অনেক অবয়ব, যা বাহ্যতঃ দেহ-বিশিষ্ট বলে মনে হয় সেগুলোরও একটি বিরাট অংশ প্রকৃতপক্ষে শূন্য। যেভাবে সৌরজগতের বহু গ্রহ-উপগ্রহ পরস্পর থেকে দূরে অবস্থান করে একটি নিয়মের অধীন আবর্তিত হতে থাকে, ঠিক সেরূপ প্রত্যেকটি জড় অবয়ব ক্ষুদ্রাকারের অগণিত সৌর ব্যবস্থারই সম্মিলন—যেগুলোকে 'এটম' বলা হয়ে থাকে। সৌর ব্যবস্থার শূন্যতা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হওয়ার কারণে আমাদের নজরে পড়ে না। অতএব প্রত্যেকটি বস্তু বাহ্যতঃ ঠাসা দৃষ্টিগোচর হলেও আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে ফাঁপা। যেমন ছয় ফুট লম্বা-চওড়া মনুষ্যদেহের মৌলিক কণারাশির মধ্য থেকে যদি শূন্যতা বা স্থান (Space) বের করে দেয়া যায় তাহলে অবশিষ্ট মৌলিক উপাদানের বিস্তৃতি একটি অদৃশ্য চিহ্নের মতই থেকে যাবে।

এভাবে জ্যোতির্বেত্তারা (Astrophysicists) বিশ্বজগতে ছড়িয়ে থাকা সম্পূর্ণ মৌলিক পদার্থের হিসাব বের করেছেন। তাদের মতে-

www.amarboi.org

"If all this were squeezed without leaving any space, the size of the universe will be only thirty times the size of the sun."

অর্থাৎ, "যদি সমগ্র প্রকৃতিজগতকে এভাবে লেপটে নেয়া যায় যে, তাতে কোনো শূন্যতা বাকী থাকবে না, তাহলে সমগ্র বিশ্বজগতের ঘনত্ব হবে বর্তমান সূর্যের মাত্র ৩০ গুণ বেশী।"

আর প্রকৃতি জগতের বিস্তৃতির অবস্থা এই যে, সৌর ব্যবস্থা থেকে দূরতম ছায়াপথ, যা এখনো দেখা যেতে পারেনি, তা সূর্য থেকে কয়েক মিলিয়ন আলোক-বর্ষ দূরে অবস্থান করছে।

ভূমি

১ পাহাড়সমূহ সম্পর্কে কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে যে, ভূমির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন ঃ

وَاَلْقٰى فِى الْاَرْضِ رَوَاسِىَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ ـ(لقمن : ١٠)

"তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করছেন পবর্তমালা যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে।"–(সূরা লোকমান ঃ ১০)

এ শব্দগুলো অবতীর্ণ হওয়ার তেরশ বছর পরও মানবীয় জ্ঞান, পাহাড়-সমূহের এ অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে ভূগোলশাস্ত্র তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছে। আধুনিক ভৌগলিক পরিভাষায় এটাকে ভারসাম্য-রক্ষা-পদ্ধতি (Isostasy) বলা হয়। যদিও এক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞান এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে তবু এঙ্গলেন (D. R. V. Englen)-এর ভাষায়–

"এটা মনে করা হয়ে থাকে যে, পৃথিবীপৃষ্ঠে যে হালকা উপাদান ছিল তা পর্বতরাজির আকারে উপরে উঠে গেছে এবং যে ভারী উপাদান ছিল তা গভীর গর্তের আকারে নীচে চলে গেছে, যেগুলো এখন সমুদ্রের পানিতে পূর্ণ। এভাবে উত্থান-পতনের সম্মেলন ভূমির ভারসাম্য বজায় রাখছে।"

আর একজন গ্রন্থকার লিখেছেন—"যেমন স্থলভাগে উপত্যকা রয়েছে তেমনি সমুদ্রের তলদেশেও উপত্যকা রয়েছে। কিন্তু সমুদ্রতলের অধিকাংশ উপত্যকা অত্যন্ত গভীরে এবং মানুষের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতা থেকে অনেক দূরে। এমন মনে হয় যে, কোনো অস্বাভাবিক চাপের ফলে সমুদ্রের মধ্যে গভীর গুহার সৃষ্টি হয়েছে (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ সমস্ত উপত্যকার গভীরতা ৩৫ হাজার ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ গভীরতা যে কোনো পাহাড়ের উচ্চতার চাইতে

www.amarboi.org

বেশী। কোনো কোনো জায়গায় এসব উপত্যকা এতই গভীর যে, যদি স্থলভাগের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেষ্টকে, যার উচ্চতা ২৯০০২ ফুট—সেখানে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে তারও এক মাইল উচ্চতা পর্যন্ত পানি ভাসতে থাকবে)। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, এ সামুদ্রিক খন্দকসমূহ (Oceanic Trenches) দূর সমুদ্রে নয় বরং স্থল ভাগের সন্নিকটে অবস্থিত। কেউ বলতে পারে না, সে কোন্ বিরাট চাপ ছিল, যার কারণে সমুদ্রের তলদেশে এ বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। তবে দ্বীপপুঞ্জ এবং আগ্নেয়গিরিসমূহের সাথে এগুলোর নৈকট্য একথা প্রকাশ করে যে, পাহাড়ের উচ্চতা এবং সমুদ্রের খন্দকসমূহের মধ্যে কোনো পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে, যেন ভূমি তার উচ্চতা ও গভীরতার মাধ্যমে নিজের ভারসাম্য (Balance) বজায় রাখে। কোনো কোনো নির্ভরযোগ্য ভূগোলবিদের ধারণা এই যে, সামুদ্রিক গভীরতাসমূহ ভবিষ্যতে গজিয়ে উঠা ভূমির চিহ্ন-বিশেষ হতে পারে। কেননা পানির নীচে এ সমস্ত অন্ধকার গুহাসমূহে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভেসে আসা স্থল ও সমুদ্রতলবর্তী গাদ বা পলি (Sediment) স্তরে স্তরে স্তূপীকৃত হচ্ছে এবং এতে মাইলের পর মাইল ভরাট হয়ে যাচ্ছে। তাই কোনো সময় এমন হতে পারে যে, ভারসাম্যহীনতার ফলে সমুদ্রের তলবর্তী সীমাহীন গভীরতার মধ্যে পুঞ্জীভূত উপাদানসমূহের চাপে নতুন পাহাড় কিংবা দ্বীপপুঞ্জের সৃষ্টি হবে। উপকূলীয় কোনো কোনো পাহাড়ের মধ্যে এ ধরনের সামুদ্রিক গাদের চিহ্ন পাওয়া গেছে। কিন্তু মানুষের বর্তমান জ্ঞানের আওতায় এখনো এমন কোনো থিওরী আবিষ্কৃত হয়নি যার দ্বারা এ সামুদ্রিক খন্দকসমূহের কোনো পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারে। এ চিরশীতল ও চিরঅন্ধকার গুহা, যার প্রতি বর্গ ইঞ্চি সাত টন বোঝার নীচে চাপা পড়ে আছে, এখনো মানুষের জন্য সমুদ্রের অন্যান্য গোলক ধাঁ-ধাঁর মতো একটি গোলক ধাঁ-ধাঁ হয়েই রয়েছে।"

২ এভাবে কুরআনে বলা হয়েছে যে, ভূমির ওপর দিয়ে এমন এক দিন চলে গেছে, যখন আল্লাহ তাআলা এটাকে ফেড়ে বিস্তৃত করে দিয়েছেন।

وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰهَا ○ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰهَا ○ (النزعت : ٣٠-٣١)

"অতপর (আল্লাহ তাআলা) পৃথিবীকে বিস্তৃত করেন ; অতপর তা হতে তার প্রস্রবণ ও চারণভূমি বের করেন।"–(সূরা আন নাযিআত ঃ ৩০-৩১)

এ শব্দগুলো অত্যাধুনিক, মহাদেশসমূহ সঞ্চালিতকরণ থিওরী (Theory of Drifting Continents)-এর সাথে হুবহু মিলে যায়। এ থিওরীর অর্থ এই যে, আমাদের সবগুলো মহাদেশ কোনো এক যুগে একটিমাত্র ভূভাগের অংশ ছিল। অতপর তা ফেটে গিয়ে ভূপৃষ্ঠের উপর এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে

www.amarboi.org

পড়েছে এবং পানিভর্তি সমুদ্রসমূহের আশেপাশে মহাদেশসমূহের একটি বিশ্ব স্থিতি লাভ করেছে।

এ থিওরীকে ইং ১৯১৫ সনে প্রথমবারের মত জার্মান ভূতত্ত্ববিদ আলফ্রেড ওয়েজনার (Alfred Wegner) জনসমক্ষে পেশ করেন। তার দলীল এই যে, মহাদেশসমূহকে যদি একত্রিত করা যায় তাহলে সেগুলো 'Jigsaw Puzzle' -এর ন্যায় পরস্পরের সাথে খাপ খেয়ে যায় (যেমন দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব-উপকূল খাপ খেয়ে যায় আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের সাথে)।

এ ধরনের আরো অনেক সামঞ্জস্য বিরাট সমুদ্রসমূহের উভয় পার্শ্বের মধ্যে বিদ্যমান। যেমন একই ধরনের পাহাড়, সমবয়সী পর্বতশিলা, একই জাতের পশু, মৎস্য এবং একই প্রজাতির বৃক্ষ ইত্যাদি। বিখ্যাত উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী প্রফেসর রোনাল্ড গুড (Ronald Good) লিখেছেন–

"উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের সর্বসম্মত থিওরী এই যে, বিভিন্ন ধরনের গাছপালা যা স্থলভাগের বিভিন্ন অংশে পাওয়া যায় তার ব্যাখ্যা এছাড়া আর কিছুতেই হতে পারে না যে, আমাদেরকে অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে, স্থলভাগের খণ্ডসমূহ অতীতে কখনো পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত ছিল।"

আর এখন তো প্রস্তরীভূত চুম্বকধর্ম (Fossil Magnetism) দ্বারা সত্যায়িত হওয়ার পর তা একটি নিশ্চিত থিওরীতে পরিণত হয়েছে। প্রস্তরকণার 'অভিমুখিতা' পরীক্ষা করার পর জানা যায়, প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন যুগে এর অবস্থান কোথায় ছিল। এ পরীক্ষা দ্বারাই জানা গেছে যে, ভূমির বর্তমান টুকরাগুলো এ সমস্ত জায়গায় ছিল না, যেখানে আজ তা পরিদৃষ্ট হয়, বরং ঠিক ঐ সমস্ত জায়গায় ছিল যেখানে 'মহাদেশসমূহ সঞ্চলিতকরণ থিওরী' নির্দেশ করে। লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসর পি. এম. এস. ব্লাকেট (Blacket) বলেছেন—"ভারতীয় প্রস্তরসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, সত্তর মিলিয়ন (১ মিলিয়ন = ১০ লক্ষ) বছর পূর্বে ভারত বিষুব রেখার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। আর দক্ষিণ আফ্রিকার প্রস্তরসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর একথা প্রমাণিত হয় যে, আফ্রিকা মহাদেশ তিনশ মিলিয়ন বছর পূর্বে দক্ষিণ মেরু থেকে টুটে বের হয়েছে।"

উপরে আমরা পবিত্র কুরআনের যে আয়াত উদ্ধৃত করেছি তাতে আল্লাহ তাআলা 'দাহভুন' শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে কোনো সম্মিলিত বস্তুকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেয়া। ইংরেজী (Drift) শব্দও, যা এ ভৌগলিক থিওরীর ব্যাখ্যার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, প্রায় অনুরূপ অর্থই প্রকাশ করে। সুদূর অতীত

www.amarboi.org

এবং বর্তমানের মধ্যে এ বিস্ময়কর সামঞ্জস্যের ব্যাখ্যা এছাড়া আর কী হতে পারে যে, এটি এমন একটি সত্তার বাণী যার অসীম জ্ঞান অতীত এবং বর্তমানকে সমভাবে ঘিরে রেখেছে।

আহার্য দ্রব্য

পবিত্র কুরআনে মানুষের আহার্য দ্রব্যের যে তালিকা দেয়া হয়েছে তাতে রক্তপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কুরআন নাযিল হওয়া পর্যন্ত মানুষ এ আহার্য আইনের গুরুত্ব সম্পর্কে অনবহিত ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রক্তকণা পরীক্ষা করা হল তখন জানা গেল যে, এ আইন মানুষের মঙ্গলকামিতার উপরই ভিত্তিশীল। অতএব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ আইনকে বাতিল করেনি, বরং এর তাৎপর্য ও গুরুত্বকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা জানা গেছে যে, রক্তের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ইউরিক এসিড (Uric Acid) রয়েছে, যা একটি অম্লদ্রব্য হওয়ার কারণে মারাত্মক বিষাক্ত প্রভাব রাখে এবং আহার্য হিসাবে এটাকে মোটেই গ্রহণ করা চলে না। ইসলাম পশু যবাহের যে নির্দিষ্ট নিয়ম বলে দিয়েছে তার মধ্যেও এ যৌক্তিকতা বিদ্যমান। ইসলামের পরিভাষায় 'যবাহ' এর অর্থ পশুকে আল্লাহর নামে এমনভাবে জবাই করা, যাতে তার দেহের সমস্ত রক্ত বের হয়ে যায়— আর এটা তখনই সম্ভব যখন পশুর 'প্রধান রক্তবাহিকা শিরা' কর্তন করা হবে ; কিন্তু ঘাড়ের বাকি শিরাসমূহ বহাল রাখা হবে যাতে জবাইকৃত পশুর হৃদয় ও মস্তিষ্কের মধ্যে মৃত্যু পর্যন্ত একটা সম্পর্ক থাকে এবং পশুর মৃত্যু, কোনো প্রধান অংগের উপর আঘাতের কারণে নয়, বরং শুধুমাত্র পরিপূর্ণভাবে রক্ত বেরিয়ে যাওয়ার কারণে সংঘটিত হয়। কেননা কোনো প্রধান অংগ, যেমন মস্তিষ্ক, হৃদয় কিংবা যকৃতে আঘাত করার ফলে যদিও তাড়াতাড়ি মৃত্যু ঘটে, কিন্তু এ অবস্থায় রক্ত তড়িৎগতিতে জমে গিয়ে দেহের সমগ্র মাংসের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে এবং ইউরিক এসিডের সংমিশ্রণের কারণে সমস্ত মাংস বিষাক্ত হয়ে পড়ে।

এভাবে শূকরের মাংসও নিষিদ্ধ (হারাম) করা হয়েছে। প্রাচীন যুগে মানুষ এ সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখত না। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান বলে যে, এর মধ্যেও অনেক অপকারিতা রয়েছে। যেমন, উল্লেখিত ইউরিক এসিড, যা একটি বিষাক্ত উপাদান এবং প্রত্যেক জীবের রক্তের মধ্যেই বিদ্যমান, অন্য জীবের দেহ থেকে বের হয়ে গেলেও শূকরের দেহ থেকে বের হয় না। মূত্রগ্রন্থি, যা প্রত্যেক মনুষ্যদেহে থাকে, এ বিষাক্ত উপাদানকে প্রস্রাবের মাধ্যমে বের করতে থাকে। মনুষ্যদেহ এ উপাদানকে শতকরা নব্বই ভাগ বের করে দেয়,

www.amarboi.org

কিন্তু শূকরের দেহের কাঠামো এমনি যে, তার রক্তের ইউরিক এসিড শতকরা মাত্র দু'ভাগ বের হয় এবং বাকি অংশ তার দেহের অংশে পরিণত হতে থাকে। এ কারণেই শূকর স্বয়ং গ্রন্থিব্যথায় আক্রান্ত থাকে এবং এর মাংস ভক্ষণকারীরাও গ্রন্থিব্যথার মত বিভিন্ন ব্যাধিতে অনায়াসে আক্রান্ত হয়।

এ ধরনের অনেক দৃষ্টান্ত কুরআন-হাদীসে রয়েছে। আর এ দৃষ্টান্তগুলো একথারই নিশ্চিত প্রমাণ যে, এগুলো এমন এক অসাধারণ 'যাত' (সত্তা) থেকে নির্গত হয়েছে যার সাথে অন্য কোনো যাতের তুলনা হয় না। কেননা অত্যাধুনিক বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন, বিস্ময়করভাবে ঐ সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে, যার উল্লেখ আমরা উপরে করেছি। কুরআন বলে ঃ

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط

"আমি ওদের জন্যে আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করবো বিশ্বজগতে ও ওদের নিজেদের মধ্যে ; ফলে ওদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আল কুরআন সত্য।"-(সূরা হা-মীম-আস সাজদা ঃ ৫৩)

৩. জীবন্ত মুজিযা

কুরআন আল্লাহর বাণী, একটি জীবন্ত মুজিযা (অলৌকিক বস্তু) এবং মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নুবুওয়াতের সবচাইতে বড় দলীল। কেননা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন আজীবন নিরক্ষর। লেখাপড়ার ধারেকাছে যাওয়ার সুযোগ বা পরিবেশ তিনি পাননি। অলংকার-সমৃদ্ধ ভাষাশৈলীর চর্চা তখনকার আরবদের নেশার বিষয় হলেও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছোটবেলা থেকে এমনি স্বভাবের ছিলেন যে, সেগুলোর প্রতি তাঁর কোনোই আকর্ষণ ছিল না। তিনি জীবনে কখনো কবিতা রচনা করেননি, কোনো কবিমেলায়ও যাননি। এমতাবস্থায় জীবনের চল্লিশতম বছরে শাব্দিক অলংকার, অপরূপ সাহিত্যকলা এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্য এ কুরআনের মতো একটি গ্রন্থ রচনা করা তাঁর পক্ষে কোনোমতেই সম্ভব ছিল না—সম্ভব হতেও পারে না। তাছাড়া যার পবিত্র মুখ দিয়ে কুরআনের বাণী নিঃসৃত হয় সেই মুহাম্মদ (সাঃ) কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী জীবনে তাঁর দৈনন্দিন কথাবার্তায় যে ভাষা ব্যবহার করতেন তার সাথে কুরআনের ভাষার কোনোই মিল ছিল না। অতএব নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে, কুরআন স্বয়ং আল্লাহ তাআলারই বাণী এবং উম্মী (অক্ষরজ্ঞানহীন) নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি বিরাট মুজিযা।

www.amarboi.org

আল্লাহ-প্রেরিত সব মহাপুরুষই কমবেশী মুজিযার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাদের ইহলোক ত্যাগের সাথে সাথে সে সমস্ত মুজিযা আর কার্যকর থাকেনি। কিন্তু কুরআন এমন একটি মুজিযা, যা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ওফাতের পরও পুরোপুরি কার্যকর রয়েছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাই থাকবে।

কুরআন বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরে প্রাচীনকালের বিভিন্ন জাতির সেই নিখুঁত ইতিহাস, যে সম্বন্ধে তৎকালীন ইয়াহুদী ও খ্রীস্টান ইতিহাসবিদদের সঠিক কোনো ধারণাই ছিল না। অন্য কথায় বলতে গেলে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ), যিনি কোনোদিন কোনো শিক্ষালয়ে যাননি, কোনো জ্ঞানী ও গুণীর সঙ্গলাভ করেননি, কোনো বইপত্র পড়েননি বা অন্যকে দিয়ে পড়িয়েও শোনেননি, তাঁর কাছ থেকেই বিশ্ববাসী জেনে নিল সৃষ্টির আদি হতে খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন জাতির নিখুঁত ইতিহাস, বিভিন্ন যুগের ধর্মীয় বিষয়সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের জীবন বৃত্তান্ত। অতএব কুরআন যে আল্লাহর বাণী এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি জীবন্ত মুজিযা তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কুরআনের মত বিশ্বে দ্বিতীয় আর একটি গ্রন্থও নেই, যার মধ্যে সর্বপ্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে—তাও আবার নেহাত স্বল্প পরিসরে এবং পরিমিত শব্দের মাধ্যমে। মানুষের যাবতীয় জীবন-জিজ্ঞাসার জবাব, মানব জীবনকে সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং সাফল্যমণ্ডিত করার সুষ্ঠু ও নির্ভুল পথ-নির্দেশ রয়েছে কুরআনে। আর তা নিঃসৃত হয়েছে এমন এক ব্যক্তির মুখ দিয়ে, যিনি কোনো দিন না কোনো শিক্ষকের কাছে গিয়েছেন, আর না কোনো কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করেছেন। অতএব কুরআন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি জীবন্ত মুজিযা বটে।

কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে একে এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যে, এর একটি বাক্য বা শব্দ তো দূরের কথা, একটি বর্ণ বা বিন্দুতেও কেউ কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি এবং আগামীতেও এ ধরনের কোনো সম্ভাবনা নেই। কুরআন ছাড়া আল্লাহ তাআলা আরো অনেক কিতাব বা গ্রন্থ নাযিল করেছেন। ঐশী গ্রন্থ তাওরাত, যাবূর এবং ইঞ্জীলের উল্লেখ রয়েছে খোদ কুরআনেই। কিন্তু কালের বিবর্তনের সাথে সাথে ঐ সমস্ত গ্রন্থ এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যে, এক শতাব্দী আগে লিখিত গ্রন্থের সাথে এক শতাব্দী পরে লিখিত গ্রন্থের বিশেষ কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কুরআনের পূর্ববর্তী গ্রন্থগুলো বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা অনূদিত হতে হতে আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, ঠিক কোন্ ভাষায় তা

www.amarboi.org

অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সে ভাষার আসল রূপ কি ছিল তা ঐ সমস্ত গ্রন্থের অনুসারীরাও সঠিকভাবে বলতে পারেন না। তাছাড়া ঐ সমস্ত গ্রন্থে এমন একটি উক্তিও খুঁজে পাওয়া যায় না যার মাধ্যমে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি ঐ সমস্ত গ্রন্থকে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন থেকে রক্ষা করবেন।

কিন্তু কুরআনকে আগাগোড়া এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যে, তা যে ভাষায় এবং যে শব্দে নাযিল হয়েছিল আজ পর্যন্ত ঠিক সেইরূপই আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হুবহু তাই থাকবে। বিশ্বে অসংখ্য ভাষায় কুরআন অনূদিত হলেও তা মূল যে ভাষায় নাযিল হয়েছিল, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে হুবহু সে ভাষায়ই তা বিশ্বের সর্বত্র পঠিত হচ্ছে এবং সাধারণত মূল ভাষা থেকেই অনূদিত হচ্ছে। তাই ভাষান্তরের ফলে এর মানে-মতলব বা ভাবের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোনো অবকাশ নেই।

কুরআন কি পরিমাণ অপরিবর্তিত রয়েছে তার একটি প্রমাণ এই : আপনি সাম্প্রতিক কালে ঢাকায় মুদ্রিত এক খণ্ড কুরআন নিন এবং কয়েক যুগ বা কয়েক শতাব্দী পূর্বে মিসর, সিরিয়া, তুরস্ক, রাশিয়া, চীন বা বিশ্বের অন্য কোনো দেশে মুদ্রিত অথবা লিখিত আর এক খণ্ড কুরআনের সাথে তা মিলিয়ে দেখুন। দেখবেন, এ দুই খণ্ড কুরআনের কোনো বাক্যে, শব্দে, এমনকি বিন্দুতেও কোনো গরমিল নেই। এর কারণ কি ? প্রধান কারণ এই যে, খোদ আল্লাহ তাআলা কুরআন শরীফে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন,

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ ـ (الحجر : ٩)

"নিশ্চয়ই আমি এ বাণী (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি এবং আমি অবশ্যই এর হিফাযতকারী (সংরক্ষক)।"-(সূরা আল হিজর : ৯)

কুরআনকে শুধু অক্ষরের সাহায্যে নয়, বরং অবতীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে এটাকে স্মৃতির সাহায্যেও অবিকল ধরে রাখা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই বেশ কিছু সংখ্যক ব্যক্তি (তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মহিলাও ছিলেন) সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্ত করে নিয়েছিলেন। যুগে যুগে এ হাফিয বা মুখস্থকারীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এক হিসাব অনুযায়ী বর্তমানে বিশ্বের আনুমানিক প্রায় ৫০ লক্ষ লোক এমন রয়েছেন, সম্পূর্ণ কুরআন হুবহু যাঁদের কণ্ঠস্থ।

অতএব একথা নিসন্দেহে বলা চলে যে, কোনো না কোনো কারণে যদি আজ সারা বিশ্বের সমস্ত বই-পুস্তক ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে অন্য কোনো গ্রন্থ

www.amarboi.org

নয়, বরং একমাত্র কুরআনকেই বর্তমানে যেমনটি আছে ঠিক তেমনটিই উদ্ধার করা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। কেননা বিশ্বের যে কোনো দেশের কয়েক জন হাফিয কোথাও একত্রে বসে গেলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আবার সম্পূর্ণ কুরআন হুবহু লিপিবদ্ধ করে নিতে পারবেন। মজার ব্যাপার এই যে, বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও তাদের কুরআন পড়ার মধ্যেও কোনো অমিল খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কুরআনের ভাষা এতই প্রাঞ্জল এবং মোহনীয় যে, তা জ্ঞানী-মূর্খ, বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলের মনেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ, যা অর্থ না বুঝেও আগাগোড়া অনায়াসে মুখস্ত করে নেয়া যায় এবং একমাত্র এ কারণেই আজ বিশ্বে অন্য কোনো গ্রন্থের নয়, বরং শুধুমাত্র কুরআনেরই লক্ষ লক্ষ হাফিয রয়েছেন।

এছাড়াও এমন আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে, যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, কুরআন নিসন্দেহে একটি আসমানী গ্রন্থ এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি জীবন্ত মুজিযা।

৪. সাম্য ও শান্তির পয়গাম

খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী হচ্ছে বিশ্ব-ইতিহাসের একটি কলঙ্কময় অধ্যায়। তখন অত্যাচার, অনাচার, অবিচার ও কুসংস্কারের অবাধ রাজত্ব ছিল বিশ্বের পূর্ব প্রান্ত হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগে। সর্বত্র ছিল দুর্নীতি, স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব। সর্বত্র ছিল জুলুম-নির্যাতন, অসাম্য আর অশান্তি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, সমগ্র বিশ্ব জুড়ে তখন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিরাজ করছিল, তাতে হাঁপিয়ে উঠেছিল বিশ্ববাসী—হাঁপিয়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষ ; কিন্তু ঐ গ্লানিকর পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি লাভের কোনো পথ তাদের জানা ছিল না।

তুলনামূলকভাবে তখন আরবের অবস্থা ছিল সবচাইতে করুণ। ঐতিহাসিকগণ 'আইয়ামে জাহিলিয়া' বা অন্ধকার যুগ নামে আখ্যায়িত করেছেন আরবের ঐ সময়কালকে। জঘন্য পাশবিকতা ও অমানুষিক কার্যকলাপ তখন আরববাসীদের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। সীমাহীন লোভ-লালসা, আত্মম্ভরিতা, অসংযত ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, পরশ্রীকাতরতা, প্রতিহিংসা-চরিতার্থতা, লাম্পট্য, ব্যভিচার, খুন-খারাবি, রাহাজানি ও মদ্যপ্রিয়তা ছিল তাদের ব্যক্তিগত

www.amarboi.org

ও জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাদের মধ্যে না ছিল আইনের শাসন আর না ছিল কোনো মানবোচিত গুণের বিকাশ। তারা ন্যায় অন্যায়ের ধার ধারতো না। স্বগোত্রপ্রীতিই ছিল তাদের সমাজ নীতির মূলমন্ত্র। কারণে অকারণে সবলরা ঝাঁপিয়ে পড়তো দুর্বলদের উপর, লুণ্ঠন করে নিত তাদের যথাসর্বস্ব। দাস-ব্যবসা তখন ছিল জমজমাট। আর সামান্য কারণে দাস-দাসীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালানো যেন প্রভুদের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিল।

পৌত্তলিকতাই ছিল আরববাসীদের ধর্ম। একত্ববাদের আদি উপাসনালয় কাবাগৃহেও তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল ৩৬০টি প্রতিমা। কিছু মানুষ চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি নৈসর্গিক জ্যোতিষ্কেরও পূজা করতো। তবে সকলেই চরম ও পরম জ্ঞান করত ইহজগতকে।

ইয়াহুদী এবং খ্রীস্টানরাও পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে মূর্তিপূজকে পরিণত হয়েছিল। খ্রীস্টানরা হযরত ঈসা (আঃ) এবং তাঁর মা মরিয়মকে উপাস্য জ্ঞানে পূজা করতো। ইহুদীরা হযরত মূসা (আঃ)-এর শিক্ষা ভুলে গিয়ে একটি খলপ্রকৃতি, কপটাচারী ও মিথ্যাশ্রয়ী জাতিতে পরিণত হয়েছিল।

তখনকার ইরান, মিসর, ভারত, জাপান, চীন, জার্মান প্রভৃতি দেশে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক শাসন ব্যবস্থা চালু ছিল বটে, তবে তা ছিল জনসাধারণের স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা ঐ সমস্ত দেশে প্রচলিত সামাজিক আইনের বলেই রাজা-প্রজা, শাসক-শাসিত, আশরাফ-আতরাফ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র প্রভৃতি শ্রেণী-বিভাগের সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে পাকাপাকিভাবে এক একটি বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠীর দাসানুদাসে পরিণত করা হয়েছিল।

তখন ইরান, খুরাসান, কাবুল ও তুর্কিস্তানের পুরো ভূখণ্ডে ছিল অগ্নিপূজারীদের আধিপত্য। সিরিয়া, ইরাক, মধ্য এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা ছিল সাধারণভাবে খ্রীস্টধর্মের শাসনাধীন। চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, তিব্বত এবং প্রাচ্যের দ্বীপাঞ্চলে ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আধিপত্য। ভারতে অগ্নিপূজক এবং বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরা ছিল বটে, তবে পৌত্তলিকরাই ছিল সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী।

তখন ভারত, মিসর, ইরান, রোম প্রভৃতি দেশে এমন কিছু দার্শনিক এবং পণ্ডিত ছিলেন, যাঁরা কোনো ধর্ম বা নবী-রাসূলে বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা সবকিছুতেই যুক্তি-তর্কের অবতারণা করতেন। অথচ তাঁদের যুক্তির ধার (?) এমনি ছিল যে, কোন্ পথ অবলম্বন করলে মানুষ শান্তি পাবে, কিভাবে তাদের জুলুম-নির্যাতন দূর হবে, কি করলে তাদের জীবনে সার্থকতা আসবে তেমন

www.amarboi.org

কোনো মত ও পথের সন্ধান দিতে তারা তখনকার ধর্মীয় নেতাদের মতই ছিলেন সম্পূর্ণরূপে অপারগ।

বিশ্ববাসীর যখন এ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা ; তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন যখন বিপর্যস্ত ও লণ্ডভণ্ড, ঠিক তখনি আবির্ভূত হয় কুরআন—আবির্ভূত হয় শান্তি ও সাম্যের বাণী নিয়ে, সবরকম অনাচার ও পাপাচারের কেন্দ্রভূমি আরবে এবং সেখান থেকেই মানুষের বিশ্বাস ও চিন্তাজগতে সূচনা করে এক মহা বিপ্লবের।

কুরআন সর্বপ্রথমে জোর দেয় আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব প্রমাণের উপর। কেননা আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বে বিশ্বাস না থাকার ফলেই মানব সমাজে সৃষ্টি হয় ফিতনা-ফাসাদের—সৃষ্টি হয় অসাম্য ও অশান্তির। কুরআন আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ব সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট দলীল-প্রমাণ পেশ করে, যা ছিল পণ্ডিত-মূর্খ সকলেরই বোধগম্য। কুরআন অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করে, একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই মানুষের প্রভু। আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকে—চাই সে মানুষ হোক—কোনো প্রাণী অথবা বস্তু হোক—প্রভু বলে স্বীকার করা মূর্খতা এবং বাতুলতা ছাড়া কিছু নয়।

কুরআন ঘোষণা করে, মানুষ মাত্রই একই পিতা ও একই মাতার সন্তান। অতএব তার প্রকৃত মর্যাদা বর্ণ, বংশ বা সম্পদের দ্বারা নয় বরং কর্ম ও স্বীয় সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্যের দ্বারা নির্ণীত হয়। কুরআন মানুষকে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা বুঝিয়ে দেয় যে, ইহজীবনই সবকিছু নয় বরং এরপরও একটি জীবন রয়েছে এবং সেটাই আসল জীবন এবং সেখানে মানুষকে তার প্রতিটি কর্মের জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

এভাবে ধীরে ধীরে মানুষের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-ভাবনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার পর কুরআন তাদের সামনে এমন একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর জীবনব্যবস্থা পেশ করে, যা অনুসরণ করে পৃথিবীতে সত্যিকার সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

কুরআন প্রদত্ত এ জীবন-ব্যবস্থা অনুসরণ করেই অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সবচাইতে অশান্ত, বর্বর ও অত্যাচারী জনগোষ্ঠী বলে পরিচিত আরববাসীরা বিশ্বের সবচাইতে সভ্য ও ন্যায়বিচারক জাতিতে পরিণত হয়। কিভাবে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়, তা তারা হাতে-কলমে দেখিয়ে দেয় বিশ্ববাসীকে।

প্রকৃতপক্ষে কুরআন কোনো বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রের জন্য নয়, বরং গোটা বিশ্বের জন্য শান্তির বার্তাবাহী। বর্তমান বিশ্বে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়

www.amarboi.org

জীবনে যে চরম অশান্তি বিরাজ করছে, তার প্রতিবিধান একমাত্র কুরআনের শিক্ষা এবং কুরআন-প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থা অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব। দরকার শুধু গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়নের এবং তা থেকে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণের।

৫. অধ্যয়নের ধারা

কুরআন মূলতঃ একটি আন্দোলন গ্রন্থ। কুরআন সব রকম অনাচার, কুসংস্কার ও অশান্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনার আহ্বান জানায় গোটা মানব জাতিকে। আর কিভাবে এ আন্দোলনের সূচনা করতে হয়, কিভাবে একে ধাপে ধাপে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়—বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে তারই পথনির্দেশ করে। কুরআন অধ্যয়নকারীকে গভীর বিশ্বাস এবং আস্থা নিয়ে উপরোক্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্যই কুরআন চর্চায় মনোনিবেশ করতে হবে। যিনি যত উন্মুক্ত হৃদয় ও পবিত্র মন নিয়ে কুরআন অধ্যয়ন করবেন, তিনি ততবেশী সক্ষম হবেন এর আসল মর্ম ও নিগূঢ় রহস্য উদঘাটনে।

কুরআন অধ্যয়নকারী শুধু একটি গ্রন্থই অধ্যয়ন করেন না, তিনি পাঠ করেন আল্লাহর বাণী—তিনি যেন কথা বলেন তার প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার সাথে। অতএব সদাসতর্ক ও নিষ্কলুষ মন নিয়ে তাকে অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করতে হবে এবং কুরআনের মর্ম অনুধাবনের জন্য তাকে চালিয়ে যেতে হবে নিরলস প্রচেষ্টা। তবেই তিনি সক্ষম হবেন কুরআনের অতল গভীরে অবগাহন করতে—সক্ষম হবেন কুরআনের অমূল্য তত্ত্বাবলীর সন্ধান লাভে।

কুরআনকে একবার নয় বরং বারবার পড়তে হবে ; তবেই অধ্যয়নকারীর সম্মুখে উদ্ভাসিত হবে কুরআনের সেই মৌলিক শিক্ষা, যার উপর ভিত্তি করে তিনি রচনা করবেন তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন।

এ ক্ষেত্রে জর্জ বার্নাড শো-এর একটি উক্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি বলেন, "When I first started reading The Quran it was boring and monotonous, when I entered into it, It was enchanting and when I finished it I had to read over and again."

অর্থাৎ যখন আমি প্রথম কুরআন পড়তে আরম্ভ করি তখন তা আমার কাছে একঘেয়ে ও বিরক্তিকর ঠেকে, যখন আমি এর ভিতরে ঢুকি তখন তা আমার কাছে লাগে মনোমুগ্ধকর, আর আমি যখন তা পড়ে শেষ করি তখন বারবার পড়তে থাকি।

www.amarboi.org

কুরআন অধ্যয়নকালে মনের মধ্যে কোনো প্রকার প্রশ্ন বা সংশয় দেখা দিলে তাতে ব্যতিব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা ধৈর্য সহকারে অধ্যয়ন কাজ চালিয়ে গেলে এ কুরআনেরই কোথাও না কোথাও উক্ত প্রশ্ন বা সংশয়ের উত্তর পাওয়া যাবে। তখন আনন্দে ভরে উঠবে অধ্যয়নকারীর মন এবং তিনি দ্বিগুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে আল্লাহর বাণী অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করবেন। একবার সমস্ত কুরআন অধ্যয়নের পরও যদি কোনো প্রশ্নের মীমাংসা না হয় তবু নিরাশ হতে নেই। কেননা মনোযোগ সহকারে বারবার কুরআন অধ্যয়নের পর ধীরে ধীরে সব প্রশ্নেরই মীমাংসা হয়ে যাবে।

কুরআন অধ্যয়নকারীকে মনে রাখতে হবে যে, কুরআন দুনিয়ার তাবৎ খুঁটিনাটি বিষয়-সম্বলিত কোনো গ্রন্থ নয়, বরং এতে প্রধানত ঐসব মূলনীতিরই বর্ণনা রয়েছে যার আলোকে মানব-জীবনের যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সম্ভব। কুরআন মানব জীবনের প্রত্যেকটি মৌলিক বিভাগের 'চতুঃসীমা' বলে দেয়—বলে দেয় কিভাবে ব্যক্তিগত স্বভাব-চরিত্র এবং সার্থক সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন গড়ে তুলতে হবে তার মূলনীতি। অতএব কুরআন অধ্যয়নকারীকে কুরআন থেকে মানব জীবনের প্রত্যেকটি মৌলিক বিভাগের চতুঃসীমা এবং প্রত্যেকটি সমস্যা সমাধানের মূলনীতি আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আর এজন্য দরকার অনাবিল মন, সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা, গভীর অনুশীলন এবং কঠোর সাধনার।

কুরআন অধ্যয়নকারীকে আর একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে। তা এই যে, কুরআন মূলতঃ লিখনের ভংগীতে নয় বরং বক্তৃতার ভংগীতে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষের সার্বিক মুক্তির যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, সে আন্দোলনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়োজন অনুপাতে তার কাছে ভাষণের আকারে আল্লাহর এক বা একাধিক বাণী অবতীর্ণ হত এবং তিনি তা ভাষণের ন্যায়ই লোক-সম্মুখে পেশ করতেন। লেখার ভংগী এবং বক্তৃতার ভংগী এক নয়। লেখার ভাষায় সাধারণতঃ একটি সন্দেহের উল্লেখ করে তবে তার জবাব দেয়া হয়। লেখার মধ্যে প্রসঙ্গত কোনো কথা লিখতে হলে পূর্বাপর সম্পর্ক রক্ষা করেই তা স্বতন্ত্রভাবে লিখতে হয়, কিন্তু বক্তৃতার মধ্যে শুধু শব্দ এবং ভংগীর পরিবর্তন করেই অনেক কথা বলা হয়, অথচ তাতে পূর্বাপর সম্পর্কচ্ছেদের সন্দেহ পর্যন্ত জাগে না। লেখার মধ্যে বিষয়বস্তুর সাথে পরিবেশের সম্পর্ক স্থাপনের কাজ শব্দপ্রয়োগের দ্বারা সম্পন্ন করা হয়, কিন্তু বক্তৃতার পরিবেশ নিজেই মূল বিষয়ের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে নেয় এবং পরিবেশের দিকে ইংগিত না করেই যেসব কথা বলা হয় তাতে কোনো শূন্যতা অনুভূত হয়

www.amarboi.org

না। বক্তৃতায় কখনো একবচনে কথা বলা হয়, আবার কখনো বহুবচনে। বক্তা কখনো নিজেই কথক হয়, আবার কখনো কোনো দলের পক্ষ থেকে কথা বলে। সে কখনো কথা বলে উচ্চতর শক্তির প্রতিনিধি হিসাবে ; আবার কখনো উচ্চতর শক্তি নিজেই বক্তার মুখ দিয়ে কথা বলায়। লেখার মধ্যে শব্দ ও ভংগীর অনুরূপ পরিবর্তন অসংবদ্ধ বিবেচিত হলেও বক্তৃতায় তা একটা বিশেষ সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সৃষ্টি করে। অতএব কুরআন অধ্যয়নকারীকে মনে রাখতে হবে যে, কুরআন অপরাপর গ্রন্থের অনুরূপ কোনো গ্রন্থ নয়, বরং তা ঐ সমস্ত ভাষণেরই সমষ্টি যা আল্লাহ তাআলা তার নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর নাযিল করেছিলেন। আর একমাত্র এ কারণেই পূর্বাপর দু'টি বাণী বা সূরার মধ্যে বাহ্যিক অসংবদ্ধতা পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। তবে ঐ সমস্ত বাণী বা সূরার পটভূমি এবং নাযিল হওয়ার কারণ জানতে পারলে ঐ অসংবদ্ধতা আর অবশিষ্ট থাকে না। অতএব কুরআনের প্রত্যেকটি বাণী ও সূরা এবং তা নাযিল হওয়ার কারণ বা উপলক্ষ সম্পর্কে কুরআন অধ্যয়নকারীকে অবশ্যই অবহিত হতে হবে। আর এজন্য দরকার রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস এবং প্রাথমিক যুগের ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়নের। দরকার রাসূল (সাঃ)-এর জীবন-চরিত আদ্যোপান্ত পাঠ করার। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর সংগ্রামী জীবন হচ্ছে মূলতঃ কুরআনেরই প্রতিচ্ছবি।

৬. সংকলনের ইতিহাস

সম্পূর্ণ কুরআন একবারে বা গ্রন্থাকারে নয়, বরং আবশ্যক অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে খণ্ডাকারে নাযিল হয়েছে। কখনো কখনো নাযিল হয়েছে মাত্র কয়েকটি আয়াত, আবার কখনো কখনো একটি সম্পূর্ণ সূরা।

সর্বপ্রথম কুরআন নাযিল হয় ২৭শে রমযান, মুতাবিক ২৮শে জুলাই, ৬১০ খ্রীস্টাব্দে। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বয়স তখন ৪০ বছর। অতপর ৬৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৩ বছরে ক্রমান্বয়ে সম্পূর্ণ কুরআন নাযিল হয়।

কুরআনের যখন যে অংশ নাযিল হত রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সংগে সংগে তা মুখস্থ করে নিতেন। অনেক সাহাবীও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে কুরআন মুখস্থ করতেন। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কয়েকজন সাহাবীকে কুরআন লেখা ও তা সংরক্ষণের কাজে বিশেষভাবে নিয়োগ করেছিলেন। তখনকার দিনে কাগজ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল বিধায় ঐ সাহাবীরা প্রধানতঃ চামড়া, খেজুর পাতা,

www.amarboi.org

পাথর ও হাড়ের উপর কুরআন লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। ঐ লিপিবদ্ধকারীদের বলা হতো 'কাতিবে ওহী' বা ঐশীবাণীর লেখক। যখনই কোনো সূরা বা আয়াত নাযিল হতো তখনই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাতিবগণকে তা লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন। খোদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) প্রত্যেকটি শব্দ, প্রত্যেকটি আয়াত এবং প্রত্যেকটি সূরার সঠিক স্থান নির্দেশ করে দিতেন এবং কাতিবগণ সে অনুযায়ী তা লিপিবদ্ধ করতেন। এছাড়াও হযরত জিবরাঈল (আঃ) প্রতি বছর একবার এসে ইতিমধ্যে কুরআনের যতটুকু নাযিল হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে যথারীতি পড়ে শুনাতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত এ নিয়ম জারী ছিল।

উপরোক্ত কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগে কুরআনকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। তাছাড়া তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন 'ওহী' প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা ছিল। তাই কুরআনকে ক্রমানুসারে এবং গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা তখন সম্ভবও ছিল না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রবীণ সাহাবীদের পরামর্শ অনুযায়ী কুরআনকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার পরিকল্পনা নেন এবং এ মহান কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সর্বপ্রধান কাতিব হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রাঃ)-এর উপর। যায়দ ইবন সাবিত (রাঃ) অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনার পর বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও স্থান হতে কুরআনের আয়াত ও সূরাসমূহ সংগ্রহ করেন। প্রত্যেকটি আয়াতের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাঁচাইয়ের ক্ষেত্রে তিনি অকাট্য প্রমাণাদির সাহায্য নেন এবং অনুরূপ পদ্ধতিতে একটির পর একটি আয়াত ক্রমানুসারে সাজিয়ে সম্পূর্ণ কুরআনকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন।

এভাবে পবিত্র কুরআনের সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ সমাপ্ত হয়। অতপর ঐ গ্রন্থ হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট রক্ষিত থাকে। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত উমর (রাঃ)-এর নিকট এবং উমর (রাঃ)-এর ইন্তেকালের পর তাঁর কন্যা এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহধর্মিণী হযরত হাফসা (রাঃ)-এর নিকট তা রক্ষিত থাকে। হযরত উসমান (রাঃ) খলীফা হওয়ার পর হযরত হাফসা (রাঃ)-এর নিকট থেকে তা নিজ হেফাযতে নিয়ে যান।

হযরত উসমান (রাঃ)-এর খিলাফত-আমলে অনুমোদিত কুরআনের অসংখ্য কপি নববিজিত দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আঞ্চলিক, ভৌগলিক ও ভাষাগত পার্থক্যের দরুন নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে কুরআনের পঠনে

www.amarboi.org

(কিরাআতে) উচ্চারণ-বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়। এমনকি শব্দের উচ্চারণ ও ধ্বনি-বৈষম্যের ফলে মুসলিম জাতির মধ্যে গুরুতর মতভেদ ও কলহের সৃষ্টি হয়। [যেহেতু শব্দের উচ্চারণ ও ধ্বনির পরিবর্তনে তার অর্থের মধ্যে স্থান বিশেষে গুরুতর পরিবর্তন, এমনকি বৈপরিত্য দেখা যায় তাই ঐ কলহ সৃষ্টিতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না।] হযরত উসমান (রাঃ) তড়িৎ গতিতে উক্ত পরিস্থিতির মুকাবালা করেন। তিনি প্রথমে সাধারণ্যে প্রচারিত ও ব্যবহৃত কুরআনের সমস্ত কপি সংগ্রহ করেন। অতপর প্রবীণ ও অভিজ্ঞ সাহাবীদের পরামর্শ নিয়ে হযরত যায়দ ইবন সাবিত (রাঃ)-এর দায়িত্বাধীনে এবং তাঁরই তৈরী প্রথম সংকলনের উপর ভিত্তি করে বিশুদ্ধ কিরাআত সম্বলিত কুরআনের একটি নতুন সংকলন তৈরী করান এবং এটাকেই একমাত্র অনুসরণীয় বলে ঘোষণা করে জনসাধারণের নিকট থেকে সংগৃহীত সমস্ত কপি নষ্ট করে দেন। এ সংকলনে একমাত্র কুরাইশদের উচ্চারণ-পদ্ধতি এবং ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য গৃহীত হয়। কারণ এটাই ছিল খোদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উচ্চারণভঙ্গি ও ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য। তখন থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের সর্বত্র ঐ একই উচ্চারণ ও ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য-সম্বলিত কুরআন প্রচলিত রয়েছে। এর মধ্যে শব্দের, অক্ষরের, এমনকি বিন্দু-যতিরও লেশমাত্র পরিবর্তন হয়নি। বলা বাহুল্য, বর্তমানে আমরা যে কুরআন পাঠ করি তা হযরত উসমান (রাঃ)-এর আমলে সংকলিত কুরআনেরই অনুলিপি।

পরবর্তী যুগে ইসলাম যখন বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে তখন বিশেষভাবে অনারব পাঠকদের সুবিধার জন্য হিজরী ৮৬ সনে ইরাকের তৎকালীন গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে নাসর বিন আসিম ইয়াহ্ইয়া, খলীল বিন আহমদ প্রমুখ কুরআনের কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণ-কারক ইত্যাদি পৃথক পৃথকভাবে চেনার উদ্দেশ্যে শব্দের শেষ অক্ষরের উপর ছোট ছোট রেখা টেনে 'এরাব' (স্বরচিহ্ন) সংযোজন করেন। সেই সাথে সমরূপ বিশিষ্ট বর্ণসমূহের মধ্যে (যথা ঃ বা. তা. ছা. কিংবা জীম, হা. খা) পার্থক্য করার জন্য নুকতার (বিন্দুর) প্রবর্তন করা হয়। ঠিক ঐ সনেই সাধারণ পাঠকদের সুবিধার জন্য সমগ্র কুরআনকে প্রায় সমান ৩০টি ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যেক ভাগ বা জুযকে 'পারা' আখ্যা দেয়া হয়। অতপর প্রত্যেক পারাকে 'নিসফ' (অর্ধ), 'সুলুস' (এক-তৃতীয়াংশ) 'রুবু' (এক-চতুর্থাংশ) প্রভৃতি ভাগেও ভাগ করা হয়। বর্তমানে প্রায় সকল মুদ্রিত কুরআনেই পারা, সূরা, রুকূ এমনকি আয়াতেরও ক্রমিক নম্বরও দেয়া থাকে। আল্লাহ বা আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশে নয় বরং সাধারণ পাঠকদের সুবিধার জন্য পরবর্তী যুগে অনুরূপ করা হয়েছে।

www.amarboi.org

৭. টুকিটাকি তথ্য

পবিত্র কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ প্রধানত দু' ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ মাক্কী ও মাদানী। অধিকাংশ মুফাস্সির (কুরআন-ব্যাখ্যাকার)-এর মতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মক্কায় অবস্থানকালে অর্থাৎ হিজরতের পূর্বে যে সমস্ত সূরা ও আয়াত নাযিল হয়, সেগুলো হচ্ছে মাক্কী এবং যে সমস্ত সূরা ও আয়াত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পর নাযিল হয় সেগুলো মাদানী। সাধারণত মাক্কী সূরায় রয়েছে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস (যেমন আল্লাহর একত্ব ও নবীর সত্যতার প্রমাণাদি, পরকালে বিশ্বাসের যৌক্তিকতা এবং নাস্তিকতা তথা আল্লাহকে অস্বীকার করা, তার সাথে কাউকে অংশীদার করা, তার রাসূলকে অমান্য করা ও পরকালকে অবিশ্বাস করার অযৌক্তিতা) সম্পর্কিত আলোচনা। অতীতে যেসব জাতি নবীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে দুনিয়ায় অশেষ কল্যাণ লাভ করেছে এবং পরকালেও অনন্ত সুখের অধিকারী হবে, মাক্কী সূরাগুলোতে বিশেষভাবে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং ঐ সমস্ত ভাগ্যহীনদের সম্পর্কেও, যারা নবী (সাঃ)-এর আহ্বানকে অগ্রাহ্য করে এ জগতেও ধ্বংস হয়েছে এবং পরজগতেও পরম শাস্তি ভোগ করবে। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস শিক্ষা দেয়ার জন্য নয় বরং ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্যই কুরআনে অতীতের ঐ সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়াও মাক্কী সূরায়, রাসূল (সাঃ) এবং তৎকালীন মুষ্টিমেয় সাহাবীকে, কাফির ও মুশরিকদের অবিরাম নির্যাতনের মুখে যেমন ধৈর্য ধারণে উৎসাহিত করা হয়েছে, তেমনি কাফির-মুশরিকদেরকেও তাদের হঠকারিতা ও বাড়াবাড়ির ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হয়েছে।

মাদানী সূরাগুলোতে সাধারণত আলোচনা করা হয়েছে রাষ্ট্র ও সমাজ-পরিচালনা সম্পর্কিত যাবতীয় মৌলিক আইন [যেমন ফৌজদারী, উত্তরাধিকার, বিবাহ-তালাক, যাকাত, উশর (ভূমি রাজস্ব) প্রভৃতি সম্পর্কিত বিধি-বিধান এবং যুদ্ধ সম্পর্কিত আদেশ-নির্দেশ] সম্পর্কে। মাদানী সূরাগুলোতে আত্মগোপনকারী মুনাফিকদের কুটিল ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা একদিকে যেমন তাঁর নবীকে অবহিত করেছেন, অন্যদিকে তেমনি ইয়াহূদী এবং মুনাফিকদেরকেও তাদের জঘন্য কাজের পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছেন।

কুরআনে মোট ১১৪টি সূরা বা পরিচ্ছেদ রয়েছে। তার মধ্যে ৯২টি মক্কায় এবং ২২টি মদীনায় অবতীর্ণ।

www.amarboi.org

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনেক ক্ষেত্রে মাক্কী সূরায় মাদানী আয়াত স্থান লাভ করেছে। অনুরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত আয়াতের সংখ্যাধিক্য অনুপাতে অথবা সূরার প্রথম ভাগে বর্ণিত আয়াতসমূহ অনুসারে ঐ সমস্ত সূরা মাক্কী বা মাদানী নামে অভিহিত হয়েছে।

প্রত্যেকটি সূরার এক একটি নাম রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাতে আলোচিত প্রধান বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রেখেই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমও দেখা যায়। কোনো কোনো সূরার একাধিক নামও রয়েছে। সাধারণত বড় বড় সূরার আয়াতসমূহ দীর্ঘ এবং ছোট সূরার আয়াতসমূহ অপেক্ষাকৃত ছোট।

সর্বসম্মতিক্রমে কুরআনের আয়াতের সংখ্যা ৬০০০ (এর মধ্যে মোট ২৭৭৫টি আয়াতের পুনরাবৃত্তি রয়েছে)। অবশ্য বসরী উলামার মতে কুরআনের আয়াতের সংখ্যা ৬২০৪, মাদানী উলামার মতে ৬২১১, মক্কী উলামার মতে ৬২১৯, সিরীয় উলামার মতে ৬২২৫ এবং কুফী উলামার মতে ৬২৩৯।

আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কে আরো কিছু মত প্রচলিত আছে। যেমন হযরত আলী ও হযরত আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)-এর মতে পবিত্র কুরআনের আয়াতের সংখ্যা ৬২১৮।

'তাফসীরে জালালাইন'-এ প্রত্যেক সূরার প্রথমে, বিভিন্ন মতানুযায়ী ঐ সূরার আয়াতের সংখ্যা বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাতে দেখা যায়, কোনো সূরার আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কে একটি, কোনো সূরার আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কে দু'টি—এমন কি কোনো কোনো সূরার আয়াতের সংখ্যা সম্পর্কে পাঁচটি পর্যন্ত অভিমত রয়েছে। 'তাফসীরে জালালাইন'—এ বর্ণিত অভিমত অনুযায়ী প্রত্যেকটি সূরার আয়াতের সর্বোচ্চ সংখ্যাগুলো একত্রে যোগ করলে যে সংখ্যাটি দাঁড়ায় তাহলো ৬২৭৯। আর সর্বনিম্ন সংখ্যাগুলো একত্রে যোগ করলে যে সংখ্যাটি দাঁড়ায় তাহলো ৬২১৫। অতএব কুরআনের আয়াতের সংখ্যা এ দু'টির কোনো একটি হতে পারে। আবার এ দু'টির মধ্যবর্তী যে কোনো একটি সংখ্যাও হতে পারে। যেমন, ৬২১৫, ৬২১৬, ৬২১৯, ৬২২৫, ৬২৩৯ ইত্যাদি।

এ মতভেদের মূল কারণ এই যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেউ কেউ দুই আয়াতের সমষ্টিকে এক আয়াত, আবার কেউ কেউ ঐ দুই আয়াতকে স্বতন্ত্র দুই আয়াতই গণ্য করেছেন। তবে স্মরণ থাকে যে, যে কোনো দুই আয়াতের সমষ্টিকে এক আয়াত বা ঐ দুই আয়াতকে স্বতন্ত্র দুই আয়াত গণ্য করা যে কোনো পাঠকের ইখতিয়ারাধীন বিষয় নয়। আসল ব্যাপার হলো, রাসূলুল্লাহ

www.amarboi.org

(সাঃ) কোনো কোনো সময় পর পর দু'টি আয়াতকে থেমে থেমে স্বতন্ত্রভাবে পড়তেন, আবার কোনো কোনো সময় ঐ দু'টি আয়াতকে এক সাথে মিলিয়ে পড়তেন। ফলে কেউ কেউ ঐ দু'টি আয়াতকে স্বতন্ত্র দু'টি আয়াত, আবার কেউ কেউ একটি মাত্র আয়াত ধরে হিসাব করেছেন। আর এ কারণে শুধুমাত্র ঐসব ক্ষেত্রে কুরআন শরীফের আয়াতের সংখ্যার মধ্যে তারতম্য ঘটেছে।

মোটকথা, পর পর দু'টি আয়াতকে এক আয়াত বা স্বতন্ত্রভাবে দু' আয়াত গণ্য করা পাঠকের সম্পূর্ণ ইখতিয়ারাধীন বিষয় নয়। এ ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি রয়েছে। এ নিয়ম-নীতির বিবরণ রামূয-ই-আওকাফ' (বিরাম চিহ্ন) এই শিরোনামে প্রায় প্রত্যেক কুরআন শরীফের প্রথমে অথবা শেষে দেয়া থাকে। এটা মনোযোগ সহকারে পড়লে আয়াতের সংখ্যার মধ্যে কেন তারতম্য দেখা দিয়েছে তা সহজেই বুঝা যাবে।

কুরআনের প্রতি মুসলিম জ্ঞান-সাধকদের কত গভীর আগ্রহ ও অনুরাগ রয়েছে এবং কুরআনের গবেষণায় তারা কী অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করেছেন তার একটি বড় নমুনা এই যে, শুধু আয়াত বা সূরা নয় বরং কুরআনের শব্দ, অক্ষর, এমনকি যতিচিহ্নের হিসাবও তারা বের করে রেখেছেন।

যেহেতু আরবী ভাষায় অনেক ক্ষেত্রেই শব্দের পূর্বের ও পরের সংযুক্ত বর্ণসমূহ কখনো ঐ শব্দেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ, আবার কখনো স্বতন্ত্র শব্দ বলে পরিগণিত হয়, তাই কুরআনের সঠিক শব্দ সংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। কুরআনের অক্ষরসংখ্যা নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা আরবী ভাষায় অনেক ক্ষেত্রে স্বরচিহ্ন বর্ণরূপে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু স্বরচিহ্নরূপে পরিগণিত হয়। এছাড়াও আরবী ভাষায় এরূপ অনেক যুক্ত অক্ষর আছে যা কখনো এক অক্ষর, আবার কখনো স্বতন্ত্র দু' অক্ষর বলে পরিগণিত হয়। অতএব মুসলিম জ্ঞান-সাধকরা কুরআনের শব্দ, অক্ষর, যতিচিহ্ন (ওয়াকফ) 'এ'কার (কাসরা), 'আ'কার (ফাতহা) প্রভৃতির যে সংখ্যা নিরূপণ করেছেন তাতে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা মতপার্থক্য রয়ে গেছে। বিভিন্ন মতানুসারে কুরআনের শব্দ সংখ্যা ৭৭২৭৭, ৭৭৪৩৭ অথবা ৭৭৯৩৪ ; অক্ষর সংখ্যা ২২১২৬৫ হতে ৩৩৮৬০৬; যতিচিহ্নের সংখ্যা ১০৫৬৪৮, 'এ'কারের সংখ্যা ২৯৫৮২ এবং 'আ'কারের সংখ্যা ৫২২৪৩। মুসলিম জ্ঞান-সাধকরা প্রত্যেক প্রকারের অক্ষরের সংখ্যাও নিরূপণ করেছেন। যেমন আলিফ ৪৮৮৭২, বা ১১২২৮, তা ১১৯৯ ইত্যাদি ইত্যাদি।

www.amarboi.org

কুরআনের শতকরা ১১ ভাগ অর্থাৎ সাড়ে সাত শ' আয়াতে বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮৯ ভাগ আয়াতে আইন-কানূন, বিধি-বিধান, আচার-অনুষ্ঠান, আকায়িদ-বিশ্বাস এবং মানবীয় শিক্ষামূলক বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। কুরআনে মোট ২৫জন নবী-রাসূলের কথা উল্লিখিত আছে। ৭০-এরও অধিক স্থানে কুরআনের পাঠককে আল্লাহর সমীপে প্রার্থনা করতে, ৯০-এরও অধিক স্থানে 'নামায' কায়েম করতে এবং ১৫০-এরও অধিক স্থানে যাকাত প্রদানের নির্দেশ এবং দান-খয়রাতের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

জনৈক গবেষকের মতে, কুরআনে ১০০০টি ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি), ১০০০টি ওয়ীদ (ভীতি প্রদর্শন), ১০০০টি আমর (আদেশ-নির্দেশ) ১০০০টি নাহী (নিষেধ), ২৫০টি হালাল (বৈধ), ২৫০টি হারাম (অবৈধ), ১০০০টি মিছাল (দৃষ্টান্ত), ৫০০টি কাসাস (কিসসা-কাহিনী), ১০০০টি তাসবীহ (আল্লাহর পবিত্রতা) ও ১৫০টি নামায সম্বন্ধীয় আয়াত রয়েছে।

কুরআনে মোট রুকূর সংখ্যা ৫৪০টি এবং সিজদার সংখ্যা ১৪টি (ইমাম শাফিয়ীর মতে ১৫টি)।

সর্বপ্রথম নাযিল হয় সূরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত। কুরআনের সর্বপ্রথম অবতীর্ণ পরিপূর্ণ সূরা হচ্ছে সূরা আল ফাতিহা ; কারো কারো মতে সূরা মুদ্দাস্‌সির ; আর সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা হচ্ছে সূরা নাস্‌র। কুরআনের সর্বাপেক্ষা বড় সূরা হচ্ছে সূরা বাকারা (আয়াত সংখ্যা-২৮৬) আর সর্বাপেক্ষা ছোট সূরা হচ্ছে সূরা কাওসার (আয়াত সংখ্যা-৩) ; সর্বাপেক্ষা বড় আয়াত হচ্ছে আয়াতে দাইয়ান (অর্থাৎ সূরা বাকারার ৩৮ রুকূ হতে শেষ পর্যন্ত), আর সর্বাপেক্ষা ছোট আয়াত হচ্ছে মুদহাম্মাতান, ওয়াল ফাজরি এবং ওয়াদ্‌দুহা।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহ্

১. আল্লাহর পরিচয়

পবিত্র কুরআন মানুষের সামনে বিভিন্ন প্রসংগে এবং বিভিন্ন ভংগিতে অত্যন্ত সুন্দরভাবে আল্লাহর পরিচয় পেশ করেছে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আল্লাহর পরিচয় হলো, তিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং মানুষের একমাত্র উপাস্য। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক, সর্বময় কর্তা, সর্বজ্ঞাত, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং সর্বজয়ী।

অনন্ত আকাশ, বিরাট বিস্তৃত সাগর-মহাসাগর, পাহাড়-পর্বত, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, বৃক্ষলতা ইত্যাদি দৃশ্য-অদৃশ্য যাবতীয় বস্তু একমাত্র তিনিই সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই এগুলোর নিয়ামক ও একচ্ছত্র অধিপতি।

আল্লাহ সর্বশক্তিমান। একমাত্র তিনিই নিখিল বিশ্বের পরিচালক। তাঁরই ইংগিতে চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র আপন আপন কক্ষপথে অত্যন্ত শৃঙ্খলার সাথে ঘুরে বেড়ায়। তাঁরই আদেশে জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতা জন্মগ্রহণ করে, মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাঁরই ইচ্ছায় বিশ্ব প্রকৃতির বিস্ময়কর স্থিতি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

আল্লাহ অদ্বৈত, সর্ব বিষয়ের নির্ভর। তার সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী। তাঁরই হাতে যাবতীয় কল্যাণ, সকল ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান তিনি।

কুরআন বলে ঃ

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَمَا
خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ○ (البقرة : ٢٥٥)

www.amarboi.org

"আল্লাহ, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, অনাদি, অনন্তকাল ব্যাপী বিরাজমান। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। কে সে যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর কাছে সুপারিশ করে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে সবই জানেন তিনি। যা তিনি ইচ্ছা করেন তাছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ব করতে পারে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত, আর এদের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি কোনো বেগ পান না। তিনিই মহান, তিনিই মহামহিম।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫)

কুরআন বলে ঃ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۞ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۞ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۞

"বলো, তিনিই আল্লাহ একক ও অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি জনক নন এবং জাতকও নন এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"-(সূরা ইখলাস ঃ ১-৪)

কুরআন আরো বলে ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ ز وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ط بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۞ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِى النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِى الَّيْلِ ز وَتُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ز وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

"বলো, হে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ, তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও, যাকে ইচ্ছা তুমি পরাক্রমশালী কর, আর যাকে ইচ্ছা হীন কর। কল্যাণ তোমার হাতেই। তুমি সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান। তুমি রাতকে দিনে আর দিনকে রাতে পরিণত কর, তুমি মৃত থেকে জীবন্তের, আবার জীবন্ত থেকে মৃতের আবির্ভাব ঘটাও। তুমি যাকে ইচ্ছা অশেষ জীবনোপকরণ (রিযক) দান কর।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ২৬-২৭)

www.amarboi.org

কুরআন আরো বলে ঃ

هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِىْ لَآاِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۤءُ الْحُسْنٰى ۗ يُسَبِّحُ لَهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ (الحشر : ٢٢-٢٤)

"তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি গোপন-প্রকাশ্য সবই জানেন। তিনি করুণাময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা-বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত ; ওরা যাকে শরীক করে আল্লাহ তা হতে পবিত্র, মহান। তিনিই আল্লাহ, সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশ-পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"-(সূরা হাশর ঃ ২২-২৪)

যিনি বিশ্বাস করেন আল্লাহকে তাঁর যাবতীয় গুণাবলীসহ, মেনে চলেন তাঁর আদেশ-নিষেধ ও বিধি-বিধান-কুরআনের পরিভাষায় তিনি মুমিন—বিশ্বাসী।

আর আল্লাহর একটি বিশেষ পরিচয় হলো, তিনি মুমিনের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর গোটা জীবনকে ভরিয়ে দেন সার্থকতায়, নৈরাশ্যের অন্ধকার থেকে বের করে নিয়ে যান তাকে আশার আলোকে।

মুমিন আল্লাহর বন্ধু। কোনো প্রকার ভয়-ভীতি বা দুঃখ-কষ্ট তাকে স্পর্শ করে না। ইহকাল-পরকালে রয়েছে তার জন্য অনাবিল শান্তি—আল্লাহর অফুরন্ত নি'মাত। মানুষের জন্য এর চাইতে বড় সাফল্য আর কী হতে পারে !

কুরআন বলে ঃ

اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○ (البقرة : ٢٥٧)

www.amarboi.org

"আল্লাহ্ মুমিনদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকে নিয়ে যান। আর অবিশ্বাসীদের অভিভাবক শয়তান, ওরা তাদেরকে আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। ওরাই অগ্নি অধিবাসী, সেখানে থাকবে তারা চিরকাল।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৭)

কুরআন আরো বলে ঃ

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۝ (يونس : ٦٢-٦٤)

"জেনে রেখো, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। (আল্লাহর বন্ধু হচ্ছে তারা) যারা মুমিন এবং আল্লাহ্ সম্পর্কে সতর্ক। তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে এবং পারলৌকিক জীবনে— আল্লাহর (এই) কথায় কোনো নড়চড় হবে না, মানুষের জন্য এটাই তো পরম সাফল্য।"-(সূরা ইউনুস ঃ ৬২-৬৪)

২. আত্মার স্বীকারোক্তি

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আল্লাহকে অস্বীকারকারী দার্শনিকের সংখ্যা ছিল বেশুমার। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও মার্কস, এঙ্গেলস প্রমুখ অনেক নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছিল। এদের সংস্পর্শে এসে শুধু ধর্মপ্রিয় জনসাধারণ নয় বরং তাদের পথপ্রদর্শক পাদ্রী তথা ধর্মীয় পুরোহিতরাও নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার পতাকাবাহীতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে পরিস্থিতি বদলে যায়। এবার ঐ সমস্ত বিজ্ঞানী, যারা বিশ্বাসহীনতা, নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতার কারণ ছিল তারা শুধু আল্লাহর অস্তিত্ব এবং ধর্মের গুরুত্বকে স্বীকারই করেননি, বরং আল্লাহ্ ও তার একত্বের প্রচারকেও পরিণত হন।

"বিংশ শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক জেমস জেনীস, এডিংটন, হোয়াইট হেড, আইন্সটাইন প্রমুখ শুধু খোদাকে স্বীকার করেননি, বরং ধর্ম ও তাসাওউফের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। আইন্সটাইন লিখেছেন, সর্বোৎকৃষ্ট আবেগ, যার অধিকারী আমরা হতে পারি তা হচ্ছে মারিফাত (তত্ত্বজ্ঞান) ও তাসাওউফের আবেগ। কেননা এর মধ্যেই মানবিকতা ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের বীজ নিহিত রয়েছে।"-(Albert Einstein by Hilaire Cuny)

www.amarboi.org

মানুষের ভিতরে আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং তার আনুগত্যের অনুভূতি এত গভীরভাবে বিদ্যমান যে, সেটাকে নাস্তিক্যবাদী প্রচারনা কিংবা ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বন্যা কখনো একেবারে মুছে ফেলতে পারে না।

বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ড. রেনডলফ অটো (Dr. Randolph Otto) যুক্তি প্রমাণের সাহায্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, মানুষ প্রতিটি যুগেই একটি বিশেষ ধরনের 'পবিত্র ভীতি' (হায়বাত) অনুভব করেছে। এটা সেই জিনিস নয় যেটাকে 'ধর্মীয় প্রবণতা' (Disposition) বলা হয়, বরং এটা হচ্ছে ঐ গূঢ় তত্ত্বের স্মারক যে, প্রাচীন থেকে প্রাচীনতম যুগেও (যে পর্যন্ত আমাদের চিন্তা-গবেষণার সীমা বিস্তার লাভ করতে পেরেছে) মানুষ সর্বদা এ অনুভূতি লাভ করে এসেছে যে, তাদেরকে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো শক্তি বা সত্তা সৃষ্টি করেছে। মানুষ প্রতিটি যুগেই একথা অনুভব করেছে যে, সে ছাড়া এমন আর একটি সত্তাও রয়েছে, যা মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অথচ তার অসীম ক্ষমতা ও পরাক্রম (Over powering absolute might) -এর সামনে মানুষ মাত্রের নিজেকে অবনত করে দেয়া (Debase) উচিত। বিষয়টি শুধু অনুভূতি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং সেদিকে মানুষ সবসময়ই একটি আকর্ষণ ও সম্পর্কের ভাব লক্ষ্য করেছে।-(How man worship by F. H. Hillard,)

বিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতদের চিন্তা-গবেষণা ও উপলব্ধি থেকে আল্লাহ তাআলার ঐ সমস্ত বাণী আমাদের মনে উদিত হচ্ছে, যেগুলোর সত্যতার স্বীকারোক্তি পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গ তাদের অজ্ঞাতসারে হলেও করেছেন বা করছেন। এসবই হচ্ছে ঐ অঙ্গীকারের প্রভাব, যা আল্লাহ তাআলা সমগ্র আত্মার কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এ অঙ্গীকার গ্রহণের কথা কুরআন মজীদে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِيْٓ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ ۚ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۗ قَالُوْا بَلٰى ۚ شَهِدْنَا ـ(الاعراف : ١٧٢)

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই ? তারা বলে, 'নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী রইলাম।"-(সূরা আল আরাফ ঃ ১৭২)

এ বিষয়টি হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "প্রত্যেকটি মানব সন্তানকে 'ফিতরাত' তথা ইসলামের উপর সৃষ্টি করা হয়। অতপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহূদী কিংবা খ্রীস্টান কিংবা অগ্নি উপাসক বানায়।" আজ

www.amarboi.org

ওহীয়ে এলাহীর সত্যতা স্বীকার করছে স্বয়ং ঐ সমস্ত লোক, যারা ওহী থেকে দূরে অবস্থান করছিলো। এতে আল্লাহ তাআলার সেই প্রতিশ্রুতিই পালিত হচ্ছে যার উল্লেখ পবিত্র কুরআনে রয়েছে। যেমন ঃ

سَنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ط

"আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করবো বিশ্বজগতে এবং ওদের নিজেদের মধ্যে ; ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটাই (আল-কুরআন) সত্য।"–(সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ঃ ৫৩)

ইতিহাসের এটি একটি শিক্ষণীয় ব্যাপার যে, হিটলারের মত পাষাণ-হৃদয় ও অত্যাচারী ব্যক্তির অন্তরেও তার জীবনের শেষ মুহূর্তে আল্লাহ্র অস্তিত্বের ধারণা উদিত হয়েছে, অথচ তিনি তার সারা জীবন এ ধারণার বিরুদ্ধে লড়ে এসেছেন। ১৯৪৫ সনের ৩০শে এপ্রিল ব্রোমিন তার দৈনন্দিন ডায়রিতে লিখেছেন, একথাটি উপেক্ষা করা চলে না যে, হিটলার সর্বদা চার্চের উপর বাড়াবাড়ি করেছেন, যাতে ত্রিত্ববাদের দর্শন তার (হিটলারের) খোদায়ীর (?) স্থান লাভ করার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে না দাঁড়ায়। এখন হঠাৎ সেই খোদার কথাই তার মনে পড়ল। মনে পড়ল সেই পাপের কথাও যে পাপ তিনি করেছেন একটি মেয়েকে বিয়ে না করেই তার সঙ্গে বসবাস করে। শেষ পর্যন্ত এ কারণেই তিনি ১৯৪৫ সালের ২৮শে এপ্রিল রাতে ঐ মেয়েটিকে বিবাহ করেন।–(Barmanns Diary : April 30th, 1945)

উপরোক্ত ঘটনা থেকে কুরআন-হাদীসের এ তত্ত্বকথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানুষের ফিতরাতেরই চাহিদা এই যে, সে আল্লাহর উপর ঈমান আনবে এবং তার সাহায্য প্রার্থনা করবে। খোদার অস্তিত্বের ধারণা মানুষের অন্তরে উদিত হওয়ার সাথে সাথে সে গুনাহকে গুনাহ্ বলে ভাবতে শুরু করে। সাধারণ অবস্থায় মানুষের 'ফিতরাত' তার বুদ্ধির আচ্ছাদনে ঢাকা পড়ে যায়। কিন্তু কোনো না কোনো মুহূর্তে খোদার কথা অবশ্যই তার মনে পড়ে। এটাকে বিংশ শতাব্দীর একটি পরিহাসই বলতে হবে যে, এ সময়ে একদিকে বিজ্ঞানীরা আল্লাহর অস্তিত্বকে শুধু স্বীকারই করছেন না, বরং সে কথা অকাতরে প্রচারও করছেন। আর অপরদিকে ঐসব পাদ্রী, যারা দেড় দু' হাজার বছর ধরে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সত্য ধর্মকে পরিবর্তন করে আসছেন তাদের মধ্যেই এমন একটি বিরাট দলের উদ্ভব হয়েছে যারা বলছে, কোনো খোদা নেই এবং খোদাকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও একজন মানুষ খ্রীস্টান থাকতে পারে।–(God is no more by werner and peis)

www.amarboi.org

খ্রীস্টানদের বিখ্যাত প্রচারযন্ত্র Awake যা বিশ্বের ২৬টি ভাষায় মুদ্রিত হয় এবং যার প্রচার সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চান্ন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার, তাতে বলা হয়েছে ঃ

"আসল ব্যাপার এই যে, বাইবেলে বহু কম কথা এমন আছে, যেগুলোর মিথ্যা হওয়া সম্পর্কে চার্চসমূহ ঘোষণা দেয়নি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যে সমস্ত আমেরিকান চন্দ্রে গমন করেছিল তারা টেলিকাস্টে পৃথিবীর উপর মানুষের বসবাসের প্রস্তুতির বর্ণনা বাইবেল থেকে পড়ে শুনিয়েছিল। কিন্তু তার পরপরই Episoopal-এর এক পাদ্রী ঐ বর্ণনার উপর অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেন, যে বর্ণনা পড়ে শুনানো হয়েছে তা স্রেফ একটা কেচ্ছা ছাড়া কিছু নয়। বাইবেলের বর্তমান কোনো গবেষক-ভাষ্যকার বাইবেলে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বকে বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক বলে মনে করেন না। যদি কোনো ব্যক্তি বাইবেলের ঐ বর্ণনাকে সত্য বলে মানেন তাহলে আপনি নিশ্চিতভাবে দেখতে পাবেন, ঐ ব্যক্তিকে নিয়ে কোনো না কোনো গির্জার পাদ্রী ঠাট্টা-তামাশা করছে।–(Awake, April 22, 1969)

৩. তাওহীদের স্বরূপ

ইসলাম তাওহীদ বা একত্ববাদের ধর্ম। কিছু কিছু ধর্ম একত্ববাদের দাবী করে বটে, তবে সেগুলোতে কোনো না কোনোভাবে পৌত্তলিকতা বা শিরকের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামী আদর্শ, ইসলামী শিক্ষা এবং তার শাখা-প্রশাখা আল্লাহর সত্তা এবং তার গুণাবলীর একত্বতা ও অদ্বিতীয়তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ আপোষহীন। ইসলাম একত্ববাদের আকীদার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। সে শিরক এবং অংশীবাদিতা সর্বক্ষেত্রে শুধু অস্বীকার করেনি, বরং এর বিরুদ্ধে এমন স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত দলীল-প্রমাণ পেশ করেছে যেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার পর বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মুশরিক এবং পৌত্তলিকরা পর্যন্ত প্রকাশ্যে না হলেও অন্তরে অন্তরে তাদের শিরকী ইতিকাদের ব্যাপারে দারুণ লজ্জা ও অপমানবোধ করেন এবং শুধু মুখ রক্ষার খাতিরে তাদের শিরকের মধ্যেও যে কোনো না কোনো ভাবে তাওহীদের রূপ-রস-গন্ধ রয়েছে তা প্রমাণ করার চেষ্টাও করেন।

ইসলামের তাওহীদ ও একত্বতার শিক্ষা অত্যন্ত পরিষ্কার এবং স্পষ্ট। পবিত্র কুরআনের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই তাওহীদের স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে এবং নানাভাবে, নানারূপে ও নানা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে তার গুরুত্বের কথা। যেমন ঃ

www.amarboi.org

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ

كُفُوًا اَحَدٌ ۝ (الاخلاص : ١-٤)

"বলো, তিনিই আল্লাহ্, একক এবং অদ্বিতীয়, আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তার সমতুল্য কেউ নেই।"-(সূরা ইখলাস ঃ ১-৪)

ইসলামী তাওহীদের আকীদাকে স্বীকার করে নেয়ার প্রথম দাবী হলো, সর্বপ্রথমে সমস্ত বাতিল মাবূদকে অস্বীকার করতে হবে, অতপর স্বীকার করতে হবে সেই আল্লাহকে, যিনি অগণিত গুণাবলীর অধিকারী এবং এসব গুণাবলী তার সত্তার মধ্যে নিহিত রয়েছে। তিনি অনাদি এবং অনন্ত। আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে এমন কোনো গুণ পাওয়া যাবে না যাতে কোনোরূপ দুর্বলতা বা অসম্পূর্ণতা রয়েছে। জগতসমূহের এখানে ওখানে সর্বত্রই যে আল্লাহর গুণাবলী অহরহ বিকাশ লাভ করছে তা যে কোনো বিবেকসম্পন্ন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির নযরে পড়ে।

তাওহীদের তিনটি শাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যথা—তাওহীদ ফিল ইবাদাত, তাওহীদ ফিস্ সিফাত এবং তাওহীদ ফিয্ যাত।

'তাওহীদ ফিল ইবাদাত'-এর অর্থ হচ্ছে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করা যাবে না। ইবাদাতের যাবতীয় আকুতি এবং যাবতীয় অঙ্গভঙ্গি একমাত্র তারই জন্য নিবেদন করতে হবে এবং তিনি ছাড়া অন্য কারো সামনে মাথা নত করা যাবে না।

'তাওহীদ ফিস্ সিফাত'-এর অর্থ হচ্ছে, যে সমস্ত সিফাত আল্লাহ্ তাআলার, তা তারই সত্তার জন্য নির্দিষ্ট মনে করতে হবে। তাছাড়া তার গুণাবলীকে মনে করতে হবে সত্তাগত ও চিরন্তন। মনে রাখতে হবে বান্দাদের গুণাবলী পরিপূর্ণ এবং চিরন্তন নয়। কিন্তু আল্লাহর গুণাবলী সর্বদিক দিয়েই পরিপূর্ণ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ।

'তাওহীদ ফিয্ যাত'-এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলার সত্তাকে এক এবং অদ্বিতীয় মনে করতে হবে। কাউকে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ, এমনকি সমকক্ষ মনে করা যাবে না। একথার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি যেমন কাউকে জন্ম দেননি তেমনি তিনি কারো জাতও নন। কেননা যে জন্মদাতা বা জাত সে যে ধ্বংসশীল তার উদাহরণ বিশ্বের সর্বত্র এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যে, তা কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার করে না। বিশ্বে সবকিছুই আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি সকলের জন্য সর্ব বিষয়ে

www.amarboi.org

নির্ভর, কিন্তু তিনি কোনো বিষয়েই কারো উপর নির্ভর করেন না। তিনি সকলকে সৃষ্টি করেছেন। তিনি অনাদি এবং অনন্ত। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। আর এই একত্বতা ও অদ্বিতীয়তার ধারণাকেই তাওহীদ বলা হয়।

আল্লাহ যে এক, অদ্বিতীয় ও সর্ব বিষয়ে নির্ভর, তা মুমিন ও বিশ্বাসীর প্রত্যেকটি কাজকর্মে ফুটে উঠে। এমন কি যারা আল্লাহর একত্বে, এমনকি তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় তারাও তাদের লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বিপদ-আপদের মুহূর্তে অজ্ঞাতসারে হলেও আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র নিগাহবান ও রক্ষাকর্তা বলে মান্য করতে থাকে—যদিও পরমুহূর্তে আবার তাকে অস্বীকার করে। এ সমস্ত লোকদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ج فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ط وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَا اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ○

"যখন তরংগ ওদেরকে (অবিশ্বাসীদেরকে) আচ্ছন্ন করে মেঘচ্ছায়ার মত তখন ওরা আল্লাহকে ডাকে তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে (তাকে একমাত্র ত্রাণকর্তা ও সর্ববিষয়ে নির্ভর মনে করে)। কিন্তু যখন তিনি ওদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছান তখন ওদের কেউ কেউ সরল পথে থাকে (আল্লাহর উপর বিশ্বাসী হয়ে থাকে); কেবল বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিই তার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে।"–(সূরা লোকমান ঃ ৩২)

আর যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে তথা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে তাদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ط وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ○(العنكبوت : ٤١)

"যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি ওরা জানত।"–(সূরা আনকাবুত ঃ ৪১)

উপরোক্ত বর্ণনার প্রেক্ষিতে অতি সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, যাবতীয় কথার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক সত্য কথা হচ্ছে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো 'ইলাহ' (সর্বময় কর্তা) নেই। যে আল্লাহকে এক বলে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, তাকে সমীহ করে চলে এবং সর্ববিষয়ে তার উপর নির্ভর করে তার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো ঃ

www.amarboi.org

ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۙ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۗ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ۝ (الطلاق : ٢-٣)

"এর দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ্ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে ; যে কেউ আল্লাহ্কে ভয় করে আল্লাহ্ তার (সমস্যা সমাধানের) পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিয্ক ; যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, আল্লাহ্ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ্ সমস্ত কিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।"–(সূরা আত তালাক ঃ ২-৩)

৪. জীবন পথের অবলম্বন

মানুষের জীবন একটি দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা ছাড়া কিছু নয়। তাতে রয়েছে অনেক চড়াই-উতরাই। অনেক বিপদ-বাধা। তাই এ পথ অতিক্রম করতে চাই কোনো না কোনো অবলম্বন। কিন্তু কি সেই অবলম্বন যার সাহায্যে মানুষ অতি সহজে এবং সাফল্যজনকভাবে এ পথ পাড়ি দিতে পারে ?

মানুষের প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি যেহেতু এক তাই তাদের জীবনপথও এক হওয়া স্বাভাবিক। আর সাফল্যজনকভাবে এ পথ অতিক্রম করার অবলম্বনও নিশ্চয় একই ধরনের হবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায় না। কেউ এক পথ অবলম্বন করে, তো কেউ অন্য পথ। আর এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো, এ দুই পথ সাধারণত একটি অন্যটির সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে থাকে। তাই এর একটি সত্য এবং অপরটি ভ্রান্ত হতে বাধ্য এবং একথা সবাই স্বীকারও করে। তবে নিজেরটিকে কেউই ভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নিতে চায় না। বরং প্রত্যেকেই নিজেরটিকে সত্য এবং অপরেরটিকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়ে থাকে।

মানুষ সৃষ্টির সেরা—আশরাফুল মাখলুকাত। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে যে প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন সে যদি সে প্রকৃতির অনুসরণ করে এবং তার পিতা-মাতাও তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে তাহলে সে কোন্ পথ সত্য ও কোন্ পথ ভ্রান্ত তা মোটামুটিভাবে উপলব্ধি করতে পারে। তাছাড়া সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তাআলা যুগে যুগে নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যারা

www.amarboi.org

মানুষের কাছে কোন্ পথটি সত্য, আর কোন্ পথটি মিথ্যা তা নিজেদের কথা ও কাজের দ্বারা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। বলা বাহুল্য, সকল নবীরই পথ-নির্দেশনা ছিল এক এবং অভিন্ন।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন তা সাধারণভাবে তারা অনুসরণ করে না এবং আল্লাহ তাআলা তাদের পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে যেসব নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন তারা তাদেরও আনুগত্য করে না। ফলে তারা সত্য পথের পরিবর্তে মিথ্যা পথই অনুসরণ করে, অথচ বুক ফুলিয়ে ঘোষণা করে যে, তারা সত্য পথই অনুসরণ করছে।

তাদের কেউ জীবন পথ পাড়ি দিতে গিয়ে সূর্যকে আপন অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছে ; অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ তাআলা সূর্যকে তাদের সেবক হিসাবেই সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপভাবে কেউ অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছে অগ্নিকে, কেউ চন্দ্রকে, কেউ তারকাকে, কেউ কোনো না কোনো মানুষকে, কেউ আপন পিতা-মাতা বা পূর্ব পুরুষকে, কেউ নিজেরই হাতে তৈরী মূর্তিকে। বলা বাহুল্য, এসব অবলম্বনের কোনোটিই স্থায়ী নয়, বরং মরণশীল অথবা ধ্বংসশীল। মানুষের জীবন ইহকালেই শেষ হয়ে যায় না বরং পরকাল পর্যন্ত তা বিস্তৃত। অতএব কোনো মরণশীল বা ধ্বংসশীল বস্তু বা সত্তা এ পথে তাদের অবলম্বন হতে পারে না। বরং এমন কেউ তাদের অবলম্বন হওয়ার যোগ্য, যিনি সর্বশক্তিমান ও চির বিদ্যমান। যেহেতু মানুষের চলার পথে প্রতি মুহূর্তে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার প্রয়োজন তাই শুধুমাত্র তিনিই তাদের অবলম্বন হওয়ার যোগ্য যিনি চিরঞ্জীব, যার নিদ্রাও নেই, তন্দ্রাও নেই। শুধুমাত্র তিনিই তাদের অবলম্বন হওয়ার যোগ্য যিনি আসমান-যমীনের মালিক এবং আসমান-যমীনের মধ্যে যিনি একক ও অদ্বিতীয়, যিনি সর্ববিষয়ে নির্ভর, যিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, কিন্তু সকলেই তার মুখাপেক্ষী। শুধুমাত্র সেই সত্তাই মানুষের অবলম্বন হওয়ার যোগ্য যিনি প্রতি মুহূর্তে, ইহকালে-পরকালে, তাদের নিরাপত্তা বিধানে সম্পূর্ণ সমর্থ, যিনি সর্বশক্তিমান, প্রবল প্রতাপান্বিত, অতীব মহিমান্বিত, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছুই শুধুমাত্র তার আনুগত্যই করে না, বরং অকাতরে তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর মানুষের প্রকৃতি ও বিবেক-বুদ্ধি এ সাক্ষ্যই প্রদান করে এবং আম্বিয়া কিরামের শিক্ষা এ পথই প্রদর্শন করে যে, ঐ মহান সত্তা একমাত্র আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কেউ নন। অতএব যারা একমাত্র আল্লাহ তাআলাকে তাদের একমাত্র প্রভু এবং জীবন পথের একমাত্র কর্তা-বিধাতা হিসাবে জ্ঞান করবে একমাত্র তারাই সাফল্যজনকভাবে তাদের জীবন পথ অতিক্রম করতে পারবে, আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে তাদের জীবন পথের অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করবে তাদের

www.amarboi.org

জীবন পথ হবে বন্ধুর। কেননা আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল। আর যে স্বয়ং ধ্বংসশীল সে অন্যকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করবে কী করে?

একথাগুলোই পবিত্র কুরআনে অতি সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন ঃ

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَىِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ؕ اُولٰٓـئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○(البقرة : ٢٥٦-٢٥٧)

"দ্বীন সম্পর্কে কোনো জবরদস্তি নেই, সত্য পথ ভ্রান্ত পথ হতে সুস্পষ্ট হয়েছে। যে তাগূত (শয়তান, কল্পিত দেব-দেবী এবং যাবতীয় বিভ্রান্তিকর অবলম্বন)-কে অস্বীকার করবে ও আল্লাহে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়। যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের অভিভাবক তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকে নিয়ে যান, আর যারা কুফরী করে তাগূত তাদের অভিভাবক, এরা তাদেরকে আলোক হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়। ওরাই অগ্নি-অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"-(সূরা বাকারা ঃ ২৫৬-২৫৭)

৫. আল্লাহর আনুগত্য

মহানবী (সাঃ) এমন এক মহান শিক্ষা ও উচ্চতর মূল্যবোধ বহন করে নিয়ে আসেন, যার নির্মল পরশে মানুষের অন্তর আল্লাহর আনুগত্যে ধন্য হয়ে উঠে, যার অনুশীলন ও চর্চার মাধ্যমে সুশৃঙ্খল হয়ে উঠে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন, যা সহায়ক হয় মানবজাতির তথা সমগ্র সৃষ্টির কল্যাণ সাধনে।

মহানবী (সাঃ)-এর মহান শিক্ষার মর্মকথা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। আর আনুগত্যের অর্থ অন্তরের বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বাস্তব আমল।

কুরআনের বহু জায়গায় সৎকাজের মাধ্যমে এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানানো হয়েছে। নিষ্ঠাপূর্ণ ঈমানকেন্দ্রিক সৎকাজই ইহ ও পরকালীন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। এটাই হচ্ছে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা। যেমন ঃ

www.amarboi.org

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهٖ ۚ وَاِنَّا لَهٗ كٰتِبُوْنَ ۝

"সুতরাং যদি কেউ মুমিন হয়ে সৎকর্ম করে তার কর্মপ্রচেষ্টা অগ্রাহ্য হবে না এবং আমি তো তা লিখে রাখি।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯৪)

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخٰفُ ظُلْمًا وَّلَا هَضْمًا ۝

"মুমিন হয়ে যে সৎকর্ম করে তার আশংকা নেই অবিচারের এবং ক্ষতিরও।"–(সূরা আত ত্বা-হা ঃ ১১২)

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ

وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ۝ (النساء : ١٢٤)

"পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎকাজ করলে ও মুমিন হলে তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাদের প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১২৪)

বস্তুত যে কাজ করলে বান্দার কোনো ক্ষতি হয় না অথচ তাতে আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ পায় সেটাকে আমলে সালিহ বা সৎকাজ বলা হয়। আর আনুগত্য বলতে যেহেতু কুরআন-হাদীসের আদেশ-নিষেধ মান্য করাকেই বুঝায়, কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলমানের অপরাধ ও পাপাচারমুক্ত প্রতিটি কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। এ জাতীয় প্রতিটি কাজের প্রতিদানে ইহ-পরকালে আল্লাহর সাহায্য ও অনুগ্রহ নির্ধারিত রয়েছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন ঃ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ (النحل : ٩٧)

"মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করবো এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করবো।"–(সূরা আন নাহল ঃ ৯৭)

বলা বাহুল্য, ঈমান বিল্লাহর নির্দেশের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষকে তাদের বৈষয়িক উপায়-উপার্জন, সুখ-সমৃদ্ধি অর্জন, কল্যাণ সাধন এবং মান-মর্যাদা লাভের উপায়ও নির্দেশ করেছেন। কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۗ

وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۝ (الملك : ١٥)

www.amarboi.org

"তিনি তো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন ; অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ কর ; পুনরুত্থান তো তারই নিকট।"–(সূরা মুলক ঃ ১৫)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۗ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطٰنًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ (الاعراف : ٣٢-٣٣)

"বল, আল্লাহ্ আপন বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা সৃষ্টি করেছেন তা কে নিষিদ্ধ করেছে ? বল, 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য যারা ঈমান আনে।' এভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বিবৃত করি। বল, 'আমার প্রতিপালক নিষিদ্ধ করেছেন প্রকাশ্য ও গোপন অশ্লীলতা আর পাপ এবং অসঙ্গত বিরোধিতা এবং কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক করা—যার কোনো সনদ তিনি পাঠাননি এবং আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্পর্কে তোমাদের কোনো জ্ঞান নেই।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৩২-৩৩)

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝ (البقرة : ١٦٨)

"হে মানবজাতি ! পৃথিবীতে যাকিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে তা থেকে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৬৮)

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ۖ وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝ وَمِنَ الْاَنْعَامِ

www.amarboi.org

حَمُولَةً وَّفَرْشًا ط كُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ○(الانعام : ١٤١-١٤٢)

"তিনিই লতা ও বৃক্ষ উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদ বিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন ও ডালিমও সৃষ্টি করেছেন—এগুলো একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন তা ফলবান হয় তখন তার ফল আহার করবে, আর ফসল তোলার দিনে তার দেয় প্রদান করবে এবং অপচয় করবে না ; কারণ তিনি অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেন না। তিনি গবাদি পশুর মধ্যে কতক ভারবাহী ও কতক ক্ষুদ্রকার পশু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ যা রিযকরূপে তোমাদেরকে দিয়েছেন তা আহার কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না ; সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"

–(সূরা আল আনআম ঃ ১৪১-১৪২)

যারা ধর্মাচরণে অধিক নিষ্ঠাবান আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অধিক দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَّاَنِ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْۤا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَّتَاعًا حَسَنًا اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى وَّيُؤْتِ كُلَّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَهٗ ط -(هود : ٣)

"তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন কর, তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য উত্তম জীবন উপভোগ করতে দেবেন। আর তিনি ধর্মাচরণে অধিক নিষ্ঠাবান প্রত্যেককে অধিক দান করবেন।"–(সূরা হূদ ঃ ৩)

এতদসত্ত্বেও যারা আল্লাহর আনুগত্যে তথা ধর্মাচরণে একনিষ্ঠ নয়, উপরন্তু যারা ধর্মের বিরুদ্ধে কটূক্তির মাধ্যমে ধার্মিকদের নিয়ে উপহাস করে, ধর্মের ছায়াতলে যারা প্রতিপালিত হয়েছে তাদের সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করে তাদের চাইতে হতভাগা আর কে হতে পারে ? এরাই ইহকালে বিভ্রান্ত ও দিশেহারা এবং পরকালে জাহান্নামের অধিবাসী। এরা পশুর মতো, বরং পশুর চাইতেও অধিক নির্বোধ ও হতভাগা। যেমন কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ز لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز

www.amarboi.org

وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰۤئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰۤئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ٥(الاعراف : ١٧٩)

"আমি তো বহু জিন্ন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি ; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কান আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শুনে না, এরা পশুর মত, বরং পশু অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। এরাই (নিজেদের ইহ-পরকাল সম্পর্কে) গাফিল ও অমনোযোগী।"

–(সূরা আল আরাফ : ১৭৯)

৬ একত্ববাদের গুরুত্ব

পবিত্র কুরআন প্রথমেই যে জিনিসটি মানুষের মনে বদ্ধমূল করে দিতে চায়, তাহলো তাওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর একত্বের আদর্শ, আর এর ভিত্তিতে গঠিত মানব জাতির সংহতির ধারণা ; আর এ ধারণা থেকে উদ্ভূত সঞ্জীবনী শক্তি দিয়ে জীবন-যাপনের সঠিক রীতিনীতি অবলম্বনের স্পৃহা।

'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু'–একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন আর কোনো ইলাহ্ (সর্বময় কর্তা, ইবাদাতের যোগ্য) নেই—এ ধারণার উপরে এতবেশী গুরুত্ব দেয়া হয়েছে যে, সমগ্র কুরআনকে এই একটি মাত্র কথার তাৎপর্য-ব্যাখ্যাগ্রন্থ বললেও অত্যুক্তি হবে না। এ প্রসংগে এক সময়ে মরহুম সি. এফ. এন্ডরুজ এক লিখিত মন্তব্যে বলেন, "ইতিহাসের এক সংকটকালে সমগ্র প্রাচ্য-প্রতীচ্যে ইসলাম যে মহত্তম আশীর্বাদ এনেছিল, তাহলো স্রষ্টার একত্ববাদে গুরুত্বদান। কেননা ৬০০ থেকে ১০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সেই অন্ধকার যুগে হিন্দু ধর্মে তো বটেই, খ্রীস্টধর্মেও এ ধারণাটিকে ধামা চাপা দিয়ে বৈশিষ্ট্যহীন করে তোলার বিপদ দেখা দেয়। তাদের মধ্যে অসংখ্য উপদেবতা ও বীরের পূজা অনেক বেশী বৃদ্ধি পায়। তাই আল্লাহর একত্ববাদের সার্বভৌম সত্য হতে নীতিভ্রষ্টতার কারণে সৃষ্ট ইউরোপ ও ভারতের সেই অন্ধকার যুগে ইসলাম এক শক্তিমান সংস্কারক ও প্রবল বাধাদানকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। সেই দুর্দিনে ইউরোপ ও ভারতের মাঝামাঝি অবস্থান (মদীনা) থেকে ইসলাম এ চরম সত্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ না করলে মানুষের চিন্তাধারায় স্রষ্টার একত্বের মতাদর্শ এখন যেমন অবিসংবাদিতরূপে (তর্কাতীতরূপে) প্রতিষ্ঠিত, তা সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ।–(The Genuine Islam, Singapore, Vol. 1, No. 8, 1936)

www.amarboi.org

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যখন কৈশোর থেকে যৌবনে এবং যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেন, তখনকার দিনের মানুষের চিন্তাধারা ও জীবন-যাত্রা-প্রণালী বর্বরতার একেবারে নিম্নস্তরে নেমে গিয়েছিল। সেই সংকটময় মুহূর্তে তিনি যে বাণী প্রচার করেন তা বস্তুত মানবতার বিবেকের বাণীর বিঘোষিত রূপ। এজন্য তাঁর মতাদর্শ সমগ্র আরবে এমনকি তাঁর জীবদ্দশাতেই সে দেশের বাইরেও স্বীকৃতি লাভ করে।

মানব সমাজে পারস্পরিক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে আল্লাহর একত্ববাদের বাস্তব মূল্য অপরিসীম। আল্লাহ্ ভিন্ন মানুষের ইবাদত লাভের যোগ্য আর কেউ নেই—এই একটি মাত্র ধারণাই বর্ণ ও গোত্রের পার্থক্য ছাড়াও সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মানুষের সকল উচ্চ-নীচ ভেদাভেদের বিলোপ সাধন করে। মানবজাতির মুক্তি সাধনের জন্য এ হলো এক বিপ্লবী নীতিবাণী। মানুষের সত্তাকে আল্লাহর ঠিক নীচেই স্থান দিয়ে এবং নিষ্কলুষ জীবনযাত্রাকে সমাজ-জীবনে শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি নির্ধারণ করে এ মহাবাণী মানব-প্রকৃতিকে মর্যাদামণ্ডিত করেছে।

ইসলামের নবীকে কুরআন যে মর্যাদা দিয়েছে সে সম্বন্ধে ভেবে দেখলে, স্বরূপ ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহর অনন্যতা সম্পর্কে কুরআন যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে তা আমাদের বোধগম্য হবে। কুরআনে বারবার ঘোষণা করা হয়েছে যে, ইসলামের নবী মানুষ ভিন্ন আর কিছু নন। তিনি স্রষ্টার একজন দাস মাত্র। প্রত্যেক মুসলমানকে ইসলামের যে ধর্মীয় মূলনীতি বিশ্বাস করতে হয়, তা এই ঃ আমি ঘোষণা করছি, আল্লাহ্ ভিন্ন কোনো ইলাহ্ নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয় এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর একজন দাস ও পয়গামবাহক।

নবীকে যাতে স্রষ্টা বা তার কোনো অবতার মনে করা না হয় কিংবা তাঁকে স্রষ্টার নিজস্ব গুণাবলীতে বা তাঁর নিজস্ব সম্মানে ভূষিত করা না হয় সেজন্য ইসলামের এ ধর্মবিশ্বাসকে সতর্কতার সাথেই প্রকাশ করা হয়েছে।

এ কারণেই মহানবীর মৃত্যুর পর মুসলমানদের মধ্যে বহু মতপার্থক্য সৃষ্টি হলেও তাঁর ব্যক্তিত্ব (আল্লাহর দাস হওয়া) সম্বন্ধে কোনো মতানৈক্য দেখা দেয়নি। তাঁর মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরই তার শ্বশুর ও ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) মসজিদ-ই-নবভীর মিহরাবে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেন, "যে ব্যক্তি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পূজা করে, সে জেনে রাখুক মুহাম্মদের মৃত্যু হয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক আল্লাহ জীবিত, তিনি অমর।"–(বুখারী)

www.amarboi.org

এ ঘোষণার পর কুরআন থেকে আল্লাহ্র যে বাণী তিনি পাঠ করেন তাহলো ঃ

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلاَّ رَسُولٌ ج قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط اَفَائِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ ط وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ○(ال عمران : ١٤٤)

"মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র ; তাঁর পূর্বে বহু রাসূল গত হয়েছেন। কাজেই যদি তিনি মারা যান বা নিহত হন তবে তোমরা কি পলায়ন করবে ? আর কেউ পলায়ন করলে সে কখনও আল্লাহ্র ক্ষতি করবে না, বরং আল্লাহ শীঘ্রই সকল কৃতজ্ঞকে পুরস্কৃত করবেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৪)

মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত তাগিদের ভিত্তিতেই কুরআন আল্লাহ্র স্বরূপ সম্বন্ধে তার ধারণা পেশ করেছে। জীবন সম্বন্ধে মানুষের ধারণা এই যে, এ বিশাল বিশ্ব আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি, কেউ তাকে সৃষ্টি করেছে। সুতরাং একজন স্রষ্টা অবশ্যই থাকবেন, যিনি এমন সব গুণের অধিকারী, যার বদৌলতে তিনি সামঞ্জস্যের সঙ্গে সৃষ্ট যাবতীয় প্রাণীর জীবন পালন ও নিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা রাখেন। কুরআনের মতে এ গুণাবলীর সংখ্যা সীমিত হতে পারে না। কেননা, "তিনি (আল্লাহ্) প্রত্যহ গুরুত্বপূর্ণ কার্যে রত।" কুরআনে তাঁর মাত্র কয়েকটি গুণ উল্লেখিত হয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটির গুপ্তরহস্যমূলক তাৎপর্য রয়েছে ; আর আল্লাহ্র উপরে যে সকল গুণ আরোপ করা হয়, মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও তাদের অধিকাংশেরই ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে। এমনকি যেসব গুণের গুপ্তরহস্যমূলক ব্যাখ্যা আছে, মানুষের পূর্ণতা অর্জন প্রচেষ্টায় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে তাদেরও নিজস্ব মূল্য রয়েছে। যে জীবন যাপন দ্বারা ব্যক্তিগত জীবনে মানুষের ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে ও মানব জাতির ঐক্যসংহতি অর্জিত হয় শুধুমাত্র তেমন ধর্মনিষ্ঠ জীবন-যাপনের দ্বারাই আল্লাহ্র এককত্বে ও তার গুণাবলীতে পরিপূর্ণ বিশ্বাস কার্যত ব্যক্ত হয়ে থাকে। ব্যক্তির স্ববিরোধমুক্ত সুসংহত জীবনে এবং মানব জাতির সম্মিলিত অস্তিত্বে, প্রতিটি মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র গুণাবলী সৃষ্টির জন্য আমাদের নবী যে উপদেশ দিয়েছেন তার তাৎপর্য এটাই। এখানে একটা বিষয় মনে রাখা দরকার। আল্লাহ্র গুণাবলী অসংখ্য, তাই তার কোনোটি এককভাবে ক্রিয়াশীল থাকে না। অভিব্যক্তির বেলায় তারা একে অন্যের সাথে মিলিতভাবে বর্তমান থাকে। আল্লাহ্র এ কর্মপদ্ধতির সাথে বা আল্লাহ্র সুন্নাতের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে নিজের জীবনাচরণে বিভিন্ন গুণের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যেই মানুষকে আল্লাহ্র গুণাবলীর অনুশীলন করতে হবে।

www.amarboi.org

পবিত্র কুরআনে আল্লাহর যেসব গুণ উল্লেখিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে মানুষের জন্য বিশেষভাবে অনুকরণীয় গুণগুলো হচ্ছে ঃ (১) রুবুবিয়াত (প্রতিপালন), (২) আদল (ন্যায় বিচার) ও (৩) রহমত (অনুকম্পা বা ক্ষমা প্রদর্শন)।

প্রথমটির দ্বারা আল্লাহ তাআলা যে মানব জাতির কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা দলের আল্লাহ নন একথা বুঝানো হয়েছে। তিনি গোটা মানব জাতির ও মহাবিশ্বের দৃশ্য-অদৃশ্য সবকিছুরই সৃজন, বিকাশ সাধন, রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করেন। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, তারা প্রত্যেকে আল্লাহর পরিবারের সদস্য। তাঁদের প্রত্যেককে তাঁর কর্মপরিকল্পনার এককরূপে, বিবেচনা করতে হবে। আল্লাহর এককত্বের বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপায়িত করতে চাইলে মানুষকে এ মতাদর্শের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আল্লাহর দ্বিতীয় প্রধান গুণ আদল ও ন্যায় বিচার। এ গুণের অনুশীলন মানুষকে নিজের বিবেকের সাথে ও বহির্জগতের অর্থাৎ পরিবেষ্টনীর সাথে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক ধৈর্য অর্জনের সামর্থ দান করে। পরিশেষে আল্লাহর তৃতীয় প্রধান গুণ রহমতের অনুকরণে মানুষকে প্রতি পদে ক্ষমাশীলতার অনুশীলন করতে হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ط-(الاعراف : ١٥٦)

"আমার দয়া—তাতো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত।"-(সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৬)

যে মুমিন আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলীতে বিশ্বাসী তাকে চিন্তা ও কর্মে এই অনুকম্পা বা ক্ষমাশীলতা গুণের পরিচয় দিতে হয় যাতে পরিণামে মানব জাতি একটি বৃহৎ সুখী পরিবাররূপে বসবাস করতে পারে। কুরআন থেকে যেসব আয়াত এবং হাদীস থেকে যেসব অংশ নীচে উদ্ধৃত হয়েছে তাতে আল্লাহর এককত্ব সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনার উপাদান মিলবে।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ج اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ج لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ط لَهٗ مَا فِى
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ط مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ
كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○

"আল্লাহ, তিনি ভিন্ন অন্য কোনো ইলাহ নেই। তিনি অমর, স্বাধিষ্ঠ-বিশ্বধাতা। তাকে তন্দ্রা বা নিদ্রা স্পর্শ করে না। আকাশ ও পৃথিবীতে যা

www.amarboi.org

কিছু আছে সবই তাঁর। কে সে যে তাঁর অনুমতি ভিন্ন তাঁর কাছে সুপারিশ করবে ? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। যা তিনি ইচ্ছা করেন তা ভিন্ন তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত ; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না ; তিনি মহান শ্রেষ্ঠ।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫)

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ○ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ○ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ (الحشر : ٢٢-٢٤)

"তিনি আল্লাহ, তিনি ভিন্ন কোনো ইলাহ নেই। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি দয়াময় পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, তিনি ভিন্ন কোনো ইলাহ নেই। তিনিই অধিপতি, তিনিই পবিত্র, তিনিই শান্তি, তিনিই নিরাপত্তা-বিধায়ক, তিনিই রক্ষক, তিনিই পরাক্রমশালী, তিনিই প্রবল, তিনিই অতীব মহিমান্বিত, ওরা যাকে শরীক স্থির করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা, সকল উত্তম নাম তারই। যা কিছু আছে আকাশে আর যা কিছু আছে পৃথিবীতে সবই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"–(সূরা আল হাশর ঃ ২২-২৪)

قَالَ رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى ○ (طه : ٥٠)

"আমাদের প্রতিপালক তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন, অতপর তাকে পথ-নির্দেশ করেছেন।"

–(সূরা আত ত্বা-হা ঃ ৫০)

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۭ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ ○ (هود : ٦)

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী সবার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহরই, তিনি ওদের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত, সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিছুই আছে।"

www.amarboi.org

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا طٰئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّا اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ط مَافَرَّطْنَا فِي الْكِتٰبِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ○(الانعام : ٣٨)

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে এমন জীব নেই অথবা নিজের ডানার সাহায্যে এমন কোনো পাখী ওড়ে না যা তোমাদের মতো একটি উম্মত নয়। কিতাবে কোনো কিছুই আমি বাদ দেইনি। তারপর নিজের প্রতিপালকের দিকে তাদের সবাইকে একত্রিত করা হবে।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৩৮)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ○اَللّٰهُ الصَّمَدُ○لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ○وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ○(الاخلاص : ١-٤)

"বলো, তিনিই আল্লাহ, একক ও অদ্বিতীয়, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী ; তিনি কাউকেও জন্ম দেননি। আর তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি, আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।"–(সূরা ইখলাস ঃ ১-৪)

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ ط -(النحل : ٧٤)

"অতএব আল্লাহর কোনো সদৃশ স্থির করো না।"–(সূরা আন নাহল ঃ ৭৪)

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ج -(الشورى : ١١)

"কোনো কিছুই তার সদৃশ নয়।"–(সূরা শুরা ঃ ১১)

لَاتُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ ز وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَ ج وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ○

"তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নন, কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁর অধিগত ; আর তিনিই সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক পরিজ্ঞাত।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১০৩)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَافِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط مَايَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ اِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ اِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا اَدْنٰى مِنْ ذٰلِكَ وَلَا اَكْثَرَ اِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَ مَاكَانُوْا ج ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ○(المجادلة : ٧)

"তুমি কি অনুধাবন করো না—যা আছে আকাশে আর যা আছে পৃথিবীতে আল্লাহ তা জানেন ? তিনজনের মধ্যে এমন কোনো গোপন পরামর্শ হয় না

www.amarboi.org

যাতে চতুর্থজন হিসেবে তিনি উপস্থিত থাকেন না ; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেন না ; ওরা এর চাইতে কম হোক বা বেশী হোক ওরা যেখানেই থাকুক না কেন আল্লাহ ওদের সঙ্গে আছেন। ওরা যা করে তিনি কিয়ামতের দিন ওদের তা জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত।"–(সূরা মুযাদালা ঃ ৭)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَاتُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ

حَبْلِ الْوَرِيْدِ ○(ق : ١٦)

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার প্রবৃত্তি তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয় তা আমি জানি। আর আমি তার ঘাড়ের ধমনীর চাইতেও নিকটতর।"
–(সূরা ক্বাফ ঃ ১৬)

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَيًّامَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰى ۚ

"বলো, তোমরা 'আল্লাহ' নামে আহ্বান কর বা 'রাহমান' নামে আহ্বান কর, তোমরা যে নামেই আহ্বান কর সব সুন্দর নামই তো তাঁর।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১১০)

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ق فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ○

"পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই ; আর যেদিকেই তোমরা মুখ ফিরাও না কেন, সেদিকে আল্লাহর মুখ (অর্থাৎ উপস্থিতি)। আল্লাহ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ১১৫)

بَلْ لَّهٗ مَافِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ○بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط

وَاِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○(البقرة : ١١٦ـ١١٧)

"বরং আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহরই। সব কিছু তাঁরই একান্ত অনুগত। আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, আর যখন তিনি কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন—শুধু বলেন, 'হও', আর তা হয়ে যায়।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ১১৬-১১৭)

وَاَحْسِنُوْا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ○(البقرة : ١٩٥)

www.amarboi.org

"তোমরা সৎকাজ করো, আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালোবাসেন।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৫)

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَاتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ○ (ال عمارن : ٧٦)

"হ্যা, কেউ তার অংগীকার পূর্ণ করলে আর তাকওয়া অবলম্বন করে চললে আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালোবাসেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৬)

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ○ (ال عمران : ١٤٦)

"আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালোবাসেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৬)

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ○ (البقرة : ٢٢٢)

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন, আর যারা পবিত্র থাকে তাদেরকেও ভালোবাসেন।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২২)

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط -(المؤمن : ٦٠)

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"–(সূরা আল মুমিন ঃ ৬০)

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ لا

فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِىْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِىْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ○(البقرة : ١٨٦)

"আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক আর আমাতে বিশ্বাসী হোক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।"–(বাকারা ঃ ১৮৬)

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ ط

اَلْمِصْبَاحُ فِىْ زُجَاجَةٍ ط اَلزُّجَاجَةُ كَاَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ يُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ

زَيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةٍ وَّلَا غَرْبِيَّةٍ لا يَّكَادُ زَيْتُهَا يُضِىٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُوْرٌ

عَلٰى نُوْرٍ ط يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ط -(النور : ٣٥)

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি, তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটা দীপাধার যার মধ্যে আছে এক প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের

www.amarboi.org

আবরণের মধ্যে স্থাপিত, কাঁচের আবরণটি যেন উজ্জ্বল নক্ষত্র সদৃশ, তা জ্বালানো হয় পূত-পবিত্র যায়তুন গাছের তেল দিয়ে যা পূর্বেরও নয়, পশ্চিমেরও নয়, আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও যেন তার তেল উজ্জ্বল আলো দিচ্ছে ; জ্যোতির উপর জ্যোতি। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন তার জ্যোতির দিকে।"–(সূরা আন-নূর ঃ ৩৫)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ○ (الفاتحة : ١-٧)

"প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য, যিনি দয়াময়, পরম দয়ালু, কর্মফল দিবসের মালিক। আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি, শুধু তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি, আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন কর, তাদের পথ যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ দান করেছ, তাদের পথ নয় যারা তোমার রোষের পাত্র, তাদের পথ নয় যারা পথহারা।"–(সূরা ফাতিহা ঃ ১-৭)

وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ط -(الاعراف : ١٥٦)

"আর আমার দয়া—তাতো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত।"–(সূরা আরাফ ঃ ১৫৬)

كَتَبَ عَلٰى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ط -(الانعام : ١٢)

"দয়া করা তিনি তাঁর কর্তব্য বলে স্থির করেছেন।"–(সূরা আনআম ঃ ১২)

৭. তাক্ওয়া

ইসলামে ঈমান ও তাওহীদের পর তাকওয়া হচ্ছে একটি বুনিয়াদী ও কেন্দ্রীয় বিষয়।

তাকওয়ার শাব্দিক অর্থ কোনো কষ্টদায়ক বস্তু হতে সাবধানতা অবলম্বন করা, ভীতিপ্রদ বস্তু হতে আত্মরক্ষা করা, পরহেয করা, সাবধান হয়ে চলা ইত্যাদি।

আর ইসলামী পরিভাষায় তাকওয়ার অর্থ পাপাচার হতে আত্মরক্ষা করা— অন্য কথায়, আল্লাহকে ভয় করা তথা আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল যা কিছু নিষেধ করেছেন তা থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করা।

www.amarboi.org

আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের হাদীস অনুযায়ী তাকওয়া দ্বীনে ইসলামের একটি বুনিয়াদী বিষয় এজন্য যে, আইন-কানুন তথা আদেশ-নির্দেশ পালন করা তাকওয়া তথা সাবধানতা অবলম্বন ছাড়া সম্ভব নয়।

পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে তাকওয়া মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত।

এক ঃ সেই যোগ্যতা ও অবস্থা, যা আল্লাহর উপর বিশ্বাসস্থাপনের পর মানুষের অন্তরে সৃষ্টি হয়ে থাকে। আর তাহলো সম্পূর্ণ সতর্কতার সাথে আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, মালিক, অভিভাবক এবং একমাত্র মাবূদ ও উপাস্য মনে করা। যদি এ অবস্থা সঠিক হয় তাহলে মানুষের যাবতীয় উৎসাহ-উদ্যম, চিন্তা-ভাবনা এবং কাজকর্মও পবিত্র ও সঠিক হবে। যদি কোনো অন্তর এ তাকওয়া থেকে বঞ্চিত থাকে তাহলে তার সব কাজকর্মই ভুল-ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হবে এবং তাতে কোনো নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় থাকবে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِيْعُوْنِ -(نوح : ٣)

"তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো, তাকে ভয় করো এবং আমার (রাসূলুল্লাহর) আনুগত্য করো।"–(সূরা আন নূহ ঃ ৩)

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ -(المؤمنون : ٥٢)

"আমিই তোমাদের প্রতিপালক ; অতএব আমাকে ভয় করো।"

প্রথম পর্যায়ের এ তাকওয়া হচ্ছে চিন্তা-ভাবনা তথা অন্তরের তাকওয়া। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পবিত্র বক্ষের প্রতি ইঙ্গিত করে এ তাকওয়া সম্পর্কেই একদা বলেছিলেন, 'তা (তাকওয়া) এখানেই রয়েছে।'

দুই ঃ সমগ্র কাজকর্মে সাবধানতা অবলম্বন। প্রথম পর্যায়ের আন্তরিক অবস্থা ও যোগ্যতা যখন সজীব ও সুদৃঢ় হয়ে উঠে তখন তার 'আছর' (প্রভাব) মানুষের উদ্যোগ-আয়োজন এবং কাজ-কর্মে প্রতিফলিত হয়। অতপর সে মানুষ যাবতীয় খারাপ ও গর্হিত কাজকর্ম তথা মিথ্যাচার, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ঈর্ষা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ইত্যাদি থেকে দূরে থাকে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا ○ يُّصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ○

www.amarboi.org

"হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো ; তাহলে তিনি তোমাদের কাজকর্মকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, তারা অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।"–(সূরা আল আহ্যাব ঃ ৭০-৭১)

অর্থাৎ হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং এ ভয় তথা তাকওয়ার ছত্রছায়ায় আপন কথাবার্তা সম্পূর্ণ সঠিক ও কলুষমুক্ত রাখো। অর্থাৎ কুফর, শিরক, মিথ্যাচার, পরনিন্দা, গালিগালাজ, দুর্নাম রটনা, অনর্থক কথা বলা প্রভৃতি থেকে দূরে থাকো। যদি তোমরা এ তাকওয়ার বলে নিজেদের জিহ্বা এবং অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হও তাহলে এর প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তাআলা তোমাদের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দেবেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ط وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ط ـ(الطلاق : ٢-٣)

"যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দেবেন (সমস্যার সমাধান করে দেবেন) এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযক দান করবেন ; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"–(সূরা আত তালাক ঃ ২-৩)

আর ভুলবশতঃ যদি তোমাদের কাজকর্মের মধ্যে কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা দেয় তাহলে আল্লাহ তাআলা এ তাকওয়ার কল্যাণে তা উপেক্ষা করবেন তথা মাফ করে দেবেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝(الانفال : ٢٩)

"হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন, তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময়।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ২৯)

তিন ঃ তাকওয়া-বিরুদ্ধ ভ্রান্ত চিন্তাধারণা এবং খারাপ কাজকর্মের কুপরিণাম থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা, যাতে করে ঈমানের সুপ্রভাবে অন্তরের মধ্যে যে সঠিক ধারণার উদ্ভব হয়েছে তা এমন

www.amarboi.org

সুদৃঢ় ও বদ্ধমূল হয় যে, এর ফলে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন জীবন মঙ্গলময় হয়ে উঠে।

এ তৃতীয় পর্যায়ের তাকওয়ার উপরও পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যেমন ঃ

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْئًا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ○ (البقرة : ٤٨)

"তোমরা সেই দিনকে ভয় কর যে দিন কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না এবং কারো সুপারিশ স্বীকৃত হবে না এবং কারো কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না এবং তারা কোনো সাহায্য পাবে না।"(সূরা বাকারা ঃ ৪৮)

www.amarboi.org

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)

১. রাসূল জীবন অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন সর্বযুগের এবং সর্বকালের মানুষের জন্য একটি আদর্শ জীবন। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্যই তাঁর জীবন অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবন-চরিত অধ্যয়ন করা মুসলিমদের জন্য বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন এজন্য যে, উসূলে ফিক্হের দৃষ্টিতে রাসূলে করীম (সাঃ)-এর প্রত্যেকটি বাণীর ন্যায় তার প্রত্যেকটি কর্মও আইনের মর্যাদা রাখে এবং সুন্নাতে নবভীর নিরিখেই ওয়াজিব (অবশ্য করণীয়), মুসতাহাব (পছন্দনীয়), মুবাহ (করলেও চলে, আবার না করলেও চলে), মাকরূহ (অপছন্দনীয়) প্রভৃতি নির্ধারণ করা হয়। মুসলমানদের জীবনকে তখনই ইসলামী জীবন বলা হবে যখন তা কুরআন মজীদের আদেশ-নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হবে। আর কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় সুন্নাতে নবভীর আইন সম্বন্ধীয় মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং এটাকে অবশ্য পালনীয় বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। এর দ্বারা সুন্নাতে নবভী তথা নবী-চরিত কুরআনের অংশবিশেষের মত না হলেও অন্ততঃ তার ক্রোড়পত্র ও পরিশিষ্টের মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে পড়ে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ق وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○ (الحشر : ٧)

"রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক। এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ; আল্লাহ্ শাস্তিদানে কঠোর।"–(সূরা হাশর ঃ ৭)

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ○ (الاحزاب : ٢١)

www.amarboi.org

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহ্কে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"-(সূরা আল আহযাব ঃ ২১)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَاَنْتُمْ تَسْمَعُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ۝ اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝ (الانفال : ٢٠-٢٢)

"হে মুমিনগণ ! আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমরা যখন তার কথা শুনছ তখন তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। আর তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা বলে, 'শুনলাম'; বস্তুতঃ তারা শুনে না। আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও মূক, যারা কিছুই বুঝে না।"
-(সূরা আনফাল ঃ ২০-২২)

وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاحْذَرُوْا ۚ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا عَلٰى رَسُوْلِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ۝ (المائدة : ٩٢)

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর এবং সতর্ক হও, যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রেখ, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের কর্তব্য।"-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৯২)

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۝ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۝ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۝ (النجم : ١-٤)

"শপথ নক্ষত্রের যখন তা হয় অস্তমিত ! তোমাদের সঙ্গী [মুহাম্মদ (সাঃ)] বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয় এবং সে মনগড়া কথাও বলে না ; কুরআন তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"-(সূরা আন নাজম ঃ ১-৪)

এ সমস্ত আয়াত এবং আরো অনেক আয়াত দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মহান পথপ্রদর্শক, দু' জাহানের নেতা রাসূলে করীম (সাঃ)-এর কথা, তাঁর কর্ম এবং যেসব বিধি-বিধান তিনি তাঁর অনুসারীদের মধ্যে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, সেসবের উপর আমল (কার্যে পরিণতকরণ) ঠিক তেমনি জরুরী, যেমনি জরুরী কুরআনের আদেশ-নির্দেশ।

www.amarboi.org

রাসূলে আরাবীর জীবন-চরিত অধ্যয়ন করা অমুসলিমদের জন্য প্রয়োজন এজন্য যে, যখন কোনো ব্যক্তি আমাদের বলে, 'তোমাদের জন্য মঙ্গলকর কিছু কথা আমি বলতে চাই'—তখন সুস্থ বুদ্ধি সম্পন্ন এমন কে আছে, যে একথা শুনতে অস্বীকার করবে ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জীবনের প্রথম বার যখন ঘোষণা করেন, "আমি সমগ্র বিশ্বের রহমতরূপে এসেছি এবং যে দ্বীন ইসলাম (শান্তির ধর্ম) নিয়ে এসেছি তার অনুসরণ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে ইহকাল-পরকালের মঙ্গল লাভ সম্ভব নয়—তখন উদ্ধত স্বভাবের লোকেরা কূটতর্কে লিপ্ত হয় এবং তার বিরোধিতা করতে থাকে। কিন্তু শান্ত ও ধীর স্বভাবের লোকেরা অনুরূপ না করে বরং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে ঃ ইসলাম কাকে বলে এবং আপনার মতে আমাদের কি করা উচিত ? এ জিজ্ঞাসার জবাব পাওয়ার পর তারা আবার ঠাণ্ডা মাথায় বিষয়টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে এবং যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হলে পর তা বিনা দ্বিধায় গ্রহণও করে। বিশ্বনবীর বাণীসমূহ, কার্যকলাপ এবং তাঁর উপস্থাপিত ধর্ম এখনো সুসংরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান। এক্ষেত্রে প্রাচীন নিদর্শনাদির উপর ভিত্তি করে কিছু একটা খাঁড়া করার কিংবা সরল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে কোনো কল্পনাপ্রসূত কথা বলার প্রয়োজন নেই।

বিষয়টিকে কিঞ্চিৎ খোলাসা করে বলা যাক। অন্যান্য ধর্মের পবিত্র এবং ঐশ্বরিক গ্রন্থাদির মধ্যে গৌতম বুদ্ধের কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায় না ; শুধুমাত্র তাঁর বাণীসমূহ পাওয়া যায়, তাও আবার যথাসময়ে লিপিবদ্ধ নয়। হিন্দু ধর্মের বেদ-পুরাণসহ কয়েকটি গ্রন্থ আছে বটে, কিন্তু সেগুলো হাজার হাজার বছর পর্যন্ত শুধু স্মৃতির উপর টিকে ছিল। শেষ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ হয় বটে—তবে তা শুধুমাত্র একই ব্যক্তির স্মৃতির উপর ভরসা করে। মূল তাওরাত এখন পাওয়া যায় না। একাধিক বার তা বিশ্ব থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং পুনরায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে শুধুমাত্র স্মৃতির উপর ভিত্তি করে। ফলে এখন তাওরাতের যে সমস্ত কপি পাওয়া যায় সেগুলোর শব্দে এবং শ্লোকে পরস্পর পার্থক্য বিদ্যমান। এর মধ্যে অনেক জিনিসই এখন লাপাত্তা। অনেকগুলো অংশ পাঠ করার পর পরিষ্কার বুঝা যায় যে, সেগুলো পরবর্তী কালের পরিবর্ধন ছাড়া কিছু নয়।

ইঞ্জীলের প্রকৃত অবস্থা এই যে, এটাকে হযরত ঈসা (আঃ) কখনো লিপিবদ্ধ করান নাই (আর যদি করিয়েও থাকেন তবে মূল ইঞ্জীল এখন লাপাত্তা)। এখন ইঞ্জীল নামে যে সমস্ত জিনিস পাওয়া যায় তা হচ্ছে তাঁর শিষ্য এবং শিষ্যের শিষ্যদের এ মর্মের বর্ণনা যে, তাদের নবী এভাবে ভূমিষ্ঠ হন, সারা জীবন এভাবে অতিবাহিত করেন এবং অমুক সময় অমুক কথা বলেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এটা তাদের কানে শোনা ঘটনাবলীর উপর লিখিত তাদের

www.amarboi.org

নবীর জীবন-কাহিনী মাত্র, কোনো খোদায়ী গ্রন্থ কিংবা আল্লাহ-প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থা নয়।

এবার কুরআন মজীদের কথায় আসা যাক। নুবুওয়াতের একেবারে সূচনা থেকে যখনই এর কোনো আয়াত নাযিল হতো, তখন তখনই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা লিখিয়ে নিতেন। নতুন কোনো আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে তিনি লেখকদেরকে নির্দেশ দিতেন, 'ইতিমধ্যে কুরআনের যে অংশটুকু নাযিল হয়েছে তার অমুক সূরার অমুক আয়াতের পর, এ আয়াতটি লিপিবদ্ধ কর।' তাছাড়া অনেক সাহাবী ঐ সমস্ত আয়াত মুখস্থ করে নিতেন এবং মুখস্থ করার সাথে সাথে তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আবার পড়ে শুনাতেন। অনেকে নাযিলকৃত আয়াতের অনুলিপিও রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন পরলোক গমন করেন তখন প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কুরআনকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার জন্য নবী যুগে সরকারীভাবে অনুমোদনপ্রাপ্ত ওহী-লেখকদের একটি কমিটি গঠন করেন এবং নির্দেশ দেন, মুখস্থ ছাড়াও অন্ততঃ দু'টি লিখিত প্রমাণের উপর প্রত্যেকটি শব্দ এবং আয়াত যেন লিপিবদ্ধ করা হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শেষ যুগে সম্পূর্ণ কুরআনের কমপক্ষে চার পাঁচজন হাফিয (মুখস্থকারী) ছিলেন এবং এরাও ছিলেন ওহী-লেখক কমিটির সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত। আর আংশিকভাবে কুরআন মুখস্থকারীরা তো ছিলেন হাজার হাজার। যাহোক, প্রথম থেকেই অত্যন্ত যত্নের সাথে কণ্ঠস্থ ও লিপিবদ্ধকরণ এবং আজ পর্যন্ত সেই একই নিয়ম জারী থাকার ফলে কুরআন মজীদ এমনভাবে সংরক্ষিত হয়ে আসছে যে, বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে অন্য কোনো ধর্ম-প্রবর্তকের ঐশীগ্রন্থ এর ধারে-কাছেও আসতে পারবে না।

মোটকথা, আমরা নিঃসংকোচে এমন এক ব্যক্তির জীবনকথা অধ্যয়ন করতে পারি যাতে তাঁর জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাবলীর বর্ণনাও বিস্তারিতভাবে সংরক্ষিত রয়েছে এবং যাঁর শিক্ষার ভিত্তি অর্থাৎ তাঁর উপর অবতীর্ণ ঐশী গ্রন্থ হুবহু এবং অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া সেটি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে অস্পৃশ্যতারও এমন কিছু নেই যে, এর অধ্যয়ন থেকে কোনো ব্যক্তি, জাতি বা সম্প্রদায়কে বারণ করা হবে ; বরং এর মধ্যে রয়েছে সার্বজনীন মঙ্গল এবং যে কেউ এটা পড়ে সে মঙ্গলের অধিকারী হতে পারে এবং নিজ থেকে এ সিদ্ধান্তও নিতে পারে যে, এ গ্রন্থকে বরণ করা যাবে কিনা। আর যে বরণ করবে না তার জন্য (এ গ্রন্থেই) পরিষ্কার নির্দেশ রয়েছে "লা ইকরাহা ফিদ-দ্বীন"—ধর্মে জোর-জবরদস্তি নেই"—(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬)। সর্বোপরি এ কুরআন হচ্ছে এমন একটি গ্রন্থ, যা ভাবশৈলীর দিক দিয়ে হোমার ও ডিমস থেনিসকে, আইন

৭—

www.amarboi.org

শিক্ষার দিক দিয়ে জাস্টিনিয়ানকে, পার্থিব মঙ্গল লাভের ক্ষেত্রে কৌটিল্যকে, পারলৌকিক মঙ্গল লাভের ক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধকে এবং শিষ্টাচার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কনফুসিয়াসকে খোলাখুলি চ্যালেঞ্জ প্রদান করতে পারে। এ সেই গ্রন্থ যা মানুষের মধ্যে সত্যিকার সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে এবং পূর্ববর্তী ধর্মগুলোকে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে সেগুলোর মধ্যে ইসলামের স্থান এমনভাবে নির্ধারণ করেছে যে, এটা হচ্ছে চিরাচরিত ন্যায় ও সত্য এবং আদি ও আসল ধর্মের খাঁটি ও নির্ভেজাল চেহারা।

রাসূল-জীবন অধ্যয়ন করা সবার জন্য প্রয়োজন এজন্য যে, ইসলামের মূলনীতি হলো, 'ইহকালে কল্যাণ, পরকালেও কল্যাণ—'ফিদ্-দুনইয়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতে হাসানাতাঁও' (সূরা আল বাকারা ঃ ২০১)। এবার দেখা যাক, ইহলৌকিক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র এবং জীবন-পদ্ধতির মধ্যে আমাদের জন্য কি কি শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

বিশ্বে মহান ব্যক্তিত্বের সংখ্যা কখনো কম ছিল না, তবে তা শুধুমাত্র এক একটি বিশেষ ক্ষেত্রে। যেমন আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ান ও হিটলারের জীবন-চরিতে যে শিক্ষণীয় বিষয় আছে তা শুধুমাত্র যুদ্ধ-পরিচালনাকারী সেনাপতি ও দিগ্বিজয়ীদের জন্য। গৌতম বুদ্ধের জীবনে যে শিক্ষণীয় বিষয় আছে তা শুধু তাদের জন্য যারা সাধনা-উপাসনার প্রতি বিশেষভাবে অনুরাগী। হোমার শুধুমাত্র একজন কবি ছিলেন। প্লেটো এবং এরিস্টটল ছিলেন শুধুমাত্র চিকিৎসক এবং দার্শনিক। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এঁদের বিশেষ কোনো দখল ছিল না। অথচ রাসূলে আরাবীর জীবনের প্রতি লক্ষ্য করুন, সর্বক্ষেত্রে তাঁর জ্ঞানের ব্যাপকতা, তাঁর কথা ও কাজের সামঞ্জস্যতা, তাঁর শিক্ষার সহজবোধ্যতা ও কার্যোপযোগিতা—সর্বোপরি তাঁর জীবনের চরম সাফল্য নিসন্দেহে অতুলনীয়তার দাবী রাখে। তাঁর জীবনের রাজনৈতিক দিকটির প্রতি লক্ষ্য করুন। আরব উপদ্বীপের সেই নৈরাজ্যকর পরিবেশ, যেখানে স্বাধীনচেতা বেদুঈন সম্প্রদায়গুলো রাতদিন রক্তাক্ত সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতো, সেখানে তিনি মাত্র দশ বছরের মধ্যে একটি শক্তিশালী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। একজন সেনাপতি হিসাবে তাঁর বিরাট কৃতিত্ব এই যে, তাঁর সকল যুদ্ধেই উভয় পক্ষের খুব কম লোকই নিহত হয়েছে। কিন্তু মাত্র দশ বছরের মধ্যে আনুমানিক বার লক্ষ বর্গমাইল এলাকার উপর তিনি তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। উপরন্তু আরবের ইতিহাসে প্রথমবারের মত এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সম্পূর্ণ উপদ্বীপটিকে একই পতাকাতলে নিয়ে আসে। আর এটা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরই শিক্ষার ফলশ্রুতি যে, আরবদের মত অজ্ঞ ও মূর্খ একটি জাতি বিজয় পতাকা নিয়ে বহির্জগতের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে

www.amarboi.org

চলে, যাদের সম্পর্কে ক্যামব্রিজের অনেক খ্রীস্টান ঐতিহাসিকের মন্তব্য হলো, "এদের চাইতে 'ভদ্র দুর্দান্ত' কোনো জাতি কখনো দিগ্বিজয়ে বহির্গত হয়নি। তাছাড়া ব্যাপকতা ও গভীরতার দিক দিয়ে দেশজয়ের যে রেকর্ড তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন তা কোনো জাতি এখনো ভাঙতে পারেনি। তাঁরা দশ বছরের মধ্যেই ইরাক, ইরান, ফিলিস্তিন, সিরিয়া, মিসর, তিউনিসিয়া, তুরস্ক এবং আর্মেনিয়া পদানত করেন। এসব অঞ্চল মোটামুটিভাবে এখনো ইসলামী এলাকার অন্তর্ভুক্ত এবং এদের সংখ্যাগুরু অধিবাসীর ভাষাও রূপান্তরিত হয়েছে আরবী ভাষায়।"

এখন শাসন ব্যবস্থার কথায় আসা যাক। যে দেশে কখনো কোনো নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সে দেশে ভূমিষ্ঠ এবং প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রতিষ্ঠা করেন তা বিশ্বের একটি বিরাট রাষ্ট্রের জন্য শুধু উপযোগীই ছিল না, বরং যতদিন পর্যন্ত তা কার্যকরী ছিল ততদিন ঐ রাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে সভ্য রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হত। গান্ধীর মত গোঁড়া হিন্দুও ইসলামী রাষ্ট্রের ঐ যুগকে মানবতার স্বর্ণযুগ বলে মনে করতেন এবং এটাকে নিজেদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য কংগ্রেসী হিন্দু রাষ্ট্রকে পরামর্শ দিতেন।

এবার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথায় আসা যাক। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রত্যেকটি অর্থনৈতিক নির্দেশের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বণ্টননীতি পরিলক্ষিত হয়। পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন, অসীয়ত নবায়ন, সুদের অবৈধতা, সঞ্চিত সম্পদের উপর যাকাত নির্ধারণ প্রভৃতি সম্পর্কে তিনি যে নীতি প্রণয়ন করেন, সেগুলোর দিকে লক্ষ্য করলে উপরিউক্ত কথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে। মোটকথা, তাঁর প্রণীত অর্থনীতি এমনি সুন্দর ও স্বয়ংসম্পূর্ণ যে, তাতে আজকালকার সমাজবাদী ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির মধ্যে বিরাজমান কাঁদা-ছোড়াছুড়ি ও সংঘর্ষের একটি সুন্দর সমাধান পাওয়া যেতে পারে।

স্ত্রীলোক, শ্রমিক এবং ক্রীতদাসের মর্যাদা সম্পর্কিত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষার মধ্যে সুন্দর ভারসাম্য রয়েছে বিধায় উপকারিতা ও কার্যকারিতার দিক দিয়ে তা অতুলনীয়।

সামাজিক এবং চারিত্রিক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শুধু অপরের শিক্ষকই ছিলেন না, বরং অপরের জন্য নিজের শিক্ষা ও সদুপদেশের জীবন্ত নমুনাও ছিলেন। একজন পিতা, একজন বন্ধু, একজন শাসক ও একজন বণিক— সর্বোপরি একজন মানুষ হিসাবে তাঁর কার্যকলাপ এতই খাঁটি ও নিখুঁত ছিল, যা তাঁর শত্রুরাও স্বীকার না করে পারেনি। বিভিন্ন ইসলামী সংস্কার ছাড়াও পৌত্তলিকতা, মদ্যপান, জুয়াখেলা প্রভৃতি নিষিদ্ধকরণ মুসলমানদের এমন

www.amarboi.org

কয়েকটি রাষ্ট্রিয় নীতি, যা বিশ্ববাসী ইচ্ছায় হোক অথবা অনিচ্ছায় হোক, অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছে।

বিশ্বে অনেক শিক্ষক, পথপ্রদর্শক এবং নবী এসেছেন। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জীবনকালে যেরূপ সাফল্য অর্জন করেছেন তা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। দশম হিজরীতে তিনি যখন মক্কায় আগমন করেন তখন তাঁর সাথে দেড় লক্ষ মুসলমান ছিলেন, যাঁরা এসেছিলেন দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চল থেকে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন সে ধর্ম আপনা-আপনি স্থান করে নিয়েছিল বিশ্ববাসীর অন্তরে। চীনে কখনো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তবু সেখানে কোটি কোটি মুসলমান রয়েছে। পাক-ভারত এবং অন্যান্য দেশেও নও-মুসলিমের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে এবং ক্রমবৃদ্ধির এ ধারা ইসলামের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যকে ফুটিয়ে তুলছে অতি সুন্দরভাবে। তিনিই ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি অসাম্য ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপে ভয়ানকভাবে জর্জরিত বিশ্বে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, বংশ, বর্ণ কিংবা ভাষা নয়, বরং পুণ্যকর্ম এবং আল্লাহভীরুতাই উৎকৃষ্টতার মাপকাঠি। "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক আল্লাহভীরু"–(সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)। তিনি ইসলামী আদর্শকে বাস্তবায়িত করেন অত্যন্ত সার্থকভাবে, যার ফলে সমাজের অবহেলিত এবং অধঃপতিত লোকেরা এটাকে নিজেদের মুক্তির একমাত্র পথ বলে মনে করে আসছে। ইসলামের চেয়ে অধিক সাম্য অন্য কোনো ধর্ম বা জীবনব্যবস্থায়ই পরিলক্ষিত হয় না। ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, বর্ণ ও ভাষাকেন্দ্রিক ভেদ-বৈষম্যের মূলোৎপাটনে ইসলামের চেয়ে অধিক সাফল্য অর্জন বিশ্বের অন্য কোনো ধর্ম বা জীবন ব্যবস্থার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

মানব-বসতির প্রত্যেকটি দল, সম্প্রদায় অথবা জাতির পৃথক ইতিহাস, পৃথক ঐতিহ্য এবং পৃথক বিশ্বাস (আকায়িদ) রয়েছে। আর মানুষকে তাদের মাননীয় ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন থেকে বিরত রাখা যেমন সহজ নয় তেমনি এতে লাভেরও কিছু নেই। বরং সহজ এবং লাভজনক পদ্ধতি এই যে, পুরানো আকীদা-বিশ্বাস, ঐতিহ্য এবং ধ্যান-ধারণার প্রতি কোনোরূপ কটাক্ষ না করে (বরং নতুন পটভূমি দিয়ে সেগুলোকে নতুন খাতে প্রবাহিত করে) কিছু নতুন জিনিসের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা স্থাপনের শিক্ষা দেয়া। অন্যথায় একই উৎস হতে উৎসারিত আদম ও হাওয়ার সন্তানদের একই কেন্দ্রে জড়ো করা কখনো সম্ভব নয়।

www.amarboi.org

একত্ববাদে বিশ্বাস এবং অন্যান্য গুণাবলীর দরুন ইয়াহূদীরা তাদের সমসাময়িক অন্যান্য জাতির উপর গর্ব করতো। কিন্তু অন্যান্য সবাই তাদেরকে একটি অভিশপ্ত জাতি বলেই মনে করতো। কিন্তু ইসলাম প্রকাশ্যে স্বীকার করে যে, 'ফায্যালাকুম আ'লাল আ'লামীন' অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমাদেরকে বিশ্ব-জগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।' ঈসায়ীরাও তাদের পৈতৃক ধর্মের কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যের দরুন গর্বিত থাকলেও অন্যান্যরা তাদেরকে মোটেই পাত্তা দিতো না। কিন্তু কুরআন ঈসায়ীদের সেই বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে নিয়ে ঘোষণা করে, "মারইয়াম-তনয় ঈসা মসীহ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর বাণী, যা তিনি মারইয়ামের কাছে পাঠিয়েছিলেন ও তাঁর রূহ (আদেশ)।"-(সূরা নিসা ঃ ১৭১)

তবে কুরআন এ উভয় জাতিকে এও বলে দেয় যে, শুধু পূর্বপুরুষের বড়াই করলে চলবে না, বরং আল্লাহ তাআলা এক এক করে প্রত্যেকটি মানুষের কাছ থেকেই তার কর্মের হিসাব নেবেন। তাছাড়া যে আল্লাহ মূসা ও ঈসা (আঃ)-কে কিছু বৈশিষ্ট্য দান করেছিলেন, সেই আল্লাহই পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষা-সম্বলিত গ্রন্থগুলো কালচক্রে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কারণে আপন অসীম করুণাগুণে আর একজন নবী পাঠিয়েছেন এবং তাঁর মাধ্যমে নতুনভাবে ঐ সমস্ত গ্রন্থের শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দিয়ে মানবজাতিকে ধন্য ও কৃতার্থ করেছেন। আর এ নবীর শিক্ষাকে এমনিভাবে সুসংরক্ষিত ও যুগোপযোগী করেছেন যে, তার পরে অন্য কোনো নবী আসার প্রয়োজন নেই।

কুরআনের ঘোষণা—"এমন কোনো সম্প্রদায় নেই, যার কাছে সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি"-সূরা ফাতির)—বিশ্বের সকল জাতি এবং সকল সম্প্রদায়ের অন্তর জয় করে নিয়েছে। হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত যে সমস্ত নবী-রাসূল এসেছেন, কুরআন তাঁদের কয়েকজনের নাম নিয়েছে এবং সাথে সাথে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলার এ ঘোষণাও প্রচার করেছে ঃ "আমি অনেক রাসূল প্রেরণ করেছি যাদের কথা পূর্বে তোমাকে বলেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি।" অতপর পূর্ববর্তী কোনো নবীর অনুসারীদের মনে কোনোরূপ মনঃকষ্ট থাকার কথা নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এভাবে নিজেকে 'সমস্ত বিশ্বের রহমত' রূপে প্রমাণিত করেছেন।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটা একই সাথে এবং একই সময়ে ইহকাল ও পরকালের মঙ্গল কামনা করে। আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং অন্তর পরিশুদ্ধির জন্য তাওহীদের (একত্ববাদের) চেয়েও উৎকৃষ্টতর কোনো পন্থা আছে এমন কথা কল্পনাও করা যায় না। যদি বিশ্বের মানুষ আল্লাহ্তে বিশ্বাসী হয়, মঙ্গলামঙ্গলের ব্যাপারে একমাত্র তাঁকে ছাড়া অন্য কাউকে ক্ষমতার অধিকারী

www.amarboi.org

মনে না করে এবং পরকাল ও বিচার দিনে বিশ্বাস করে তাহলে এ বিশ্বে অপরাধ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব না হলেও সুকঠিন হবে নিসন্দেহে। নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, আল্লাহর পথে জিহাদ প্রভৃতির নির্দেশ এমনি যে, এগুলো পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ সম্মান এবং মর্যাদার ক্ষেত্রে ফিরিশতাদেরকেও ছাড়িয়ে যায়। যার মধ্যে অবাধ্য হওয়ার ক্ষমতাই নেই (যেমন ফিরিশতা) সে জড় পদার্থের মত কোনো কাজ করলে সে কাজের জন্য শাস্তি বা পুরস্কার কোনোটিই পাবে না। আর যার মধ্যে একই সময়ে পাপ-পুণ্যের ক্ষমতা রয়েছে এবং সে তার ক্ষমতাকে শুধু পুণ্য কাজে নিয়োজিত করে সে নিসন্দেহে সৃষ্টির সেরা।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনে রয়েছে মানবজীবনের সাফল্য লাভের সত্যিকার পথ-নির্দেশ এবং এ কারণে তাঁর জীবন-চরিত অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম।

২. পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ

গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, বর্তমানে বিশ্বে পুণ্য ও মঙ্গলের যা কিছু আলো রয়েছে, আন্তরিকতা ও মঙ্গলকামিতার যা কিছু চর্চা রয়েছে তা শুধুমাত্র ঐ সব মহান ব্যক্তিদের শিক্ষা ও পথপ্রদর্শনের ফলশ্রুতি, যাদেরকে আমরা আম্বিয়া কিরাম বলে অভিহিত করে থাকি। পাহাড়, গিরিগুহা, জঙ্গল, প্রান্তর, গ্রাম, শহর-যেখানেই আমরা ন্যায়বিচার, ক্ষমা, স্নেহ, ভালোবাসা, দয়া, করুণা ও অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলীর যা কিছু নিদর্শন দেখি তা ঐসব সম্মানিত ব্যক্তিদেরই কারো না কারো দাওয়াত ও আহ্বানের সুবর্ণ ফসল। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,

وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ (فاطر : ٢٤)

"এমন কোনো জাতি বা সম্প্রদায় নেই যার কাছে সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি।"-(সূরা আল ফাতির ঃ ২৪)

এ থেকে অনায়াসে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার সর্বত্রই আম্বিয়া কিরামের আবির্ভাব হয়েছে। আর এ কারণেই যে কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ে কমবেশী চারিত্রিক গুণাবলীর অস্তিত্ব রয়েছে।

www.amarboi.org

অতএব যারা চারিত্রিক গুণাবলীর শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক ছিলেন সেই আম্বিয়া কিরামের জীবনীসমূহ মানব জাতির জন্য নিসন্দেহে এক একটি মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আম্বিয়া কিরামের প্রত্যেকেই আপন আপন যুগে আপন আপন জাতি ও সম্প্রদায়ের ঐ সময়ের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নত চরিত্র ও আচার-আচরণের একটা না একটা অতি উন্নত ও দৃষ্টান্তমূলক নমুনা পেশ করে গেছেন। কেউ নমুনা পেশ করেছেন ধৈর্যের, কেউ আত্মোৎসর্গের, কেউ পবিত্রতার, কেউ সংসার-বিমুখতার, কেউ বা অন্য কিছুর। তবে তাদের সকলেরই সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান আহ্বান ছিল আল্লাহর একত্বের প্রতি এবং এ আহ্বানকে ভিত্তি করে তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন জীবনের চলার পথে এমন এক একটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা যা তখনকার মানুষকে সহজ সরল পথে পরিচালিত করতে পারতো। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন সর্বগুণের আলোকবর্তিকারূপী এমন একটি নমুনার যা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র রাস্তাটি আপন হেদায়াত ও আমল দ্বারা উজ্জ্বল প্রজ্জ্বল করে তুলবে এবং তার চিরন্তন হেদায়াত ও শিক্ষা প্রত্যেকটি পথিককে তার লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান দেবে।

ঐ পরিপূর্ণ জীবন বা জীবনাদর্শ যা মানুষের জন্য একটি নমুনা হিসাবে বিবেচিত হবে তার ক্ষেত্রে যে সমস্ত শর্তাদি আরোপিত হতে পারে সেগুলোর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে ইতিহাসের ভিত্তিশীলতা। অর্থাৎ তার জীবন-ইতিহাসের কোনো অংশ বা কোনো দিক অজ্ঞাত থাকবে না। বরং তা হবে আলোকিত দিনের ন্যায় উজ্জ্বল এবং ঐতিহাসিক দিক দিয়ে প্রামাণিক। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে সার্বজনীনতা। অর্থাৎ তার জীবনের প্রত্যেকটি কর্মের মধ্যে মানব-জাতির অনুকরণ ও অনুসরণের উপাদান থাকবে। আর তৃতীয় ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে তার কথা ও কর্মের মধ্যে থাকবে পূর্ণ সামঞ্জস্য। অর্থাৎ তিনি যা বলবেন তার ব্যক্তিগত কর্মের মধ্যে অবশ্যই তার দৃষ্টান্ত ও নমুনা থাকবে।

উপরোক্ত মাপকাঠিতে যদি আম্বিয়া কিরামের জীবনীসমূহ পর্যালোচনা করা যায় তাহলে জানা যাবে তাদের কারো জীবনই হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর জীবনের ন্যায় যাবতীয় বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে পরিপূর্ণ ছিল না। বিশ্বে এমন কোনো নবী বা পয়গম্বর নেই যার চারিত্রিক জীবন ও আচার-আচরণের প্রত্যেকটি দিক আমাদের সামনে এমনি আবরণযুক্ত, যেন তিনি আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। হযরত নূহ (আঃ) থেকে আরম্ভ করে হযরত মূসা (আঃ) পর্যন্ত তাওরাতে উল্লেখিত নবীদের মধ্য থেকে এমন একজন নবীও

www.amarboi.org

পাওয়া যাবে না যার জীবনের বিস্তারিত অবস্থাদি আমরা জানতে সক্ষম হয়েছি। আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর দুনিয়ার তেত্রিশ বছরের জীবনের মাত্র তিন বছরের যেসব অবস্থাদি আমরা জানতে পেরেছি তা তার দৈনন্দিন জীবনের নয়, বরং শুধুমাত্র তার কারামাত ও মুজিযায় ভর্তি কিছু ঘটনাবলীর। উল্লেখিত আম্বিয়া কিরামের কথা বাদ দিলে পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে যে সকল নবীর আবির্ভাব হয়েছে তাদের জীবনকে বিস্তারিতভাবে জানার কোনো মাধ্যমই আজ আমাদের কাছে নেই। এক্ষেত্রে শুধু মুহাম্মদ (সাঃ)-ই হচ্ছেন এমনি একজন নবী যার জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনাই আজ আমাদের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ বাসওয়ার্থ স্মিথের একটি উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ দিনের আলোর ন্যায়, যার মধ্যে তার চরিত্রের প্রত্যেকটি দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।"

অনুরূপভাবে যদি আমরা সার্বজনীনতার মাপকাঠিতে বিশ্বের ঐ সমস্ত মহান ব্যক্তিদের জীবনীসমূহ পর্যালোচনা করি যারা নবী ছিলেন না, কিন্তু তাদের কোনো না কোনো মহৎ আচরণের মাধ্যমে মানব সমাজে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন —তাহলে তাদেরও এক একজনের জীবনী থেকে শুধুমাত্র আংশিক তথা এক বা একাধিক আচরণের শিক্ষাই পাওয়া যাবে। তাদের কারো কারো জীবন ছিল এমনি যে, তাতে ক্ষমা ও করুণা ছাড়া অন্য কিছুর শিক্ষা ছিল না। আবার কারো কারো জীবন ছিল এমনি যে, তাতে বৈরাগ্য ও সংসার-বিমুখতা ছাড়া অন্য কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবন আমাদের সামনে এমনি স্পষ্ট হয়ে আছে যে, তাতে আমরা যাবতীয় চারিত্রিক গুণাবলীর সামগ্রিকতা ও সার্বজনীনতা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করি। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের মধ্যে প্রত্যেক স্তরের মানুষের জন্য তাদের যাবতীয় আচার-আচরণের বাস্তব নমুনা রয়েছে, যার মাধ্যমে তারা তাদের চারিত্রিক গুণাবলী ও আচার-আচরণে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্র ও আচার-আচরণ এমনি সার্বজনীন ও পরিপূর্ণ ছিল যে, তিনি ছিলেন একাধারে আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ বন্ধু, আদর্শ গৃহস্থ, আদর্শ বণিক, আদর্শ শাসক, আদর্শ সেনাপতি, আদর্শ শিক্ষক, আদর্শ মুরশিদ তথা সর্বগুণে গুণান্বিত একজন আদর্শ মানুষ। তাই তো পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ(الاحزاب : ٢١)

"তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ।"

–(সূরা আল আহযাব ঃ ২১)

www.amarboi.org

৩. দু'আর ফসল ও ভবিষ্যদ্বাণীর নিদর্শন

সমগ্র বিশ্বের রহমত, দয়া, করুণা, ভালবাসা ও মানবতার অনন্য প্রতীক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) একটি রোগাক্রান্ত ইয়াহূদী যুবককে দেখতে যান। তিনি ঐ যুবকের ঘরে পদার্পণ করে দেখতে পান যে, তার পিতা রুগ্ন পুত্রের শিয়রে বসে তাওরাত পাঠ করছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন তার পিতাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ আমি আল্লাহর কসম দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, বলো তো, তাওরাতে কি আমার প্রশংসা করা হয়নি ? তাতে কি বর্ণিত হয়নি আমার হাল-হাকীকত ? সে উত্তরে বললো, 'না'।

পিতার এ জবাব শুনামাত্র রুগ্ন পুত্র উচ্চস্বরে বলে উঠল ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি কসম খেয়ে বলছি, তাওরাতে আমরা আপনার প্রশংসা ও হাল-হাকীকত পাঠ করেছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই এবং আপনি তাঁর রাসূল।

এ হাদীসটি বিখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এ থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওহীর মাধ্যমে জ্ঞাত হয়েছিলেন যে, তাওরাতে তাঁর সম্পর্কে সুসংবাদ রয়েছে। এ কারণেই ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানদের ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ চরম আগ্রহ সহকারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আগমন প্রতীক্ষায় ছিল এবং এ কারণেই তারা তাদের স্বধর্মীয়দেরকেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর ঈমান আনার তাকীদ দিত।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন নুবুওয়াতের ঘোষণা দিলেন, তখন ঐসব লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে শুধু অস্বীকারই করেনি বরং তার চরম শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। কেননা তারা এ ধারণা পোষণ করতো যে, এই শেষ নবী তো ইয়াহূদীদের মধ্যেই আবির্ভূত হবেন। কিন্তু যখন তারা দেখতে পেল যে, তিনি ইসমাঈল বংশে আগমন করেছেন তখন তারা তাওরাতের ঐ সুসংবাদের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে তাঁকে সোজাসুজি অস্বীকার করে বসল।

বস্তুতঃ এ সুসংবাদটি শুধু তাওরাত-ইনজীলে নয়, বরং সব আসমানী কিতাবে বিদ্যমান ছিল। কুরআন মজীদের স্পষ্ট উক্তি হল, সমগ্র আম্বিয়া কিরামের মাধ্যমে তাদের উম্মত থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছিল যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আগমন ঘটবে তখন তারা যেন তাঁর উপর ঈমান আনে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّٖنَ لَمَآ اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ
رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ ؕ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ
عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِيْ ؕ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا ؕ قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ ۝

"স্মরণ করো, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন (এ মর্মে যে,) তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যা কিছু দিয়েছি তার শপথ, আর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসবে তখন নিশ্চয় তোমরা তার উপর ঈমান আনবে এবং তাঁকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি স্বীকার করলে এবং এ সম্পর্কে আমার অঙ্গীকার কি তোমরা গ্রহণ করলে ? তারা বললো, 'আমরা স্বীকার করলাম।' তিনি বললেন, তবে তোমরা সাক্ষী থাক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম।'–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮১)

কী মহান ও পবিত্রই না ছিল ঐ অঙ্গীকার। এমন অঙ্গীকার যে, খোদ আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন তাঁর সাক্ষী। এ অঙ্গীকার অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাদিতেও ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিশ্বে আগমন করে নুবুওয়াত লাভ করলে পর বিশ্ববাসী ঐ সমস্ত সুসংবাদের সফল বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও বিশ্বের সকল নবীকে সত্য বলে স্বীকার করেছেন, সত্যায়ন করেছেন তাঁদের প্রতি নাযিলকৃত কিতাবসমূহ। শুধু এটুকুই নয়, বরং সমগ্র আম্বিয়া (আঃ)-এর উপর, তাঁদের নাম কুরআনে থাকুক বা নাই থাকুক—বিশ্বাস স্থাপনকে তিনি তাঁর উম্মতের ঈমানের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অনুরূপভাবে বিশ্বের সমগ্র জাতি ও সমগ্র সম্প্রদায়ের নবীগণ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের সংবাদ দিয়েছেন এবং আপন আপন উম্মতকেও তাঁর উপর ঈমান আনার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্য জগতের ঐক্য, শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য এ কর্মধারা অনুসরণের প্রয়োজন ছিল।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) এমনি সৌভাগ্যবান ও উচ্চমর্যাদা-সম্পন্ন নবী ছিলেন যে, তিনি ছিলেন একাধারে বনূ ইসহাক (ইয়াহূদী) ও বনু ইসমাঈল (আরবের কুরাইশ ইত্যাদি সম্প্রদায়)-এর পিতৃপুরুষ। যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাবের সাথে সাথে বনূ ইসহাক গোত্রের নুবুওয়াতের ক্রমধারা বন্ধ হয়ে গেল, তখন আল্লাহ তাআলা খাতামুন্নাবীয়ীন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বনূ ইসমাঈল গোত্রে প্রেরণ করলেন। এজন্য যে, হযরত ইবরাহীম ও ইস-মাঈল (আঃ) কা'বা নির্মাণকালে আল্লাহর দরবারে একটি অতি সুন্দর ও আকর্ষণীয় দু'আ করেছিলেন, যার বর্ণনা কুরআন মজীদে রয়েছে। যেমন ঃ

www.amarboi.org

وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمٰعِيْلُ ۗ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۗ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَاۤ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ ص وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ج اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ○ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ ۗ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○ (البقرة : ١٢٧ ـ ١٢٩)

"স্মরণ করো, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বা গৃহের প্রাচীর তুলছিল, তখন তারা বলেছিল, হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদের উভয়কে তোমার একান্ত অনুগত কর এবং আমাদের বংশধর হতে তোমার এক অনুগত উম্মত তৈরী কর। আমাদেরকে ইবাদাতের নিয়ম-পদ্ধতি দেখিয়ে দাও এবং আমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হও। তুমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। হে আমাদের প্রতিপালক ! তাদের মধ্য হতে তাদের নিকট এক রাসূল প্রেরণ কর, যে তোমার আয়াতসমূহ তাদের নিকট আবৃত্তি করবে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবে এবং তাদেরকে পবিত্র করবে। তুমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১২৭-১২৯)

হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর এ আকুতি কবুল হয়েছিল আল্লাহর দরবারে। অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল তাঁদের মনস্কামনা। ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধরদের মধ্যেই আবির্ভূত হয়েছিলেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আর পর এক্ষেত্রে মহানবী হযরত মূসা কালীমুল্লাহ (আঃ)-এর এ সম্পর্কিত সুসংবাদ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাওরাতে আছে ঃ

"যিনি শেষ যুগে আসবেন তাঁর জ্যোতি ফারান পর্যন্ত বিকীর্ণ হবে। তিনি দশ হাজার ভক্ত (সাহাবী) সঙ্গে আনবেন এবং তাঁর ডান হাত থেকে এক জীবন্ত বিধানগ্রন্থ বের হবে।"-(তাওরাত ঃ ইসতিছনা ৩৩ ঃ ২)

কুরআন মজীদে হযরত মূসা (আঃ)-এর এ আকাঙ্ক্ষার কথা যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তাহলো ঃ

وَاكْتُبْ لَنَا فِىْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ اِنَّا هُدْنَاۤ اِلَيْكَ ۗ قَالَ عَذَابِىْۤ اُصِيْبُ بِهٖ مَنْ اَشَاۤءُ ج وَرَحْمَتِىْ وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ ۗ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ

www.amarboi.org

وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِاٰيٰتِنَا يُؤْمِنُوْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ
الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ
وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

"মূসা বলল, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদের জন্য নির্ধারিত কর ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ, আমরা তোমার কাছে প্রত্যাবর্তন করছি। আল্লাহ্ বললেন, আমার শাস্তি যাকে ইচ্ছা দিয়ে থাকি আর আমার দয়া তা তো প্রত্যেক বস্তুতে ব্যাপ্ত, সুতরাং আমি ওটা তাদের জন্য নির্ধারিত করব যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দেয় এবং আমার নিদর্শনে বিশ্বাস করে। যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল, যা তাদের কাছে আছে, তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃংখল (কঠিন বিধানাবলী, যা পূর্ববর্তী শরীআতে ছিল অথবা পরাক্রমশালী শত্রুর অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃংখল) হতে যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে সেটার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।"–(সূরা আরাফ ঃ ১৫৬-১৫৭)

'উম্মী নবী' বলতে শুধুমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কেই বুঝায়। মদীনায় ইয়াহূদীরা হযরত মূসা (আঃ)-এর সুসংবাদ সম্পর্কে অবহিত ছিল এবং তারা স্বচক্ষেও প্রত্যক্ষ করেছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর বিধানাবলী প্রচারে সর্বক্ষণ নিয়োজিত রয়েছেন।

অনুরূপভাবে হযরত ঈসা (আঃ)-ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তাহলো ঃ

"আমি তোমাদেরকে সত্যি করে বলছি যে, আমার চলে যাওয়াটা তোমাদের জন্য মংগলজনক। কেননা আমি যদি না যাই তাহলে ঐ সাহায্যকারী (শেষ নবী) তোমাদের কাছে আসবেন না। যদি আমি যাই

www.amarboi.org

তাহলে তাঁকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। তোমাদেরকে আমার আরো কথা বলার আছে। কিন্তু তোমরা তা সহ্য করতে পারবে না। কিন্তু যখন ঐ সত্য আত্মা আসবেন তখন তিনি তোমাদেরকে যাবতীয় সত্যপথ দেখাবেন। কেননা তিনি তো নিজে থেকে কিছু বলবেন না, বরং (আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে) যা কিছু শুনবেন তাই বলবেন এবং তোমাদেরকে ভবিষ্যতের সংবাদ দেবেন।"–(ইনজিল ঃ ইউহান্না ১৬ ঃ ১৭-২৪)

এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে যা বলা হয়েছে তাহলো ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗ اَحْمَدُ ط

"স্মরণ করো, মারইয়াম-তনয় ঈসা বলেছিল, হে বনী ইসরাঈল ! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্‌র রাসূল এবং আমার পূর্ব হতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রয়েছে আমি তার সমর্থক এবং আমার পরে আহমদ [মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অপর নাম] নামে যে রাসূল আসবেন আমি তার সুসংবাদদাতা।"–(সূরা আস সফ ঃ ৬)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى

"তিনি (মুহাম্মদ) মনগড়া কথা বলেন না। এটা (কুরআন) তো ওহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়।"–(সূরা আন নাজম ঃ ৩-৪)

খ্রীস্টানদের পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত এ সুসংবাদের উপর তাদের বিশ্বাস এতই দৃঢ় ছিল যে, তাদের বড় বড় রাহিব ও পুরোহিতরা অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আগমন-প্রতীক্ষায় ছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থাদিতে তো এরূপও বর্ণিত হয়েছে যে, যখন হুযূর (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে এল তখন এর বিভিন্ন নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে ঐ ধর্মীয় নেতারা বলতে শুরু করলেন যে, ঐ প্রতিশ্রুত নবী এখনই আসবেন। কিন্তু যখন তিনি এলেন, তখন ইয়াহূদীদের মত খ্রীস্টানরাও তাঁর বিরোধিতা করতে লাগল এবং উভয় সম্প্রদায়ই তাদের পবিত্র গ্রন্থে বর্ণিত ঐ সমস্ত আয়াতের নানা মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান করতে লাগল, যে আয়াতগুলোতে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আগমনের স্পষ্ট সুসংবাদ ছিল এবং তা ছিল হুবহু ঐ অঙ্গীকার অনুযায়ী, যা আল্লাহ তাআলা তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, হযরত নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার তাওহীদের বৈপ্লবিক পয়গাম আনয়নকারী

www.amarboi.org

প্রত্যেক নবীই মানুষের সামনে ইসলাম পেশ করেছেন এবং তাঁরা একে অন্যের শিক্ষাকে সমর্থনও করেছেন। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ○ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ○ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ○ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ○ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ○ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ○ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ○ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ○ (التين : ١-٨)

"শপথ 'ত্বীন' ও 'যায়তুন'-এর, শপথ সিনাই পর্বতের এবং শপথ এ নিরাপদ নগরীর (মক্কার)—আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে, অতপর আমি ওকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ, এদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। সুতরাং এরপর কিসে তোমাকে (হে অবিশ্বাসী মানুষ) কর্মফল সম্বন্ধে অবিশ্বাসী করে ? আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন ?"–(সূরা আত-তীন ঃ ১-৮)

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার এ পয়গাম (ইসলাম), একদা যা হযরত নূহ (আঃ)-এর মাধ্যমে 'জূদী পাহাড়' (তীন পাহাড়) থেকে শুনানো হয়েছিল, একদা যা বায়তুল মুকাদ্দাসের 'যায়তুন' (উৎপাদনকারী পাহাড়) থেকে হযরত ঈসা (আঃ) শুনিয়েছিলেন, একদা যা 'সিনাই' পাহাড়ের চূড়া থেকে শোনানো হয়েছিল এবং এখন যা মক্কা থেকে সমগ্র বিশ্ববাসীকে শুনানো হচ্ছে—তা একথা বলে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু সে এমনি যে, সবসময়ই পতনের দিকে যেতে চায়। কিন্তু যারা আল্লাহ তাআলার বিধান অনুযায়ী ঈমান আনে, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহ তাআলার এমন বিরাট পুরস্কার, যা কখনো শেষ হবে না। দুনিয়ার কোনো শক্তিই আল্লাহর প্রতিদান প্রদানের এ নীতিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারবে না। কেননা তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, কুরআন মজীদের উপরোক্ত সূরায় (সূরা ত্বীনে) বলা হয়েছে যে, হযরত নূহ (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবীর পয়গাম ছিল একই। আর সেই পয়গাম অনুযায়ী মানুষকে তার কর্মফল প্রদান করা হবে। স্বীকার না করে উপায় নেই যে, এত বিরাট রহস্যপূর্ণ বক্তব্যকে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে একটি অতি ক্ষুদ্র সূরার মাধ্যমে

www.amarboi.org

অতি অল্প কথায় এভাবে সর্বসমক্ষে তুলে ধরাটা শুধুমাত্র কুরআন মজীদের পক্ষেই সম্ভব।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বিশ্বের অন্যান্য ধর্মীয় গ্রন্থাদিতেও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, মহত্ত্ব ও বিশ্বজনীন নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠতম যোগ্যতাকে অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করে কার্লাইল, গিবন, বার্ণাডশ', টলস্টয়, হিট্টি, স্যার উইলিয়াম মুইর, মিঃ গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের প্রখ্যাত মনীষীবৃন্দ যেসব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, এখানে সেগুলোর উল্লেখের কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কেননা বিশ্বের দু'জন অতি উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন নবী যাঁর আবির্ভাবের জন্য আল্লাহর দরবারে বিনীত মুনাজাত করেছিলেন এবং যাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে বিশ্বের সকল আম্বিয়া কিরামের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে—বিশ্বের প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদগণ তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করবেন, এতে তো বিস্ময়ের কিছু দেখি না।

৪. ক্ষমা ও করুণার মূর্তপ্রতীক

ইসলাম আইনসম্মতভাবেই মজলুমকে তার জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, وَجَزَاؤُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا "আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দই (সূরা শুরা ঃ ৪০)।" অর্থাৎ এ প্রতিশোধ যেন আবার জুলুমের তুলনায় বেশী হয়ে না যায়। অন্যথায় এটাও জুলুমে পরিণত হয়ে মজলুমকে জালিমের স্থানে নিয়ে দাঁড় করাবে।

ক্ষমা ও সহনশীলতা হলো মানবীয় চরিত্রের উত্তম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তাআলা মানুষের এ গুণকে খুবই পছন্দ করেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ط-(الشورى : ٤٠)

"যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ নিষ্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে আছে।"-(সূরা শুরা ঃ ৪০)

মোটকথা, ক্ষমা দ্বারা আখিরাতে অফুরন্ত পুরস্কার তো পাওয়া যাবেই ; উপরন্তু এর দ্বারা দুনিয়াতেও বিভিন্নভাবে উপকৃত হওয়া যাবে। সুনির্দিষ্ট অপরাধের পরও যদি প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করে দেয়া হয় তাহলে এ উদার আচরণ দ্বারা সে বা তারা এমনই প্রভাবিত ও লজ্জিত হয় যে, অতপর তাদের শত্রুতা মিত্রতায় পরিণত হয় এবং তারা ক্ষমাকারীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে শেখে। এ বিষয়টি পবিত্র কুরআনে যেভাবে বিবৃত হয়েছে তাহলো ঃ

www.amarboi.org

اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ○

"মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা ; ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত।"-(সূরা হা-মীম-আস সাজদা ঃ ৩৪)

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন এ ক্ষমা ও করুণার এক মূর্তপ্রতীক।

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমার ভৃত্যের কি পরিমাণ অপরাধ আমি ক্ষমা করবো ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোনো জবাব না দিয়ে নীরব রইলেন। প্রশ্নকারী আবারো ঐ একই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন, "প্রতিদিন সত্তরবার"। অবশ্য এখানে কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল না, বরং ক্ষমার আধিক্যের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়ার উপরোক্ত বিধান কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ। কেননা যে অপরাধ ব্যক্তিগত পর্যায় অতিক্রম করে সামাজিক পর্যায়ে বিস্তার লাভ করবে তার প্রতিকার অবশ্যই করতে হবে। অন্যথায় গোটা সমাজ এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে।

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনো নিজের কোনো ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। এমনকি নিজের প্রাণের শত্রুকেও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। কিন্তু শরীয়ত-নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে তিনি কখনো কোনো শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনো নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু কেউ আল্লাহর হুকুম অমান্য করলে তিনি তাকে ছেড়ে দিতেন না। যেমন, একদা তিনি (সাঃ) বলেন, আল্লাহর শপথ ! মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করে, তবে আমি তার হাতও কর্তন করার হুকুম দেব।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহান চরিত্রে ক্ষমা ও সহনশীলতার এমনি সমাবেশ ঘটেছিল যে, পৃথিবীর অন্য কোনো মানুষের চরিত্রে তেমনটি কখনো লক্ষ্য করা যায়নি। পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে, "তুমি ক্ষমাপরায়ণতা অবলম্বন কর" (সূরা আল আরাফ ঃ ১৯৯)। এর তাফসীরে বলা হয়েছে, "কেউ আপনাকে বঞ্চিত করলে আপনি তাকে দান করুন এবং কেউ আপনার উপর জুলুম করলে আপনি তাকে ক্ষমা করে দিন।"

www.amarboi.org

পৃথিবীতে উপদেশ দেয়ার মত লোকের অভাব কখনো হয় না। উন্নত চরিত্র ও ক্ষমার শিক্ষাদানকারী বহু ব্যক্তি এ দুনিয়াতে ছিলেন বা আছেন। কিন্তু নিজের শিক্ষা অনুযায়ী ক্ষমার বৈশিষ্ট্যকে নিজেরই চরিত্রে বাস্তবায়ন করার মত মানুষ খুব কমই পাওয়া যায়।

কেউ কেউ বলে, ক্ষমা করে দিলে প্রভাব-প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। আসলে এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা বাস্তবতার সাথে এর ক্ষীণতম সম্পর্কও নেই। প্রকৃত-পক্ষে রাগ ও কঠোরতা দ্বারা সাময়িকভাবে প্রভাব বিস্তার করা যেতে পারে বটে, কিন্তু এর দ্বারা মানুষের অন্তর জয় করা যায় না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্ষমা প্রদর্শন করে আল্লাহ তাআলা তার সম্মান বাড়িয়ে দেন।

মুসলমানদের প্রতি ক্ষমা

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কা অভিযানের প্রস্তুতি পর্বে সকলকে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ ও যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'তোমাদের এ আয়োজনের কথা প্রতিপক্ষ যেন জানতে না পারে।' কিন্তু ঐ সময়েই হযরত হাতিব ইবনে আবী বালতাআ (রাঃ) মক্কাবাসীদেরকে এ আয়োজনের কথা জানিয়ে একটি চিঠি লিখেন। অতপর তিনি অতি সঙ্গোপনে একটি স্ত্রীলোকের মাধ্যমে ঐ চিঠিটি মক্কায় প্রেরণ করেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঐ বিষয়টি পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত আলী, হযরত জুবায়ের এবং হযরত মিকদাদ (রাঃ)-কে বলেন, তোমরা অবিলম্বে 'খাখ' নামক স্থানের দিকে রওয়ানা হও। তোমরা সেখানে পৌঁছে উটের উপর আরোহী অবস্থায় একটি স্ত্রীলোকের সাক্ষাত পাবে। তার কাছে মক্কার মুশরিকদের নামে প্রেরিত একটি চিঠি আছে। তোমরা তার নিকট থেকে তা উদ্ধার করে নিয়ে এসো। উল্লেখিত সাহাবীগণ যথাস্থানে গিয়ে স্ত্রীলোকটির সাক্ষাত পেলেন বটে, কিন্তু তার কাছে কোনো চিঠি পাওয়া গেল না। পরে তারা স্ত্রীলোকটিকে চ্যালেঞ্জ করে বললেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-প্রদত্ত তথ্য কখনো মিথ্যা হতে পারে না। হয় তুমি চিঠি বের করে দাও, অন্যথায় আমরা তোমাকে বিবস্ত্র করে দেহ তল্লাশী করতে বাধ্য হব। এ পর্যায়ে স্ত্রীলোকটি নিরুপায় হয়ে তার মাথার চুলের ভাঁজের ভিতর থেকে চিঠিটি বের করে দিল। তখন সাহাবীগণ তা নিয়ে এসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে পেশ করলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত হাতিব ইবনে আবী বালতাআকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এরূপ করলে কেন? তিনি বিনীতভাবে নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবেন না।

www.amarboi.org

কুরাইশদের সাথে আমার কোনো বিশেষ আত্মীয়তা বা ঘনিষ্ট সম্পর্ক নেই। অথচ এখন আমার সন্তান-সন্ততি মক্কায় অবস্থান করছে। সেখানে তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই। পক্ষান্তরে মক্কার অন্যান্য মুহাজিরদের আত্মীয়-স্বজন সেখানে রয়েছে। প্রয়োজন দেখা দিলে ওরাই মুহাজিরদের সন্তান-সন্ততির হিফাযত করবে। অতএব এ চিঠির মাধ্যমে আমি মক্কাবাসীদের প্রতি কিছুটা অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক আমার সন্তান-সন্ততির প্রতি তাদের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম। এর বিনিময়ে হয়ত তারা আমার সন্তান-সন্ততির হিফাযত করবে। এটাই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আল্লাহর কসম ! আমি মুরতাদ হয়ে যাইনি; কিংবা ইসলামের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে এ কাজ করিনি। আমার এ কাজের মধ্যে আল্লাহর রাসূলের প্রতি শত্রুতা পোষণ কিংবা ইসলামের কোনো ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা নিহিত ছিল না।

নবী (সাঃ) হযরত হাতিব ইবনে আবী বালতাআর ঐ নিবেদন শুনে বললেন, নিসন্দেহে হাতিব সত্য বলেছে। হযরত উমর (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনার অনুমতি পেলে আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। কিন্তু নবী (সাঃ) বললেন, নিসন্দেহে হাতিব বদর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। হে উমর! আল্লাহ তাআলা তো নিজ রহমতে বদরে অংশ গ্রহণকারীদের সম্পর্কে বলেছেন, "তোমরা এখন যা ইচ্ছা আমল কর ; নিসন্দেহে আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।"

একদা একজন পল্লীবাসী মুসলমান মসজিদে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করলো। অতপর সে মসজিদের ভেতরেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে আশেপাশের সাহাবীগণ ছুটে এসে তাকে বাধা দিতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে বারণ করে বললেন, ওকে কিছু বলো না, বরং এক বালতি পানি এনে জায়গাটি পরিষ্কার করে দাও। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে কঠোরতার জন্য নয়, বরং সহজীকরণের জন্য প্রেরণ করেছেন।

কাফির ও মুশরিকদের প্রতি ক্ষমা

ভূপৃষ্ঠে এমন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই কম যিনি নিজের শত্রুদের প্রতিও অপরিসীম ক্ষমা ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন পূর্ণ মাত্রায় এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

www.amarboi.org

উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা হযরত হামযা (রাঃ)-কে শহীদ করেছিল ওয়াহশী। মক্কা বিজয়ের পর ওয়াহশী প্রাণভয়ে তায়েফ চলে যায়। কিন্তু তায়েফের লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করলে সে ঐ ভূখণ্ডকেও নিজের জন্য আর নিরাপদ মনে করেনি। তবে সে শুনেছিল যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আগত কোনো প্রতিনিধির সাথেই তিনি খারাপ ব্যবহার করেন না। সুতরাং সে ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে তায়েফের প্রতিনিধি দলের সাথে মদীনায় এসে হাযির হলো।

কিন্তু সাহাবা কিরাম ওয়াহশীকে দেখা মাত্র তাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল ! এই সেই ওয়াহশী, যে আপনার প্রিয় চাচাকে শহীদ করেছিল।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওয়াহশীর নিকট হযরত হামযার হত্যাকাণ্ডের ঘটনা জানতে চাইলেন। ওয়াহশী নিদারুণ অনুশোচনা ও বেদনার সাথে কেবল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হুকুম পালনার্থে ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের আনুপূর্বিক বর্ণনা দিল এবং বললো, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছি।

ওয়াহশীর ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে শুধু এতটুকু বলেছিলেন, যদি সম্ভব হয় তবে তুমি আমার সামনে এসো না। কেননা তোমাকে দেখলেই আমার শহীদ চাচার কথা মনে পড়বে।

পরবর্তী জীবনে হযরত ওয়াহশী (রাঃ) উহুদের সেই ঘটনার কাফ্ফারা স্বরূপ ইসলামের স্বপক্ষে অনুরূপ কোনো দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা ঘটাবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে সে সুযোগও দান করলেন। যে অস্ত্র দ্বারা তিনি হযরত হামযা (রাঃ)-কে শহীদ করেছিলেন, সেই অস্ত্র দ্বারাই নুবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার মুসায়লামা কাযযাবকে তিনি হত্যা করেন। হযরত হামযা (রাঃ)-কে যে পদ্ধতিতে তিনি আঘাত করেছিলেন সেই একই পদ্ধতিতে, নাভীতে বর্শা বিদ্ধ করে তিনি মুসায়লামাকেও আঘাত করেছিলেন। এভাবে হযরত ওয়াহশী একজন শ্রেষ্ঠ মানবের হত্যার কাফ্ফারা অপর একজন নিকৃষ্ট মানুষের হত্যার মাধ্যমে পরিশোধ করেছিলেন।

মক্কার কাফিররা ক্রমাগত তিন বছর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তার অনুসারী ও শুভানুধ্যায়ীদেরকে একটি পাহাড়ী উপত্যকায় অবরোধ করে রাখে। এ সুদীর্ঘ সময় ঐ অবরুদ্ধ অঞ্চলে খাদ্য ও পানি সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখা হয়। তখন শিশুরা রাতভর ক্ষুৎপিপাসায় চীৎকার করতো। তাদের অনাহার-ক্লিষ্ট চেহারা দেখে যে কোনো পাষাণ হৃদয়েও করুণার উদ্রেক হত। কিন্তু কাফিরদের

www.amarboi.org

অন্তরে এর কোনো প্রতিক্রিয়া হত না। অথচ পরবর্তীতে এ ধরনের পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মক্কার কাফিরদের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলেন তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মক্কার খাদ্যশস্য আসত ইয়ামামা থেকে। কিন্তু সেখানকার গোত্রপতি ইসলাম গ্রহণ করার পর মক্কার কাফিররা স্বধর্ম ত্যাগের জন্য তাকে তিরস্কার করায় তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে ঘোষণা দিয়েছিলেন ঃ আল্লাহর শপথ ! রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অনুমতি ছাড়া আর একটি দানাও ইয়ামামা থেকে মক্কায় প্রেরণ করা হবে না। তিনি তার ঘোষণা অনুযায়ী সত্যি সত্যিই মক্কায় শস্য প্রেরণ বন্ধ করে দেন। ফলে মক্কায় ভয়াবহ খাদ্য-সংকট দেখা দেয়। এমতাবস্থায় নিরুপায় হয়ে মক্কার কুরাইশ নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে এ ব্যাপারে তার করুণাদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সংগে সংগেই ইয়ামামার গোত্রপতিকে মক্কায় খাদ্য প্রেরণের নির্দেশ দেন। ফলে মক্কাবাসীরা ঐ মহাবিপদ থেকে রক্ষা পায়।

বদরের যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সুহায়ল বিন উমর। সে চমৎকার কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিল এবং প্রকাশ্য জনসমাবেশে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমালোচনা করে বক্তৃতা করত।

বদরের যুদ্ধে সে মুসলমানদের হাতে বন্দী হলে হযরত উমর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে নিবেদন করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তার নীচের পাটির দু'টি দাঁত উপড়িয়ে ফেলা হোক, যাতে সে আর ভালভাবে কথা বলতে না পারে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বলেন, আমি যদি তার কোনো অংগ নষ্ট করে দিই, তবে আমি নবী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা আমার অংগও নষ্ট করে দেবেন।

যী-কারদ নামক স্থানটি ছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত রাষ্ট্রীয় চারণভূমি। একবার আবদুর রহমান বিন উয়াইনার নেতৃত্বে গাতফান গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি সেখানে অতর্কিতে আক্রমণ চালায় এবং উটের রাখালকে হত্যা করে ২০টি উট ছিনিয়ে নিয়ে যায়। ঐ রাখাল ছিলেন হযরত আবু যর (রাঃ)-এর পুত্র। আক্রমণকারীরা তার স্ত্রীকেও বন্দী করে নিয়ে যায়।

এ দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়ার পর মুসলমানগণ আক্রমণকারীদের পিছনে ধাওয়া করলে তারা আত্মরক্ষার জন্য একটি পাহাড়ী ঘাটিতে প্রবেশ করে। সেখানে গাতফান গোত্রের সেনাপতি উয়াইনা বিন হাসান তাদের সাহায্যের জন্য অবস্থান করছিলেন।

www.amarboi.org

এদিকে হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তীরন্দাজ সাহাবী। সর্বপ্রথম তিনিই উপরোক্ত দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়েছিলেন। তিনি সাথে সাথে উচ্চস্বরে চীৎকার করে সাহাবীদেরকে সেখানে জড়ো করেন এবং সবাই দ্রুত অগ্রসর হয়ে আক্রমণকারীদের আশেপাশে অবস্থান নেন। তারা তখন উটগুলোকে পানি পান করাচ্ছিলো। হযরত সালামা ক্ষিপ্র গতিতে তাদের উপর তীর বর্ষণ করতে থাকেন। তখন দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যেতে থাকলে হযরত সালামা তাদের পিছনে ধাওয়া করেন এবং তাদের হাত থেকে উটগুলোকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হন।

অভিযান শেষে হযরত সালামা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হন এবং ঘটনার বিবরণ দানের পর নিবেদন করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল ! যদি আমার সাথে একশ লোক দেয়া হয় তাহলে আমি পুনরায় অভিযান চালিয়ে ওদের সকলকে বন্দী করে নিয়ে আসতে পারি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বলেন, কারো উপর প্রাধান্য লাভের পর তার সাথে ক্ষমাসুলভ আচরণ করো। এই বলে তিনি তাদেরকে বন্দী করে নিয়ে আসতে নিষেধ করলেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির পরের ঘটনা। রাসূলুলুল্লাহ (সাঃ) তখনো হুদায়বিয়াতেই অবস্থান করছিলেন। একদা ফজরের সময় মুসলমানগণ যখন জামাআতে নামায আদায় করছিলেন, তখন একযোগে তাদের সকলকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ৮০জন কাফির তানঈম পাহাড় থেকে নীচে নেমে আসে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার ইচ্ছায় তাদের সকলেই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের সকলকেই কোনো প্রকার মুক্তিপণ বা শাস্তি ছাড়াই মুক্ত করে দেন। এ ঘটনাকে উপলক্ষ করে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি নাযিল হয় ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط (الفتح : ٢٤)

"তিনি মক্কা উপত্যকায় ওদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত ওদের থেকে নিবারিত করেছেন ওদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর।"–(সূরা আল ফাতাহ ঃ ২৪)

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া ছিলেন কুরাইশ নেতৃবর্গের মধ্যে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং এক সময় তিনি ইসলামের কট্টর শত্রু ছিলেন। তিনি মোটা পুরস্কার দানের আশ্বাস দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যা করার জন্য উমায়র ইবনে ওহাবকে উৎসাহিত করেছিলেন।

www.amarboi.org

মক্কা বিজয়ের পর সাফওয়ান প্রাণভয়ে জেদ্দায় পালিয়ে যান এবং সমুদ্র পথে ইয়ামন চলে যাওয়ার সংকল্প নেন। তখন উমায়র ইবনে ওহাব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে নিবেদন করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া তার গোত্রের সরদার, অথচ আজ সে প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে এবং নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে মনস্থ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বলেন, তাকে নিরাপত্তা দেয়া হল। উমায়র পুনরায় নিবেদন করেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমার সাথে সাফওয়ানের নিরাপত্তা দান সম্পর্কিত এমন কোনো প্রমাণ দেয়া হোক, যা দেখে সে আমার কথায় আশ্বস্ত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন নিরাপত্তার প্রমাণ স্বরূপ আপন পবিত্র পাগড়ী খুলে তা উমায়রের হাতে তুলে দেন।

এবার উমায়র সাফওয়ানের কাছে গিয়ে তাকে নিরাপত্তার সুসংবাদ দেন। কিন্তু সাফওয়ান কিছুতেই একথা বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে বলল, সেখানে যেতে আমার ভয় হচ্ছে। জবাবে উমায়র বলেন, তবে মনে হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উদারতা ও ক্ষমা সম্পর্কে তোমার কিছুমাত্র ধারণা নেই। একথা শুনার পর সাফওয়ানের মনের ভয় দূর হলো এবং সে উমায়রের সাথে রওয়ানা হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে এসে হাযির হল। এখানে এসে সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সর্বপ্রথম যে কথাটি জিজ্ঞেস করেছিল তাহলো, উমায়র বলেছে, আপনি নাকি আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন ? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হ্যাঁ, সে সত্য বলেছে। অতপর সাফওয়ান বলল, আপনি আমাকে দু' মাসের সময় দিন। তিনি বললেন, দু মাসের কেন, তোমাকে চার মাসের সময় দেয়া হলো। অতপর সাফওয়ান স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলো।

নবী (সাঃ)-এর অশেষ অনুকম্পা, উদারতা ও ক্ষমার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল মক্কা বিজয়ের দিন। মক্কার যেসব লোক আল্লাহর নবীর উপর পদে পদে অত্যন্ত নির্মম ব্যবহার করেছিল, সুদীর্ঘ তিন বছর সামাজিক বয়কট করে যারা আল্লাহর নবীকে সীমাহীন দুঃখকষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিল, এমনকি যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যা করার জন্য জঘন্য ষড়যন্ত্র পর্যন্ত করেছিল— মক্কা বিজয়ের দিন সেই বর্বর জালিমদেরকে অপরাধী বেশে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে এনে হাযির করা হয়।

রাসূলুল্লাহ (সা) কাবার অভ্যন্তর হতে সকল মূর্তি অপসারণপূর্বক বাইরে এসে দেখতে পেলেন, মক্কার অপরাধী কুরাইশরা নিদারুণ উৎকণ্ঠার মধ্যে তাদের অতীত অপরাধের শাস্তির ঘোষণা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা মনে মনে চিন্তা করেছিলো, অতীতে আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও মুসলমানদের

www.amarboi.org

উপর যেভাবে নির্মম অত্যাচার করেছি তার পরিণতিতে আজ নিশ্চয়ই আমাদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের সকলকে লক্ষ্য করে বললেন, আজ তোমাদের সাথে কী ধরনের ব্যবহার করা হবে ? জবাবে কুরাইশ নেতৃবর্গ বিনীতভাবে নিবেদন করল, হে হৃয়দবান ভ্রাতা! আমরা তো এখন তোমার হাতে বন্দী। (সুতরাং তুমি যা ইচ্ছা করতে পার)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন ঘোষণা করলেন, যাও, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম।

মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। আবূ সুফইয়ান বিন হারিছ বিন আবদুল মুত্তালিব ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচাতো ভাই। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দুধভাইও ছিলেন। অর্থাৎ উভয়ে হযরত হালিমার দুধ পান করেছিলেন। নুবুওয়াতের পূর্বে তাদের মধ্যে এমনই অন্তরঙ্গতা ছিলো যে, তারা পরস্পর থেকে কখনো বিচ্ছিন্ন হতেন না। অথচ নুবুওয়াত লাভের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি আবূ সুফইয়ানের সেই ভালোবাসা শত্রুতায় পরিণত হয় এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমালোচনায় রচিত কবিতাসমূহ আবৃত্তি করে এদিক সেদিক বেড়াতে থাকেন।

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ফুফাতো ভাই অর্থাৎ আতিকা বিনতে আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আবদুল্লাহ বিন আবী উমাইয়াও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরোধিতায় অত্যন্ত সোচ্চার ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উল্লেখিত দুই ভাইও তার খিদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন ; কিন্তু তাদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মনে এমনই কষ্ট ছিল যে, তিনি সরাসরি তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন। এ সময় উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) এ ব্যাপারে সুপারিশ করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সাক্ষাত প্রার্থীদের একজন আপনার চাচার পুত্র এবং অপরজন আপনার ফুফাতো ভাই (সুতরাং তাদের আবেদন মঞ্জুর করুন)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যন্ত বেদনার সাথে বলেন, তাদের সাথে আমার সাক্ষাতের কোনো প্রয়োজন নেই। আমার চাচাতো ভাই আমার সম্মানহানি করেছে। আর ফুফাতো ভাই হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে একদা মক্কায় আমাকে বলেছিল, আল্লাহর শপথ ! আমি কখনো তোমার উপর ঈমান আনব না—এমনকি আমি যদি স্বচক্ষে এ দৃশ্য দেখতে পাই যে, তুমি সিঁড়ি লাগিয়ে আকাশে আরোহণের পর সেখান থেকে (নুবুওয়াতের) প্রমাণসহ অবতরণ করছ এবং তোমার সাথে এমন চারজন ফিরিশতাও রয়েছে, যারা সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন।

www.amarboi.org

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) পুনরায় নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার ঔদার্য ও মহানুভবতার ফলে এরূপ আশা করা যায় যে, আপনার রহমতের ভাণ্ডার হতে আপনার এ দুই ভাইও বঞ্চিত হবে না।

ঐ সময় আবূ সুফইয়ান বিন হারিস এ মর্মে মন্তব্য করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যদি আমাকে তাঁর খিদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি না দেন, তবে আমি আমার ছেলে জাফরকে সঙ্গে নিয়ে কোনো মরুভূমিতে চলে যাব এবং সেখানে ক্ষুৎপিপাসায় ধুকতে ধুকতে প্রাণত্যাগ করবো।

অবশেষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ), উম্মুল মুমিনীনের জোর সুপারিশের ফলে এবং ওদের অনুশোচনার ব্যাপারটিও জানতে পেরে ওদেরকে তার খিদমতে হাযির হওয়ার অনুমতি দেন। তখন হযরত আলী (রাঃ), আবু সুফইয়ান বিন হারিসকে এ মর্মে পরামর্শ দেন যে, আপনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখোমুখি হওয়ার পর সর্বপ্রথম সে কথাই বলবেন, যে কথাটি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর ভ্রাতাগণ তাঁর সামনে বলেছিলেন। অর্থাৎ হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ তাআলার কসম ! আমাদের চাইতে আল্লাহ তাআলা আপনাকেই পছন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম।

আবূ সুফইয়ান রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে হাযির হওয়ার পর আলী (রাঃ)-এর পরামর্শ অনুযায়ী উপরোক্ত কথাই বলেন এবং তার কথা শুনার সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, "আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করুন। তিনি সকল করুণাময়ের চাইতে বড় করুণাময়।"

যা হোক, আবূ সুফইয়ান বিন হারিস এবং আবদুল্লাহ বিন আবী উমাইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং পরে মুসলমানদের সঙ্গেই মক্কা বিজয় অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।

আবূ সুফইয়ানের স্ত্রীর নাম ছিল হিন্দ। এ হিন্দ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা হযরত হামযা (রাঃ)-এর বুক চিরে কলিজা বের করে তা চিবিয়ে চিবিয়ে টুকরো টুকরো করেছিল।

সেই হিন্দ মক্কা বিজয়ের দিন মুখ ঢেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দরবারে এসেছিল যাতে কেউ তাকে চিনতে না পারে এবং ঐ সুযোগে সে ইসলাম গ্রহণ করে নিরাপত্তার সনদ আদায় করে নিতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বিলক্ষণ চিনতে পেরেছিলেন। এতদসত্ত্বেও তিনি হিন্দের সামনে তার কৃত ঐ নারকীয় ঘটনার কোনো উল্লেখই করেননি।

www.amarboi.org

ফলে হিন্দ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহানুভবতায় এতটা প্রভাবিত হয় যে, সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠে, হে আল্লাহর রাসূল! ইতিপূর্বে আমার নিকট আপনার ঘরটি ছিল সবচাইতে ঘৃণিত, কিন্তু এখন আমার নিকট ওটাই সবচাইতে প্রিয়।

হুবার ইবনুল আসওয়াদ নবী কন্যা হযরত যায়নাবকে অবর্ণনীয় কষ্ট দিয়েছিল। হযরত যায়নাব (রাঃ) অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় যখন মদীনা অভিমুখে হিজরত করছিলেন তখন কাফিররা তার গতিরোধ করে। আর তখনই হুবার জেনে শুনে হযরত যায়নাব (রাঃ)-কে উষ্ট্রপৃষ্ঠ হতে ভূতলে ফেলে দেয়। এ কঠিন আঘাতের ফলে তার গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়। এছাড়াও সে আরো বহু অপরাধের সাথে জড়িত ছিল।

এ সকল অপরাধের কারণেই মক্কাবিজয়ের পর তার মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়। হুবার এ ঘোষণা শুনার পর ইরান চলে যেতে মনস্থ করে, কিন্তু আল্লাহ তাআলা আপন অনুগ্রহে তার মনকে ইসলামের দিকে ঝুঁকিয়ে দেন। ফলে সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করে, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ইরান চলে যেতে মনস্থ করেছিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আপনার অনুগ্রহ, অনুকম্পা ও ক্ষমার কথা আমার মনে পড়ে। তাই আমি কোথাও পালিয়ে না গিয়ে আপনার খিদমতে এসে হাযির হয়েছি। আমার সম্পর্কে আপনি যা শুনেছেন তার সবই সত্যি। আমি আমার সকল অপরাধই স্বীকার করছি। তবে হে আল্লাহর রাসূল! আমি আজ ইসলাম গ্রহণের জন্যই আপনার খিদমতে এসে হাযির হয়েছি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন কোনো রূঢ় কথা না বলে তাকে আপন রহমতের ক্রোড়ে তুলে নেন।

ইয়াহুদী ও মুনাফিকদের প্রতি ক্ষমা

কোনো একটি যুদ্ধে একজন মুহাজির একজন আনসারকে রাগের বশবর্তী হয়ে একটি থাপ্পড় মারেন। আনসার তখন সমগ্র আনসার সম্প্রদায়ের দোহাই দেন। সঙ্গে সঙ্গে মুহাজিরও মুহাজির সম্প্রদায়ের দোহাই দেন। শেষ পর্যন্ত বিতর্ক বৃদ্ধি পেয়ে এক পর্যায়ে তা সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নেয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন তাদেরকে ডেকে বলেন, এটা কোন্ ধরনের মূর্খতা? তার এ তিরস্কারের ফলে সকলে শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হয়।

কিন্তু ঐ মুহূর্তে মুনাফিক-নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই মন্তব্য করল, মদীনা ফিরে যাওয়ার পর এ নিকৃষ্ট মুসলমানদেরকে সেখান থেকে অবশ্যই বহিষ্কার করা হবে। সে তার সাথী-সঙ্গীদেরকে পরামর্শ দিল, মুসলমানদেরকে জব্দ করার সহজ উপায় হচ্ছে, তোমরা তাদের সহযোগিতা থেকে বিরত থাক। এতে তারা আপনা-আপনি কোণঠাসা হয়ে পড়বে।

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে তার ঐ মন্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে পরিষ্কার ভাষায় জবাব দিল, আমি এ ধরনের কোনো কথা বলিনি। উমর ফারুক (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিবেদন করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অনুমতি পেলে আমি এ মুনাফিকের গর্দান এখনি উড়িয়ে দিই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে বারণ করে বললেন, এতে লোকেরা বলাবলি করবে, মুহাম্মদ তার নিজের সাথীদেরকেও হত্যা করে।

মোটকথা, এহেন ধৃষ্টতার পরও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুনাফিক-নেতার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেননি। উহুদ যুদ্ধে এই আবদুল্লাহ বিন উবাই নিজের তিনশত সঙ্গীসাথীসহ মুসলমানদের পক্ষ ত্যাগ করে মদীনায় ফিরে এসেছিল। ফলে রণাঙ্গনে মুসলমানদের মধ্যে দারুণ নৈরাশ্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এহেন গুরুতর অপরাধের পরও আল্লাহর রাসূল আবদুল্লাহ বিন উবাইকে ক্ষমা করে দেন। উপরন্তু তিনি তার প্রতি এতটা বদান্যতা প্রদর্শন করেন যে, তার অন্তিম আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য আপন জামা দ্বারা কাফন পরিয়ে তিনি তার লাশ দাফনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এজন্য সাধারণ মুসলমানরা আপত্তি উত্থাপন করলেও তিনি তাতে কর্ণপাত করেননি।

প্রাণের শত্রুর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন

সপ্তম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের পর ইয়াহূদীদের ক্রমাগত ফিতনা-ফাসাদ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং তাদেরকে নিজেদের ভূখণ্ডেই বসবাস করার সুযোগ দেন। অবশ্য তাদের জমির উৎপন্ন ফসলের উপর নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করা হয়।

খায়বার বিজয়ের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছু দিন সেখানেই অবস্থান করেন। এ সময় যায়নাব বিনতে হারিছা নাম্নী জনৈকা ইয়াহূদী রমণী গোশতের সাথে বিষ মিশিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে হাদিয়া হিসাবে তা পেশ করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা মুখে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিষের গন্ধ পেয়ে সতর্ক হয়ে যান। কিন্তু আহারে উপবিষ্ট তার অপর সঙ্গী হযরত বিশর বিন বারা মা'রূর (রাঃ) অজান্তে কিছু গোশত খেয়ে ফেলেন। অবশ্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাকেও সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, এ মাংসের সাথে বিষ মিশানো হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই কিছু গোশত হযরত বিশর গলধঃকরণ করে ফেলেছিলেন। পরে যায়নাবকে ডেকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে সে বলে, খাবারের সাথে আমি বিষ মিশিয়েছি বটে, তবে এর পিছনে আমার একটি উদ্দেশ্য ছিল। আর তা এই যে, আপনি যদি সত্য নবী হন, তবে আল্লাহ

www.amarboi.org

তাআলা অবশ্যই আপনাকে বিষের কথা জানিয়ে দেবেন। পক্ষান্তরে আপনার দাবী যদি অসত্য হয়, তবে মানুষ আপনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেহেতু নিজের ব্যক্তিগত বিষয়ে কখনো কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না, এ কারণে দুরাচারী যায়নাবকে তিনি কিছুই বললেন না। কিন্তু পরে ঐ বিষক্রিয়ার ফলেই হযরত বিশরের ইন্তেকাল হলে যায়নাবকে বিশরের আত্মীয়-স্বজনের হাতে সোপর্দ করা হয়। কারণ এ ক্ষেত্রে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সত্তার সাথে নয়, বরং অন্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল। পরে হযরত বিশর (রাঃ)-এর লোকজন শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যায়নাবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে।

একবার এক হতভাগা, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে হত্যা করতে চেয়েছিল। সাহাবায়ে কিরাম, তাকে বন্দী করে আনলে সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখে ভয়ে কাঁপতে থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে অভয় দিয়ে বলেন, ভয় পেয়ো না ; তুমি ইচ্ছে করলেও আমাকে হত্যা করতে পারতে না।

কুরাইশ গোত্রের উমায়র ইবনে ওহাব একদা ইসলামের একজন কট্টর শত্রু ছিল। একবার সে সাফওয়ানের সঙ্গে 'হিজর' নামক স্থানে বসে বদরে নিহতদের কথা স্মরণ করে আক্ষেপ করছিল। সাফওয়ান বলছিল, আল্লাহর শপথ! এখন আর বেঁচে থাকার কোনো অর্থই হয় না। উমায়র জবাব দিল, তুমি সত্য বলেছ ! যদি আমার উপর ধারকর্জ না থাকত এবং আমার সন্তান-সন্ততিদের ঝামেলাও না থাকত, তবে এক্ষুণি আমি ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করতাম এবং মুহাম্মদকে হত্যা করে (নাউযুবিল্লাহ) ফিরে আসতাম। আমার এক ছেলেকেও সেখানে বন্দী করে রাখা হয়েছে। সাফওয়ান তাকে আশ্বস্ত করে বলল, তুমি ধারকর্জের কথা ভেবো না, তোমার সন্তানদের দেখাশুনার দায়িত্বও আমি গ্রহণ করলাম। তুমি তোমার পরিকল্পনা কার্যকর কর।

সাফওয়ানের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস পাওয়ার পর উমায়র ঘরে এসে নিজের তলোয়ারে বিষ মিশিয়ে যাত্রার আয়োজন করতে লাগল এবং যথাসময়ে মদীনায়ও এসে পৌঁছল। কিন্তু এখানে তার সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করে হযরত উমর (রাঃ)-এর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং তিনি তাকে পাকড়াও করে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি এখানে এসেছ ? সে জবাবে বলল, আমার ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি। তিনি এবার জিজ্ঞেস করলেন, তবে তলোয়ার সঙ্গে এনেছ কেন ? সে বলল, বদরে এ তলোয়ার কি

www.amarboi.org

কাজেই বা এসেছে ? এবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কি ভাই, তুমি এবং সাফওয়ান হিজরে বসে আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করনি ?

উমায়র আল্লাহর রাসূলের মুখে নিজেদের এ একান্ত গোপন ষড়যন্ত্রের কথাটি শুনতে পেয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল এবং সহসাই বলে উঠল, নিশ্চয়ই আপনি সত্য নবী। আল্লাহ তাআলার শপথ ! এই গোপন বিষয়টি আমি এবং সাফওয়ান ছাড়া অপর কারোরই তো জানা ছিল না।

অতপর উমায়র স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে এবং মক্কার সেই কুরাইশরা, যারা আল্লাহর নবীর প্রাণ সংহারের সংবাদ শুনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, তাদের নিকট উল্টো উমায়রের মুসলমান হওয়ার সংবাদটিই গিয়ে পৌঁছে।

চতুর্থ হিজরীর ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদা কোনো একটি কাজে বনু নাযীরের মহল্লায় গেলে সেই সুযোগে তথাকার মুশরিকরা আল্লাহর নবীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। পরিকল্পনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সা)-কে একটি দেয়ালের পাশে বসিয়ে রেখে উপর হতে ইবনে জাহ্হাশ নামক জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে একটি ভারী পাথর তাঁর উপর নিক্ষেপের আয়োজন করা হয়, যাতে সংগে সংগেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে বসার পরই আল্লাহ তাআলা কাফিরদের এ দূরভিসন্ধি সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন। ফলে তিনি সেখান থেকে উঠে আসেন এবং তাদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা পান। কিন্তু এজন্য তিনি ইয়াহূদীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করেননি।

মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করছেন, এমন সময় সুযোগ বুঝে ফুযালা ইবনে উমায়র রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে সামনে এগিয়ে আসে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, ফুযালা, তুমি কি এদিকে আসছ ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি পুনরায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এ মুহূর্তে তুমি মনে মনে কি চিন্তা করছিলে বলতো ? ফুযালা জবাব দিল, কিছুই না, আমি তো মনে মনে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' বলছিলাম। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মৃদু হেসে বললেন, আচ্ছা, তুমি তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে নিজের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। এই বলে তিনি তার পবিত্র হাত ফুযালার বুকে রাখলেন।

পরবর্তীকালে ফুযালা বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর রাসূলের হাতের পরশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি এক অনাবিল আত্ম-প্রশান্তি লাভ করি এবং আমার

www.amarboi.org

অন্তরে তাঁর ভালবাসা এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, অতপর অপর কাউকেও আমি তাঁর চাইতে অধিক ভালবাসতে পারিনি।

হযরত ফুযালা (রাঃ) আরো বলেন, সেদিন তাঁর নিকট হতে বাড়ী ফেরার পথে আমার প্রেমিকার সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেদিন তার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি তাকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলাম, ইসলাম আমাকে এই সকল অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে নিষেধ করেছে। অতএব তোমা থেকে চিরবিদায়।

৫. কথা ও কাজে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

যে নিজের কথা ও কাজের মধ্যে মিল রাখে না সে অন্যকে যত সদুপদেশ দিক, বাহ্যতঃ নিজেকে ধার্মিক প্রমাণের যত চেষ্টাই করুক, ধর্মীয় বাণী যতই আওড়াক, তাতে কিছু যায় আসে না। আসলে সে ভণ্ড, মনুষ্যত্বের মুখোশ-পরা একটি নিকৃষ্ট জীব মাত্র। তাই তো এদেরকে সম্বোধন করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ○

"তোমরা কি মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, আর নিজেদের কথা বেমালুম ভুলে যাও, অথচ তোমরা ধর্মীয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করছ—তবে কি তোমরা বুঝ না ?"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৪৪)

যাদের কথা ও কাজের মধ্যে মিল নেই তাদের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআনে এ ধরনের আরো অনেক সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ সৃষ্টির সেরা এজন্য যে, সে কথা বলতে জানে। আর মানুষের মধ্যে সেরা হচ্ছেন তিনি, যার কথা ও কাজের মধ্যে মিল থাকে। আর এ বিশেষ গুণের কারণেই মানুষের মধ্যে সেরা হচ্ছেন আম্বিয়া কিরাম। আর আম্বিয়া কিরামের সরদার বা নেতা হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তাই তো হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর প্রত্যেকটি কথা ও কাজের মধ্যে এক অপূর্ব মিল পরিলক্ষিত হয়।

তিনি (সাঃ) মানুষকে বলতেন, আল্লাহকে স্মরণ করতে ; এবং নিজের বাস্তব জীবনেও তিনি এর উৎকৃষ্ট নমুনা পেশ করে গেছেন। তার সমগ্র জীবনে

www.amarboi.org

এমন একটি মুহূর্তও কাটেনি যখন তার মুখ বা অন্তর আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল ছিল।

তিনি মানুষকে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহ্ তাদের জন্য যথেষ্ট। তার বাস্তব জীবনেও দেখা যায়, প্রতিটি মুহূর্তে তিনি একথার উপর সুদৃঢ় ছিলেন। বহু ঘটনার মাধ্যমে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে, যারা আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং ভরসা রাখে তারা কোনোদিন ঠকে না, বরং পরিণামে সফলকামই হয়।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সবাইকে নামায পড়তে বলতেন এবং বাস্তবে তার অবস্থাও ছিল এই যে, পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায ছাড়াও তিনি রাতে এবং দিনে আরো অনেক নফল নামায, যেমন—ইশরাক, চাশত, তাসবীহ, আউয়াবীন ইত্যাদি প্রায় নিয়মিতই পড়তেন। তিনি যখন একাকী নামায পড়তেন তখন তার কিয়াম-কুউদ (নামাযে দাঁড়ানো ও বসা) রুকূ-সিজদা প্রভৃতি অত্যন্ত দীর্ঘায়িত হত। বিশেষ করে তার কিয়াম এতই দীর্ঘায়িত হত যে, দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার পা দু'টি ফুলে উঠতো। হযরত আয়েশা (রাঃ) একদা তার কাছে নিবেদন করেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আল্লাহ্ তাআলা তো আপনার সব গুনাহই মাফ করে দিয়েছেন, এতদসত্ত্বেও আপনি এত কষ্ট করছেন কেন ? রাসূল (সাঃ) জবাবে বলেন, হে আয়েশা! তাহলে কি আমি আল্লাহর একজন শোক্‌রগুযার (কৃতজ্ঞ) বান্দা হব না ?

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে রোযা রাখার নির্দেশ দিতেন এবং বাস্তব জীবনে তার অবস্থা এই ছিল যে, এমন একটি মাস বা সপ্তাহ অতিবাহিত হত না যাতে তিনি অন্ততঃ দু' চারটি নফল রোযা না রাখতেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নফল রোযা শুরু করতেন তখন মনে হত তিনি কখনো আর তা ভাঙ্গবেন না। রমযানের ফরয রোযার পূর্বে পুরো শাবান মাসই তিনি নফল রোযা রাখতেন। 'আইয়ামে বীয' তথা প্রত্যেক চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে তিনি প্রায়ই রোযা রাখতেন। একান্ত ওযর না থাকলে তিনি প্রতি সপ্তাহের সোম ও বৃহস্পতিবারেও রোযা রাখতেন। তিনি মুসলমানদেরকে সূর্যাস্তের পর রোযা রাখতে নিষেধ করতেন ; অথচ তার অবস্থা এই ছিল যে, কখনো কখনো এক নাগাড়ে দু' তিন দিন পর্যন্ত কিছু না খেয়ে তিনি রোযার মধ্যেই কাটিয়ে দিতেন। এক্ষেত্রে সাহাবীরা তার অনুকরণ করতে চাইলে তিনি বলতেন, তোমাদের মধ্যে আমার তুল্য কে আছে ? আমাকে যে আমার প্রভু খাওয়ান এবং পানও করান।

www.amarboi.org

তিনি মানুষকে যাকাত ও সাদাকা দানের নির্দেশ দিতেন ; এবং বাস্তবে তার অবস্থা এই ছিল যে, প্রায় দিনই তিনি দারিদ্র ও অভাব-অভিযোগের মধ্যে অতিবাহিত করতেন। অথচ যুদ্ধ জয়ের পর যা কিছু গনীমত তার ভাগে পড়ত তার সবই তিনি দরিদ্রদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সমগ্র মানুষের চাইতে অধিক বদান্য ছিলেন। সমগ্র জীবন তার এভাবে কেটেছে যে, তিনি কারো যাচ্‌নার উত্তরে 'না' বলেননি। তিনি একা একা কোনো জিনিসই খেতেন না। আহার্য বস্তু যত অল্পই হোক, তিনি তাতে কাউকে না কাউকে শরীক করে নিতেন। তার একটি সাধারণ ঘোষণা এই ছিল যে, 'কোনো মুসলমান ঋণ রেখে মারা গেলে আমাকে সে সম্পর্কে অবহিত কর, আমি অবশ্যই তার ঋণ পরিশোধ করে দেব।'

একদা আসরের নামাযের পর অন্যান্য দিনের মত জায়নামাযে না বসে তিনি দ্রুত হুজরার ভিতর চলে যান এবং প্রায় সাথে সাথেই আবার বেরিয়ে আসেন। এতে উপস্থিত সাহাবীরা কিছুটা বিস্মিত হয়েছেন—একথা আঁচ করতে পেরে তিনি সবাইকে সম্বোধন করে বলেন, নামাযের মধ্যে আমার স্মরণে পড়ে গেল যে, সোনার একটি ছোট টুকরা আমার ঘরে রয়েছে। তখন মনে করলাম, এমন যেন না হয় যে, রাত কেটে যাক অথচ মুহাম্মদের ঘরে ঐ সোনার টুকরাটি পড়ে থাক।

তার পরোপকারের মনোবৃত্তি এমনি ছিল যে, তিনি সর্বদা নিজের সত্তা ও নিজের পরিবারবর্গের উপর অন্যকে স্থান দিতেন। জনৈক সাহাবীর ঘরে কোনো একটি অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু তার কাছে আহার্য-সামগ্রী কিছুই ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা জানতে পেরে ঐ সাহাবীকে বলেন, আয়েশার কাছে যাও এবং তার কাছ থেকে আটার টুকরীটি নিয়ে এসো। সাহাবী সেখানে যান এবং আস্ত টুকরীটি চেয়ে নিয়ে আসেন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা ছিল এই যে, ঐ রাতে এ আটা ভিন্ন আর কোনো খাবারই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঘরে ছিল না। এই ছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাস্তব জীবনের নমুনা। তিনি মুখে যা বলতেন বাস্তবেও তা-ই করতেন। এজন্যই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ
الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا ٥ (الاحزاب : ٢١)

"তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"-(সূরা আল আহযাব ঃ ২১)

www.amarboi.org

৬. সঠিক জীবন পদ্ধতি

মানুষের দুনিয়ার এ জীবন খুবই ক্ষণস্থায়ী। তা সত্ত্বেও কোনো কোনো মানুষ দুনিয়াকে নিয়ে এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে, তার এ জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি তা সে বেমালুম ভুলে বসে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

"(এ দুনিয়ায়) প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহাচ্ছন্ন রাখে যতক্ষণ না তোমরা কবরে উপনীত হও। এটা সঙ্গত নয়, তোমরা শীঘ্রই তা জানতে পারবে।"-(সূরা আত তাকাসুর ঃ ১-৩)

আবার কোনো কোনো মানুষ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়িত্ব লক্ষ্য করে সন্ন্যাসবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। অথচ সন্ন্যাসবাদ তার সম্পূর্ণ প্রকৃতি-বিরুদ্ধ হওয়ায় এটা সে যথাযথভাবে পালন করে না এবং করতেও পারে না। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا

حَقَّ رِعَايَتِهَا ج-(الحديد : ٢٧)

"সন্ন্যাসবাদ এটা তো ওরা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল, আমি (আল্লাহ) ওদেরকে এর বিধান দিইনি, অথচ এটাও ওরা যথাযথভাবে পালন করেনি।"-(সূরা আল হাদীদ ঃ ২৭)

তাহলে মানুষের এ জীবন পরিচালনার সঠিক পদ্ধতি কি? হ্যাঁ, এর একটি সঠিক পদ্ধতি আছে। আর তা হচ্ছে সেই পদ্ধতি যা আম্বিয়া কিরাম (আঃ) মানুষকে বাত্‌লে দিয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর একটি নির্দেশনা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলে করীম (সাঃ) আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বলেন—দেখ, তুমি দুনিয়ায় এমনভাবে তোমার জীবন অতিবাহিত করবে যেন তুমি একজন প্রবাসী কিংবা একজন পথ চলা মুসাফির। রাসূলে করীম (সাঃ) যে ভঙ্গিতে কথাটি বলেছিলেন, হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) সে ভঙ্গিটিও এখানে উল্লেখ করেছেন। আর এ ভঙ্গিতে (কাঁধের উপর হাত রেখে) কাউকে কিছু বলা একথারই ইঙ্গিতবহ যে, যে কথাটি বলা হচ্ছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি এমন একটি কথা, যা অত্যন্ত

www.amarboi.org

মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে এবং তা অন্যের কাছে প্রচারও করতে হবে।

যা হোক, রাসূলে করীম (সাঃ) দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবন পরিচালনার পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন তাহলো, তুমি দুনিয়ার জীবন এভাবে অতিবাহিত কর যেন তুমি একজন প্রবাসী। আর প্রবাস জীবনের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, একজন মানুষ তা এমনভাবে অতিবাহিত করে যে, সে বিদেশে থাকে সত্য, কিন্তু তার অন্তর, তার মস্তিষ্ক এবং তার চিন্তা-ভাবনা পড়ে থাকে স্বদেশ ভূমিতে। সে বিদেশে অবস্থানের জন্য ঠিক ততটুকু উদ্যোগ আয়োজন করে যাতে মোটামুটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে তার দৈনন্দিন জীবনটি কেটে যেতে পারে। সে প্রবাসে অর্থ খরচ করে কম, কিন্তু বাঁচায় বেশী, যাতে করে সে স্বদেশে ফিরে গিয়ে এ জমানো অর্থ নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের আয়েশ-আরামের জন্য খরচ করতে পারে। এমনকি, সে প্রবাসে আয়েশ-আরামের জীবন অতিবাহিত করার কথা চিন্তাও করতে পারে না। কেননা কষ্টেসৃষ্টে অর্জিত সব অর্থ সেখানে খরচ করে খালি হাতে ঘরে ফেরাটা তার কাছে একটি বোকামী ছাড়া কিছু নয়। প্রবাসে যখনই সে এমন কোনো জিনিস দেখে যা স্বদেশে ফিরে আসার পর তার কোনো না কোনো কাজে লাগতে পারে সে সংগে সংগে ঐ জিনিসটি করায়ত্ব করার চেষ্টা করে। প্রবাসে সে কাউকে অত্যধিক ভালও বাসে না, যেন এখানকার ক্ষণস্থায়ী জীবন অতিবাহিত করে স্বদেশে ফিরে যাবার পর এ ভালবাসার স্মৃতি তার মনঃকষ্টের কারণ না হয়।

প্রবাসে সে কারো সাথে শত্রুতায়ও লিপ্ত হয় না। কেননা সে জানে, এ ক্ষণস্থায়ী জীবনটি কারো সাথে শত্রুতায় লিপ্ত না হয়ে বরং সবার সাথে মিলে মিশে কাটিয়ে দেয়াই সবদিক দিয়ে নিরাপদ ও মঙ্গলজনক।

মোটকথা, রাসূলে করীম (সাঃ) মানুষকে দুনিয়ায় প্রবাসীর ন্যায় জীবন যাপন করার উপদেশ দিয়ে এ শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার লোভে মত্ত না থেকে তোমরা তোমাদের পরকাল তথা চিরস্থায়ী জীবনের কথা চিন্তা কর। তোমার দেহ এ দুনিয়ায় থাকলেও তোমার অন্তর যেন পরকালের স্থায়ী জীবনের প্রতি নিবিষ্ট থাকে। এখানে থাকার জন্য তোমার এতটুকু ব্যবস্থাপনাই যথেষ্ট যে, তুমি মোটামুটিভাবে সুখে শান্তিতে তোমার হাতে গোনা দিনগুলো কাটিয়ে দিতে পার। এজন্য তো বিরাট বিরাট আয়োজন ও আকাশচুম্বী দালান-কোঠার আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। বরং তোমার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে এটাই যে, তুমি শীঘ্রই যে চিরস্থায়ী জীবনে পা দিচ্ছো সে জীবন যাতে সুখে-

৯—

www.amarboi.org

শান্তিতে অতিবাহিত হয়, সেজন্য অধিক থেকে অধিকতর ধন-সম্পদ ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করো। আমরা এখানে অতিথি। তাও আবার এমন অতিথি যে, এখানে কতদিন থাকব তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। সম্ভবত আজই এখানে থাকার মেয়াদকাল শেষ হয়ে যাবে এবং কোনোরূপ অবকাশ না দিয়ে আমাদেরকে স্বদেশে ডেকে পাঠানো হবে। অতএব এটাই বুদ্ধিমানের কাজ যে, আমরা যতবেশী পারি এবং যেভাবে পারি এখানে উপার্জন করব যাতে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ অধিক থেকে অধিকতর হয় এবং এর মাধ্যমে আমরা আমাদের চিরস্থায়ী জীবন সুখে শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারি। মোটকথা, দুনিয়ার জীবনকে প্রবাস জীবনের সাথে তুলনা করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ক্ষণস্থায়িত্ব এবং এতে করণীয় বিষয়াদি সম্পর্কে যে ধারণা পেশ করেছেন তা নিসন্দেহে অনবদ্য এবং পরম শিক্ষণীয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বিতীয় যে উপমাটি পেশ করেছেন তাহলো, দুনিয়ায় যেন তুমি একজন পথচলা মুসাফির। এ উপমাটি প্রথম উপমার চাইতে অধিকতর আকর্ষণীয়। কেননা প্রবাসী কিছুকাল পর্যন্ত প্রবাস-জীবনে থাকে। সে 'কিছুকাল' কয়েক বছরের হোক অথবা কয়েক মাসের, এজন্য তাকে কিছু না কিছু আয়োজন অবশ্যই করতে হয়। কিন্তু পথ-চলা মুসাফিরের জন্য এরও কোনো বালাই নেই। সে বিভিন্ন মনযিলে অবতরণ করে সত্য, তবে সেখানে তার অবস্থান এতই সংক্ষিপ্ত হয় যে, সে মনযিলকে সজ্জিত করার, এমনকি সেদিকে ফিরে তাকাবার ফুরসতও তার থাকে না। সে শুধু স্বদেশ এবং কিভাবে সেখানে গিয়ে আয়েশ-আরামের সাথে জীবন অতিবাহিত করবে সে চিন্তায় নিমগ্ন থাকে। অতএব মুসাফিরী অবস্থায় কোথাও অবস্থান করতে হলে ঘরবাড়ী নির্মাণ করার কথা সে ভাবে না, বরং কোনো সরাইখানায় বা হোটেলে অবস্থান করে যত শীঘ্র সম্ভব স্বদেশের পথে পা বাড়ায়। অতি ক্ষণস্থায়ী ঐসব অবস্থানস্থলে কোনোরূপ অসুবিধা বা কষ্ট হলেও সে তা হাসিমুখে সহ্য করে নেয়। এজন্য কারো কাছে কোনো অভিযোগ করার প্রয়োজন বোধ করে না। উপরন্তু এ অবস্থায় কারো সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা বা কারো শত্রুতা করা তার কাছে হাস্যকর ব্যাপার বলেই মনে হয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, রাসূলে করীম (সাঃ) উপরোক্ত দু'টি উপমা দ্বারা আমাদেরকে যে অমূল্য উপদেশ প্রদান করেছেন তাহলো, এ দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী ; তবে এ দুনিয়া থেকে চিরস্থায়ী আখিরাত জীবনের আয়েশ-আরামের সামগ্রী আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ তাআলা যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আমাদেরকে দিয়েছেন তা কাজে লাগিয়ে আখিরাত

www.amarboi.org

জীবনের সামগ্রী আমাদেরকে যথাশীঘ্র সম্ভব তৈরী করে নিতে হবে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ـ

"আল্লাহ (দুনিয়াতে) তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর ; আর দুনিয়া হতে তোমার (আখিরাতের) অংশ নিয়ে যেতে ভুলো না।"–(সূরা আল কাসাস ঃ ৭৭)

৭. বিশ্বজগতের রহমত

মক্কা বিজয়ের কিছুদিন পূর্বের ঘটনা। তখন মক্কার অবস্থা এমনি যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কট্টর শত্রু হিসাবে সেখানকার অধিবাসীরা শুধু আরব বিশ্বের মানবতাবাদী সমাজগোষ্ঠীর কাছে নয়, বরং বহির্বিশ্বেও ছিল দারুণভাবে নিন্দিত ও সমালোচিত। কেননা তারা এ পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদেরকে বিশ্ব থেকে উৎখাত করার জন্য সব রকম প্রচেষ্টাই চালিয়েছে এবং এখনো সে লক্ষ্য অর্জনে সদা-তৎপর রয়েছে। ঠিক এমনি মুহূর্তে মক্কায় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মানুষ অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছার সাথে সাথে তিনি মক্কাবাসীদের দুর্দশা লাঘবের জন্য আপন কট্টর শত্রু আবু সুফইয়ান বিন হারব এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়ার কাছে—যারা ছিল তৎকালীন মক্কাবাসীদের নেতা—রিলিফ হিসাবে পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা পাঠিয়ে দেন।

নবী করীম (সাঃ)-এর নুবুওয়াত লাভের বেশ কয়েক বছর পূর্বের ঘটনা। একটি কাফেলা রাস্তা দিয়ে যাবার সময় একদল ডাকাত তাদের সবকিছু ছিনিয়ে নেয়। সেই সাথে উঠিয়ে নিয়ে যায় যায়েদ নামক তাদের একটি সুন্দর ফুটফুটে বালককেও এবং সুদূর মক্কার একটি বাজারে হাকিম বিন হাযাম নামীয় জনৈক ব্যক্তির কাছে তাকে বিক্রি করে। হাকিম বিন হাযাম আপন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ফুফু খাদীজার জন্য ঐ বালকটিকে কিনে নিয়ে গিয়েছিল। ঐ খাদীজাই পরবর্তীকালে হুযুর (সাঃ)-এর সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন এবং উপহার স্বরূপ যায়েদকে আপন প্রাণপ্রিয় পতির খিদমতে পেশ করেন।

দীর্ঘদিন পর যায়েদের পরিবার-পরিজন জানতে পারে যে, বালক যায়েদ দাস হিসাবে মুহাম্মদ (সাঃ) নামীয় মক্কার জনৈক ব্যক্তির খিদমতে নিয়োজিত

www.amarboi.org

রয়েছে। তখন তার বাবা ও চাচা প্রচুর অর্থ নিয়ে মক্কায় আসেন এবং হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর খিদমতে নিবেদন করেন ঃ হে মুহাম্মদ! আপনি বিখ্যাত কুরাইশ বংশের একজন অতি হৃদয়বান ব্যক্তি। আপনি আমাদের উপর কৃপা করুন এবং যায়েদকে মুক্ত করে দিন। এর বিনিময়ে আপনি যে পরিমাণ অর্থ চান আমরা তা দিতে রাজি আছি। হুযুর আকরাম (সাঃ) উত্তরে বলেন, যায়েদ যদি তোমাদের সাথে চলে যেতে চায় তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এ ব্যাপারে যায়েদের কাছে তার ইচ্ছার কথা জানতে চাওয়া হলে সে স্পষ্ট ভাষায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ছেড়ে যেতে অস্বীকার করে এবং বলে ঃ আমার কাছে হুযুর আকরাম (সাঃ)-এর সংসর্গ তথা দাসত্ব আমার মা-বাবা ও পরিবার-পরিজনের সংসর্গের চেয়ে অনেক শ্রেয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ বালকই পরবর্তী সময়ের প্রখ্যাত সাহাবী সেই যায়েদ (রাঃ), সমগ্র সাহাবীদের মধ্যে একমাত্র যার নামটিই পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

আর একজন সাহাবী হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ), [যিনি সুদীর্ঘ দশ বছর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খাদিম ছিলেন], বলেন ঃ এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনো আমার উদ্দেশ্যে 'উহ্' শব্দ উচ্চারণ করেননি। আমি কোনো কাজ ভুল করে ফেললে তিনি কখনো বলেননি, তুমি এটা কেন করেছ? আবার কোনো কাজ না করলে তিনি কখনো বলেননি, তুমি এটা কেন করনি?

হিজরী ৯ সনের কথা। ইয়ামনের বনী ত্বাই সম্প্রদায় ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন ঐ অঞ্চলের গভর্নর হযরত আলী (রাঃ) বিদ্রোহীদের পাকড়াও করে মদীনায় পাঠিয়ে দেন। ঐ বন্দীদের মধ্যে আরবের বিখ্যাত বদান্য ব্যক্তি হাতিম ত্বাই-এর মেয়েও ছিল। সে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে নিবেদন করে ঃ আমি হলাম আমার সম্প্রদায়ের সরদারের মেয়ে। আমার বাবা হাতিম ত্বাই-এর জনসেবা ও দান-দক্ষিণার কথা সর্বজনবিদিত। তিনি আজ নেই। আমার ভাইও মুসলমানদের কাছে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গেছে। এমতাবস্থায় আপনি আমার উপর দয়া করুন। নবী করীম (সাঃ) তখন তাকে বলেন, তোমার বাবার মধ্যে একজন মুমিনেরই গুণাবলী বিদ্যমান ছিল।

যাহোক, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে তার সঙ্গী-সাথীসহ মুক্ত করে দেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় পাথেয় এবং পোশাক-পরিচ্ছদেরও ব্যবস্থা করে দেন।

হুজুর (স)-এর জীবনে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে, যা তার দয়া, করুণা ও মহানুভবতার এক একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। এ সমস্ত ঘটনা একথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, 'আমি তোমাকে বিশ্বজগতের রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছি' এবং

www.amarboi.org

'তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত'—কুরআনের এই সমস্ত আয়াত অত্যন্ত সফল ও কার্যকরভাবে তার জীবনে বাস্তবায়িত হয়েছিল। শুধু এ আয়াতগুলোই বা কেন, গোটা কুরআনই তো চিত্রিত ও বাস্তবায়িত হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মহান জীবনে। যেমন হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'কানা খুলকুহুল কুরআন'—কুরআনই ছিল তাঁর চরিত্র।'এক কথায় বলতে গেলে, হুযুর (সাঃ)-এর জীবন ছিল কুরআনেরই বাস্তব নমুনা।

৮. রাসূল (সাঃ)-এর হিজরত

যখন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) মক্কায় ইসলামের দাওয়াত দেন তখন স্বাভাবিকভাবেই সেখানে দু'টি দলের উদ্ভব হয়। একদল ছিল ঐ সমস্ত লোকের, যারা এ দাওয়াত কবুল করেছিল। অপর দল ছিল সমগ্র কুরাইশ বংশ এবং তাদের সরদারদের, যারা এ দাওয়াতের বিরোধী ছিল। এবার লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, তাদের মধ্যে এ বিরোধিতার ভিত্তি কি ছিল ? দাওয়াতগ্রহণকারীরা বলত, আমরা যেটাকে সত্য মনে করি সেটা গ্রহণ করার অধিকার আমাদের রয়েছে। আর বিরোধীরা বলতো, না, তোমাদের অনুরূপ অধিকার নেই। অন্য কথায়, বিরোধীরা মানুষের বিশ্বাসের স্বাধীনতা স্বীকার করতো না। তারা তরবারির জোরে অপর পক্ষকে তাদের আকীদা-বিশ্বাস থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতো।

ইসলামের নবী তের বছর পর্যন্ত সব ধরনের জুলুম-অত্যাচার সহ্য করেন। শেষ পর্যন্ত যখন মক্কায় টিকে থাকা তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তখন তিনি মদীনায় হিজরত করেন। কিন্তু কুরাইশরা সেখানেও তাকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। তারা তার উপর একের পর এক হামলা শুরু করে। পবিত্র কুরআনে হিজরত প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۝ (الانفال : ٣٠)

"স্মরণ করো, কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার, হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন (তাদের সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেন); আর আল্লাহই ষড়যন্ত্রকারীদের (কৌশলীদের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"–(আনফাল ঃ ৩০)

www.amarboi.org

অর্থাৎ কাফিররা ষড়যন্ত্র করার ব্যাপারে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কৌশলই জয়যুক্ত হল এবং কাফিরদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর হিফাযতে ইয়াসরিবে পৌছে গেলেন।

যখন মক্কায় ইসলামের শত্রুরা এ সিদ্ধান্ত নিলো যে, সমগ্র গোত্রের লোক সমবেতভাবে একই সময়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর হামলা করবে ঠিক তখনই আল্লাহ তাআলা তাকে হিজরতের নির্দেশ দেন। তিনি প্রথমে হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে সংগে নিয়ে 'ছাওর' গুহায় আত্মগোপন করেন। সেখানে তিনি তিন রাত অতিবাহিত করে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। যেসব শত্রু তার সন্ধানে ছিল তারা ছাওর গুহায় গিয়েও পৌছেছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার নবীকে রক্ষার জন্য এমন কৌশল অবলম্বন করেন যে, তারা তাকে সেখানে ভালভাবে খুঁজে দেখার চেষ্টা না করেই ফিরে যায়। পবিত্র কুরআনের সূরা তাওবায় এর প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে ঃ

اِلاَّ تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَتَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ۚ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى ؕ وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ۝ (التوبة : ٤٠)

"যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর তবে স্মরণ করো, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাকে বহিষ্কার করেছিল এবং সে ছিল দু'জনের একজন, যখন তারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল ; সে তখন তার সংগীকে বলেছিল, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সংগে আছেন। অতপর আল্লাহ তার উপর তার প্রশান্তি বর্ষণ করেন। এবং তাকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দিয়ে যা তোমরা দেখনি, এবং তিনি কাফিরদের কথা হেয় করেন, আল্লাহর কথাই সর্বোপরি এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"–(সূরা আত্ তাওবা ঃ ৪০)

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), যিনি ছিলেন নুবুওয়াত-প্রদীপের উৎসর্গীকৃত-প্রাণ পতঙ্গ, ছাওর গুহায় ঐ তিন রাত কি অবস্থায় কাটিয়েছিলেন সে সম্পর্কে একটা ধারণা করা শুধু তার পক্ষেই সম্ভব, যে কখনো প্রেমের কিছুমাত্র স্বাদ উপভোগ করেছে।

www.amarboi.org

আল্লাহর রাসূল গুহার মধ্যে আত্মগোপন করে আছেন। শত্রুরা তার সন্ধানে ব্যাপৃত রয়েছে। প্রতিটি মুহূর্তে এ ভয় রয়েছে, কখন না শত্রুরা আবার তার সন্ধান পেয়ে যায়। একবার তো তাদের আওয়াজ শুনাই যাচ্ছিলো। এমতাবস্থায় তার অন্তরে কি পরিমাণ ভয়ভীতি বিরাজ করবে তা তো জানা কথা। তবে নিসন্দেহে তার এ বিশ্বাসও ছিল যে, আল্লাহ তার রাসূল (সাঃ)-কে অবশ্যই সাহায্য করবেন। কিন্তু প্রেম-ভালোবাসার প্রকৃতিগত চাহিদা এই ছিল যে, প্রেমিক তার প্রিয়জনকে বিপদের মধ্যে দেখে অবশ্যই ভীতিগ্রস্ত হত। এ থেকে সে কখনো আপন অন্তরকে রুখে রাখতে পারত না। আর পারলেও প্রেমের আদালতের ফয়সালা তার বিরুদ্ধে চলে যেত।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মানসিক স্বস্তির অবস্থা ছিল অন্যরূপ। যখন তার গুহার সাথী (আবূ বকর) প্রেমোচ্ছ্বাসের দরুন ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়তেন তখন তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, 'বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।' খোদ হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেছেন, যখন শত্রু গুহার সন্নিকটে এসে পৌঁছল তখন আমি ভীতিগ্রস্ত হয়ে বললাম, যদি এদের কেউ তার পা একটু উঁচু করে দাঁড়ায় তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বলেন, আবু বকর, তুমি এ দু'জন মানুষ সম্পর্কে কী ধারণা করছ যাদের সাথে তৃতীয় আর একজন রয়েছেন এবং তিনি হচ্ছেন খোদ আল্লাহ তাআলা (বুখারী ও মুসলিম ঃ আনাস থেকে বর্ণিত)।

উপরের আয়াতে উল্লেখিত 'আল্লাহ তাআলা তার উপর প্রশান্তি বর্ষণ করেন'-এর অর্থ আবূ বকর (রাঃ)-এর উপর শান্তি ও স্বস্তি বর্ষণ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর শান্তি বর্ষণের কোনো প্রয়োজন ছিল না। কেননা তিনি তো আল্লাহর ফযলে প্রথম থেকেই শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে ছিলেন।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ

وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۝ (الانفال : ٢٩)

"হে মুমিনগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের শক্তি দেবেন। তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময়।"-(সূরা আল আনফাল ঃ ২৯)

www.amarboi.org

এ থেকে জানা গেল যে, যে জনগোষ্ঠী আল্লাহকে ভয় করবে তাদের অন্তরে ন্যায়-অন্যায়ের ও ভাল-খারাপের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের একটি বিশেষ ক্ষমতা বিরাজ করবে। এ প্রেক্ষিতে নিশ্চয় বিশ্ববাসী লক্ষ্য করেছে প্রথম যুগের মুসলমানদের অবস্থা কি ছিল। আরবের বেদুইন, যাদের সমগ্র জীবন উট চরানোর মধ্যে কেটে যেত, সেই তারাই হঠাৎ একদিন ইরানী ও রোমকদের মত সভ্য জাতিসমূহের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসল। সেই সাথে ভাল-খারাপের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির এমন একটি ক্ষমতাও তাদের করায়ত্বে এসে গেল যে, তারা যা কিছু করতো এবং যেভাবে করত তা ন্যায়, সত্য, মঙ্গল ও পুণ্য ছাড়া কিছু হতো না।

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ ط وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ط وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ○(الانفال : ٣٠)

"স্মরণ করো, কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তোমাকে বন্দী করার জন্য, হত্যা করার অথবা নির্বাসিত করার জন্য এবং তারা ষড়যন্ত্র করে এবং আল্লাহও ষড়যন্ত্র করেন (তাদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করেন)। আর আল্লাহই ষড়যন্ত্রকারীদের (কৌশলীদের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ।"-(সূরা আনফাল ঃ ৩০)

এ আয়াত নিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায়, মানুষ তার মূর্খতা ও অন্যমনস্কতার কারণে কি চিন্তা করে, আর হিকমতে ইলাহীর গোপন কৌশলসমূহের সিদ্ধান্ত কি হয়ে থাকে। হিজরতের পূর্বে মক্কার কুরাইশরা যখন এ পরিকল্পনা নিয়েছিল তখন তারা কি ক্ষণিকের জন্যও ঐ সমস্ত আসন্ন পরিণামের কথা চিন্তা করতে পেরেছিল ? মূলতঃ তাদেরই জুলুম-অত্যাচার এবং বাড়াবাড়ি এ সমস্ত পরিণামের পটভূমি তৈরী করে দিয়েছিল।

যদি জুলুম-অত্যাচার না হতো তাহলে হিজরতও হত না। আর যদি হিজরত না হত তাহলে ঐ সমস্ত পরিণামও প্রকাশিত হতো না। এটাই হচ্ছে আল্লাহর বিধানের গোপন কৌশল যে, মানুষ যখন সত্যের অনুসারীদের উপর জুলুম-অত্যাচার করে তখন তাদের যাবতীয় ষড়যন্ত্র ও কলাকৌশল বানচাল করে দেয়া হয়।

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ط وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

www.amarboi.org

"আল্লাহ্ এমন নন যে, তুমি [মুহাম্মদ] তাদের মধ্যে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন, এবং আল্লাহ্ এমন নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন।"–(সূরা আনফাল ঃ ৩৩)

মক্কায় কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে হিজরত করতে বাধ্য করে এবং তাদের বাড়াবাড়ি এই পর্যায়ে গিয়ে পৌছে যে, তারা আল্লাহর বান্দাদেরকে তাদের উপাসনালয় থেকে জবরদস্তিমূলকভাবে রুখে রাখে। এমতাবস্থায় তো এমন কোনো কারণ থাকতে পারে না যে, তাদের ঐ দুষ্কর্মের পরিণতি প্রকাশিত হতে বিলম্ব ঘটবে। শেষ পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয়ও। যার ফলে মক্কার কুরাইশদের গোষ্ঠীগত সৌভাগ্য-সূর্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়ে যায়।

৯. অন্যের দৃষ্টিতে মুহাম্মদ (সাঃ)

সমকালীন বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিতে

॥ ১ ॥

হুদাইবিয়ার সন্ধির কিছুদিন পরের কথা। ইসলামের আমন্ত্রণ জানিয়ে যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 'কায়সার-ই-রোম' (রোমান সম্রাট)-এর কাছে একটি পত্র লিখেন তখন কায়সার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাল-হাকীকত বিস্তারিতভাবে জানার জন্য তার সভাসদদের বলেন, যদি কোনো আরবকে পাওয়া যায় তাহলে আমার দরবারে তাকে নিয়ে এসো। ঘটনাচক্রে ঐ সময়ে তৎকালীন মক্কার কাফিরদের সরদার আবূ সুফইয়ান মক্কার একদল আরব বণিকসহ সেখানে অবস্থান করছিলেন। অতএব দূতেরা তাদেরকেই কায়সারের কাছে নিয়ে যায়।

কায়সার ঐ উপলক্ষে একটি বিশেষ দরবারের আয়োজন করেন। তার সিংহাসনের চতুর্দিকে নেতৃস্থানীয় পাদ্রী-পুরোহিতরা আসন গ্রহণ করেন। এবার কায়সার আরবদেরকে সম্বোধন করে বলেন, মক্কায় যে ব্যক্তি নুবুওয়াতের দাবী করেছেন তোমাদের মধ্যে তার নিকটাত্মীয় কেউ আছে কি ? আবূ সুফইয়ান নিবেদন করেন, আমিই তার নিকটতম আত্মীয়। কায়সার তখন অন্যান্য আরব বণিকদেরকে বলেন, আমি একে কয়েকটি প্রশ্ন করব। যদি সে ভুল উত্তর দেয় তাহলে তোমরা আমাকে তৎক্ষণাৎ বলে দেবে। কায়সার ও আবূ সুফইয়ানের মধ্যে সেদিন যে কথাবার্তা হয়েছিল তা নিম্নরূপ ঃ

কায়সার ঃ নুবুওয়াতের দাবীকারী ব্যক্তির বংশ কিরূপ ?

আবূ সুফইয়ান ঃ সম্ভ্রান্ত।

www.amarboi.org

কায়সার ঃ তার বংশে ইতিপূর্বে কেউ নুবুওয়াতের দাবী করেছিল কি ?

আবূ সুফইয়ান ঃ না।

কায়সার ঃ তার বংশে কেউ বাদশাহী করেছে কি ?

আবূ সুফইয়ান ঃ না।

কায়সার ঃ তার অনুসারীদের মধ্যে দরিদ্র লোকের সংখ্যা বেশী, না প্রতিপত্তিশালী লোকের ?

আবূ সুফইয়ান ঃ দরিদ্র লোকের।

কায়সার ঃ তার অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, না হ্রাস পাচ্ছে ?

আবূ সুফইয়ান ঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কায়সার ঃ তোমরা কোনো ব্যাপারে তাকে মিথ্যাবাদী পেয়েছ কি ?

আবূ সুফইয়ান ঃ না।

কায়সার ঃ তিনি কি কখনো তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন ?

আবূ সুফিয়ান ঃ এখানো করেননি। তবে সম্প্রতি তার সাথে আমাদের একটি চুক্তি (হুদাইবিয়ার সন্ধি) হয়েছে। দেখা যাক তিনি এ ব্যাপারে কি করেন।

কায়সার ঃ তোমরা কি কখনো তার সাথে যুদ্ধ করেছ ?

আবূ সুফইয়ান ঃ হ্যাঁ।

কায়সার ঃ ফলাফল কি হয়েছে ?

আবূ সুফইয়ান ঃ কখনো আমাদের জয় হয়েছে, আবার কখনো তার।

কায়সার ঃ তিনি কী শিক্ষা দেন ?

আবূ সুফইয়ান ঃ তিনি বলেন, এক আল্লাহর ইবাদত কর, তার সাথে কাউকে শরীক করো না, নামায পড়, সত্য কথা বল, পবিত্রচিত্ত থাক, আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ ইত্যাদি।

এ কথাবার্তার পর দোভাষীর মাধ্যমে কায়সার, আবূ সুফইয়ানকে বলেন ঃ তুমি বলেছ যে, 'তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান'। আর নবীরা সবসময় সম্ভ্রান্ত পরিবারেরই সন্তান হয়ে থাকেন। তুমি বলেছ যে, 'তার বংশে কেউ কোনোদিন নুবুওয়াতের দাবী করেনি।' যদি এরূপ কেউ করতো তাহলে ধরে নিতাম যে, বংশগত প্রভাবেই তিনি এরূপ করছেন। তুমি স্বীকার করেছ যে, 'তার বংশে কেউ বাদশাহী করেনি।' যদি এরূপ কেউ করতো তাহলে ধরে নিতাম যে, তার মধ্যেও বাদশাহী করার উচ্চাশা জেগেছে। তুমি অকুণ্ঠে স্বীকার করেছ যে, 'তিনি কখনো মিথ্যা বলেননি।' অতএব যে ব্যক্তি কখনো মানুষের সাথে মিথ্যা

www.amarboi.org

বলেনি সে কি আল্লাহ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা বলতে পারে ? তুমি বলেছ যে, 'গরীবরাই তার অনুসরণ করেছে।' আর একথা সত্যি যে, নবীদের প্রাথমিক অনুসারীরা সবসময় গরীবই হয়ে থাকে। তুমি স্বীকার করেছ যে, 'তাঁর প্রচারিত ধর্ম দিন দিন উন্নতি করছে।' আর সত্যি কথা এই যে, সত্য ধর্ম এভাবেই উন্নতি করে থাকে। তুমি স্বীকার করেছ যে, 'তিনি কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেননি।' আর প্রকৃত ব্যাপার এই যে, একজন নবী কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। তুমি বলেছ যে, 'তিনি আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী ও পবিত্র-চিত্ততার পথ প্রদর্শন করেন।' যদি এটা সত্যি হয় তাহলে আমি দৃঢ়তার সাথে বলছি যে, আমার এ পদদ্বয়ের নীচ পর্যন্ত একদিন তার শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। আমার ধারণা ছিল যে, শীঘ্রই একজন নবী আসবেন, তবে আমার কল্পনায় কখনো আসেনি যে, তিনি আরবে জন্মগ্রহণ করবেন। যদি তার ওখানে আমি যেতে পারতাম তাহলে আমি নিজ হাতে তার পবিত্র পদযুগল ধুইয়ে দিতাম।

॥ ২ ॥

বিখ্যাত আরব কবি উতবা বিন রাবীআ মক্কা সফরে এলে সেখানকার কাফিররা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিরুদ্ধে তাকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করে। তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একজন কবি আখ্যা দেয় এবং তার কাছে যে সমস্ত ওহী আসে তা নিয়েও ঠাট্টা-মশকারা করে। উতবা তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে তার উপর নাযিলকৃত কিছু ওহী শ্রবণ করার পর কাফিরদের কাছে গিয়ে বলেন ঃ মুহাম্মদ (সাঃ) আমাকে যে সমস্ত বাণী শুনিয়েছেন তা নিছক কাব্য নয়, বরং অন্য কিছু। তোমাদের প্রতি আমার পরামর্শ এই যে, তোমরা তাকে আর বিরক্ত করো না, বরং আপন অবস্থার উপরই তাকে ছেড়ে দাও।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমসাময়িক অনেক শত্রু ও বিরুদ্ধবাদী তাঁর সম্পর্কে এমনি ধরনের আরো অনেক মন্তব্য করেছিল, যা শুধু ওদের নিজেদেরকে নয় বরং অন্যান্য লোকদেরকেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খাঁটি অনুসারী ও ভক্ত-অনুরক্তে পরিণত করতে সাহায্য করেছিল।

আপনজনের দৃষ্টিতে

❑ হযরত জাফর সাদিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সকল মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

❑ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চেয়ে সুন্দর চরিত্রের অধিকারী (দুনিয়ায়) আর কোনো লোক ছিল না। তাঁর সাহাবা ও পরিবারবর্গের মধ্যে থেকে কেউ যখন তাকে আহ্বান করতেন

www.amarboi.org

তখন তিনি তার জবাবে বলতেন, 'লাব্বায়িক'–'আমি হাযির'। এ কারণেই মহান আল্লাহ্ তাঁর সম্পর্কে বলেছেন, "নিসন্দেহে আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।"

❒ হযরত যায়িদ বিন সাবিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নবী (সাঃ)-এর নিকট বসতাম, তখন যদি আমরা আখিরাতের আলোচনা শুরু করতাম, তিনিও আমাদের সাথে সে আলোচনায় যোগ দিতেন। আর আমরা যদি দুনিয়ার আলোচনা শুরু করতাম, তিনি তাতেও আমাদের সাথে অংশ গ্রহণ করতেন। আর আমরা যদি পানাহারের আলোচনা করতাম, তিনি তাতেও অংশ নিতেন।

❒ খারিজা বলেন, আমরা যায়িদ বিন সাবিত (রাঃ)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করুন। তিনি বললেন, আমি তাঁর কোন্ কোন্ চরিত্র সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করবো। আমি তো তাঁর প্রতিবেশী ছিলাম। তাঁর উপর যখনই ওহী নাযিল হতো, আমাকে ডেকে পাঠাতেন। আমি তা লিখে নিতাম। আর আমরা যখন দুনিয়া সম্পর্কে আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সাথে সে আলোচনায় অংশ নিতেন।

❒ সিমাক বলেন, আমি জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ)-কে বললাম, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহচর্যে বসতেন ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, (আমি তাঁর সাহচর্যে বসে দেখেছি,) তিনি অধিকতর নীরব থাকতেন। সাহাবা (রাঃ) তাঁর সামনে কবিতা আবৃত্তি করতেন, জাহিলী যুগের প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন এবং হাসতেন। তারা যখন হাসতেন, তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-ও মুচকি হাসতেন।

❒ হযরত মুগীরা ইবনে শুবা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রসূন খেয়ে মসজিদে গেলাম। এক রাকআত (নামায) আমার ছুটে গিয়েছিল। আমি মসজিদে প্রবেশ করতেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) রসূনের গন্ধ টের পেয়ে গেলেন। নামায শেষ করে তিনি বললেন, এ গাছ থেকে কেউ ভক্ষণ করলে তার গন্ধ দূর না হওয়া পর্যন্ত সে যেন আমাদের কাছে না আসে। (বর্ণনাকারী বলেন) আমি নামায শেষ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আল্লাহর কসম, আপনি আপনার হাত মুবারক একটু আমাকে দিন। তিনি তার হাতখানা আমাকে দিলেন। তখন তার হাতখানা আমার জামার হাতার মধ্য দিয়ে আমার বক্ষের উপর রাখলাম। তখন নবী (সাঃ) লক্ষ্য করলেন যে, আমার বুকের উপর একটি পট্টি বাঁধা রয়েছে। তখন তিনি বললেন ঃ আরে তোমার তো ওযর রয়েছে।

www.amarboi.org

☐ হযরত জারীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সাঃ)-এর গৃহে প্রবেশ করলেন। গৃহটি তখন লোকে পরিপূর্ণ ছিল। তাই জারীর (রা) [বসার স্থান না পেয়ে] গৃহের বাইরে বসে পড়লেন। নবী (সাঃ) যখন তাঁকে (বাইরে বসতে) দেখলেন, তখন তিনি তাঁর একটি কাপড় ভাঁজ করে জারীর (রাঃ)-এর দিকে ছুড়ে দিলেন এবং বললেন, এ কাপড়টির উপর বসো। জারীর (রাঃ) ঐ কাপড়টি তুলে তাঁর চেহারায় লাগালেন এবং চুমু খেলেন।

[অর্থাৎ নবী (সাঃ)-এর ন্যায় উন্নত মানসিকতার অধিকারীর পক্ষে এটা সম্ভব ছিল না যে, তিনি তাঁর গৃহের মধ্যে ফরাশে উপবিষ্ট থাকবেন এবং তাঁর সাথী জারীর (রাঃ) বাইরে মাটিতে বসবেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে নিজের কাপড় ছুঁড়ে দিলেন যাতে সেটি বিছিয়ে তিনি তাঁর উপরে বসতে পারেন। কিন্তু জারীর (রাঃ) এটা কিভাবে পছন্দ করতে পারেন যে, নবী (সাঃ)-এর পবিত্র কাপড় মাটিতে বিছিয়ে তার উপর তিনি বসবেন। তাই তিনি ঐ পবিত্র কাপড়টি তুলে অত্যন্ত ভক্তি সহকারে নিজের চোখে লাগালেন এবং তাতে চুমু খেলেন।]

☐ জুবাইর ইবনে নুফায়র (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গেলাম এবং তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, তাঁর চরিত্র ছিল 'আল কুরআন'। অর্থাৎ নবী (সাঃ)-এর চরিত্র ছিল সম্পূর্ণরূপে পবিত্র কুরআনের বাস্তব ব্যাখ্যা। পবিত্র কুরআনে যতগুলো চারিত্রিক দিক-নির্দেশনা রয়েছে নবী (সাঃ)-এর জীবন ছিল তার পূর্ণাঙ্গ বাস্তব নমুনা।

☐ ইমাম হাসান বাসরী (রহঃ) কুরআন কারীমের আয়াত ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ج (ال عمران : ١٥٩)

"হে মুহাম্মদ! আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছিলেন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

–এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ ছিল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চরিত্র, যা আল্লাহ তাআলা বর্ণনা করেছেন।

☐ আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর পরিজনের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, তিনি তাঁর পরিজনের সাথে বিভিন্ন গৃহস্থালীর কাজে অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু যখন নামাযের সময় হতো তখন তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন এবং নামায আদায় করতেন।

www.amarboi.org

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্রতম জীবনের বাস্তব নমুনা। একদিকে তিনি আপন উম্মতের ভাবনায় নিমগ্ন থাকতেন এবং অন্যদিকে গার্হস্থ্য কাজকর্মে আপন পরিজনকে সাহায্য করতেন।

❑ হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া (রাঃ) জনৈক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিভাবে তাঁর গৃহে সময় কাটাতেন ? তিনি বললেন, তিনিও তোমাদের মতো গৃহস্থালী কাজকর্মে নিয়োজিত থাকতেন। তিনি নিজের কাপড় এবং জুতা নিজেই সেলাই করতেন।

❑ উরওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী (সাঃ) একান্তে কি কি কাজ করতেন ? তিনি বললেন, তিনি তাঁর কাপড় সেলাই করতেন, জুতা মেরামত করতেন এবং একজন মানুষ তার ঘরে বসে যেসব কাজ করে থাকে, তিনিও তার সবই করতেন।

❑ যুহরী (রহঃ) বলেন, হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর গৃহের মধ্যে কি ধরনের আচরণ করতেন ? তিনি বললেন, তোমরা যেরূপ কোনো একটি বস্তু উপরে তুলে রাখো কিংবা নিচে নামিয়ে রাখো তিনিও তদ্রূপ করতেন। তবে সেলাইয়ের কাজ ছিল তাঁর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয়।

❑ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ)-এর গৃহে কাপড়ের পুতুল নিয়ে খেলা করতাম। আমার কিছু সখীও ছিল। তারা আমার কাছে এসে আমার সাথে খেলা করতো। তারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আসতে দেখলে গৃহের এদিক সেদিক লুকিয়ে থাকতো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদেরকে এদিক সেদিক থেকে একত্রিত করে পুনরায় আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। তারা এসে পুনরায় আমার সাথে খেলা শুরু করতো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুসামাজিকতার দর্পণ স্বরূপ। আপন পরিবার-পরিজনের মন রক্ষা ও সন্তোষ বিধানের প্রতিও তিনি যে যত্নবান ছিলেন এ হাদীস থেকে তা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে।

❑ হযরত হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে [হযরত আলী (রাঃ)-কে] নবী (সাঃ)-এর গৃহ মধ্যকার কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, ব্যক্তিগতভাবে তাঁর এ অভ্যাস ছিল যে, যখনই ইচ্ছা করতেন তখনই তিনি গৃহে প্রবেশ করতেন। [অর্থাৎ নবী (সাঃ)-এর বাইরে থাকার ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা

www.amarboi.org

ছিল না, বরং আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে এ অনুমতি ছিল যে, তিনি যখন ইচ্ছা, আপন গৃহে গমন করতে পারতেন।] আর যখনই তিনি গৃহে গমন করতেন তখন আপন সময়কে তিন ভাগে ভাগ করে নিতেন। এক ভাগ আল্লাহর ইবাদাতের জন্য, এক ভাগ নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য এবং অপর ভাগ নিজের আরামের জন্য। তিনি আবার নিজ আরামের জন্য নির্দিষ্ট সময়টুকুও লোকজনকে দিয়ে দিতেন। আর তা এভাবে যে, তিনি বিশিষ্ট লোকদের মাধ্যমে উপকারী কথাবার্তা সাধারণ লোকদের মধ্যে পৌঁছিয়ে দিতেন। অর্থাৎ ঐ সময় বিশেষ বিশেষ সাহাবা কিরাম তাঁর গৃহে প্রবেশ করতেন এবং তাঁর কাছ থেকে দ্বীনী মাসায়েল ও মর্মকথা শ্রবণ করে সাধারণ লোকদের কাছে তা পৌঁছে দিতেন। তিনি তাদের কাছে কোনো কথা গোপন রাখতেন না। অর্থাৎ দ্বীন ও দুনিয়ার লাভজনক সব কথাই তিনি তাদের কাছে বলতেন। তার অভ্যাস ছিল যে, উম্মতের জন্য নির্ধারিত সময়ে আপন ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি জ্ঞানীদেরকে প্রাধান্য দিতেন এবং সময়ের ঐ বণ্টনে দ্বীনী মর্যাদা হিসাবে তারতম্য ঘটতো। তাদের মধ্যে কারো থাকতো একটি কাজ, কারো দুটি কাজ এবং কারো কয়েকটি কাজ। তিনি তাদের ঐ কাজে নিজেও অংশগ্রহণ করতেন এবং তাদেরকেও তাতে মশগুল রাখতেন। এতে তাদের এবং সেই সাথে উম্মতেরও সংশোধনের কাজ হতো। তিনি তাদের সমস্যাবলী জানতে চাইতেন এবং তাদেরকে তাদের অবস্থা অনুযায়ী পরামর্শ দিতেন। বলতেন, যারা এখানে উপস্থিত আছে, তারা যেন তা অনুপস্থিতিদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। তিনি বলতেন, আমাকে সেই ব্যক্তির প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত করো, যে তার প্রয়োজনের কথা আমা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। কেননা, যে ব্যক্তি আমীর (প্রশাসক) পর্যন্ত ঐ ব্যক্তির প্রয়োজনের কথা পৌঁছিয়ে দিয়েছে, যে তা ঐ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে দৃঢ়পদ রাখবেন।

❒ সুফইয়ান ইবনে ওয়াকীর রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, সাহাবীরা নবী (সাঃ)-এর নিকট ইল্‌ম ও দ্বীন-অন্বেষী হয়ে যেতেন এবং এগুলোর স্বাদ না নিয়ে সেখান থেকে ফিরতেন না। আর যখন সেখান থেকে বের হতেন, তখন পথপ্রদর্শক হয়ে বের হতেন। বর্ণনাকারী পথপ্রদর্শকের ব্যাখ্যা করেছেন 'ফুকাহা' শব্দ দ্বারা (অর্থাৎ দ্বীনের অগাধ পাণ্ডিত্য নিয়ে তারা সেখান থেকে বের হতেন।)

❒ হযরত হুসাইন (রাঃ) [এখান থেকে হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর রেওয়ায়াত শুরু হচ্ছে। প্রকাশ থাকে যে, এ হাদীসের প্রথম অংশটি হযরত হাসান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। আর এ অংশটি বর্ণিত হয়েছে হযরত হুসাইন (রাঃ) থেকে] বলেন, অতপর আমি (আমার পিতাকে) বললাম, "নবী

www.amarboi.org

(সাঃ)-এর ঘরের বাইরের কাজকর্ম সম্পর্কে কিছুটা বলুন। অর্থাৎ ঘরের বাইরে তিনি কি কাজকর্ম করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অনর্থক কথাবার্তা থেকে আপন রসনাকে বাঁচিয়ে রাখতেন। তিনি মানুষকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট রাখতেন, বিচ্ছিন্ন হতে দিতেন না। তিনি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করতেন এবং তাকেই ঐ সম্প্রদায়ের নেতা ও অভিভাবক বানাতেন। তিনি মানুষের সাথে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতেন; কিন্তু কারো সাথে আপন আন্তরিকতা ও প্রফুল্লচিত্ততার ক্ষেত্রে কোনোরূপ তারতম্য করতেন না। তিনি আপন সঙ্গীদের খোঁজ-খবর নিতেন, মানুষকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। তার ভাল কথাকে ভাল বলতেন এবং তার প্রশংসা করতেন। আর মন্দ কথাকে মন্দ বলতেন এবং তার নিন্দা করতেন। প্রত্যেক কাজে তার ভারসাম্য বজায় থাকতো। তিনি এদিকে-ওদিকে ঝুঁকে পড়তেন না। তিনি মানুষের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখতেন যাতে তারা অমনোযোগী হয়ে না পড়ে কিংবা অতিষ্ঠ হয়ে না ওঠে। তার কাছে প্রত্যেক অবস্থারই উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতো। তিনি সত্য গ্রহণে ত্রুটি করতেন না এবং সত্য ত্যাগ করে অন্য দিকে ফিরে যেতেন না। তাঁর সঙ্গী-সাথীরা ছিলেন উত্তম লোক। তাঁর কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন তিনি, যিনি সবার মঙ্গল কামনা করতেন এবং তাঁর কাছে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাশীল ছিলেন তিনি, যিনি মানুষের সমব্যথী ছিলেন এবং সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে ছিলেন সবচেয়ে উত্তম।

[হযরত হুসাইন (রাঃ) বলেন,] অতপর আমি (আমার পিতাকে) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মজলিস ও উঠাবসার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উঠতে বসতে আল্লাহর যিক্‌র করতেন। তিনি কোনো স্থানকে নিজের বসার জন্য নির্ধারিত করতেন না এবং অন্য লোককেও এরূপ করতে নিষেধ করতেন। [প্রকাশ থাকে যে, এ অবস্থা ছিল প্রথম দিককার। পরবর্তী সময়ে যখন প্রতিনিধি দলের আগমন শুরু হয় এবং বহিরাগতদের পক্ষে তাঁকে চিনতে অসুবিধা দেখা দেয় তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁর জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থানের ব্যবস্থা করতে সাহাবা কিরামকে অনুমতি দেন।] তিনি যখন মানুষের সাথে বসতেন, তখন যেখানেই বসার স্থান পেতেন বসে পড়তেন এবং মানুষকেও এরূপ করতে নির্দেশ দিতেন। তিনি তাঁর মজলিসের প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করতেন। ফলে কেউ একথা মনে করতো না যে, সে ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি তাঁর (রাসূলুল্লাহর) কাছে বেশী প্রিয়। যে ব্যক্তি (কোনো প্রয়োজনে) তাঁর নিকট এসে বসতো কিংবা উঠে যেতো তিনি তার সাথে নিজেকে সেই সময় পর্যন্ত আটকে রাখতেন—যে পর্যন্ত না সে নিজেই চলে যেত। কেউ যদি তাঁর কাছে

www.amarboi.org

কোনো কিছু চাইতে আসতো, সে তার বাসনা পূরণ করে কিংবা সান্ত্বনা নিয়ে ফিরে যেতো। তাঁর ব্যবহার সব লোকের জন্য ছিল সমান। (স্নেহ-মমতার ক্ষেত্রে) তিনি ছিলেন তার অনুসারীদের কাছে পিতৃতুল্য। লোকেরা (অধিকারের ক্ষেত্রে) তাঁর নিকট ছিল সমান। তাঁর মজলিস ছিল ধৈর্যশীলতা, লজ্জাশীলতা, সততা ও আমানতের মজলিস। সেখানে উচ্চস্বরে কথাবার্তা বলা হতো না, কারো ইয্যত-আব্রুর উপর কলংক লেপন করা হতো না এবং কারো দোষত্রুটি সমালোচিত হতো না। তার সভার সদস্যদের মধ্যে সংযত ভাব বিদ্যমান ছিল। তারা তাকওয়া বজায় রাখতেন, পরস্পরের সাথে ভদ্র ও নম্র আচরণ করতেন, বড়দের শ্রদ্ধা করতেন, ছোটদের স্নেহ করতেন, অভাবগ্রস্তদের প্রাধান্য দিতেন এবং অপরিচিত আগন্তুকদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন।

হযরত হুসাইন (রাঃ) বলেন, অতপর আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার সভাসদদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের সাথে আনন্দচিত্তে মিলিত হতেন। তিনি নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। কঠোর ও দুর্বিনীত ছিলেন না। তিনি হাট-বাজারে হৈহুল্লোড় করতেন না। অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করতেন না। কাউকে দোষারোপ করতেন না। কারো অহেতুক প্রশংসাও করতেন না। অপছন্দনীয় জিনিস থেকে তিনি দূরে থাকতেন এবং সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতেন না। তিনটি বিষয় থেকে তিনি নিজেকে দূরে রাখতেন। এক ঃ ঝগড়া-বিবাদ থেকে। দুই ঃ বেশী কথা বলা থেকে, তিন ঃ অর্থহীন কাজ থেকে। তিনটি বিষয় থেকে তিনি অন্য মানুষকে রক্ষা করতেন। এক ঃ কারো কুৎসা রচনা করতেন না। দুই ঃ কাউকে লজ্জা দিতেন না। তিন ঃ কারো দোষ অন্বেষণ করতেন না। যে কথা বললে সাওয়াবের আশা করা যেতো তিনি তাই বলতেন। তিনি যখন কথা বলতেন তখন সভাসদগণ তাদের গর্দান এমনভাবে ঝুঁকিয়ে রাখতেন যেনো তাদের মাথার উপর পাখী বসে আছে। তিনি যখন কথা বন্ধ করতেন তখন অন্যরা কথা বলতেন। তার সামনে কেউ কারো কথার প্রতিবাদ করতেন না। যখন কেউ কোনো কথা শুরু করতেন, তখন অন্যরা তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকতেন। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের কথাই তাঁর নিকট ততটুকু গুরুত্বের অধিকারী হতো, যতটুকু গুরুত্ব পেতো প্রথম ব্যক্তির কথা। সবাই যে কথা শুনে হাসতো, তিনিও তাতে হাসতেন। সবাই যাতে আশ্চর্য হতো, তিনিও তাতে আশ্চর্য হতেন। আগন্তুকের অসংলগ্ন কথাবার্তা ও প্রশ্নাবলী তিনি ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করতেন। তার সাহাবীগণ এরূপ লোকদেরকে তার নিকট নিয়ে আসতেন (যাতে তাদের প্রশ্নাবলী থেকে নতুন বিষয় জানা যায়)। তিনি বলতেন, তোমরা যখন কোনো অভাবগ্রস্তকে, তার অভাব দূর করার ব্যাপারে

www.amarboi.org

প্রার্থনা করতে দেখো, তখন তাকে সাহায্য করো। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক, তিনি তা পছন্দ করতেন না। তবে কেউ কৃতজ্ঞতাবশত কিছু বললে সেটা ছিল স্বতন্ত্র। তিনি কারো কথার প্রতিবাদ করতেন না। অবশ্য সে যদি সীমা অতিক্রম করে যেত তবে তার কথার প্রতিবাদ করতেন। হয় তাকে তা থেকে নিষেধ করতেন নতুবা সেখানে থেকে উঠে দাঁড়াতেন।

হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, অতপর আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চুপ থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চুপ থাকা ছিল চারটি কারণে। এক ঃ সহনশীলতার কারণে। দুই ঃ সাবধানতার দরুন। তিন ঃ আন্দাজ করার উদ্দেশ্যে। চার ঃ চিন্তা-ভাবনা করার জন্য। তাঁর আন্দাজ করার অর্থ, অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ চিন্তা-ভাবনা করা এবং মানুষের আলাপ-আলোচনা শ্রবণ করা। তিনি চিন্তা-ভাবনা করতেন সেসব বিষয়ে যা অবশিষ্ট থাকে এবং বিলীন হয় না। সহনশীলতাকে তার ধৈর্যের মধ্যেই একত্রিত করা হয়েছিল। কোনো বিষয় তাঁকে ক্রুদ্ধ করতে পারতো না এবং অস্থির করেও তুলতে পারত না। আর সাবধানতা তাঁর জন্য চারটি জিনিসের মধ্যে একত্রিত করা হয়েছিল। (আর তা হচ্ছে) তিনি উত্তম বস্তুটি গ্রহণ করতেন, যাতে মানুষও সেটা গ্রহণ করে এবং তিনি মন্দ বস্তু পরিত্যাগ করতেন, যাতে মানুষও সেটা থেকে বিরত থাকে। আর যে জিনিসে তাঁর উম্মতের সংশোধন হতো, তিনি তার পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করতেন এবং যে জিনিসে তাদের কল্যাণ নিহিত তিনি দৃঢ়তার সাথে তা সমর্থন করতেন। এভাবে তিনি তাঁর উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণকে সমন্বিত করেছিলেন।

❑ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দশ বছর পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহচর্যে ছিলাম। আমি সব রকমের আতরের ঘ্রাণ নিয়েছি। কিন্তু তার মুখের ঘ্রাণ থেকে উত্তম কোনো ঘ্রাণ আমি কখনো শুঁকিনি। সাহাবীদের মধ্যে কারো সাথে যখন তার সাক্ষাত হতো, তখন তিনি তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং যে পর্যন্ত ঐ সাহাবী তার হাত গুটিয়ে না নিতেন, তিনি আপন হাত মুবারক তার হাত থেকে গুটিয়ে নিতেন না। আর কোনো সাহাবী যখন তার সাথে মিলিত হয়ে তার কানে কানে কোনো কথা বলতে চাইতেন, তখন তিনি তার কান তার দিকে পেতে দিতেন এবং সেই সময় পর্যন্ত আপন কান সরিয়ে আনতেন না, যে পর্যন্ত না ঐ ব্যক্তি আপন মুখ সরিয়ে নিতো।

❑ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মাতা আমাকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হলেন এবং তাকে

www.amarboi.org

বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই আপনার ছোট সেবক। তারপর আমি নয় বছর পর্যন্ত নবী (সাঃ)-এর সেবা করলাম। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তিনি কখনো আমাকে বলেননি যে, তুমি এ কাজটি ভাল করোনি, কিংবা তুমি এ কাজটি খারাপ করেছ।

❑ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাবশী লোকেরা তখন মসজিদে নববীতে যুদ্ধের কসরত দেখাচ্ছিল। আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের কসরত দেখছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে তাঁর চাঁদর দ্বারা আড়াল করে দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সেখান থেকে সরে না এসেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, তোমরা অনুমান করো, একজন অল্প বয়সী বালিকার খেলাধুলার প্রতি কতখানি কৌতুহল থাকতে পারে। [এবং তিনি (সাঃ) কত দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন।]

❑ হযরত ইয়াযীদ ইবনে বাবনূস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন ! রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র কিরূপ ছিল ? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র ছিল কুরআন। তারপর বললেন, তোমরা কি সূরা মুমিনূন পড়ো না ? আমরা বললাম, হ্যাঁ, পড়ি। তিনি বললেন, পড়ো। তখন আমি নিম্নের পাঁচটি আয়াত পড়লাম। যথা ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ○ (المؤمنون : ١-٥)

"অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ যারা বিনয়-নম্র নিজেদের নামাযে, যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে।"–(সূরা মুমিনূন ঃ ১-৫)

এবার হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র এরূপই ছিল।

❑ হযরত খারিজা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। হযরত যায়িদ ইবনে সাবিত (রাঃ)- এর নিকট কিছু লোক ইরাক থেকে আগমন করলো। তিনি কথা প্রসঙ্গে তাদেরকে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহচর্যে ছিলাম।

www.amarboi.org

আমরা যখন দুনিয়ার প্রসঙ্গে আলোচনা করতাম তিনিও আমাদের সাথে ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন। আমরা যখন আখিরাত প্রসঙ্গে আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সাথে ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা করতেন। আমরা যখন আহার সম্পর্কে আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সাথে সে বিষয়ে আলোচনা করতেন। [এ রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, নবী (সাঃ)-এর জীবনে কঠোরতা ছিল না এবং তার মজলিস ছিল সহজ-সরল। দ্বীন ও দুনিয়ার সবরকম কথাই সেখানে আলোচিত হতো।]

❒ উমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একান্তে কিভাবে কাটাতেন? তিনি বললেন, তিনি ছিলেন সবচেয়ে ভদ্র ও খুব হাসিখুশী লোক।

❒ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চেয়ে অধিক হাসিখুশী লোক আর দেখিনি।

❒ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, জনৈক স্ত্রীলোকের বুদ্ধিতে কিছুটা ক্রটি ছিল। সে বললো, ইয়া রসূলাল্লাহ ! আপনার সাথে আমার কিছু কথা আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, হে অমুকের মা, তুমি যে কোনো এক রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াও, যাতে আমিও তোমার সাথে গিয়ে দাঁড়াতে পারি। অতপর তিনি তার সাথে গিয়ে একান্তে কথাবার্তা বললেন, যে পর্যন্ত না ঐ স্ত্রীলোকটি তার প্রয়োজনীয় কথা শেষ করলো।

❒ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার ছোট্ট মেয়েদের মধ্যকার কোনো একটি মেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসতো এবং তার হাত ধরতো। তিনি মেয়েটির হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতেন না। সে যেখানে ইচ্ছা তাকে হাত ধরে নিয়ে যেতো।

❒ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কখনো এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি, যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাত নিজের হাতে নিয়েছে এবং তিনি (সাঃ) তার হাত ছেড়ে দিয়েছেন, যে পর্যন্ত না সে নিজেই নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে।

❒ হযরত আনাস (রাঃ)-এর অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, তিনি বলেন, আমি কখনো এমন কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি, যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কানে কানে কোনো কথা বলার জন্য তাঁর দিকে ঝুঁকেছে অথচ তিনি তাঁর মাথা তার দিক থেকে ঘুরিয়ে নিয়েছেন, যে পর্যন্ত না সে নিজেই নিজের মাথা সরিয়ে নিয়েছে।

www.amarboi.org

❒ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দশ বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমত করেছি। আল্লাহর কসম, তিনি আমার কাজে কখনো বিরক্তি প্রকাশ করেননি। আমার কোনো কাজে তিনি একথাও বলেননি, তুমি একাজটি কেনো করেছো ? আর কোনো কাজ না করলে তিনি একথাও বলেননি যে, তুমি একাজটি কেনো করলে না ?

❒ হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের সাথে সদ্ভাব রাখতেন এবং আমাদের এখানে আসা-যাওয়াও করতেন। আমাদের সাথে একটি বালক ছিল। তাকে আবু উমায়র নামে ডাকা হতো। (একবার) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) (হাস্য-কৌতুক করে) তাকে বললেন, হে আবু উমায়র, কোথায় গেলো তোমার নুগায়র ? (নুগায়র বুলবুল কিংবা এক প্রকার লাল পাখীকে বলা হয়। ঐ ছেলেটি তার পোষা নুগায়রের সাথে সব সময় খেলা করতো।)

❒ হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কখনো আপন হাঁটু তার সান্নিধ্যে উপবেশনকারীদের সামনে ছড়িয়ে বসেননি। আর এমন কখনো হয়নি যে, কোনো ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে বসেছে এবং সে উঠে যাওয়ার পূর্বেই তিনি উঠে দাঁড়িয়েছেন। আর এমনও কখনো হয়নি যে, কোনো ব্যক্তি তার হাত নবী (সাঃ)-এর মুবারক হাতের সাথে মিলিয়েছে অথচ তিনি (সাঃ) তার হাত ছেড়ে দিয়েছেন, যে পর্যন্ত না ঐ ব্যক্তি তার হাত নিজে থেকেই গুটিয়ে নিয়েছে।

❒ আবু মালিক আশজায়ী (রাঃ) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা নবী (সাঃ)-এর নিকট উপবেশন করতাম। আমি তার চেয়ে অধিক নির্বাক কোনো ব্যক্তিকে দেখিনি। সাহাবীগণ যখন তার নীরবতাকে অধিক উপভোগ করতেন তখন তিনি হেসে দিতেন।

❒ হযরত ইবনে আওফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহকে অধিক স্মরণ করতেন এবং কাউকে অভিশাপ দিতেন না। তিনি নামায দীর্ঘ করতেন এবং খুতবা সংক্ষেপ করতেন। তিনি গরীব ও মিসকিনদের সাথে উঠাবসা করতেন, তাদের অভাব পূরণ করতেন এবং নিজেকে তাদের চেয়ে বড় মনে করতেন না।

❒ হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) বলেন, আমি বহু বছর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমত করেছি–(এ দীর্ঘ সময়ে) তিনি আমাকে কখনো গালি দেননি, মারপিট করেননি, ধমক দেননি এবং চোখও রাঙাননি। আর এমন

www.amarboi.org

কোনো কাজের জন্য তিনি আমাকে তিরস্কার করেননি, যা তিনি আমাকে করতে আদেশ করেছেন, অথচ আমি তা করতে আলস্য করেছি। তার ঘরের কেউ যদি এ ব্যাপারে আমাকে ভর্ৎসনা করতো তবে তিনি তাকে বলতেন, আরে রাখো তো, যদি সম্ভব হত তাহলে তো সে করতোই।

আধুনিক কালের অমুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে

॥ ১ ॥

"উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব, উপায়-উপকরণের স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর সফলতা— যদি এ তিনটি বিষয়ই মানব-প্রতিভার মানদণ্ড হয়, তাহলে ইতিহাসের অন্য কোনো মহামানবকে এনে মুহাম্মদের সাথে তুলনা করবে এমন সাহস কার আছে ?---- দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্মপ্রচারক, আইন-প্রণেতা, যোদ্ধা, আদর্শ বিজেতা, মানবিক রীতিনীতির প্রবর্তনকারী এবং একটি ধর্মীয় সাম্রাজ্য ও বিশটি জাগতিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা যিনি, তিনি মুহাম্মদ (সাঃ)। আমরা নির্দ্বিধায় জিজ্ঞেস করতে পারি, মানুষের মহত্ত্বের পরিমাপ করা যেতে পারে, এমন সকল মানদণ্ডের বিচারে তার চেয়ে মহত্ত্বর আর কোনো মানুষ আছে কি?

মুহাম্মদ বিনম্র তবু নির্ভিক, শিষ্ট তবু সাহসী, ছেলেমেয়েদের মহান প্রেমিক তবু বিজ্ঞজনপরিবৃত। তিনি সবচেয়ে সম্মানিত, সবচেয়ে উন্নত, বরাবর সৎ, সর্বদাই সত্যবাদী, শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসী, এক প্রেমময় স্বামী, এক হিতৈষী পিতা, এক বাধ্য ও কৃতজ্ঞ পুত্র, বন্ধুত্বে অপরিবর্তনীয়, সহায়তায় ভ্রাতৃসুলভ, সম্পদের সমৃদ্ধিতে অথবা দারিদ্রে, শান্তিকালে বা যুদ্ধে অবিচলিত, দয়ার্দ্র, অতিথিপরায়ণ, উদার এবং নিজের জন্য সর্বদাই মিতাচারী। কঠিন তিনি মিথ্যা শপথের বিরুদ্ধে, ব্যভিচারীর বিরুদ্ধে, খুনী, কুৎসাকারী, অপব্যয়ী, অর্থলোভী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা এবং এ জাতীয় লোকদের বিরুদ্ধে। তিনি ধৈর্যে, বদান্যতায়, দয়ায়, পরোপকারিতায়, কৃতজ্ঞতায়, পিতামাতা ও গুরুজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনে এবং নিয়মিত আল্লাহর প্রার্থনা অনুষ্ঠানে এক মহান ধর্মপ্রচারক।"

–(প্রফেসর ল্যামার্টিন)

॥ ২ ॥

"আজ এটা এক বিশ্বজনীন সত্য যে, মুহাম্মদ নারীদেরকে উচ্চতর মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন।"–(এইচ এ আর গিব)

॥ ৩ ॥

"হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তিনটি বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ছিলেন, যা তখনকার দিনে ছিল না বললেই চলে। ধর্ম প্রবর্তক হিসাবে তার অসামান্য

www.amarboi.org

মেধা, রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে তার অনন্য-সাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং প্রশাসক হিসাবে তার অতুলনীয় দক্ষতা।"–(ডব্লিউ, মন্টগোমারী ওয়াট)

॥ ৪ ॥

"সেই মহান আরবী ও তাঁর বিশ্বাস, তাঁর প্রকাশিত ও ব্যক্তিগত চরিত্রের গুণ ও ত্রুটি, তাঁর কাল ও পারিপার্শ্বিকতা পরিপূর্ণ ও পক্ষপাতহীন অধ্যয়নের পর—যে অধ্যয়ন চল্লিশ বছরেরও বেশী সময়ে ব্যাপ্ত এবং সকল শ্রেণী ও জাতির মুসলমানদের সঙ্গে নিকট-সম্পর্কযুক্ত—আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শাসক ও ইতিহাস-স্রষ্টার তালিকায় এ নবীর স্থান অতি উচ্চে—শিবিরে ও পরামর্শ-সভায় সমভাবে ; মানুষের শাসনকর্তা, প্রশাসক এবং সাহসী ও হাঙ্গামাকারী উপজাতি বা সুস্থিত জাতির সংগঠক হিসেবে। রাজনীতিজ্ঞ, বন্ধু এবং শত্রুর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছেন মুহাম্মদ এবং যারা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে ও জনসাধারণের মধ্যে জানার সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাদের সকলের ভালবাসা, প্রশংসা ও শ্রদ্ধা লাভ করেছেন তিনি।"

–(মেজর জেনারেল ফার্লঙ্গ)

॥ ৫ ॥

"আমি আল্লাহর মহিমা কীর্তন করি এবং পূতচরিত্র ও দিব্য প্রেরণা-প্রাপ্ত নবী মুহাম্মদ ও পবিত্র কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। কয়েক বছরের মধ্যে মুসলমানরা অর্ধেক পৃথিবী জয় করেছিল। মিথ্যা দেবতার কাছ থেকে তারা ছিনিয়ে নিয়েছিল অনেক আত্মাকে। তাই মুহাম্মদ ছিলেন মহান ব্যক্তি।"

–(নেপোলিয়ন বোনাপার্ট)

॥ ৬ ॥

"আমরা যদি হযরত মুহাম্মদের প্রতি সুবিচার করি, তাহলে একথা আমাদের ভোলা উচিত নয় যে, আমরা খ্রীস্টানরা সজ্ঞানভাবে অথবা অবচেতনভাবে স্বীকার করি, বাইবেলের স্বর্গীয় বাণীতে আমরা যে অদ্বিতীয় ও সুউচ্চ চরিত্রের দর্শন পাই মুহাম্মদ সেই ধরনেরই চরিত্র।"–(টর আন্দ্রো)

॥ ৭ ॥

"নবী ও সংস্কারক হিসাবে মুহাম্মদ একজন পুরাদস্তুর বিপ্লবী পুরুষ বৈ অন্য কিছু নন।"–(ভন ক্রেমার)

www.amarboi.org

॥ ৮ ॥

“জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর ৫৬৯ খৃষ্টাব্দে আরবের মক্কা নগরে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করলেন, যিনি সমগ্র মানব জাতির উপর তার সর্বাধিক প্রভাব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন।”-(জন উইলিয়াম ড্রেপার)

॥ ৯ ॥

“পৃথিবীর কোনো মানুষ যদি আল্লাহকে দেখে থাকেন, কোনো মানুষ যদি কখনো সৎ ও মহান উদ্দেশ্য নিয়ে আল্লাহর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে থাকেন তাহলে নিশ্চিতরূপে সে ব্যক্তিটি হলেন আরবের নবী। মুহাম্মদ যে শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন তা নয়, বরং এ পর্যন্ত যত মানুষ মানবতার জন্ম দিয়েছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানব ছিলেন তিনি। মুহাম্মদ এমন একজন মানুষ যিনি শুধু মহতই নন, মহত্তমদের অর্থাৎ সত্যের শীর্ষে আরোহণকারীদের অন্যতমও ছিলেন। তিনি শুধু নবী হিসেবেই নন, দেশপ্রেমিক নেতা হিসাবেও মহান। তিনি ছিলেন পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক পথের নির্মাতা। তিনি গঠন করেছেন একটি মহান জাতি এবং সুবিশাল সাম্রাজ্য। তিনি ছিলেন সত্যের জনক, তিনি স্বয়ং ছিলেন সত্য—তার নিজের কাছে, তার অনুসরণকারীদের কাছে, পরিচিতদের কাছে, সর্বোপরি মহান আল্লাহর কাছে। ইতিহাসে তাঁর ন্যায় আর কোনো নবী, রাসূল বা সংস্কারক দেখা যায় না, যিনি এতো অল্প সময়ে মানুষের জীবনে এতবড় অলৌকিক ও বিস্ময়কর সংস্কার সাধন করেছেন।”-(মনীষী মেজর আর্থার, জি লিউনার্ড)

॥ ১০ ॥

“মুহাম্মদের বাণী ও আদর্শ তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের মনে এমনই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল যা যীশুর অনুগামীদের মাঝে পাওয়া যাবে না। যীশুকে যখন শূলে চড়ানো হল তখন তার অনুসারীরা পালিয়ে গেল, তাদের ধর্মনেশা কেটে গেল, নিজেদের মাননীয় নেতাকে মৃত্যুমুখে ফেলে রেখে তারা পলায়ন করল। অপরদিকে মুহাম্মদের অনুগামীরা তাদের উৎপীড়িত রাসূলকে হিফাযতের জন্য নিজেদের সর্বস্ব বিপদের মুখে নিক্ষেপ করে তাকে দুশমনদের উপর জয়ী করেছিল।”-(ইতিহাসবিদ ক্যাডফ্রে হিগেন্স)

॥ ১১ ॥

“গোত্রীয় কোন্দলে উচ্ছৃংখল ও রক্তপিপাসু একটা সমাজকে তিনি সুবিন্যস্ত করেছিলেন। এ ব্যাপারে ‘জোর যার মুল্লুক তার’ নীতির পরিবর্তে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা, নিষ্ঠুরতা থেকে মানবতা এবং উচ্ছৃংখলতাকে শৃংখলাবদ্ধ করাই ছিল তাঁর প্রধান সমস্যা।”-(রোম লেনদু)

www.amarboi.org

॥ ১২ ॥

"সৃষ্টিকর্তার অন্যতম মহান দূত আরবের এই নবীর প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব না করাটা সেই লোকের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব যে তাঁর জীবন ও চরিত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন করেছে এবং তার শিক্ষাদান প্রণালী ও জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা রাখে। আমি যা কিছু আপনাদের কাছে উপস্থাপন করেছি তার অনেক কিছুই হয়তো আপনাদের কাছে পরিচিত, কিন্তু তবুও আমি যখনই সেগুলো পুনঃ অধ্যয়ন করি, তখনই সেই মহান আরবীয় শিক্ষকের প্রতি নতুন করে ভক্তি ও শ্রদ্ধা অনুভব করি।"-(অ্যানি বেসান্ত)

॥ ১৩ ॥

"মুহাম্মদের রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ ছিল বিলীয়মান বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য থেকে অনেক বেশী পরিচ্ছন্ন, ব্যাপক প্রাণ-প্রদীপ্ত ও উদ্যমশীল। অলৌকিকতা প্রদর্শনের সকল দাবীকে তিনি প্রত্যাখ্যান করে চলতেন। তিনি সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন, কিন্তু তাই বলে সন্যাসব্রত তাঁর ধর্মে ছিল না।"-(এ সি বুকেট)

॥ ১৪ ॥

"মুহাম্মদ ধর্মের ইতিহাসে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি সংসার-বিরাগী সাধু ছিলেন না, স্বর্গ থেকে নেমে-আসা দেবতা ছিলেন না, কিংবা অতি মানবিক কোনো গুণেরও অধিকারী ছিলেন না, তবুও সকলের উপর তার বিস্ময়কর প্রভাব ছিল। তার বিশাল ও মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্বকে বাদ দিলে অন্যান্য মুসলমান থেকে তাকে পৃথক করা যায় না।"-(আর ভি সি বডলি)

॥ ১৫ ॥

"হাজ্জ অনুষ্ঠানের দ্বারা মুহাম্মদ যা করেছেন তা নিছক এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অনেক উর্ধে। হাজ্জের মহাসম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলমানদের ধ্যান-ধারণা আদান-প্রদানের যে স্থায়ী ব্যবস্থা হয়েছে, তার কাছে আজকের ইউরোপের সুসংঘবদ্ধ ও সুশৃংখল প্রচার ব্যবস্থা প্রায় মূল্যহীন।"

-(এন এন ব্রে)

॥ ১৬ ॥

"মুহাম্মদ একজন রাসূল ছিলেন, কোনো ধর্মবেত্তা ছিলেন না—এটা যে কোনো নিরপেক্ষ মানুষের কাছেও সুস্পষ্ট। প্রাথমিক মুসলমানদের যে সভ্য

www.amarboi.org

সমাজ তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল, তারা তাঁর আইন ও দৃষ্টান্ত পালন করে সন্তুষ্ট ছিলেন।"–(মরিস গডফ্রে)

॥ ১৭ ॥

"মুহাম্মদ যে ধর্মীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন তা তার সাথীদের মন-মেযাজ ও দেশের প্রচলিত রীতিনীতির ক্ষেত্রে শুধু উপযুক্তই ছিল না, বরং তা ছিল এসবেরও অনেক উর্ধে। তাঁর এ আদর্শ মানবিক প্রবণতার সাথে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ যে, মাত্র চল্লিশ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ তাঁর ধর্মে আশ্রয় গ্রহণ করলো। সুতরাং এটি এমন একটি মতাদর্শ যার কথা শুনতে হয় এবং যা স্বাভাবিকভাবেই হৃদয়ে প্রবেশ করে।"

–(লা কোঁথে ডি বোলেঁভিলার)

॥ ১৮ ॥

"সামাজিক বিজয়ে তার কোনো গর্ব ছিল না, বা তিনি কোনো ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করতেন না। দুঃখের দিনগুলোতে তাঁর যে চেহারা ও সরল ব্যবহার দেখা যেত, বৃহত্তম ও সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবার পরও তাঁর সেই একই অবস্থা ছিল। রাজকীয় আচার-আচরণ থেকে তিনি এত দূরে ছিলেন যে, কোনো ঘরে প্রবেশকালে সম্মান প্রদর্শনমূলক কেউ কিছু করলে তিনি অসন্তুষ্ট হতেন। পার্থিব শাসনের চেয়ে আদর্শগত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। ফলে তাঁর পরিবারের জন্য তিনি কিছুই রেখে যাননি।"–(ওয়াশিংটন আরভিং)

॥ ১৯ ॥

"মুহাম্মদের দৈনন্দিন আচার-ব্যবহারের গুরুত্বপূর্ণ কিংবা তুচ্ছ সবকিছুই একটি অনুসরণীয় নীতিতে পরিণত হয়েছে, যা আজো কোটি কোটি মানুষ পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে মেনে চলছে। একমাত্র তিনি ছাড়া মানব জাতির কোনো অংশ, নির্ভুল মানুষ হিসেবে আর কাউকেই এমন নিখুঁতভাবে অনুসরণ করে চলে না।"–(ডি জি হোগার্থ)

॥ ২০ ॥

"ইতিহাসে প্রথম ও শেষবারের মত আরব ভূমিতে জগত-সম্মোহনকারী এমন এক আত্মার আবির্ভাব ঘটেছিল, যিনি তদানীন্তন বিধি ব্যবস্থাকে নতুন খাতে প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং পরিবর্তন এনেছিলেন গোটা মহাদেশীয় জীবনে।"–(মি. ডবলিট সি, উম্যান)

www.amarboi.org

॥ ২১ ॥

"মানুষের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করার যে বিপুল ক্ষমতার অধিকারী তিনি (মুহাম্মদ) ছিলেন, মানব জাতির ইতিহাসে অনুসরণযোগ্য হয়েও কেউ কোনো দিন আর তা অতিক্রম করতে পারেনি কিংবা তাঁর সমকক্ষও হতে পারেনি কেউ। অর্থাৎ তিনি মানব হৃদয়কে যেমনভাবে শাসনাধীনে এনেছিলেন ইতিহাসের কোনো ব্যক্তি আর তেমনটি করতে পারেননি।"

–(আর্থার এন. ওয়ালাস্টন)

॥ ২২ ॥

"ইসলামের সেই উম্মী নবীর ইতিবৃত্ত বড় আশ্চর্যজনক। তৎকালের কোনো বৃহৎ শক্তি যে জাতিকে নিজের আওতায় আনতে পারেনি সেই উচ্ছৃংখল জাতিকে তিনি এক আওয়াজে বশীভূত করেন। অতপর সেই জাতিকে তিনি এমন স্তরে উন্নীত করেন যার দ্বারা বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। বর্তমান কালেও সেই উম্মী নবী কবরে অবস্থান করেও লক্ষ লক্ষ আল্লাহর বান্দাকে ইসলামের কালিমাহ্‌র উপর অটল রেখেছেন।"–(ডঃ গেসটাউলী)

॥ ২৩ ॥

"সঠিকভাবে বলতে গেলে মুহাম্মদ ছিলেন সময়ের উপযুক্ত মানুষ। তার বিস্ময়কর সাফল্য সম্পর্কে জানতে হলে তার সমকালীন অবস্থা জানতে হবে। যীশুর আগমনের সময় থেকে সাড়ে পাঁচশ বছর পার হয়ে গেছে তখন। সে সময়ে গ্রীস ও রোম এবং ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের একশ একটি রাজ্যের প্রাচীন ধর্ম তাদের সত্যতা হারিয়েছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে সভ্য জগত বিশৃংখলার দ্বারদেশে উপনীত হয়েছিল। তখন প্রাচীন সাংস্কৃতিক বন্ধন যে সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল এবং তাদের ঐক্যের সুযোগ দিয়েছিল তা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এর স্থান পূরণ করার মত আর কিছু ছিল না।

বিগত চার হাজার বছর ধরে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল এবং তখন মানবজাতি বর্বর যুগে এসে দাঁড়িয়েছিল। তখন প্রত্যেক গোত্র একে অপরকে শত্রু বিবেচনা করতো। তখন আইন-কানুন বলতে কিছু ছিল না। খ্রীস্টীয় মতবাদ ঐক্য ও শৃংখলার পরিবর্তে বিভক্তি ও ধ্বংস সৃষ্টি করতে থাকে। অন্তঃসারশূন্য সভ্যতা তখন বিশাল মহীরুহের মত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। তখন এমন কোনো বন্ধন ছিল না যা মানব জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। --- তখন আরব দেশে সেই মহাপুরুষ জন্ম নিলেন, যিনি পূর্ব ও দক্ষিণ বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ করলেন।"–(ফ্রিজিল ক্যানী)

www.amarboi.org

॥ ২৪ ॥

"পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে আজকের সভ্যজগত সম্পূর্ণ বিশৃংখলাপূর্ণ ছিল। প্রাচীন সংস্কৃতি, যা সভ্যতার গোড়াপত্তন করেছিল তা ভেঙ্গে পড়েছিল এবং এর স্থান পূরণের উপযুক্ত কোনো বিকল্প ছিল না। মনে হচ্ছিল, যেন চার হাজার বছরের পুরাতন সভ্যতা ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে। মানুষ যেন বর্বরতার চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। কারণ গোত্রে গোত্রে দ্বন্দ্ব-কলহের ফলে আইন-শৃংখলা ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। এর উপর খ্রীস্টবাদ এসে আইন-শৃংখলা ও সাম্যের অবনতি ঘটায়। ঠিক এমনি সময় এ সমাজে এমন এক মহামানব জন্ম নিলেন, যিনি প্রাচ্য-প্রতীচ্যকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করলেন। এ মহামানবই হলেন বিশ্বনবী—প্রশংসিত মহাপুরুষ।"–(ডঃ ডেনিসন)

॥ ২৫ ॥

"নবী হিসাবে তার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না বা কখনও তিনি কোনো নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দেননি। তিনি (হযরত মুহাম্মদ) সর্বদা সত্যানুসন্ধানী ছিলেন।"–(অধ্যাপক নাথানিয়েল স্মীথ)

॥ ২৬ ॥

"বিশাল ও বর্ণালী প্রকৃতি হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত অথচ সচরাচর শিক্ষা হতে ব্যতিক্রমধর্মী তাঁর চিন্তাধারা সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান শত্রুদের মধ্যে যেমন বিতর্কের সৃষ্টি করতো তেমনি তাঁর নিম্নস্তরের অনুসারীদেরও স্পর্শ করতে পারতো। তাঁর সরল-সোজা ও অভূতপূর্ব বক্তব্য, নির্ভীক ও পুণ্যময় চেহারা তাঁর জন্য সম্মান ও ভালবাসা বয়ে আনতো। তাঁর এমন এক অপার্থিব ও শক্তিধর প্রতিভা ছিল, যা মূর্খ-পণ্ডিত উভয়কেই সমভাবে প্রভাবিত করতো।"

–(চার্লস স্টুয়ার্ড মিলস)

॥ ২৭ ॥

"তাকে (নবী মুহাম্মদকে) একটা বর্বর ঘৃণ্য জাতির ইন্দ্রিয়পরায়ণ গোঁয়ার লোকদেরকে সংগঠিত করতে হয়েছিল।"–(রেইন হার্ভ ডোজী)

॥ ২৮ ॥

"স্বীয় কাজে তিনি (হযরত মুহাম্মদ) সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। কোনো জরুরী সময়েই তাকে অপ্রস্তুত দেখা যায়নি। নিজের কাজের প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল। তিনি অসীম সাহসিকতা ও নিরলস কর্ম-সাধনা দ্বারা শত্রুর উপর বিজয় অর্জন করেন।"–(জি. এম. ড্রাইকোট)

www.amarboi.org

॥ ২৯ ॥

"রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অত্যন্ত জটিল সমস্যা সমাধানের অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর মত রাজনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি ইতিহাসে বিরল। তাই ইতিহাস অতি গর্বের সাথে তাঁকে 'আর্টিফিসার্স অব নেশান্স' বা জাতি গঠনের সুনিপুণ শিল্পী উপাধি দিয়েছে।"–(এস. পি. স্কট)

॥ ৩০ ॥

"তাঁর (নবী মুহাম্মদের) প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল ইচ্ছার দৃঢ়তা ও উদ্দেশ্যের স্থিরতা। কোনো ব্যক্তিগত বিপদ বা দীর্ঘ বিরোধিতা বা নির্বাসন কখনো তাকে সংকল্পচ্যুত করতে পারতো না। এজন্যই সমগ্র আরবের অন্তর একীভূত হয়ে তাঁর কাছে পদানত হয়েছিল। এটাই ছিল তার পরম সফলতা।"

–(স্টুবার্ট)

॥ ৩১ ॥

"মুহাম্মদ আরবদেরকে একটি জাতিতে পরিণত করে তাদেরকে ইতিহাসের আওতাধীনে আনেন। তাদের উপর তাঁর শিক্ষাগত প্রভাব এমনই ছিল যে, আরবগণ প্রায় তিনশ বছর যাবত বিশ্ব সভ্যতার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।"

–(অধ্যাপক অলিভার জে. থেচার)

॥ ৩২ ॥

"নবীর সমাজব্যবস্থা প্রত্যেক মুসলমানকে দিয়েছে সমান আত্মিক মর্যাদা, ইসলামকে করেছে রাজনীতি ও সমাজনীতির মিলন কেন্দ্র, আর তাই দিয়েছে তাঁকে জগত শাসনের ভার। জগতটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের পক্ষে সুখী হবার বিধান হিসাবে ইসলাম যথেষ্ট। বৌদ্ধদর্শন ও ব্রাহ্মণ্যবাদের গোঁড়ামির সংঘর্ষে যখন উত্তর ভারতে একটা রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল সেই সংকটকালেই ইসলাম সঞ্চয় করেছে তার চূড়ান্ত রাজনৈতিক শক্তি।"–(মি. হ্যাভেল)

॥ ৩৩ ॥

"মুহাম্মদের কঠোর একত্ববাদ আরবীয় মুসলমানদের তরবারি সঞ্চালনে এমন অজেয় ক্ষমতা দান করলো যে, তা শুধু আরব উপজাতিগুলোর দূষিত পৌত্তলিকতাই নষ্ট করলো না, জরথুস্ত্রের অপপ্রচার থেকে, আচারভ্রষ্ট খ্রীস্টধর্মের অঘটন ও অন্ধ বিশ্বাস থেকে, আর মঠ ও মঠাধ্যক্ষ সমস্যা-সংক্রমিত মারাত্মক

www.amarboi.org

ব্যাধির হাত থেকে অগণিত মানুষকে মুক্তি দেবার জন্য ইতিহাসের প্রধান ও একমাত্র সহায় হয়ে রইলো। --- সামাজিক ভাংগন ও আত্মিক হতাশার সেই গভীর অন্ধকারে আরবের নবীন উদ্দীপনাময় আশাবাদী বাণী, আশার আলো-শিখার মতো সহসা প্রদীপ্ত হয়ে উঠলো। নৈরাশ্যের অতলে নিমজ্জিত এক জাতির সম্মুখে ইসলাম খুলে দিলো আশার এক নতুন দিগন্ত। বাহ্যদৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে ইসলামের তলোয়ার আল্লাহর নামেই সঞ্চালিত হয়েছে, কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, কার্যত তাই করছে সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের সমাধির সূচনা। ইসলামের বিপ্লবই বাঁচিয়ে গেছে মানুষকে।"

–(মানবেন্দ্র নাথ রায়)

॥ ৩৪ ॥

"ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদের জন্ম, ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইসলামের প্রচারে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এক নবতর ধারণার উন্মেষ ঘটেছে। ---- --- বিস্ময়কর দীনতা প্রকাশ করে মহান নবী নিজেকে অজ্ঞানী (নিরক্ষর) বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যে মানুষটি বলেছিলেন জ্ঞানই উচিত-অনুচিতের পার্থক্য বুঝাবার ক্ষমতা প্রদান করে, জ্ঞানই স্বর্গের পথ আলোকিত করে, মুরুভূমিতে জ্ঞান আমাদের মিত্র, নির্জনতায় আমাদের স্বজন, বন্ধুহারা জীবনে সাথী, শত্রুদের বিরুদ্ধে বর্ম—তাঁর চেয়ে জ্ঞানী আর কে হতে পারে?"

–(মিসেস ইন্দিরা গান্ধী)

॥ ৩৫ ॥

"সমতার ভিত্তিতে মানব-জাতিসমূহের মিলন সাধন করতে ইসলামই সবচেয়ে বেশী কৃতকার্য হয়েছে। কারণ মুহাম্মদের ধর্মের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব অনুসারে প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘই মানবকুলের এমন এক মহামিলন ঘটাতে পারে, যা দেখে অন্যান্য ধর্মের লোকেরা লজ্জাবোধ করবে।"–(অধ্যাপক স্নোক)

॥ ৩৬ ॥

"পৃথিবীর যা কিছু মঙ্গলময়, যা কিছু মহৎ ও সুন্দর–সবই নবী মুহাম্মদ। তার তুলনা শুধু তিনি নিজেই।"–(ইংরেজ কবি জন কীটস)

॥ ৩৭ ॥

"হযরত মুহাম্মদের প্রচারিত ধর্ম-এর সততা, সরলতা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং এর বৈপ্লবিক, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমতা ও ন্যায়নীতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লোকদের অনুপ্রাণিত করে। কারণ ঐ সমস্ত রাজ্যের জনসাধারণ দীর্ঘ দিন যাবত একদিকে

www.amarboi.org

শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক নিপীড়িত, শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছিল, অপরদিকে ধর্মীয় ব্যাপারে নির্যাতিত, নিষ্পেষিত হচ্ছিল পোপদের হাতে। ---- তাদের কাছে এ নতুন ব্যবস্থা ছিল মুক্তির দিশারী।"-(পণ্ডিত জাওহার লাল নেহরু)

॥ ৩৮ ॥

"আরবীয় নবীর শিক্ষা যখন অসভ্য আরবদের মধ্যে উজ্জীবিত করে দিল এক নতুন জীবন, তখন তারা হয়ে দাঁড়াল সমগ্র দুনিয়ার শিক্ষক। আর শিক্ষা, বিজয় ও ঐশী সাহায্যের পতাকা উড়তে লাগল একদিকে বাংলা ও অন্যদিকে স্পেনের উপর।"-(স্যার গোকুল চন্দ্র নারাঙ)

॥ ৩৯ ॥

"মুহাম্মদের চরিত্র ছিল পূর্ণাঙ্গ ও কলঙ্কহীন এবং কতক ব্যাপারে যীশু-খ্রীস্টের চেয়ে উন্নততর। মুহাম্মদ নিজেকে কখনো ভগবানের সমান মনে করেননি। তাঁর অনুসারীরা একবারও বলে না যে, তিনি শুধু একজন মানুষের চেয়ে আরো বেশী কিছু ছিলেন। তারা কখনো তার উপর ঐশী সম্মান আরোপ করেনি। নবী সবসময়ই 'ভগবানের প্রেরিত পুরুষ মাত্র' বলেই নিজেকে প্রকাশ করেছেন। কতক দিক দিয়ে যীশুখ্রীস্টের চেয়ে মুহাম্মদ মানুষের কাছে উন্নততর দৃষ্টান্ত। পার্থিব ও আত্মিক-উভয় ব্যাপারেই তিনি ছিলেন মানুষের দক্ষ নেতা। শত্রুর প্রতি তিনি ছিলেন সদয়। জীবনের পবিত্রতাকে তিনি ভালবাসতেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এক ন্যায়বান ও সত্যনিষ্ঠ জীবন যাপন করে গেছেন। যীশুখ্রীস্টের বিপরীতে তিনি কঠোর পরীক্ষায়ও কখনো কোনো অভিযোগ করেননি। ----- সুতরাং আল্লাহর নবী মুহাম্মদ অন্য যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে দুনিয়ার অধিকতর মঙ্গল সাধন করে গেছেন।"-(প্রফেসার ভেংকটরত্নম)

॥ ৪০ ॥

"মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন বিশ্বের প্রথম সফল আন্দোলনের সংগঠক।"-(ডঃ ধল্লা)

॥ ৪১ ॥

"পশ্চিমা দেশগুলো যখন অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল, তখন প্রাচ্যে এক নক্ষত্রের উদয় হয়। এমন এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, যার আলোকে অন্ধকার পৃথিবী আলোকিত হয়ে উঠে। ইসলাম কোনো মিথ্যা ধর্ম নয়। হিন্দু ভাইদের তা অধ্যয়ন করা দরকার। তাহলে তারাও আমার মত ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে। ---- আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি যে, ইসলাম

www.amarboi.org

তরবারির দ্বারা প্রসার লাভ করেনি, বরং এর মূলে রয়েছে নবীর কঠোর সারল্য, দৃঢ় প্রত্যয়, সম্পূর্ণ আত্মবিলোপতা, চুক্তির প্রতি সযত্ন সম্মান, বন্ধুজন ও অনুসারীদের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ, তাঁর নির্ভীকতা, নিজের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান এবং অপরাপর মহৎ গুণরাজি। তাঁর ঐ সমস্ত গুণই মানবাত্মাকে বশীভূত করেছে।"-(মহাত্মা গান্ধী)

॥ ৪২ ॥

"হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যে আল্লাহর প্রেরিত সত্য নবীপুরুষ ছিলেন দৃঢ়তার সঙ্গে অকুণ্ঠ চিত্তে তিনি এর সাক্ষ্য প্রদান করেছেন। ---------- মুহাম্মদের চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমরা আসল মুহাম্মদকে দেখতে পাই। সেই সময় তিনি তাঁর আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করেছিলেন এবং আল্লাহর একত্বের অনুপম সত্য প্রচারের আহ্বানও উপলব্ধি করেছিলেন। মানবজাতির কাছে নৈতিক সত্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের ডাক অনুভব করে যদি কেউ বলে মুহাম্মদ আল্লাহর নবী বা তত্ত্ববাহকরূপে প্রেরিত হননি, তবে আমি বলবো, আল্লাহ কখনো কোনো নবীই প্রেরণ করেননি। নবী প্রেরণের ধারণাই অমূলক।"

-(ডঃ অধ্যাপক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)

॥ ৪৩ ॥

"মুহাম্মদ বিশ্বজগতের সচ্চরিত্রতা, ভালবাসা এবং সাম্যের আলো ছড়িয়েছেন ; দরিদ্রজন থেকে অত্যাচারের চির নির্বাসন ঘটিয়েছেন।"

-(প্রফেসর শান্তারাম)

॥ ৪৪ ॥

"মানুষের ধর্মবুদ্ধি খণ্ড খণ্ড করে বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাকে তিনি (নবী মুহাম্মদ) অন্তরের দিকে, অখণ্ডের দিকে, অনন্তের দিকে নিয়ে গিয়েছেন। বিশ্বের পরম দেবতাকে একটি বিশেষরূপে একটি কোনো বিশেষ স্থানে আবদ্ধ করে না রেখে (তিনি) সেই মহাপুণ্যের দ্বারকে সমস্ত মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।"-(বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

॥ ৪৫ ॥

"মুহাম্মদের ধর্ম ব্যতীত আর কোনো ধর্মই ব্যবহারিক জীবনে এতটুকু উজ্জ্বল হয়ে উঠেনি। জাতির বাতিক, হীনতাবোধের বাতিক, সাদা-বাদামী-কালোর বাতিক থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি তত্ত্বের আশ্রয় নিতে চাই না,

www.amarboi.org

দেখতে পাই ইসলামেই শুধু এমন কোনো বাতিক নেই।"–(স্যার সি. পি. রামস্বামী আয়ার)

॥ ৪৬ ॥

"দুনিয়ার অন্যতম মহান বীর হিসেবে মুহাম্মদকে আমি অভিবাদন জানাই। মুহাম্মদ এক বিশ্ব শক্তি, মানব জাতির উন্নয়নে এক মহানুভব শক্তি।"

–(প্রফেসর সাধু টি. এল. বাস্বনী)

॥ ৪৭ ॥

"তিনি (নবী মুহাম্মদ) মূর্তিপূজার এক জগাখিচুড়ি দর্শনের স্থলে নির্ভেজাল একত্ববাদের আকীদা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মানুষের চারিত্রিক মান উন্নত করেন, সাংস্কৃতিক জীবনকে বিকশিত করেন এবং একটি সুসমন্বিত ও যুক্তিভিত্তিক উপাসনারীতি প্রবর্তন করেন। শেষ পর্যন্ত তিনি এ আকীদা ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে আবর্জনার মত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভয়ংকর অসভ্য ও উচ্ছৃংখল গোত্রগুলোকে এক সূত্রে গেঁথে এক শক্তিশালী দলে পরিণত করেন। তিনি আরবে প্রচলিত অনেক ঘৃণ্য রেওয়াজ-প্রথার ভিত্তিমূলে চরম আঘাত হানেন এবং লাগামহীন যৌনচর্চার স্থলে একাধিক বিবাহের এক সতর্ক ও বিধিবদ্ধ রীতি প্রবর্তন করেন। তিনি কন্যাহত্যার বর্বর নিয়মকে সমূলে উচ্ছেদ করেন।"–(রেভারেণ্ড ডবলিউ, ষ্টিফেন)

॥ ৪৮ ॥

"বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত যে, মুহাম্মদের যাবতীয় কাজ এ মহৎ প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হত, যেন মানব জাতি অজ্ঞতা, মূর্খতা ও পৌত্তলিকতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। তাঁর আপ্রাণ চেষ্টা ছিল—নিগূঢ় সত্য তথা আল্লাহর নির্ভেজাল একত্বের বহুল প্রচার।"–(জি. এম. রডওয়েল)

॥ ৪৯ ॥

"চরিত্র গঠন ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তিনি (নবী মুহাম্মদ) যে সাফল্য অর্জন করেছেন, সে প্রেক্ষাপটে তাঁকে মানবতার মহান দরদী বলে বিশ্বাস করতেই হয়।"–(এডওয়ার্ড মুনন্ট)

॥ ৫০ ॥

"ভয় ও অজ্ঞানতার কুয়াশার মধ্য দিয়ে অনেকেই মুহাম্মদকে অবলোকন করেছেন। তাদের কাছে তিনি এমন ভয়ংকর বস্তু যার সম্পর্কে যে কোনো মন্দ

www.amarboi.org

কথাই উচ্চারণ করা যায়। কিন্তু এখন তো সন্দেহের মেঘ দূরীভূত হয়েছে। ইসলামের মহান প্রবর্তককে এখন আমরা পরিষ্কার আলোকে অবলোকন করতে পারছি।"–(বিশপ বয়ড কার্পেন্টার)

॥ ৫১ ॥

"মক্কা বিজয় মুহাম্মদের প্রশংসনীয় চরিত্রের এক মহৎ দৃষ্টান্ত। মক্কাবাসীদের অতীত দুর্ব্যবহার তাঁকে স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজিত করে তোলার কথা ছিল, কিন্তু তিনি সেনাবাহিনীকে সকল রক্তপাত থেকে বিরত রাখেন। মহাবিজয়-রূপ দয়া প্রদর্শনের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে বিনম্র মনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। মাত্র দশ অথবা বার ব্যক্তিকে তাদের অতীতের জঘন্য অপরাধের জন্য দণ্ড প্রদান করা হয়। এর মধ্যে চারজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অন্যান্য বিজেতাদের তুলনায় এটা একান্ত মানবিক। ১০৯৯ খ্রীস্টাব্দে জেরুজালেম অধিকার কালে খ্রীস্টান ক্রুসেডাররা ৭০ হাজার মুসলিম নারী, শিশু ও অসহায় মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করে।"–(আর্থার গিলম্যান)

॥ ৫২ ॥

"আমরা মুহাম্মদের মধ্যে বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি দেখতে পাই। একই ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন ভাবধারার সমন্বয়-সাধন-প্রয়াসীও তার কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করতে পারেন। ---- চরমপন্থীগণ তার মধ্যে শুধু দেখেছেন ফকীর-দরবেশ ও সূফীর কার্যকলাপ এবং আল্লাহর উপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীলতা ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন বাস্তববাদী নবী। তিনি দেহ ও মন—এ দুই মানবীয় প্রান্তকেই কর্মব্যস্ত থাকার প্রেরণা জুগিয়েছেন। তিনি তার যুগের অসৎ প্রকৃতি ও আভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রতি জনগণের উদ্দেশ্য-প্রবণতার জন্য দুঃখ করে গিয়েছেন। কিন্তু তিনি দুনিয়ার কার্যক্রমে দায়িত্ব পরিহার করে জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান চাহেননি।"–(কে. সি. আর্চার)

॥ ৫৩ ॥

"ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। বছরের পর বছর ধরে প্রতিদিন নির্যাতন ভোগ করেছেন, নির্বাসিত হয়েছেন, সহায়-সম্পদহারা হয়েছেন, আত্মীয়-স্বজনদের রোষানলে পড়েছেন।--- কিন্তু কোনো প্রাচুর্যের মোহ, কোনো হুমকি কিংবা কোনো প্রলোভনই তার ন্যায়ের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দিতে পারেনি।"–(ডঃ মার্কোস উড)

www.amarboi.org

॥ ৫৪ ॥

"মহাবিজ্ঞতা-প্রসূত একটি মাত্র উদ্যোগ দ্বারা মুহাম্মদ একই সঙ্গে তার দেশের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিলেন।"-(প্রফেসর স্টিফেন্স)

॥ ৫৫ ॥

"তিনি (নবী মুহাম্মদ) ছিলেন পুরোপুরি ঐতিহাসিক যুগের মানুষ। তার সহজ মানবতাবোধ, মানব-সমাজে তাকে মানবরূপেই প্রমাণিত করেছে। তার কথায় হেঁয়ালীর মারপ্যাচ ছিল না। তিনি ছিলেন কঠোর বাস্তববাদী। অলৌকিক কার্যকলাপের মধ্যে তিনি নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। মানবতার কল্যাণ ও বিশ্বজনীনতা তার কথায় ও কাজে বিদ্যমান ছিল।"-(ডঃ স্যামুয়েল জনসন)

॥ ৫৬ ॥

"দার্শনিক, বাগ্মী, ধর্মপ্রবর্তক, আইন-প্রণেতা, সেনানায়ক, মতবাদ-বিজয়ী, যুক্তিমঙ্গল ধর্মমতের সংস্থাপক, মূর্তিবিহীন ধর্মমতের প্রবর্তক, কুড়িটি পার্থিব সাম্রাজ্য এবং একটি ধর্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এ মুহাম্মদ। মানুষের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যাঁচাই করার জন্য যতগুলো মাপকাঠি রয়েছে, আমরা জিজ্ঞেস করি, সেগুলো দিয়েও যাঁচাই করলে তার চাইতে শ্রেষ্ঠ মানুষ আর আছে কি?"

-(হেসারটিন)

॥ ৫৭ ॥

"মুহাম্মদ তাঁর জাতির সম্মুখে স্থাপন করলেন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর চরিত্রও কলংকহীন, তাঁর বাসগৃহ, তাঁর পোশাক, তাঁর খাদ্য সবই ছিল বিরল সাধারণত্বে বৈশিষ্ট্যময়। সকলের জন্য সহানুভূতিতে পূর্ণ থাকতো তাঁর মন। তাঁর বদান্যতা ও উদারতা ছিল সীমাহীন, যেমন সীমাহীন ছিল তাঁর নিজ জাতির কল্যাণের জন্য উৎকণ্ঠিত মনোযোগ। সকল অঞ্চল থেকে তাঁর নিকট অসংখ্য উপহার সমর্পিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজের কাছে রাখতেন খুবই সামান্য এবং সেটাকেও তিনি বিবেচনা করতেন রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হিসেবে। তিনি রক্তপিপাসু নীতি এবং স্বেচ্ছাচারী শক্তির আইনের পরিবর্তে পবিত্র ও মহান আইন-পদ্ধতির জন্ম দিয়েছেন। তিনি সেই ব্যক্তি, যিনি সর্বকালের আইন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সেই ব্যক্তি যিনি ক্রীতদাসদের কঠোর জীবনকে করেছিলেন মোহনীয় এবং দরিদ্র, বিধবা ও ইয়াতীমদের দেখিয়েছিলেন পিতৃসুলভ যত্ন।"-(ডঃ গুস্তাভ ওয়েল)

www.amarboi.org

॥ ৫৮ ॥

"দাসত্বকে মুহাম্মদ সহ্য করেছিলেন এক প্রয়োজনীয় ক্ষতি হিসাবে, যেমন সহ্য করেছিলেন মূসা ও সেন্ট পল। মুসলিমদের হাতে এটা খুব দুর্বল এক প্রথামাত্র, যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদাসত্বের চাইতে অনেক দুর্বল। বহুবিবাহ কঠিনতর এক প্রশ্ন। মূসা এটাকে নিষিদ্ধ করেননি। দাউদ কর্তৃক তা পালিত হয়েছিল এবং বাইবেলে এটাকে প্রত্যক্ষভাবে বারণ করা হয়নি। বহুবিবাহের সীমাহীন অনুজ্ঞাকে সীমাবদ্ধ করলেন মুহাম্মদ। এটা নিয়মের ব্যতিক্রম।"

–(রেভারেণ্ড সি. আই. টেলর)

॥ ৫৯ ॥

"মুহাম্মদ আবির্ভূত হলেন ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং পৌত্তলিকতাকে নিশ্চিহ্ন করলেন এশিয়া, আফ্রিকা ও মিসরের অনেকাংশ থেকে, যার সর্বাংশেই আজ পর্যন্ত এক পবিত্র আল্লাহর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত। প্রবক্তাদের মনের উপর মুহাম্মদের ধর্ম-শক্তির সবচেয়ে সন্দেহাতীত প্রমাণ পাওয়া যায়। অতীতের সকল বিশ্বাসের জরাজীর্ণ অবস্থার ও সৃষ্টিকে স্রষ্টার আসনে স্থাপন করার প্রবণতা রোধে ইসলাম যদিও যথেষ্ট প্রাচীন, তবু এর অনুসারীরা শেষ পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার লক্ষ্যকে মানুষের ইন্দ্রিয় ও কল্পনার স্তরে নামিয়ে আনাকে ঠেকিয়েছে। --- গোত্রপতি ইবরাহীমের সময় থেকেই পৃথিবীতে বহুবিবাহ প্রচলিত এবং বাইবেল অনুযায়ী তা সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ। বাইবেলে বিস্তর বক্তব্যাংশ রয়েছে যাতে দেখা যায় যে, এটা অপবিত্র বলে বিবেচিত হতো না। সুতরাং মুহাম্মদ বহুবিবাহের প্রচলন করেননি, বরং এটাকে কমের সীমায় সীমিত করেছেন।"–(কবি জন মিল্টন)

॥ ৬০ ॥

"হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এমন একজন মানুষ যিনি শুধু মহৎ ছিলেন না, বরং মহোত্তমদের অন্যতমও ছিলেন। তিনি শুধু পয়গাম্বর হিসাবেই নন, দেশপ্রেমিক ও নেতা হিসাবেও মহান ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন জাগতিক ও আধ্যাত্মিক নির্মাতা। তিনি গঠন করেছেন একটি মহান জাতি ও এক বিশাল সাম্রাজ্য। কিন্তু এসব ছাড়াও তিনি এমন একটি বিষয় নির্মাণ করে গেছেন, যা তুলনাহীন। আর তাহলো, একটি ধর্মবিশ্বাস। তিনি সত্য ছিলেন—সত্য ছিলেন নিজের কাছে, তার অনুসারী ও পরিচিতজনদের কাছে এবং সর্বোপরি তার আল্লাহর কাছে।"–(মেজর আর্থার গ্লীশ লিউনার্ড)

www.amarboi.org

॥ ৬১ ॥

"গোড়া থেকেই ইসলাম খ্রীস্টধর্মের জটিলতা ও ইয়াহূদীবাদের কুটিল ধর্মান্ধতার বিরোধিতা করে আসছে। ---- এটা গৌতম বুদ্ধের মতবাদের ন্যায় শুধু একটা নতুন মতবাদ ছিলো না, বরং তৎকালীন ঈসায়ী ধর্মের ন্যায় এটা স্বর্গীয় এক নতুন ধর্ম ছিল। তদুপরি এটা হলো চিরস্থায়ী একটা জীবন ব্যবস্থা। ---- উদারতা, মহানুভবতা ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের গুণরাজিতে ইসলাম পরিপূর্ণ। ইসলাম তার নিজস্ব উপাসনা-পদ্ধতির মাধ্যমে ধনী-দরিদ্র সকলকে একই কাতারে সাম্য-মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। তাই সমস্ত গুণের অধিকারী হওয়ার দরুন মুহাম্মদ সর্বপ্রকার মানুষের অন্তরে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন।"-(এইচ, জি; ওয়েলস)

॥ ৬২ ॥

"মুহাম্মদ (সাঃ) এমনই একজন মহান ব্যক্তি, যার আবির্ভাব না হলে বিশ্ব অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। তিনি নিজেই নিজের তুলনা। তার কৃতিত্বময় ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে।"-(জোসেফ হেল)

॥ ৬৩ ॥

"অনেক অনেক দিন—চল্লিশ বছরেরও অধিককাল ধরে এ মহান আরাবীর জীবন, তাঁর ধর্মমত, তাঁর সময় ও পরিবেশ এবং সেই সঙ্গে তাঁর অনুসারী সমস্ত জাতি ও গোত্রের মানুষদের, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ও পুংখানুপুংখরূপে পর্যবেক্ষণ করার পর স্বীকার না করে পারছি না যে, পৃথিবীর শাসনকর্তা ও ইতিহাস-সৃষ্টিকারীদের তালিকার শীর্ষে যার নাম তিনিই এ পয়গাম্বর। কর্মী শিবিরে এবং শাসক সংঘে সর্বত্রই তিনি ছিলেন পথপ্রদর্শক, শাসক, পরিচালক এবং সংগঠক। সমস্ত দুর্ধর্ষ যাযাবরের স্থায়ী অধিবাসীবৃন্দের এবং শত্রু-মিত্র, বাদশাহ-ফকীর সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)। তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে ও সমাজ জীবনে যারা তাকে জানবার সুযোগ পেয়েছিল তারা সবাই তাকে ভালবাসতো, শ্রদ্ধা ও সম্মান করতো, তার সম্পর্কে পোষণ করতো অত্যন্ত উঁচু ধারণা।"-(মেজর জেনারেল মারলভ)

॥ ৬৪ ॥

"বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের তালিকার শীর্ষে মুহাম্মদ (সাঃ)-কে আমার চয়ন করায় অনেক পাঠক বিস্মিত হতে পারেন এবং অন্যান্যরা প্রশ্নও উত্থাপন করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি যিনি পার্থিব ও ধর্মীয় উভয় ক্ষেত্রে সবচেয়ে সফল হয়েছিলেন।

www.amarboi.org

-------নিতান্ত সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেও তিনি পৃথিবীর অন্যতম প্রধান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারক হিসাবে এবং অতুলনীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর তেরশ বছর পর আজো তার প্রভাব তেমনি প্রবল ও ব্যাপ্তিশীল।"-(মাইকেল এইচ, হার্ট)

॥ ৬৫ ॥

"একাধারে দার্শনিক, বক্তা, সংস্কারক বা নতুন মতবাদের প্রচারক, আইন-প্রণেতা, যোদ্ধা, বিজয়ী, যৌক্তিক ধর্মমতের পুনরুদ্ধারকারী, প্রতিমাহীন উপাসনা-পদ্ধতি উদ্ভাবনকারী ও একটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন মুহাম্মদ (সাঃ)। মানুষের মহত্ব পরিমাপের সকল মানদণ্ড অনুসারে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি তার চেয়ে বড় আর কেউ আছেন কি ?"-(আলফ্রেড দেলা মার্টিন)

॥ ৬৬ ॥

"হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মতাদর্শ আরবের তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনে যেভাবে সফলতা অর্জন করেছিল দুনিয়ার ধর্মীয় ইতিহাসে তা নজীরবিহীন। তার অক্ষয় কীর্তি সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয়, এত দ্রুততার সাথে তিনি তার দেশের বহুধাবিভক্ত গোত্রের মানুষদের একটি মহত্তর জাতিতে পরিণত করতে পেরেছিলেন যা মধ্যযুগের আরবভূমিতে ইয়াহূদী কিংবা খ্রীস্টীয় মতবাদের দ্বারা কোনোক্রমেই সম্ভব হতো না। শুধু কি তাই ? পরিপূর্ণভাবে একটি সভ্যতা গড়ে তোলার কাজে মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অমূল্য সাধনা শুধু আরবদের জন্য নয়, গোটা দুনিয়ার জন্যই নিয়োজিত ছিল এবং কল্যাণ বয়ে এনেছিলো।"-(আলফ্রেড মার্টিন)

॥ ৬৭ ॥

"নারীদের উপর থেকে পিতৃশাসনের প্রথা ও স্বামীর মালিকানা স্বত্বের বিলোপ সাধন করে, স্বামী যাতে স্ত্রীর প্রতি সৎ ও সদয় ব্যবহার করে সেজন্য নতুন বিধি-নিষেধ প্রবর্তন করে, স্বামীর অসৎ আচরণের বিরুদ্ধে স্ত্রীদের আইনের অধিকার প্রদান করে জাহিলী যুগের প্রথাসিদ্ধ ও প্রচলিত নিকটআত্মীয়ের সঙ্গে মেয়েদের বিবাহদানের রীতি বন্ধ করে এবং সদ্য-প্রসূত কন্যাকে জীবন্ত কবরদানের পৈশাচিক প্রথা উৎখাত করে তিনি [মুহাম্মাদ (সাঃ)] নারী জাতিকে মুক্তিদান করেন ; তাদের অবস্থার শুভ পরিবর্তন সাধন করেন। অধিকন্তু আইন করে তিনি বহুবিবাহ প্রথার উপরেও কঠোর বিধি-নিষেধ আরোপ করেন।"-(বসওয়ার্থ স্মীথ)

www.amarboi.org

॥ ৬৮ ॥

"বড় লোকদের চরিত্র রহস্যময়, তাদের পদ্ধতি আমাদের অনুসন্ধানের অতীত। আমরা তাদের বিচার করতে পারবো না। যীশুখ্রীস্ট, মুহাম্মদ (সাঃ)-কে কেউ কি বিচার করতে পারে ? ক্ষুদ্র শক্তি। আমরা এসব মহান আত্মার কি বুঝি ? ---------- এ প্রাচীন ব্যক্তিরা সবাই ঈশ্বরের দূত ছিলেন। আমি প্রণত হয়ে তাদের পূজা করি। তাদের পদধুলি গ্রহণ করি। এ মহান ব্যক্তিরা পথের দিকচিহ্ন। এটাই তাঁদের উপযোগিতা। ------------- এঁরা হলেন আলোকের মহৎ বার্তাবহ। ------------------- এঁরা আমাদের মহান শিক্ষক, জ্যেষ্ঠ সহোদর।"-(স্বামী বিবেকানন্দ)

॥ ৬৯ ॥

"জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর চার বছর পর ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে আরবের মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করে যে মানুষটি সমগ্র মানব জাতির উপরে সর্বাপেক্ষা বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তিনিই হচ্ছেন আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।" -(অধ্যাপক ড্রেপার)

॥ ৭০ ॥

"মুহাম্মদ (সাঃ) যাদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তাদের জন্য তিনি ছিলেন বিশ্বস্ততম রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁকে এক নজর দেখামাত্র দর্শকের মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠতো। যে ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে আসতো সে তাকে ভালো না বেসে পারত না। তাঁর সাথে যে ব্যক্তি সাক্ষাত করতো সে স্বীকার না করে পারতো না যে, 'পূর্বে কিংবা পরে তার মত আর কাউকে দেখি নাই।' তিনি ছিলেন নিতান্ত স্বল্পভাষী। কিন্তু যখন তিনি কথা বলতেন, এত সুন্দর ও স্বচ্ছভাবে বলতেন যে, সে বক্তব্য কারো পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব হতো না। অস্পষ্টতা ও অনিশ্চয়তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত কুরআন, স্রষ্টার একত্বের একটি মহিমান্বিত দৃষ্টান্ত। পার্থিব ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেও মুহাম্মদ (সাঃ) রাজকীয় জৌলুসের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। বস্তুত কেবলমাত্র স্রষ্টার কিংবা তার ফিরিশতাদের পক্ষেই মানবজাতির বিশ্বাসের উপর এরূপ আইনসম্মত রাজদণ্ড পরিচালনা করা সম্ভব।"-(এডওয়ার্ড গীবন)

॥ ৭১ ॥

"তিনি ধারণার ধীশক্তিতে, মানসিক উৎকর্ষে এবং বিনম্র সৌহার্দপূর্ণ মহতী ক্ষমতায় বিভূষিত ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা যায়, তিনি ছিলেন পর্দানশীন

www.amarboi.org

কুমারীর চাইতেও লাজনম্র। তিনি ছোটদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সদয়। তিনি তাদের কখনো সামান্যতম তিরস্কার পর্যন্ত করতেন না। তার ভৃত্য আনাস বলেছেন ঃ আমি দশ বছর রাসূলের সঙ্গে ছিলাম, কিন্তু কোনোদিন তিনি আমার প্রতি 'উহ্' পর্যন্ত উচ্চারণ করেন নাই। তিনি তার পরিবারের প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। সন্তানদের প্রতি ছিলেন সবিশেষ স্নেহশীল। রাস্তাঘাটে ছেলে-মেয়েদের দেখা পেলে তিনি তাদের মাথায় ও মুখে আদরের হাত বুলাতে কখনো ভুল করতেন না। জীবনে তিনি কাউকে আঘাত দেননি। বিরক্তি প্রকাশের জন্য তিনি বড়জোর বলতেন, 'তার হলোটা কি? তার কপালে কাদামাটি লাগুক।' কাউকে যদি অভিসম্পাত করার কথা তাকে বলা হতো তাহলে তিনি বলতেন, 'অভিশাপ দেয়ার জন্য নয়, বরং মানব জাতির রহমত হিসাবে আমাকে পাঠানো হয়েছে।' তিনি পীড়িতের সেবা করতেন, মৃতের দাফনে অংশগ্রহণ করতেন, নিজেই নিজের কাপড়-চোপড় ধুইয়ে নিতেন, ছেঁড়া জামা-কাপড় নিজ হাতে সেলাই করতেন, ছাগল দোহাতেন, নিজেই নিজের সকল কাজকর্ম করতেন। স্বল্পভাষিতা ছিল তার আর একটি স্বভাব। করমর্দনকালে তিনি কখনই নিজের হাত আগে ছাড়িয়ে নিতেন না এবং একত্রে দণ্ডায়মান অপর ব্যক্তি রওয়ানা না হওয়া পর্যন্ত সে স্থান ত্যাগ করতেন না।"

–(স্টেনলি লেনপুল)

॥ ৭২ ॥

"মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিষ্টাচার ছিল মহত্তম। তিনি ছিলেন বিনীত ও অমায়িক এবং তার আচরণ ছিল বিচারের উর্ধে। এতসব কারণেই তিনি সম্মানিত হয়েছিলেন, শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম লাভ করেছিলেন এবং সকলের স্বীকৃতি লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর বুদ্ধি-বিবেচনা অপরের প্রত্যয় অর্জন করতো এবং আদেশ ও নির্দেশদানের ব্যাপারে তার যোগ্যতা ছিল সকলের নিকট গ্রহণীয়। সাধারণ অর্থে লেখাপড়া না জানলেও বিশ্ব প্রকৃতিকে এত গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন যে, তিনি শত্রুদের সূক্ষ্মতম ধূর্তামীপূর্ণ মনোভাবও অতি সহজে অনুধাবন করতে এবং আপন অনুসারীদের সামান্যতম আশংকাও বুঝতে পারতেন। তার বাচনভঙ্গী ছিল অত্যন্ত মধুর ও ভালবাসাময়। কথা বলার কালে তার চেহারায় এত সুন্দর নমনীয়তা ফুটে উঠতো যে, তার ফলে তাঁর দৃঢ়তা ও আবেগ-প্রবণতা বুঝে উঠা সহজ হতো। তিনি এতই শক্তিশালী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন যে, শিক্ষিত-অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর মানুষকেই তিনি সমভাবে প্রভাবান্বিত করতে সক্ষম হতেন। বন্ধু হিসাবে যেমন, অভিভাবক হিসাবেও তেমনি তিনি মনের কোমলতার অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করে গেছেন। এত মায়া-মমতাপূর্ণ ও আবেগভরা হৃদয়ের অধিকারী হয়েও কিন্তু তিনি পারিবারিক

www.amarboi.org

ও সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনের বেলায় কখনই নুবুওয়াতের কোনো অমর্যাদা করেননি। একটি মহৎ মনের সমস্ত সারল্য নিয়েই তিনি সকল কর্ম সম্পাদন করতেন। শব্দ প্রয়োগের শত চাতুর্যেও কেউ তার ধৈর্যশীলতা ও সহ্যগুণের বাঁধ ভাংতে পারত না। সারা আরবের একচ্ছত্র অধিপতি হয়েও তাকে দেখা যায়—নিজ হাতে জামা-কাপড়, এমনকি ছেঁড়া জুতা পর্যন্ত সেলাই করেছেন, উষ্ট্রী দোহন করেছেন, ঘর ঝাট্ দিয়েছেন এবং বাতি ধরাচ্ছেন। তার নিয়মিত খাদ্য ছিল খেজুর আর পানি। দুধ ও মধু ছিল তার বিলাসিতার বস্তু। সফরের সময় তিনি তার মুষ্টি পরিমাণ খাদ্যও ভৃত্যের সঙ্গে ভাগ করে খেতেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর শূন্যগর্ভ বাক্স-পেটরাগুলোই তার সততা ও বদান্যতার প্রমাণ বহন করেছে।"-(জন দাভেন পোর্ট)

॥ ৭৩ ॥

"আমি বিশ্বাস করি বর্তমান শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্য সংস্কারকৃত ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ করবে। (এ অভিমতের পক্ষে যুক্তিদান করে লেখক আরো বলেন) বিস্ময়কর গুণাবলীর জন্য আমি সবসময় হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে আসছি। আমার মতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা জগতের পরিবর্তনশীলতার সাথে খাপ খেয়ে চলার ক্ষমতা রাখে। এ ধর্ম সকল যুগের উপযোগী। দুনিয়ার মানুষদের, আমার মত মানুষের কথায় গুরুত্ব দেয়া উচিত। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্ম সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে, ইদানিং এ ধর্ম ইউরোপের নিকট যেমন গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে, আগামীতেও তা তেমনি আরো গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। অজ্ঞতার কারণেই হোক কিংবা গোঁড়ামীর দরুনই হোক, মধ্যযুগের পাদ্রী-পুরোহিতেরা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চেহারায় যথেচ্ছভাবে কালিমা লেপন করেছে। আসলে মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর ধর্মের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াবার জন্যেই তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো। তাদের নিকট মুহাম্মদ (সাঃ) ছিলেন খ্রীস্টধর্ম-বিরোধী। আমি গভীরভাবে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করেছি এ বিস্ময়কর মানুষটিকে এবং আমার মতে খ্রীস্টধর্ম বিরোধী হওয়া তো দূরের কথা, তাকে মানবতা ও মনুষ্যজাতির ত্রাণকর্তা হিসাবে আখ্যায়িত না করে উপায় থাকে না। আমি বিশ্বাস করি, যদি তাঁর মত কোনো মানুষ আধুনিক জগতের সর্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করতেন, তাহলে তিনি এমনভাবে এ পৃথিবীর যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে দিতেন—যার মাধ্যমে ধরাধামে চিরাকাংখিত সুখ ও শান্তি নেমে আসতো। মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মতাদর্শ ইউরোপকে মুগ্ধ-বিমোহিত ও আবেগ-উদ্বেল করতে শুরু করেছে। আগামী

www.amarboi.org

শতাব্দীতে ইউরোপ তার সমস্যাদির সমাধান করতে গিয়ে এ মতাদর্শের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতাকে আরো গভীরভাবে উপলব্ধি করবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে আপনাদের অবশ্যই আমার অভিমত সমর্থন করতে হবে। ইতিমধ্যে আমার দেশবাসী এবং ইউরোপের অনেকেই মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। কাজেই বলতে বাধা নেই যে, ইউরোপের ইসলামাইজেশন বা ইসলামীকরণ শুরু হয়ে গেছে।"-(জর্জ বার্নার্ডশ)

---

www.amarboi.org

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইসলাম

১. ইসলামের বুনিয়াদ

ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি হলেও এগুলোর মূল কিন্তু একটি। আর তাহলো, আল্লাহর একত্বে আন্তরিক ও নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্বাস, তার প্রকাশ্য স্বীকৃতি এবং তদনুযায়ী বাস্তব আমল।

ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের দাবী হলো কথায়, কাজে, প্রকাশ্যে, গোপনে, দিনে, রাতে—সর্বক্ষণই একই আল্লাহর বন্দেগীতে নিজেকে সমর্পিত রাখা। ইসলামের এ পঞ্চ বুনিয়াদ হলো বান্দার ঈমানের যথার্থতা ও শুদ্ধাশুদ্ধি যাঁচাই করার কষ্টিপাথর। এর উপরই নির্মিত হয়েছে ইসলামের অনবদ্য ইমারত। অতএব যে ব্যক্তি এর কোনো একটি বুনিয়াদের প্রতি উপেক্ষা বা অবহেলা প্রদর্শন করল সে যেন ইসলামকে তথা এর বুনিয়াদকে ধ্বংস করার কাজে সক্রিয় ভূমিকা পালন করলো।

এ সত্যটুকু যাদের জানা নেই তারা মনে করে, ইসলাম কেবলমাত্র কালিমাহ্ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'-এর উপরই ভিত্তিশীল। তাদের মতে নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদি রুকনসমূহ আনুষঙ্গিক বিষয় মাত্র। কাজেই এগুলোকে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ মনে করাটা দোষের কিছু নয়। তাদের এ ভ্রান্ত ধারণার বিষফল এই দাঁড়িয়েছে যে, তারা এসব বুনিয়াদের উপর আমল বর্জন করে কেবল 'নামকা ওয়াস্তে' মুসলমান রয়ে গেছে।

প্রকৃতপক্ষে মুসলমান নামধারী এসব মানুষের অন্তর ঈমানশূন্য। তাদের অন্তরে ইসলামী মূল্যবোধের সেই নিখুঁত চিত্র অনুপস্থিত, যা তাদেরকে অন্যায় থেকে ফিরিয়ে ন্যায়ের পথে চালিত করবে। আর এ কারণে আমাদের সমাজ-জীবনও আজ ইসলামী মূল্যবোধের বিপরীত মতাদর্শ ও মতবাদের পংকিলতায় বিপর্যস্ত। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আল্লাহর একত্বের, মৌখিক স্বীকৃতির পর আল্লাহর পক্ষ থেকে আরোপিত ফরয-ওয়াজিবসমূহ পালন না করা মূলতঃ ঐ স্বীকৃতিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করারই নামান্তর। এটি একটি ইবলিসী আচরণ ছাড়া কিছু নয়। কেননা ইবলীস আদমকে কার্যত সিজদা করতে অস্বীকার করেছিল—অথচ সেও জানে যে, আল্লাহ্ একক, তার কোনো

www.amarboi.org

শরীক নেই। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর হুকুম পালন করা ওয়াজিব—এ বিশ্বাস তারও ছিল, কিন্তু কার্যত সে এর প্রমাণ দেয়নি।

আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হয় তাকে অস্বীকৃতির দরুন অথবা তার অবাধ্যতার কারণে কিংবা তার প্রতি অনীহা-উদাসীনতার কারণে। আর এর প্রত্যেকটিই ঈমানী চেতনার পরিপন্থী।

ইসলাম মানুষের আত্মশুদ্ধির একটি পরিপূর্ণ ব্যবস্থাপত্র। আত্মম্ভরিতা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে বিরত থাকা এবং খোদায়ী নির্দেশের সামনে নত থাকার জন্যই ইসলামের প্রত্যেকটি রুকন পালন করা মানুষের জন্য ফরয। কেননা আত্মশুদ্ধির এ ব্যবস্থাপত্র পুরোপুরি মেনে না চললে তা থেকে আত্মিক রোগ নিরাময়ের আশা করা যায় না।

যে গৃহটি পাঁচটি খুঁটির উপর দাঁড়ানো, তার কোনো একটি খুঁটি বিনষ্ট করার অর্থই হলো গোটা গৃহটি ভেঙ্গে দেয়া।

উপরোক্ত কারণেই আল্লাহ তাআলা ঐ সকল (ঈমান আনয়নকারী) মানুষকেও 'দ্বীন প্রত্যাখ্যানকারী' ও 'দুর্ভোগের শিকার' আখ্যা দিয়েছেন, যারা ইসলামের নির্দেশিত কাজসমূহের প্রতি উদাসীন। আর যখন তারা তা করে তখন আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নয়, বরং লোক দেখানোর জন্যই করে। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝ (الماعون : ١-٧)

"তুমি কি দেখেছ তাকে, যে দ্বীনকে প্রত্যাখ্যান করে ? সে তো সে-ই, যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না। সুতরাং দুর্ভোগ সেই নামাযীদের, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সাহায্যদানে বিরত থাকে।"-(সূরা আল মাউন ঃ ১-৭)

২. প্রকৃতির ধর্ম

ইসলাম হচ্ছে দ্বীনে ফিতরাত তথা প্রকৃতির ধর্ম। আর যে কোনো ধর্মের ফিতরী বা প্রকৃতিমুখী হওয়াটা তার চিরন্তনতার বড় প্রমাণ। যে ধর্মের আইন-

www.amarboi.org

কানূন ও রীতিনীতি স্বভাবসুলভ তথা প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ মানানসই সে ধর্ম ক্রমেই উন্নতির দিকে ধাবিত হয় এবং কখনো তা বিলীন হয়ে যায় না। এর যাবতীয় আইন-কানূন ও রীতিনীতি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির মৌলিক চাহিদা-সমূহ পূরণ করে এবং তাদের জীবনে প্রকৃত শান্তি ও স্বস্তি বয়ে আনে।

ইসলামের আইন-কানুন কোনো একটি বিশেষ যুগের জন্য রচিত নয় যে, সে যুগ অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তাতে পরিবর্তন, পরিবর্ধন তথা উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন দেখা দেবে। বরং এটা প্রত্যেকটি যুগ এবং প্রত্যেকটি অবস্থার সাথেই সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ইসলাম সর্বযুগে ও সর্বকালে মানবজাতির জন্য সেই পথেরই সন্ধান দেয়, যে পথে রয়েছে তাদের ইহকালীন ও পরকালীন সত্যিকার শান্তি ও মঙ্গল।

ইসলামের আইন-কানুন প্রেম-ভালোবাসা, শান্তি-শৃঙ্খলা ও ন্যায়নিষ্ঠতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম গর্দানে মেরে মানুষকে সৎপথে নিয়ে আসার কথা বলে না, বরং তাদের মন-মানসিকতায় বিপ্লব ঘটিয়ে অত্যন্ত হিকমতের সাথে তাদেরকে সৎ তথা মঙ্গল ও কল্যাণের পথে নিয়ে আসতে বলে। স্বভাব-সিদ্ধ ধর্ম ইসলামের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, তা প্রায় ক্ষেত্রেই মানুষের কৃতকর্মকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে, তাকে অবকাশ দেয়, যাতে করে সে নিজেই নিজের ভুল সংশোধনের উদ্যোগ নেয়। ইসলাম মানুষের বড় বড় ত্রুটি-বিচ্যুতি, এমনকি তাদের হত্যার অপরাধকেও 'দিয়াত' তথা রক্তমূল্যের বিনিময়ে মাফ করে দেয়। যখন সংশোধনের কোনো পথই বাকি থাকে না, শুধুমাত্র তখনই ইসলাম মানুষের উপর কঠোর শাস্তি প্রয়োগের হুকুম দেয়। ইসলাম শুধুমাত্র সেই সমস্ত লোকের উপর তরবারি চালানোকে অনুমোদন করে যাদের সামনে সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়েছে এবং তারা সত্যকে সত্য বলে স্বীকারও করে নিয়েছে, অথচ সেটাকে গ্রহণ করছে না ; উপরন্তু যারা গ্রহণ করেছে তাদের সামনে নানা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। ইসলামের মতে, শুধুমাত্র ফিতনা-ফাসাদ বন্ধের জন্য এবং বঞ্চিত-নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য তরবারি চালানো যেতে পারে। অর্থাৎ যখন ন্যায়-সত্য প্রতিষ্ঠা ও জুলুম-অত্যাচার বন্ধের আর কোনো পথই অবশিষ্ঠ থাকবে না কেবলমাত্র তখনই তরবারির আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। অন্য কথায়, ইসলাম মানুষের চলার পথ থেকে শুধু কাঁটা দূর করে, তার পাশে প্রস্ফুটিত ফুলের সাথে কোনো সংঘর্ষে যায় না। আর এ ধরনের স্বভাবসিদ্ধ পন্থায় যখন মানুষের অন্তরে ইসলামী আইন-কানূনের নক্শা আঁকা হয়ে যায় তখন সে আপনা-আপনি সত্যের দিকে ধাবিত হয়। কেননা যে কেউ একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বুঝতে পারবে যে, ইসলামী আইনের মধ্যে শান্তি, নিরাপত্তা এবং ইহকাল-পরকালের মুক্তি ও

www.amarboi.org

কল্যাণের যে সুন্দর ব্যবস্থা রয়েছে তা একাধারে স্বভাবসিদ্ধ, সহজবোধ্য ও সহজসাধ্য। স্বভাব-প্রকৃতি অনুযায়ী ইসলাম প্রত্যেকটি মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। ইসলাম পুরুষের দায়িত্ব স্ত্রীলোকের উপর, কিংবা স্ত্রীলোকের দায়িত্ব পুরুষের উপর চাপিয়ে দেয়নি।

বিশ্বজনীন ইসলামী আইনের মূল বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মধ্যে জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায় এবং বিশ্বের প্রত্যেকটি অঞ্চলের জন্য যথোপযুক্ত পথ-নির্দেশ রয়েছে। রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবন পর্যন্ত ছোট বড় প্রত্যেকটি সমস্যারই সমাধান রয়েছে ইসলামে।

ইসলামী আইন অত্যন্ত স্বভাবসিদ্ধ বলে জবরদস্তিমূলকভাবে এটাকে প্রয়োগ করার কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় না। ইসলামের দর্শন এই যে, মানুষ তার কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করে অথবা পুরস্কার লাভ করে—হয় এ জগতে, নয়ত পর জগতে অথবা উভয় জগতে। মানুষ কোনো পাপ করার পর চাতুর্যের আশ্রয় নিয়ে অথবা অন্য কোনোভাবে দুনিয়ার শাস্তি থেকে রেহাই পেলেও আখিরাতের শাস্তি তাকে ভোগ করতেই হবে। অনুরূপভাবে যদি কোনো মানুষ এ দুনিয়ায় তার পুণ্যকর্মের কোনো বিনিময় না পায় তাহলে আখিরাতে নিশ্চয়ই সে তা পাবে। ইসলামের এ নীতি যেমন মানুষকে পাপকর্ম হতে বিরত রাখে তেমনি পুণ্যকর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। ইসলামী আইন ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সাথে গোষ্ঠীগত জীবনেও শান্তি ও মঙ্গল বয়ে আনে। ইসলাম মানুষের পারিবারিক জীবনের জন্য নির্দিষ্ট আইন দিয়েছে, যা একদিকে যেমন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা ও ভক্তিশ্রদ্ধার সম্বন্ধ তৈরী করে অন্যদিকে তেমনি সুস্থ সমাজবন্ধন তৈরীর ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে ইসলাম যে উত্তরাধিকার ও বৈবাহিক আইন দিয়েছে তা এ আধুনিক বিশ্বের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছেই যথার্থ বলে আজ স্বীকৃত। অনুরূপভাবে ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন-কানূনও আজ সর্বমহলের প্রশংসা অর্জন করছে।

ইসলাম যে প্রকৃতির ধর্ম একথার উল্লেখ পবিত্র কুরআনেও রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط

لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ لا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ○

"আল্লাহর প্রকৃতির (দ্বীন ইসলামের) অনুসরণ করো, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন ; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই

www.amarboi.org

সরল দ্বীন (দ্বীনে ফিতরাত); কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"
–(সূরা আর রূম ঃ ৩০)

অতএব যারা দ্বীন ইসলাম তথা আল্লাহর প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী নিজেদের যাবতীয় বিষয়াদির ফায়সালা করে না তারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছে এবং নিজেরাই নিজেদের উপর জুলুম করছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ○(المائدة : ٤٤)

"আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না তারা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৪)

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○(المائدة : ٤٥)

"আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না তারা জালিম।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৫)

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○(المائدة : ٤٧)

"আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী যারা ফয়সালা করে না তারা সত্যত্যাগী।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৪৭)

৩. ইসলাম-প্রচার-পদ্ধতি

কুরআন কারীমে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে আল্লাহর পথে হিকমত (সুবিজ্ঞতা) ও সদুপদেশের মাধ্যমে জনগণকে আহ্বান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ط-(النحل : ١٢٥)

"(হে নবী !) তুমি মানুষকে হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো এবং সদ্ভাবে ওদের সাথে আলোচনা করো।"–(সূরা আন নাহল ঃ ১২৫)

www.amarboi.org

এ আয়াতটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইসলাম প্রচারের পদ্ধতির উপর সুস্পষ্ট আলোকপাত করে। এ থেকে যে বৈশিষ্ট্যসমূহ উদ্ভাসিত হয়ে উঠে তাহলো ঃ

এক ঃ দ্বীনের দাওয়াতের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া। মাক্কী ও মাদানী উভয় যুগেই ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মহানবী (সাঃ) উক্ত পদ্ধতি সর্বদা অনুসরণ করেন। এরই ভিত্তিতে ১৩ বছর মক্কায় অবস্থানকালে বিশেষভাবে ইসলামের মূল স্তম্ভ তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও তাকদীরের বিষয় প্রচার করা হয়। অতপর মাদানী যুগে ধীরে ধীরে প্রচার করা হয় অন্যান্য বিধানসমূহ। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এ পদ্ধতির তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, কুরআন কারীমে যে সূরা প্রথম দিকে অবতীর্ণ হয়, তাতে জান্নাত ও জাহান্নামের উল্লেখ করা হয়। অতপর যখন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয় তখন হালাল ও হারামের বিধান সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হয়। যদি প্রথমেই নিষেধসূচক বিধানাবলী প্রদান করা হতো তাহলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তা মান্য করা কষ্টকর হতো। তারা তা পালনে ইতস্তত করতো, এমনকি তাদের দ্বারা তা অস্বীকারের সম্ভাবনাও ছিলো।–(সহীহ্ আল বুখারী)

মূলত এ পন্থাটির মধ্যে মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য বিকাশের অত্যধিক সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা সংগ্রামের পথে, সহজ থেকে কঠিনের দিকে অগ্রসর হওয়াটাই অধিক ফলপ্রসূ হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমনে প্রেরণ করার সময়ও দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে, ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হওয়ার এ নীতি অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। উক্ত নির্দেশে তিনি বলেন, প্রথমে জনগণকে তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত প্রদান করবে। যদি তারা এটা স্বীকার করে নেয়, তাহলে তাদেরকে নামায শিক্ষা দেবে। যদি তারা এটাও পালন করে, তাহলে তাদেরকে যাকাতের বিধান সম্পর্কে অবহিত করবে।–(সহীহ্ আল বুখারী)

দুই ঃ ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল হিকমত। হিকমত শব্দের বহু অর্থ রয়েছে। তবে আবু হাইয়ান আল-আনদালুসীর (বাহরুল মুহীতের প্রণেতা) ব্যাখ্যাটি সাধারণত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তাঁর মতে, যে কথা বা কর্মপদ্ধতিতে কোনো ব্যাপারে অপরের উপর কোনোরূপ বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় না, স্বভাবতঃ মানুষ যা দ্রুত গ্রহণ করে এবং তাদের জ্ঞান ও অন্তর উভয়ই যা দ্বারা প্রভাবিত হয় সেটাকেই হিকমত বলে। এক্ষেত্রে হুযূর (সাঃ)-এর যে বৈশিষ্ট্য ছিল, তা নিম্নোক্ত ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়।

www.amarboi.org

একদা আরবের প্রখ্যাত জ্যোতিষী যিমাদ আল-আযদী যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বক্তৃতা শুনতে পান, তখন তিনি কুণ্ঠাহীন চিত্তে স্বীকার করেন যে, এরূপ বাণী রচনা কোনো জ্যোতিষী, যাদুকর অথবা কবির পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। অতপর তিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলাম গ্রহণ করেন।-(আহমদ)

প্রখ্যাত কবি ও দাওস গোত্রের নেতা তুফায়ল ইবনে আমর আদ দাওসীও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বাণী শুনে স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, তিনি এর চেয়ে উত্তম বাণী ইতিপূর্বে কখনো শুনেননি।

তিন ঃ নবী করীম (সাঃ)-এর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, মাওয়াইযা-ই-হাসানা। মাওয়াইযা শব্দটির মূল ধাতু ওয়ায। ওয়ায অর্থ কোনো হিত কামনাসূচক কথা ও উপদেশ কারো কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করা, যেন উক্ত উপদেশের কষ্টকর দিকটিও তার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে। 'আল হাসানা' শব্দ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, ঐ বক্তব্যও যেন এমন হয়, যা দ্বারা শ্রোতার অন্তর প্রশান্তি লাভ করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রচারকার্য ও দাওয়াতের রীতি-পদ্ধতি এতই হৃদয়গ্রাহী ও সর্বব্যাপী ছিল যে, নিতান্ত হঠকারী ও একগুঁয়ে লোক ছাড়া সকলেরই অন্তর তাতে আগ্রহী হয়ে উঠত। তার বাণীর এ বৈশিষ্ট্যের কারণে মক্কার কুরাইশরা তাঁকে 'সাহির' (যাদুকর) বলে আখ্যায়িত করতো। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, যেমন আবু জাহল, আবু সুফইয়ান ও আল আখনাস ইবনে শারীক-এর মত কট্টর কাফিরও রাত্রির অন্ধকারে গোপনে আল্লাহ্ তাআলার কালামের অনবদ্য ভাষা শ্রবণ করে তাতে সম্মোহিত হয়ে উঠতো।

চার ঃ মহানবী (সাঃ)-এর চতুর্থ বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বোত্তম পন্থায় প্রতিপক্ষের মুকাবালা করা। কুরআন কারীমে এ মুকাবালার দু'টি ধরন বর্ণনা করা হয়েছে। যথা ঃ (১) সর্বোত্তম মুকাবালা ও (২) অন্যায়-অসঙ্গত (বাতিল) মুকাবালা। অন্যায়-অসঙ্গত মুকাবালা কাফের-মুশরিকরাই করতো। আর তা এই যে, কোনো যুক্তি-প্রমাণ ব্যতিরেকে আপন অভিমতে অটল থাকা, মৌল বিষয়বস্তুকে অযথা অসংলগ্ন কথায় জড়িয়ে ফেলা, অযৌক্তিক বক্রোক্তি এবং কষ্টকল্প বিষয়ের অবতারণা করে অহেতুক সময় নষ্ট করা। এটা ছিল সর্বকালের ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের পদ্ধতি। পক্ষান্তরে সত্যাবলম্বীদের প্রতি সর্বপ্রথম নির্দেশ এই যে, যথাসম্ভব কোনো বিষয়কে কলহ-বিবাদে পরিণত হতে দেবে না। যদি মুকাবালা করতেই হয়, তবে সর্বোত্তম পন্থায়ই মুকাবালা করবে। অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা দাওয়াতের পদ্ধতির প্রতি ইংগিত করেছেন। আয়াতটির শিক্ষা হলো ঃ শ্রোতার সম্মুখে প্রথমে এমন বিষয়গুলো উপস্থাপন করবে যেগুলোর মৌলিকতা এক ও অভিন্ন এবং যা নীতিগতভাবে সর্বসম্মত। [সূরা আলে

www.amarboi.org

ইমরান ঃ ৬৪] শ্রোতাকে আন্তরিকভাবে আপন মতবাদে আকৃষ্ট করতে হলে আস্থা, ভালবাসা, সদ্ব্যবহার ও সুন্দর যুক্তি-প্রমাণের মাধ্যমে তা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মদীনায় অবস্থানকালে ইয়াহূদী ও নাজরানের অধিবাসী খ্রীস্টানদের সাথে অনুষ্ঠিত তাঁর এ ধরনের বিতর্কমূলক আলোচনা হচ্ছে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পাঁচ ঃ রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল 'কাওল-ই-লায়্যিন'। কাওল-ই-লায়্যিন অর্থ নম্র কথা। একজন দ্বীন-প্রচারকের কথায় নম্রতা থাকা একান্ত অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে এ সদ্গুণ ও বৈশিষ্ট্যটি পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান ছিল। কুরআন মজীদে তাঁর এ গুণটির উল্লেখ করে বলা হয়েছে ঃ

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص (ال عمران : ١٥٩)

"আল্লাহর রহমতে তুমি তাদের প্রতি নম্র হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতে, তবে তারা তোমার কাছ হতে সরে পড়তো।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

রাসূলে করীম (সাঃ) প্রায় ক্ষেত্রেই শত্রুর প্রতি যে অপরূপ দয়া, সৌহার্দ্য ও নম্রতা প্রদর্শন করেছেন, তা বিশ্ব ইতিহাসের এক একটি অনন্য দৃষ্টান্ত। এরই ফলে আবূ সুফইয়ান ইবনে হারব, ইকরামা ইবনে আবী জাহল, আমর ইবনে ওয়াহাব আল জুমাঈ, হিন্দ বিনতে উতবা, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার ন্যায় বহু বিরুদ্ধ মতাবলম্বী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিও শেষ পর্যন্ত তার গুণ-মুগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি আপন প্রাণের শত্রুকেও নম্র ও মাধুর্যপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা নিজের ও ইসলামের ভক্ত-অনুরক্তে পরিণত করেছিলেন।

ছয় ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দ্বীন প্রচারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল 'তালীফ-ই-কালব' বা অন্যের সন্তুষ্টি বিধান ও হৃদয় জয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোনো কোনো অমুসলিম বা নও-মুসলিমের সাথে এ উদ্দেশ্যে বিশেষ সৌজন্যমূলক আচরণ করতেন, যেন তারা এর আলোকে ইসলামকে সহানুভূতি ও সদাচারের একটি উজ্জ্বল আদর্শ বলে ভাবতে শেখে। মক্কা বিজয়ের সময় ইতিপূর্বেকার সকল শত্রুর প্রতিই তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ঐ ঘোষণাটি শত্রুদের অন্তর জয় করার পক্ষে খুবই সহায়ক হয়। এরই ফলে মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই দু' হাজার কুরাইশ ইসলাম গ্রহণ করে। হুনাইনের যুদ্ধে বিজয় লাভের পর তা হতে প্রাপ্ত গনীমতের এক বিরাট অংশ তিনি নও-মুসলিমদেরকে দান

www.amarboi.org

করেন। এরও উদ্দেশ্য ছিল ওদের মনকে ইসলামের প্রতি সুদৃঢ় করা। ঐ গনীমত হতে তিনি আবু সুফইয়ান ও তার সন্তানদেরকে ৩০০ উট ও ১২০ আওকিয়া রৌপ্য, হাকীম ইবনে হিযামকে ২০০ উট, হারিস ইবনে হিশামকে ১০০ উট, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে ১০০ উট, কায়স ইবনে আদীকে ১০০ উট, সুহায়ল ইবনে আমরকে ১০০ উট, আকরা ইবনে হাবিসকে ১০০ উট, উয়ায়না ইবনে হিস্‌ন ফাযারীকে ১০০ উট এবং মালিক ইবনে আওফকে ১০০ উট প্রদান করেন। এছাড়াও তিনি অনেককে ৫০টি করে উট প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঐ বদান্যতা ঐসব লোককে ইসলামের প্রতি অধিকতর নিষ্ঠাবান করে তুলেছিল।

সাত ঃ দ্বীন প্রচারের ক্ষেত্রে নবী করীম (সাঃ)-এর আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তার ভালবাসা ও দয়াদ্রতা। তাঁর সাথে যারা লেনদেন, উঠাবসা ও চলাফেরা করেছিলেন তারা সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, তিনি ছিলেন প্রেম-প্রীতি ও করুণার একটি বাস্তব নিদর্শন। প্রাথমিক পর্যায়ে পথভ্রষ্ট জনগণ সত্য পথে না এলে তাতে দয়ালু নবী খুবই দুঃখ পেতেন। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন ঃ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ـ

"ওরা এ বাণী বিশ্বাস না করলে, সম্ভবত ওদের পিছনে ঘুরে তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে।"-(সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ৬)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পর্কে সাহাবা-ই-কিরামের মন্তব্য ছিল এই যে, কেউ তাকে হঠাৎ দেখলে তাঁর ব্যক্তিত্বে সম্মোহিত হয়ে যেত। আর যে জ্ঞাতসারে তাঁর সাথে মেলামেশা করতো, সে তাঁকে ভালবাসতেই থাকতো। জনৈক সাহাবী বলেন, আমি তার চেয়ে অধিক মুচকি হাসতে কাউকে দেখিনি। এ হাদীস থেকে সমাজ ও মানব-স্বভাব সম্পর্কে তাঁর গভীর প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর যে গুণটি সর্বাধিক অবদান রেখেছে, তাহলো তাঁর ক্ষমা, মার্জনা ও চারিত্রিক মহত্ত্ব। তিনি আপন প্রাণের শত্রুকেও নিঃশর্তভাবে ক্ষমা করে দিতেন। এমনকি, যারা তাকে হত্যা করতে এসেছিল, তাদেরকেও তিনি ক্ষমা করেছেন। তায়েফবাসীদের নির্মম জুলুম-নির্যাতনের পরেও তিনি তাদেরকে এই বলে ক্ষমা করে দেন যে, যদি এরা ঈমান নাও আনে, আমি আশা করি, এদের সন্তানেরা ঈমান এনে নিজেদের জীবনকে ধন্য করবে। উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা তাঁকে রক্তাক্ত দেখে মুশরিকদের জন্য তাঁকে

www.amarboi.org

বদ্-দুআ করতে বললে দয়ার অনন্য প্রতীক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ ! আমার সম্প্রদায়কে হিদায়াত দান করুন, কারণ তারা বুঝে না।' আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারহ্, ইকরামা ইবনে আবী জাহল, আবু সুফইয়ানের স্ত্রী হিন্দ, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া, ওয়াহ্শী ইবনে হারব প্রমুখকে তাঁর ক্ষমা করে দেয়াটা ক্ষমার ইতিহাসে এক একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। এতদ্ব্যতীত ধর্ম প্রচারে তাঁর দৃঢ় কর্মনীতি ও তার অনুসৃত একক কর্মপদ্ধতি মানুষের অন্তরাত্মা ও চিন্তাধারাকে তার দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে বিশেষভাবে সহায়ক হয়।

এক কথায় বলতে গেলে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সমগ্র জীবন ছিল একজন নিবেদিত প্রাণ দায়ী' ও মুবাল্লিগের (সত্যের আহ্বায়ক ও প্রচারকের) জীবন। ইসলামী বিপ্লবের সাফল্যের পিছনে যে হেতুটি সর্বাধিক কাজ করেছিল তাহলো তাঁর নিরবচ্ছিন্ন প্রচার-তৎপরতা। আর এর ভিত্তি ছিল মানুষের মন-মানসিকতাকে গভীরভাবে অধ্যয়ন। সকলকে 'একই লাঠিতে তাড়াবার নীতি' তাঁর দাওয়াতী জীবনে গৃহীত হয়নি। বরং পরিস্থিতি ও ব্যক্তি-প্রকৃতির প্রেক্ষিতে তাঁর দ্বীন প্রচারের পদ্ধতি পরিবর্তিত হতো। তিনি মানুষের সাথে তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধি অনুযায়ী কথা বলতেন। তিনি প্রত্যেকের সাথে তার মর্যাদা অনুযায়ী সদ্ব্যবহার করতেন। তিনি সহাস্য বদনে সকলের সাথে মেলামেশা করতেন। শ্রোতা কখনো রূঢ় স্বভাবের পরিচয় দিলেও তিনি তাতে কখনো রুষ্ট হতেন না। কেউ অশালীন ব্যবহার করলে তিনি তা নীরবে সহ্য করতেন। একদা তিনি এক ব্যক্তিকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলে সে উত্তরে বলে, আপনার সাথে আমি সকল বিষয়ে একমত, তবে অমুক অভ্যাসটি আমি ছাড়তে পারবো না। তার ঐ কথাটি শুনে কয়েকজন সাহাবী অসন্তুষ্ট হন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মুচকি হেসে তাকে নিকটে ডেকে এনে নম্রভাবে উক্ত কাজের কুফল বুঝিয়ে দেন। ফলে সে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। এক বেদুঈন মসজিদ-ই-নববীতে পেশাব করতে থাকলে সাহাবা-ই-কিরাম (রাঃ) তাকে প্রহার করতে উদ্যত হন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তা হতে তাদেরকে নিরস্ত করেন। যখন ঐ লোকটি পেশাব করা শেষ করলো তখন হুযুর (সাঃ) অত্যন্ত নম্রতা ও আন্তরিকতার সাথে তাকে মসজিদের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত করান। একদা দামাম ইবনে সালাবা নামক জনৈক বেদুঈন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে এসে তাঁকে শক্ত শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, সত্যিই আপনি কি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হতে প্রেরিত ? তিনি ধৈর্য সহকারে সহজভাবে উত্তর দেন, হ্যাঁ। লোকটি অতপর রুক্ষভাবে আরো কয়েকটি প্রশ্ন করলে তিনি পূর্ণ ঔদার্যের সাথে সেগুলোরও উত্তর দেন। উপরন্তু লোকটি চলে গেলে তিনি তার রুক্ষতার সমালোচনা না করে বরং তার সারল্য ও নিষ্ঠার প্রশংসা করেন।

www.amarboi.org

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে কেবল একজন 'নেতা' ও 'হিরো' (বীর) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, উক্ত দুটি পদবীর কোনোটিই তার ক্ষেত্রে হুবহু প্রযোজ্য নয়। কারণ তিনি ছিলেন মূলত একজন নবী ও রাসূল, যিনি আল্লাহ তাআলার মনোনীত ও সমর্থন-প্রাপ্ত। বিশ্বের অন্যান্য নেতার ন্যায় তাঁর উদ্দেশ্য পার্থিব ও জাগতিক ছিল না। বরং তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল আধ্যাত্মিক। উপরন্তু কোনো নির্দিষ্ট দল বা গোষ্ঠীর জন্য নয় বরং তিনি সর্বকালের ও সমগ্র বিশ্বের জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন।

৪. ইসলামের নামকরণ

ইসলামই হচ্ছে বিশ্বের একমাত্র ধর্ম, যার নামকরণ করা হয়েছে তার জীবনাদর্শ, আকীদা এবং জীবনব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে। অন্যান্য যত সব ধর্ম আছে প্রধানত সেগুলোর নামকরণ করা হয়েছে তাদের প্রথম প্রবর্তক কিংবা সংশ্লিষ্ট দেশ কিংবা সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায় অথবা জনগোষ্ঠীর নামে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ইয়াহূদী ধর্ম ইয়াহূদার দিকে সম্পর্কিত। আর ইয়াহূদা ছিল ইসরাঈলী নবী-পরিবারের জনৈক সদস্যের নাম। আর ঈসায়ী ধর্ম হচ্ছে হযরত ঈসা (আঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে পার্সী ধর্ম (অগ্নি উপাসকদের ধর্ম) পারস্য তথা ইরান দেশের দিকে সম্পর্কিত। হিন্দু ধর্ম 'হিন্দ' তথা ভারতবর্ষের দিকে সম্পর্কিত। আর বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত তার প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের দিকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম, যা একটি জীবনব্যবস্থা, একটি আকীদা ও একটি নুবুওয়াতের প্রতি সম্পর্কিত। ইসলাম সরাসরি আল্লাহর পথপ্রদর্শন এবং তার প্রদত্ত আদেশ-নির্দেশ তথা শরীয়তের দিকে সম্পর্কিত। অন্য কথায় ইসলাম হচ্ছে এমন একটি ধর্ম, যা সার্বিকভাবে আকীদা ও জীবনব্যবস্থা কেন্দ্রিক। আর এটাই হচ্ছে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ইসলামের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

ইসলাম শুধু আকীদা বা ইবাদাত-বন্দেগীর নাম নয় বরং তা মানুষের একটি সর্বাঙ্গীন জীবনব্যবস্থাও বটে। অতএব সর্বাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ইসলামের শতকরা শত ভাগ হুকুম-আহকাম ও রীতিনীতি পালন করতে হয়। এতে কারো জন্য কোনো ছাড়, ব্যতিক্রম বা কনসেশন নেই।

www.amarboi.org

কোনো কোনো ধর্ম এমন আছে যেগুলোতে শুধুমাত্র যেনতেনভাবে একটি আকীদা মেনে চললেই হয়। নিয়মিতভাবে কোনো ইবাদাত-বন্দেগী করতে হয় না। আর করলেও বর্ণ বিশেষের লোককে তা করতে হয়। সকল বর্ণের সকল লোকের উপর এ ব্যাপারে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। কোনো কোনো ধর্ম এমন আছে, যেখানে দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয় আইন-কানূন মেনে চলাটা শুধুমাত্র যাজক-পুরোহিতদের জন্য বাধ্যতামূলক মনে করা হয় এবং অন্যান্য সকল লোকের জন্য তা মেনে চলাটা কোনো জরুরী বিষয় বলে মনে করা হয় না।

কিন্তু যেহেতু ইসলাম হচ্ছে সকল মানুষের জীবনব্যবস্থা তাই রাজা-প্রজা, ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অভিজাত-অনভিজাত নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষকে তা সর্বাবস্থায় ও সর্বোতভাবে পালন করতে হবে। শুধু আকায়িদ বা ইবাদাতের ক্ষেত্রে নয়—পারিবারিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলামের যে নীতি ও আদর্শ রয়েছে তাও সবাইকে বিনা দ্বিধায় মেনে চলতে হবে। কেননা মানুষকে শতকরা শত ভাগ একজন মানুষ হিসাবে জীবন ধারণ করাটা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর তা করতে হলে তাকে আল্লাহ-প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা শতকরা শত ভাগই মেনে চলতে হবে।

কিন্তু একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত আজ মুসলমানরাও ইসলাম-অনুসরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ছাড় ও ব্যতিক্রম চালু করার প্রয়াস পাচ্ছে। তাদের কেউ কেউ ইসলামের আকায়িদ ও ইবাদাত-বন্দেগীর দিকটি মানে বটে, তবে এর পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিকটি মানে না। তারা তাদের এ মানা ও না-মানার পক্ষে বিভিন্ন কারণ এবং অজুহাত পেশ করে থাকে।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে মানার বাস্তব দৃষ্টান্ত মিলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও তার সাহাবা কিরাম (রাঃ)-এর জীবনে। অতএব ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে মানতে হলে সে জীবনই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবা কিরাম (রাঃ)-এর শুধু আকীদা ও ইবাদতের দিকটি মেনে চললে হবে না, তারা কিভাবে তাদের পারিবারিক জীবন যাপন করতেন, কিভাবে বিয়ে-শাদী করতেন, কিভাবে আহার-বিহার করতেন, কিভাবে তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সামাধান করতেন, কিভাবে দুনিয়ার উপর দ্বীনকে প্রাধান্য দিতেন— এক কথায়, কুরআন ও হাদীসের আলোকে তারা কিভাবে তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন করতেন তা আমাদের জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। ইসলামের প্রকৃত অর্থ আল্লাহর আনুগত্য।

www.amarboi.org

অতএব প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদেরকে আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে। যদি আমরা তা না করি অর্থাৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে আল্লাহর আনুগত্য না করে নিজেদের খেয়ালখুশী মত চলি তাহলে বুঝতে হবে, আমরা সেক্ষেত্রে আমাদের চিরশত্রু শয়তানের প্ররোচনায় পড়েছি এবং তার পদাংক অনুসরণ করছি। এক্ষেত্রে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ص وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطٰنِ ط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥ (البقرة : ٢٠٨)

"হে মুমিনগণ ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২০৮)

৫. ইসলাম ও মানবীয় সম্বন্ধ

দরিদ্র, শ্রমিক, দুর্বল, কৃষক ও সর্বহারা শ্রেণীর নামে আজকের এ আধুনিক বিশ্বের যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক দল, বলতে গেলে অহোরাত্র সংগ্রাম-মুখর রয়েছে। বিশ্বে এমন কোনো রাষ্ট্র, এমন কোনো দল বা এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে কোনো না কোনোভাবে গরীব ও অসহায়দেরকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে না। আমেরিকা-রাশিয়া থেকে শুরু করে ভুটান-বাংলাদেশ তথা বিশ্বের এমন কোনো ছোট-বড় দেশ নেই যেখানে উপরোক্ত শ্লোগান ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, কোথাও সামাজিকভাবে এমনটি পরিলক্ষিত হয় না যে, একজন দরিদ্র ও অসহায় মানুষকে, শুধুমাত্র মানুষ হওয়ার কারণে সাহায্য করা হচ্ছে। বরং প্রায়ই দেখা যায়, সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে কোথাও সাদা-কালো, কোথাও উঁচু নীচ, কোথাও ব্রাহ্মণ-শূদ্র, কোথাও দেশী-বিদেশীর মধ্যে ভেদ-বৈষম্য করা হচ্ছে। কোথাও কোথাও আর কিছু না হলেও স্বধর্মী-বিধর্মী প্রশ্ন উত্থাপন করা হচ্ছে। আর আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের মধ্যে ভেদ-বৈষম্য তো প্রায় ক্ষেত্রেই একটি অলিখিত অথচ অবশ্য পালনীয় নীতি হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে।

হ্যাঁ, শুধুমাত্র ইসলামই এমন একটি প্রতিষ্ঠান, এমন একটি মাযহাব ও দ্বীন, যেখানে সর্বপ্রকার ভেদ-বৈষম্য ও পক্ষপাতিত্বের কথা ভুলে গিয়ে একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে, একজন মানুষকে, শুধুমাত্র তার মানুষ হওয়ার কারণে, সাহায্য প্রদানের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে ঃ

www.amarboi.org

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَآءً ج ـ(النساء : ١)

"হে মানুষ, তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার সংগিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।"–(সূরা নিসা ঃ ১)

ইসলাম আরো ঘোষণা করেছে ঃ

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط ـ(النساء : ١)

"(হে মানুষ,) তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করো যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচ্না করো এবং সতর্ক থাক জ্ঞাতি-বন্ধন সম্পর্কে।"–
(সূরা আন নিসা ঃ ১)

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ইসলামের উপরোক্ত দু'টি ঘোষণা সম্পর্কে যদি চিন্তা করা যায় তাহলে অনায়াসে বুঝা যাবে, মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বের সমগ্র মানুষকে কী সুন্দরভাবেই না একই সূত্রে গেঁথে দিয়েছেন। অর্থাৎ একই ব্যক্তি হতে তার জোড়া সৃষ্টি করা এবং সে জোড়া থেকে তাদের বংশধরদের—সমগ্র মানব জাতি যাদের অন্তর্ভুক্ত—বিস্তৃতি ঘটানো দ্বারা যেন এ তত্ত্বটি ফাঁস করে দেয়া হয়েছে যে, মানুষে মানুষে সবচেয়ে মজবুত ও মৌলিক সম্বন্ধ এই যে, তাদের সকলেরই পূর্বপুরুষ একই ব্যক্তি অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ)। এ সম্বন্ধের সুবাদে তারা পরস্পরের ভাই। আর এক ভাইয়ের সাথে অন্য ভাইয়ের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখা, তার মঙ্গল সাধন করা এবং প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসার সাথে তার সংসর্গে দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করা চারিত্রিক, সামাজিক ও পার্থিব দিক দিয়ে একান্ত কর্তব্য। তাই আয়াতের দ্বিতীয় অংশে একথার উপরই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, যিনি সমগ্র মানুষের স্রষ্টা তার সম্পর্কে সতর্ক হও এবং তাকে ভয় করে চলো। সাথে সাথে হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার যে সম্বন্ধ সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কেও সাবধান থাক। আর এ সম্বন্ধের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এতবেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারেও তোমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখেন। কেননা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও কারো সম্পর্কে গাফিল থাকেন না।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এ আয়াতের উপর যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখে সে নিজের চেয়ে দুর্বল কোনো মানুষকে কখনো অন্যায়ভাবে কষ্ট দিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে উল্লেখিত আয়াতে মানবিক সম্বন্ধের প্রতি সম্মান

www.amarboi.org

প্রদর্শনের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার বিরুদ্ধাচরণ করা একজন প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়।

হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি এ মানবীয় সম্বন্ধের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করবে আমি তাকে অপমানিত করবো, যে এ সম্বন্ধ ছিন্ন করবে আমিও তার সাথে সম্বন্ধ ছিন্ন করবো, আর যে ব্যক্তি এ সম্বন্ধের প্রতি যত্নবান হবে আমিও তার প্রতি যত্নবান হব।

উপরন্তু ইসলাম একথাও ঘোষণা দিয়েছে যে, শরাফত বা আভিজাত্য জাতি, বর্ণ, বংশ কিংবা ধন-সম্পদের উপর নির্ভর করে না, বরং তা নির্ভর করে তাকওয়া, পরহেযগারী তথা আল্লাহ সম্পর্কে সদাসতর্ক থাকার উপর। যেমন পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ـ (الحجرت : ١٣)

"তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক মুত্তাকী।"–(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৩)

অতএব দুনিয়ায় দুর্বলতার সবচাইতে বড় কারণ যেটি, ইসলাম তার শিকড় কেটে দিয়েছে, আর যাবতীয় ঐসব দরজা বন্ধ করে দিয়েছে যেগুলো দিয়ে অহংকার ও দাম্ভিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং যেগুলোর মাধ্যমে সৃষ্টি হয় ফিতনা-ফাসাদের।

এগুলো শুধু কথার কথা নয়, বরং খোদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এগুলোকে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আপন সাহাবা ও সমগ্র উম্মতের সামনে।

আজকাল আনন্দের মুহূর্তে সাধারণত এরূপ দেখা যায় যে, দরিদ্রদেরকে এড়িয়ে গিয়ে শুধুমাত্র সম্পদশালী লোকদেরকে ভোজের আমন্ত্রণ জানানো হয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, সম্পদশালীদের দেখাদেখি এখন গরীবরাও এ পদ্ধতি অনুসরণ করতে শুরু করেছে। অথচ আল্লাহর রাসূল পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন, ওয়ালীমা তথা বিবাহের আনন্দ উদযাপন উপলক্ষে তৈরী সেই ভোজ সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যাতে বিত্তশালীদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং বিত্তহীনদেরকে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

কতই না সুন্দর হতো এ দুনিয়া, যদি এর সকল অধিবাসী নিজেদের মধ্যে মধুর সম্বন্ধ স্থাপন এবং তা অটুট রাখার ব্যাপারে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের শিক্ষাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করত !

www.amarboi.org

৬. ভেদ-বৈষম্যের মূলোৎপাটনে ইসলাম

আজ সমগ্র বিশ্ব দারুণ অশান্তির সম্মুখীন। জলেস্থলে সর্বত্র শুধু ফাসাদ আর ফাসাদ। উন্নত দেশগুলোর চিন্তাবিদ ও সমাজবিদরা প্রায়ই শান্তি ও সাম্যের শ্লোগান তুলেন বটে, তবে তাদের দেশে যে চরম বর্ণ-বৈষম্য ও ভেদাভেদ নীতি বিরাজ করছে তা এখনো একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত। আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা-কালোর বৈষম্য, ভারতের মত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আর্য-অনার্যের বৈষম্য এবং সেই সাথে সাম্প্রদায়িক, বংশগত ও জাতিগত সংঘর্ষ এমনভাবে বিরাজ করছে যে, সেখানকার মানব-রচিত আইন-কানূন এবং বিকৃত-রহিত ধর্মসমূহ এগুলোর মূলোৎপাটনের ক্ষেত্রে কোনোই অবদান রাখতে পারছে না।

ফিতনা-ফাসাদ, জুলুম-অত্যাচার ও মানবীয় ভেদ-বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে ইসলামের যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তাতে একথা নিসন্দেহে বলা চলে যে, শুধুমাত্র ইসলামী নীতিই বর্তমান বিশ্বের যাবতীয় নতুন-পুরাতন ফিতনা-ফাসাদ ও ভেদ-বৈষম্য দূর করতে পারে। কেননা ইসলামের চোখে মানুষে মানুষে কোনো পার্থক্য নেই। ইসলাম প্রত্যেকটি মানুষের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার তালীম দেয়। ইসলাম মানুষের প্রাণ রক্ষার উপর যে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে তা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। যেমন বলা হয়েছে ঃ

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ط-(المائدة : ٣٢)

"নর হত্যা অথবা দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কার্য করা হেতু ব্যতীত কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষকেই হত্যা করলো।"−(সূরা আল মায়িদা ঃ ৩২)

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ط-(بنى اسرائيل : ٣٣)

"আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করো না।"−(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৩)

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ط-(المائدة : ٣٢)

www.amarboi.org

"কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করলো।"–(সূরা আল মায়িদা ঃ ৩২)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা এবং মানুষকে হত্যা করা জঘন্য পাপ। তিনি আরো বলেছেন, আল্লাহ ঐ ব্যক্তির উপর দয়া করেন না যে অন্যের উপর দয়া করে না।

অন্যায়-হত্যা, জুলুম-অত্যাচার এবং ফিতনা-ফাসাদ কুরআনের দৃষ্টিতে জঘন্য পাপ। পবিত্র কুরআনে মানব-সৃষ্টির যে আকীদা বর্ণিত হয়েছে স্বয়ং তা-ই সাম্য, ন্যায়-বিচার এবং মানবীয় মর্যাদার পাঠ শিক্ষা দেয়। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط (الحجرت : ١٣)

"হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।"–(হুজুরাত ঃ ১৩)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার ঐতিহাসিক বিদায় হাজ্জের খুতবায় ঘোষণা করেছিলেন, "হে মানুষ, সাবধান ! তোমাদের সকলেরই প্রভু এক। কোনো অনারবের উপর কোনো আরবের, কোনো কালোর উপর কোনো সাদার, কিংবা কোনো সাদার উপর কোনো কালোর শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শুধুমাত্র তাকওয়াই হচ্ছে তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী।"

ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সকল ধর্ম ও দর্শনে ক্ষেত্র বিশেষে ভেদ-বৈষম্যের শিক্ষাই বিদ্যমান রয়েছে। ইয়াহূদী জাতি নিজেদেরকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য সব জাতির চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে। সমগ্র বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকে তারা নিজেদের জন্মগত অধিকার বলেই মনে করে। খ্রীস্টানদের মধ্যেও আঞ্চলিক ও বংশগত ভেদ-বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। ভারতে সনাতন ধর্মের অনুসারীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদের মনুস্মৃতিসমূহে ধর্মের দিক দিয়েও ভেদ-বৈষম্যের শিক্ষা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন মনুস্মৃতিতে বলা হয়েছে, 'ব্রহ্মা আপন মুখ থেকে ব্রাহ্মণকে, হাত থেকে ক্ষত্রিয়কে, উরু থেকে বৈশ্যকে এবং পা থেকে শুদ্রকে সৃষ্টি করেছেন।"–(৩১ ঃ ১)

www.amarboi.org

অতএব যে ধর্ম মানব সৃষ্টির আদিতেই ভেদ-বৈষম্য নীতি কার্যকর ছিল বলে ঘোষণা দেয় সে ধর্মের অনুসারীদের কেউ কেউ যদি সংস্কারকের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সাম্যের শিক্ষা প্রদান করেনও, তবু তা প্রকৃতিগতভাবেই তার স্বজাতি ও স্বধর্মীদের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করবে না—করতে পারে না।

অপরদিকে ইসলাম মনুষ্যত্ব ও মানবতার যে শিক্ষা দিয়েছে তা তার মূলনীতির (ধর্মীয় মূলনীতির) অন্তর্ভুক্ত। ফলে দেখা যায়, ইসলামী ফিক্‌হের সর্বত্রই মানবীয় সম্মান ও মর্যাদাকে বহাল রাখা হয়েছে। ইসলামে মানুষের দেহ এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয়ই শুধু নিষিদ্ধ করা হয়নি বরং এ নির্দেশও দেয়া হয়েছে যে, মানবদেহ থেকে আত্মা বের হয়ে যাওয়ার পরও, ঐ দেহের প্রতি পুরোপুরি সম্মান প্রদর্শন করে সেটাকে যেন মাটির অভ্যন্তরে দাফন করা হয়। ইসলাম মানুষের উচ্ছিষ্টকে–চাই সে মানুষ যে কোনো জাতি বা ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হোক—পবিত্র ঘোষণা করেছে। অন্যান্য ধর্মের উপাস্য কিংবা পুরোহিতদেরকে তিরস্কার করার অনুমতি ইসলাম কোনো অবস্থাতেই দেয় না। কোথাও অমুসলিমরা মুসলিমদের উপর জুলুম করলে তার প্রতিশোধ গ্রহণার্থে অপর কোথাও নির্দোষ-নিরপরাধ অমুসলিমদের উপর জুলুম করা ইসলামের দৃষ্টিতে মোটেই বৈধ নয়। পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا قف هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

"কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে ; সুবিচার করবে, এটা তাকওয়ার নিকটতর।"
–(সূরা আল মায়িদা ঃ ৮)

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ
اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف فَلَا
تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ج وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○ (النساء : ١٣٥)

"হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে, আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ, যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং

www.amarboi.org

আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয় ; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে কামনার অনুগামী হবে না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বলো অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে জেনে রাখবে যে, তোমরা যা কর আল্লাহ তার সম্যক খবর রাখেন।”-(সূরা আন নিসা ঃ ১৩৫)

ইসলামী শিক্ষার ফলশ্রুতি এই যে, মুসলমান যতই তার ধর্মের নিকটবর্তী হতে থাকে ততই সে সরে আসে ফিতনা-ফাসাদ ও জুলুম-অত্যাচার থেকে। ইসলামের সত্যিকার কোনো অনুসারী বাড়াবাড়ি, অশান্তি সৃষ্টি, অন্যায়-অবিচার এবং মানবতা ও মনুষ্যত্ববিরোধী কোনো কাজকে কখনো বরদাশ্‌ত করতে পারে না। মুসলমান-নামধারী কোনো সংগঠন যদি অনুরূপ বাড়াবাড়ি করে, মানব সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ায় কিংবা ভেদ-বৈষম্যের সৃষ্টি করে তাহলে অবশ্যই বুঝে নিতে হবে তারা ইসলামের সত্যিকার অনুসারী নয়, বরং নামে মাত্র মুসলমান। অতএব তাদেরকে উপলক্ষ করে ইসলামী নীতির সমালোচনা করা অন্যায় ও অবিচার ছাড়া কিছু নয়।

মোটকথা, আজ বিশ্বব্যাপী যে অন্যায়, অবিচার, বিশৃঙ্খলা এবং ভেদবৈষম্য বিরাজ করছে তার মূলোৎপাটন করতে হলে ইসলামী আদর্শ অনুসরণ করতে হবে, ইসলাম প্রদর্শিত ন্যায়নীতি অনুসরণ করে নতুনভাবে গড়ে তুলতে হবে সমাজ কাঠামো এবং একমাত্র এ পদ্ধতিতেই বিশ্বসমাজে ফিরে আসতে পারে শান্তি-শৃঙ্খলা। আর তখনই বসবাস করতে পারে একজন মানুষ যাবতীয় মানবিক অধিকার নিয়ে আপন সমাজে বা আপন রাষ্ট্রে।

৭. সহজাত বিচার শক্তি

মানুষের মধ্যে যে সহজাত বিবেক-বুদ্ধি বা বিচার শক্তি রয়েছে তা দ্বারা সে অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারে যে, সে তার নিজের স্রষ্টা বা হর্তাকর্তা নয়। অনেক কিছু করার ক্ষমতা তার থাকলেও প্রকৃতপক্ষে সে এমন এক বিরাট শক্তির কব্জায় রয়েছে, যা তাকে অজ্ঞাত অতীত থেকে বর্তমানে নিয়ে এসেছে এবং বর্তমান থেকে অনবরত অজ্ঞাত ভবিষ্যতের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ার মোহে পড়ে মানুষ যখন তার সহজাত বিবেক-বুদ্ধি হারিয়ে বসে কেবলমাত্র সেই মুহূর্ত ছাড়া অন্য সব মুর্হূতেই সে কোনো না কোনোভাবে উপরোক্ত বিরাট শক্তির অস্তিত্ব টের পায় এবং কখনো সাময়িকভাবে আবার কখনো স্থায়ীভাবে তার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এ উপলব্ধি এবং শ্রদ্ধাভক্তিই হচ্ছে ধর্মের মূল ভিত্তি।

www.amarboi.org

কিন্তু এ উপলব্ধি বা বোধশক্তির ক্ষেত্রে যুগে যুগে, দেশে দেশে এবং মানুষে মানুষে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এ তারতম্য একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তার জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রায়শঃ লক্ষ্য করা যায়। আর এটা হয়ে থাকে শুধু বিচারশক্তির পরিপক্কতা বা অপরিপক্কতার কারণে। কখনো দেখা যায়, একজন মানুষ এমন একজন ব্যক্তি বা এমন একটি বস্তুকে তার সৃষ্টিকর্তা বা ভাগ্য-বিধাতা জ্ঞান করছে, যে ব্যক্তি বা বস্তু প্রকৃতপক্ষে অন্যের সৃষ্টি এবং তার ভাগ্যও সম্পূর্ণরূপে অন্যের নিয়ন্ত্রণাধীনে রয়েছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে এখান থেকেই মানুষের ধর্ম দুটি বিপরীত ধারা অবলম্বন করেছে। একটি পৌত্তলিক ধারা এবং অপরটি তাওহীদী বা একত্ববাদী ধারা। যারা শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনগ্রসর তাদেরকে সাধারণত ধর্মের ক্ষেত্রে পৌত্তলিক ধারা অনুসরণ করতে দেখা যায়। তবে এমন লোকও অনেক আছে, যারা পার্থিব সভ্যতা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনগ্রসর হলেও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী হওয়ার কারণে পৌত্তলিক ধারা অনুসরণ করাকে নিজের জন্য একটি অপমানকর বিষয় বলেই মনে করে। আবার কিছু লোক এমন আছে যারা পার্থিব সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রসর থাকা সত্ত্বেও আপন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি তথা সহজাত বিচারশক্তি কাজে না লাগানোর ফলে বংশ পরম্পরায় সেই গতানুগতিক পৌত্তলিক ধারাই অনুসরণ করে চলে। এরা পূজা করে মূর্তি, পাথর, সূর্য, চন্দ্র, তারকা, সাপ, গাছ এবং আরো অনেক কিছুর। কখনো কখনো এরা জীবন্ত মানুষের, আবার কখনো কখনো মৃত মানুষের বা তাদের কবরের পূজা করে থাকে।

তাওহীদপন্থী বা একত্ববাদী ধারাকে বলা হয় দ্বীনে হানীফ। যুগে যুগে আল্লাহর নবীগণ এ দ্বীন বা ধর্মীয় ধারাকে দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। আর এর নামই দ্বীন ইসলাম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মানুষ আত্মিক প্রশান্তি তথা মানসিক সান্ত্বনা লাভের উদ্দেশ্যেই একটি ধর্মীয় ধারা নির্বাচন ও অনুসরণ করে। এ নির্বাচন ও অনুসরণের ক্ষেত্রে ভুল হয়ে গেলে এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে সে ভুল শুধরাতে না পারলে মানুষ কখনো আত্মিক প্রশান্তি তথা ইহ-পরজগতের শান্তি ও মঙ্গল লাভ করতে পারে না।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষের মধ্যে যে সহজাত বিবেক-বুদ্ধি ও বিচার শক্তি রয়েছে তা ঠিকমত কাজে লাগালে সে সঠিক ধর্মীয় ধারা নির্বাচন ও অনুসরণের ক্ষেত্রে ভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয় না। সে ঐ ব্যক্তি বা বস্তুকে আপন সৃষ্টিকর্তা ও ভাগ্যবিধাতা মেনে নিয়ে তার সামনে মাথা নত করে না, যে

www.amarboi.org

প্রকৃতপক্ষে অন্যের সৃষ্টি বা অন্যের অনুগ্রহের পাত্র। সে এমন কাউকে নিজের রিয্‌কদাতা বা জীবনদাতা হিসাবে মেনে নেয় না, যে স্বয়ং অন্যের দেয়া রিয্‌কের মুখাপেক্ষী এবং যার জীবন-মৃত্যু সম্পূর্ণরূপে অন্যের নিয়ন্ত্রাধীন।

যারা ধর্মীয় ক্ষেত্রে পৌত্তলিক ধারার অনুসারী তাদের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে ভক্তির আতিশয্য আছে বটে, কিন্তু সহজাত বিবেক-বুদ্ধির অনুসরণ মোটেই নেই। আর এ কারণেই তারা সৃষ্টিকে স্রষ্টা, রিয্‌ক-প্রার্থীকে রিয্‌কদাতা এবং মরণশীলকে জীবনদাতা ভেবে তার সামনে শ্রদ্ধাবনত হয়ে পড়ে। কিন্তু যারা দ্বীনে হানীফ তথা ইসলামের অনুসারী তাদের ক্ষেত্রে অনুরূপ আচরণ লক্ষ্য করা যায় না। কেননা ইসলাম হচ্ছে একটি সরল দ্বীন—এমন দ্বীন যার মধ্যে আল্লাহর ফিতরাত তথা সহজাত প্রকৃতিকে অনুসরণ করা হয়। আর খোদ আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে 'ফিতরাত' অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا ط فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِىْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ط
لَاتَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ لا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَعْلَمُوْنَ ○

"তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দ্বীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর ফিতরাতের (আল্লাহ্-প্রদত্ত সহজাত প্রকৃতির) অনুসরণ কর, যে ফিতরাত অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন ; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"-(সূরা আর রূম ঃ ৩০)

ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ—ইসলাম অর্থ শান্তি। যিনি সত্যিকার স্রষ্টা, যিনি জীবনদাতা, মরণদাতা ও জগতসমূহের প্রতিপালক, একমাত্র তার সমীপে আত্মসমর্পণ করার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি এবং এর মধ্যেই মানব জীবনের সাফল্য ও স্বার্থকতা। তাইতো পবিত্র কুরআনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে ঃ

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰنِىْ رَبِّىْٓ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ج دِيْنًا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيْفًا ج
وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○ قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعٰلَمِيْنَ ○ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ج وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ○

"বলো, আমার প্রতিপালক আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন—ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ, সে ছিল একনিষ্ঠ এবং সে

www.amarboi.org

মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। বলো, 'আমার নামায, আমার ইবাদাত (কুরবানী ও হাজ্জ), আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তার কোনো শরীক নেই এবং আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম (আমার এ তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি আমিই সর্বপ্রথম অনুগত)।"

–(সূরা আল আনআম ঃ ১৬১-১৬৩)

৮. ইসলামের কতিপয় বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেকটি ব্যক্তি বা বস্তুর কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার দ্বারা তাকে অন্য ব্যক্তি বা বস্তু থেকে পৃথক করা যায়। অনুরূপভাবে দুনিয়ার প্রত্যেকটি দ্বীন ও প্রত্যেকটি ধর্মমতেরও কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

আমরা এখানে দ্বীনে ইসলামের কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবো। তবে এ প্রসঙ্গে যে কথাটি সর্বাগ্রে স্মরণ রাখতে হবে তাহলো, দ্বীনে ইসলাম কোনো তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবি, আইনজীবি, মনোবিজ্ঞানী, দিগ্বিজয়ী বীর, কল্পনাবিলাসী দার্শনিক কিংবা ভাগ্যান্বেষী রাজনৈতিক নেতার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছেনি, বরং পৌঁছেছে সেই আম্বিয়া কিরামের মাধ্যমে, যাদের কাছে আল্লাহর ওহী (বাণী) আসতো এবং হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে যাদের আগমন-ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

দ্বীনে ইসলামের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি একটি আকীদা বা বিশ্বাসের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আর সংক্ষেপে সে আকীদা হলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (সর্বময় কর্তা) নেই, তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই। প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ করে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) পর্যন্ত সকল নবীই মানুষকে এ আকীদা বা বিশ্বাসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা যেমন কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ সহ্য করেননি তেমনি কারো সাথে কোনোরূপ বোঝাপড়া বা আপোষ-মীমাংসায়ও আসেননি। কেননা তাদের মতে, এটাই হচ্ছে মানুষের চরিত্র সংশোধনের এবং তাদেরকে সর্বপ্রকার বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘন থেকে বিরত রাখার আদি ও আসল মাধ্যম। এটাই হচ্ছে সেই উৎস যেখান থেকে প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণধারা নেমে আসে। এটাই সেই কেন্দ্রভূমি যেখান থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় মানুষের উত্থান-পতন ও উন্নতি-অবনতি। এটাই সেই শক্তি, যা অর্জন

www.amarboi.org

করার পর অন্য কোনো শক্তিই মানুষকে বিব্রত বা পরাভূত করতে পারে না। আর একমাত্র এ কারণেই আম্বিয়া কিরাম (আঃ)-এর উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

দু'টি উৎস থেকে উপরোক্ত তথ্য ও তত্ত্বের সত্যতা ও নির্ভরযোগ্যতার বহু দলীল-প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথম উৎস হলো পবিত্র কুরআন, যা এখন পর্যন্ত সর্বপ্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন থেকে সংরক্ষিত আছে এবং নিশ্চিতভাবে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। দ্বিতীয় উৎস হলো, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবন। প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে সেই আদর্শ মানব-জীবন, যার উপর ঐতিহাসিক ও জ্ঞানগত দিক থেকে পুরোপুরি আস্থা রাখা যায়।

এ প্রসংগে সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের সেই আয়াতটি পেশ করা যেতে পারে যাতে হযরত ইবরাহীম (আঃ) তথা আম্বিয়া কিরামের দাওয়াতের মর্মকথাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন—

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ج اِذْ قَالُوْا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰٓؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ز كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ ـ(الممتحنة : ٤)

"তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদাত করো তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে সৃষ্টি হলো শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য, যদি না তোমরা এক আল্লাহর উপর ঈমান আনো।"–(সূরা আল মুমতাহানা ঃ ৪)

পবিত্র কুরআনের সূরা কাফিরূন থেকেও এ আকীদার গুরুত্ব অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। মনে রাখা উচিত যে, সূরা কাফিরূন মক্কায় ঐ সময়ে নাযিল হয় যখন সাধারণ ধারণামতে, কাফিরদের সাথে ইবাদাত-বন্দেগী বা আকীদা-বিশ্বাসের উপর ঝগড়া-বিবাদ না করে ঐ সময় পর্যন্ত তা মুলতবী রাখা উচিত ছিল, যতক্ষণ না মুসলমানরা শক্তিশালী হয়ে উঠে এবং এজন্য একটি অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ঐ সময় কিছু কাফির রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট একটি আপোষ-প্রস্তাবও উত্থাপন করেছিল এই মর্মে যে, 'আমরা আপনার মাবুদের ইবাদাত করি এবং আপনি আমাদের মাবুদের (দেবতার) ইবাদাত করুন। এভাবে একটি মিশ্রিত দ্বীন কায়েম হোক।' কিন্তু দ্বীনে

www.amarboi.org

ইসলামে আকীদার গুরুত্ব এতবেশী যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ওদের ঐ আপোষ-প্রস্তাবের প্রতি মোটেই দৃকপাত করেননি, বরং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পরিষ্কার ঘোষণা করেন ঃ

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْكَٰفِرُونَ ۝ لَآ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝ وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٌ

مَّا عَبَدتُّمْ ۝ وَلَآ أَنتُمْ عَٰبِدُونَ مَآ أَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِىَ دِينِ ۝

"হে কাফিরগণ, আমি তার ইবাদাত করি না, যার ইবাদাত তোমরা কর। এবং তোমরাও তার ইবাদাতকারী নও, যার ইবাদাত আমি করি এবং আমি ইবাদাতকারী নই তার, যার ইবাদাত তোমরা করে আসছ এবং তোমরাও তার ইবাদাতকারী নও যার ইবাদাত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের এবং আমার দ্বীন আমার।"–(সূরা আল কাফিরূন ঃ ১-৬)

এবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র জীবনের অসংখ্য ঘটনাসমূহের মধ্য থেকে শুধুমাত্র একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। আকীদা-বিশ্বাসের উপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করতেন, এ ঘটনা থেকে তা পরিষ্কার বুঝা যাবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বদর অভিমুখে রওয়ানা হন। যখন তিনি 'হাররাতুল ওবরাহ' নামক স্থানে পৌঁছেন তখন এমন এক ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাত করে, যার বীরত্ব ও সাহসিকতার খ্যাতি ছিল সর্বত্র। তাকে দেখে সাহাবা কিরাম (রাঃ) অত্যন্ত আনন্দিত হন। (কেননা তার মত একজন বীর-বাহাদুরের অংশগ্রহণের ফলে মাত্র তিন শ তের জন সৈন্য সম্বলিত ইসলামী বাহিনীর শক্তি নিশ্চিতভাবে বৃদ্ধি পাবে।) যাহোক ঐ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে নিবেদন করলো, আমি এজন্য আপনার কাছে এসেছি, যাতে আপনার সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি এবং মালে গনীমতের ভাগীদার হই।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বলেন, তুমি আল্লাহ ও তার রাসূলের উপর ঈমান রাখ ? সে উত্তরে বলে, 'না'। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বলেন, তুমি ফিরে যাও। কেননা আমরা কোনো মুশরিকের সাহায্য নিতে পারি না।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, সে তখন চলে যায়। কিন্তু আমরা যখন 'শাজরাহ' নামক স্থানে পৌঁছি তখন সে আবার ফিরে আসে এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ঐ একই কথা বলে। তিনিও তাকে ঐ একই জবাব দেন। সে এবারও চলে যায় এবং আমরা যখন 'বায়দা' নামক স্থানে পৌঁছি তখন পুনরায় ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

www.amarboi.org

এবারও তাকে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ্ ও তার রাসূলের উপর কি তুমি ঈমান রাখ ? সে উত্তরে বলে, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন বলেন, তাহলে এবার আমাদের সাথে চলো।–(সহীহ্ মুসলিম ঃ কিতাবুল জিহাদ)

দ্বীনে ইসলামের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, আম্বিয়া কিরাম এবং তাঁদের প্রকৃত অনুসারীগণ, যাঁরা এ দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন তাঁদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

দ্বীনে ইসলামের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো, আম্বিয়া কিরাম, যাঁরা এ দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন তারা তাদের আকীদা, পয়গাম তথা শরীআতের হিফাযত ও সংরক্ষণে ছিলেন অতীব সাবধানী—অন্য কথায় অটল ও অনড়। তাঁরা কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতির মুকাবালা করেছেন, পার্থিব অনেক সুযোগ-সুবিধা হাতছাড়া করেছেন, কিন্তু নিজেদের দাওয়াত বা শরীআতে কোনো অবস্থায়ই কোনোরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন করতে রাজী হননি। আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ط وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهٗ ط وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ○

"হে রাসূল, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করো ; যদি না করো তবে তো তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। আল্লাহ তোমাকে মানুষ হতে রক্ষা করবেন। আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৭)

৯. ধর্ম সবচেয়ে বড় নি'মাত

ধর্ম মানুষের জন্য আল্লাহ্ তাআলার সবচেয়ে বড় নি'মাত। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, সে জ্ঞান ও বিবেকের অধিকারী। আর এ জ্ঞান ও বিবেক শুধুমাত্র ধর্মের মাধ্যমেই প্রস্ফুটিত, বিকশিত, সংস্কৃত ও পরিমার্জিত হতে পারে। বিশ্বের সকল ধর্মই এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তবে আমরা এখানে শুধু ইসলামের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করবো। কারণ, অন্যান্য ধর্ম ছিল কোনো না কোনো বংশ, গোত্র বা এলাকাভিত্তিক। কিন্তু ইসলাম এসেছে বিশ্বধর্ম হিসাবে। এটা কোনো বংশ, গোত্র বা এলাকাভিত্তিক ধর্ম নয়। তাছাড়া ইসলাম যে কিতাবের মাধ্যমে এসেছে তাতে কখনো কোনো পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হওয়ার সম্ভাবনা নেই। অতএব

www.amarboi.org

আমরা ধরে নিতে পারি যে, মানুষের প্রতি ধর্মের যে আবেদন তা এখন আমরা ইসলামের মাধ্যমেই নিখুঁতভাবে জানতে ও বুঝতে পারি। আর এটা কে না জানে যে, কুরআনের সর্বপ্রথম বাণী, যা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছিল, তাহলো ঃ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۝ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ۝

الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۝ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ۝ (العلق : ١-٥)

"পাঠ কর তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন—সৃষ্টি করেছেন মানুষকে 'রক্তপিণ্ড' হতে। পাঠ কর, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত, যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন—শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে, যা সে জানত না।"–(সূরা আল আলাক ঃ ১-৫)

আল্লাহ তাআলা এখানে মানুষকে শুধু পাঠ করার প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেননি, সাথে সাথে পরোক্ষভাবে একথাও বলে দিয়েছেন যে, সে যেন জ্ঞানার্জনে 'কলম' (জ্ঞানার্জনের অন্য যে কোনো উপাদানও এর অন্তর্ভুক্ত) ব্যবহার করে ; তাহলে সে অনেক অজানাকেই জানতে পারবে। আর এ জানার যোগ্যতা ও ক্ষমতা অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে নয় বরং শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই রয়েছে। মানুষের অন্তর্নিহিত এ বিরাট শক্তির সম্ভাবনা এবং সেটাকে প্রস্ফুটিত ও বিকশিত করার অত্যাধুনিক পন্থা উল্লেখিত আয়াতে যেভাবে বর্ণিত ও নির্দেশিত হয়েছে তাতে একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, ইসলামই সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সর্বপ্রথম আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার খুলে দিয়েছে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তো পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন, "জ্ঞান অর্জন করা নারী পুরুষ সকলের জন্য ফরয (অবশ্য কর্তব্য)।" তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা জ্ঞান অর্জন কর, এজন্য প্রয়োজন হলে সুদূর চীন দেশে যাও।' কুরআন-হাদীসে এ ধরনের আরো অনেক বাণী রয়েছে। আর এ সমস্ত বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়েই মুসলমানরা এমন এক যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক বিকশিত ও প্রস্ফুটিত করে তুলেছিলেন যখন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থান ইউরোপ ও আমেরিকায় ছিল মূর্খতার আধিপত্য এবং অসভ্যতা ও বর্বরতার ছড়াছড়ি। কুরআন-হাদীস থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েই সে যুগে আল খারিযমী, আল বিরুনী, হুনাইন বিন ইসহাক, আল রাযী, জাবির বিন হাইয়ান, আবূ আলী সীনা প্রমুখ মনীষী আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের জনক ও পথপ্রদর্শক হতে পেরেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কুরআন-হাদীসে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয়ভিত্তিক ও ধারাবাহিক কোনো আলোচনা নেই এবং এর প্রয়োজনও নেই। কেননা আল্লাহ

www.amarboi.org

তাআলা মানুষের মধ্যে যে সহজাত উদ্ভাবনী শক্তি ও যোগ্যতা নিহিত রেখেছেন তা যথাযথ প্রয়োগ করলে মানুষ নিজেরাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম উন্নতি সাধন করতে পারে। এজন্য প্রয়োজন শুধু প্রেরণার এবং সে প্রেরণা কুরআন-হাদীস মানুষকে দিয়েছে বারে বারে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে।

কুরআন-হাদীসে যে বিষয় সম্পর্কে পুংখানুপুংখ আলোচনা করা হয়েছে তাহলো নীতি-বিজ্ঞান তথা বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়। এটি একটি সূক্ষ্ম বিষয়, অথচ এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব-জীবনের প্রকৃত সাফল্য এবং তার যাবতীয় জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর। বিশ্বাস সম্পর্কিত বিষয়াদির মধ্যে ইসলাম মানুষের সামনে সর্বপ্রথম তার স্রষ্টার পরিচয় তুলে ধরেছে অত্যন্ত সুন্দর ও সার্থকভাবে। এজন্য সে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দলীল প্রমাণাদি পেশ করেছে বিশ্ব জগত থেকে এবং স্বয়ং মানুষের 'নাফ্‌স' থেকে। কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَفِى الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ـ وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ ـ (الذّٰرِيٰت : ٢٠ـ٢١)

"নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে এবং (হে মানুষ) তোমাদের নিজেদের মধ্যেও।"–(সূরা আয-যারিয়াত ঃ ২০-২১)

মানুষ যখন ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা তথা নিজের স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয় এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলতেও অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, কেবল তখনই সে বুঝতে পারে, কী ভীষণ অন্ধকারেই না সে এতদিন হাবুডুবু খাচ্ছিলো। অতপর সে ক্রমে ক্রমে জবাব পায় তার সকল জীবন-জিজ্ঞাসার এবং একটি মানবাকৃতির জীব থেকে উন্নীত হয় একটি পরিপূর্ণ মানুষে।

যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যবশত ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি লাভ করতে পারেনি সে একটি বল্গাহারা জীব বিশেষ। অনেক জীবন-জিজ্ঞাসার সঠিক উত্তরই সে জানতে পারে না। ফলে ক্রমে ক্রমে সে তার সহজাত জ্ঞানবুদ্ধি হারিয়ে বসে এবং এক বিবেক-বর্জিত উন্মাদে পরিণত হয়। তখন সে ব্যক্তি, সমাজ, সমাজপতি, এমন কি ধর্ম সম্পর্কেও অশিষ্ট ধরনের নানা হাস্যকর কথাবার্তা বলতে শুরু করে। আপন স্রষ্টা সম্পর্কে গাফিল, লক্ষ্যভ্রষ্ট ও আত্মভোলা এ মানুষটির জন্য সত্যি করুণা হয়। কেননা সে যে অবস্থায় আছে তাতে তার মত হতভাগ্য প্রাণী বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই।

১০. ইসলামের জীবন-দর্শন

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে যারা বিভিন্ন ধর্ম পালন করতেন কিংবা যারা কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করতেন না তাদের জীবন-দর্শন ছিল ফিতরাতে ইনসানী

www.amarboi.org

তথা মানুষের স্বভাবধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাদের প্রথম দল বৈরাগ্য তথা সংসার ত্যাগের শিক্ষা দিতেন এবং দ্বিতীয় দল "খাও, দাও. স্ফূর্তি করো"—কে মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে জ্ঞান করতেন।

মোটকথা, দুনিয়া ও দুনিয়ার জীবন সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোষ্ঠী যখন পরস্পর বিরোধী বিভিন্ন ধারণা পোষণ করতো ঠিক তখনই ইসলাম মানুষের সামনে এমন একটি জীবন-দর্শন পেশ করলো যা তাদের স্বভাবধর্মের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। সে এমন একটি চলার পথ এবং এমন একটি জীবন ব্যবস্থা পেশ করলো, যা মানুষের বিভিন্নমুখী যোগ্যতা ও গুণাবলী প্রকাশের একটি সম্পূর্ণ অনুকূল ও জুতসই পরিবেশ তৈরী করে দিলো।

ইসলাম তার যাবতীয় নীতি-দর্শন এবং সেগুলোর বাস্তবায়ন ও প্রতিফলনের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করলো এবং এ শিক্ষা দিলো যে, দ্বীন ও দুনিয়া ওতপ্রোত। জীবন থেকে পলায়ন করাও যেমন স্বভাব-বিরুদ্ধ তেমনি শুধুমাত্র দুনিয়ার স্বাদ-আহ্লাদের মধ্যে ডুবে থাকা, অন্যকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা এবং আল্লাহর নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করাও দ্বীনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলীকে উপেক্ষা করারই নামান্তর। প্রকৃতপক্ষে সংসার ত্যাগী সাধু-সন্নাসী এবং খেয়ালী যোগী-বৈরাগীদের অনুসরণ করা ধর্ম নয়, বরং ধর্ম হচ্ছে এমন একটি পরিমিত ও সংযত রাস্তা, যা মানুষের যাবতীয় পরস্পর-বিরোধী যোগ্যতা ও দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করে। ইসলাম বলে, দুনিয়ায় যা কিছু আছে তা মানুষেরই অধীন করে দেয়া হয়েছে—অন্য কথায়, যমীন-আসমান, পাহাড়-পর্বত, জন্তু-জানোয়ার, সোনা-রূপা-মণিমুক্তা সবকিছুই মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে তা করা হয়েছে কিছুটা বাধ্যবাধকতা আরোপ করে। আর তাহলো, এগুলো থেকে শুধু বৈধভাবে উপকৃত হওয়া যাবে—অবৈধভাবে নয়।

দ্বীন ইসলাম হচ্ছে আকায়িদ ও আমালের সমষ্টি। আকায়িদ হচ্ছে সেই জিনিস যা মানুষের মনে আমালের অনুভূতি সৃষ্টি করে। আর আমাল হচ্ছে সেই জিনিস যা আকায়িদকে রূপায়িত করে। আকায়িদ হচ্ছে সেই জিনিস যা সংশোধন ও সংস্কারের আহ্বায়ক এবং আমাল হচ্ছে ঐ বস্তু যা সংশোধন ও সংস্কারের বাস্তবায়নকারী।

ইসলামী জীবন দর্শনে 'দায়িত্বজ্ঞান'-এর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। যদি আমরা এই একটি শব্দকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করি তাহলে যাবতীয় আকায়িদ ও আমাল এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বে। বিভিন্ন ধরনের ফারায়িয বা কর্তব্যসমূহ দায়িত্বজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত থাকে এবং প্রতিফলিত ও

www.amarboi.org

প্রস্ফুটিত হয় এরই মাধ্যমে। এ কারণে ইবাদাত-বন্দেগী, লেন-দেন তথা সংসার যাত্রা নির্বাহের যাবতীয় প্রথা-পদ্ধতি ও কলাকৌশল ইসলাম অতি সুন্দরভাবে মানুষের সামনে পেশ করেছে।

ইসলাম মানুষের জীবনের লক্ষ্য শুধু এটাই নির্ধারণ করেনি যে, সে শুধু আমোদ-স্ফূর্তি করে কাটাবে কিংবা সংসার ত্যাগ করে নিজেকে দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের জন্য একটি বিকলাঙ্গ অথর্ব জীবে পরিণত করবে। বরং মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে এবং তার হাতে অর্পণ করা হয়েছে একটি বিরাট দায়িত্ব তথা আল্লাহর খিলাফত ও প্রতিনিধিত্ব।

ইসলাম যে জীবন-দর্শন পেশ করেছে তার মধ্যে 'আমর ও নাহী' তথা আদেশ-নিষেধের স্থান সর্বোচ্চে। আল্লাহর আদেশ পালনের মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়—লাভ করা যায় তার পুরস্কার, আর নিষেধ পালন করলে ঐ সমস্ত নিন্দনীয় আচার-আচরণ ও কুস্বভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, যা তার অসন্তুষ্টির কারণ।

'আমর ও নাহী'-এর মধ্যে মানুষের দ্বীন-দুনিয়ার মঙ্গল তথা যাবতীয় সাফল্য নিহিত রয়েছে। এর মধ্যে আবার 'হাক্কুল্লাহ' (আল্লাহর হক) ও 'হাক্কুল ইবাদ' (বান্দার হক) আদায়ের স্থান সর্বাগ্রে। 'হাক্কুল্লাহ' বলতে ঐ সমস্ত কাজকর্মকে বুঝায় যেগুলো আল্লাহ্ তাআলার সত্তার সাথে সম্পর্কিত। যেমন—ইবাদাত, নামায, রোযা, হাজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি। আর 'হাক্কুল ইবাদ' বলতে ঐ সমস্ত হক বা অধিকারকে বুঝায় যেগুলো বান্দার সাথে সম্পর্কিত। যেমন—মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার, পিতা-মাতার অধিকার, সন্তান-সন্ততির অধিকার, প্রতিবেশীর অধিকার, শ্রমিকের অধিকার ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাচ্ছে, ইসলামই হচ্ছে এমন একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর দ্বীন, যা মানব জাতির সামনে এমন একটি জীবন দর্শন পেশ করেছে, যা মানুষকে তার জীবনের সর্বক্ষেত্রে পথপ্রদর্শন করতে পারে, সন্তোষজনক জবাব দিতে পারে তার যাবতীয় জীবন-জিজ্ঞাসার, স্বার্থক করে তুলতে পারে তার দুনিয়া আখিরাতকে। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো ঃ

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ قف ـ(ال عمران : ١٩)

"নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯)

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ج ـ(ال عمران : ٨٥)

www.amarboi.org

"কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫)

১১. ইসলাম ও সিয়াসাত

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম—একটি সর্বাঙ্গীন জীবনব্যবস্থা। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মানুষ তার প্রতিটি মুহূর্ত কিভাবে অতিবাহিত করবে ইসলাম সে সম্পর্কে একটি অতি সুন্দর ও প্রকৃতিসম্মত পথ বাত্‌লে দিয়েছে, যা অনুসরণ করলে মানুষ একটি সফল ও সার্থক জীবনের অধিকারী হতে পারে। ইবাদাত, আকায়িদ, সমাজ নীতি, অর্থনীতি তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম এমন সব বিধান দিয়েছে যা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে আল্লাহর ওহী দ্বারা সমর্থিত। ইসলাম সিয়াসাত তথা রাজনীতিকেও মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হিসাবে গণ্য করেছে।

এতদসত্ত্বেও আমরা দেখতে পাই যে, বর্তমান মুসলিম বিশ্বেও দ্বীন ও সিয়াসাতের মধ্যকার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তিনটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম দল মনে করেন যে, দ্বীনের সাথে সিয়াসাতের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। এ দলকে সেকুলারিষ্ট বা ধর্মনিরপেক্ষবাদী বলা হয়। এদের মতে, দুনিয়ার ব্যাপারে দ্বীনের এবং দ্বীনের ব্যাপারে দুনিয়ার হস্তক্ষেপ মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

দ্বিতীয় দল এর ঠিক বিপরীত। তারা গোটা দ্বীনকে নিখাদ সিয়াসাত বলে মনে করেন। তাদের দ্বীন-ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য যেন রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ব করা। তাদের এ চিন্তাধারা ও মনোবৃত্তির কারণে ইবাদাতের সাথে তাদের কালবী তথা রূহানী সম্পর্ক ধীরে ধীরে লোপ পায়। বাকী থাকে শুধু ব্যবহারিক ও অভ্যাসগত সম্পর্ক। ফলে তারা আল্লাহর ইবাদাত করেন—তথা নামায পড়েন, রোযা রাখেন, হাজ্জ করেন, যাকাত দেন, যিক্‌র-আযকার করেন, কিন্তু তাতে তাদের অন্তর আল্লাহর পরশ অনুভব করে না এবং সেই অনাবিল প্রশান্তিতে তাদের মন ভরে উঠে না যার প্রতি ইংগিত করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ط-(الرعد : ٢٨)

"যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর যিক্‌রে যাদের চিত্ত প্রশান্ত হয়।"–(সূরা আর রাআদ ঃ ২৮) কিংবা

www.amarboi.org

يَاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِىْ اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

"হে প্রশান্ত চিত্ত ! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।"- (সূরা আল ফাজর ঃ ২৭-২৮)

মোদ্দাকথা, তারা নিয়মিত ইবাদাত করেন বটে, তবে তাদের ও তাদের মাবুদের মধ্যে সেই নিবিড় যোগ বা সম্পর্ক সৃষ্টি হয় না, যা ইবাদাতের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

তৃতীয় দলের মতে, সিয়াসাত দ্বীন থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন নয় বটে, তবে সিয়াসাত না করলে তাতে দ্বীনের কিছু যায় আসে না। বরং সিয়াসাতের সাথে জড়িয়ে পড়লে তাতে দ্বীনদারীর সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই রাষ্ট্র বা সমাজে যাই ঘটুক না কেন, একজন দ্বীনদারকে সিয়াসাত তথা রাজনীতির সাথে জড়িয়ে না পড়াটাই বাঞ্ছনীয়।

ইসলামের দৃষ্টিতে উপরোক্ত তিনটি মতাদর্শই ভ্রান্তিপূর্ণ। সঠিক মতাদর্শ হচ্ছে, দ্বীন ও সিয়াসাতের মধ্যে কোনো বিরোধ বা বৈপরিত্য নেই। তবে এ অবস্থা তখনই লক্ষ্য করা যাবে যখন সিয়াসাতকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং খুলাফা-ই- রাশিদীনের সিয়াসাতের আদর্শ অনুযায়ী পরিচালনা করা হবে। কেননা ঐ সিয়াসাতের মূল লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণ, তাদের অবস্থার উন্নয়ন, তাদের সংস্কার ও সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন এবং জালিম ও ধর্মদ্রোহীদের জুলুম-অত্যাচার থেকে তাদেরকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যখন হুকুমত ও খিলাফত 'আলা মিনহাজিন নুবুওয়াত' তথা নুবুওয়াতের আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হবে তখন দ্বীন তথা ইসলামের সাথে হুকুমত ও ইমারতের কোনো বিরোধ থাকবে না।

ইসলামের মতে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে দু'টি বিরাট উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। এক ঃ ইবাদাতের জন্য। যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (الذريت : ٥٦)

"আমার ইবাদাতের জন্যই আমি মানুষ ও জ্বিনকে সৃষ্টি করেছি।"
-(সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬)

দুই ঃ খিলাফতের জন্য। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط-(البقرة : ٣٠)

www.amarboi.org

"স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি পৃথিবীতে খলীফা সৃষ্টি করছি।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৩০)

মুমিনদের কর্তব্য ও দায়িত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط (الحج : ٤١)

"আমি এদেরকে (মুমিনদেরকে) পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজ নিষেধ করবে।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪১)

ইবাদাত ও খিলাফত কোনো পৃথক বস্তু নয়, বরং খিলাফত হচ্ছে ইবাদাতেরই একটি পুরস্কার। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط (النور : ٥٥)

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেনই, যেমন তিনি খিলাফত দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে অবশ্যই নিরাপত্তা দান করবেন।"–(সূরা আন নূর ঃ ৫৫)

ইবাদাত ও খেলাফত একটি অপরটির অবিচ্ছিন্ন অংশ। কেননা ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিকভাবে ইবাদাত করা যাবে না এবং তাতে কোনো স্বাদও পাওয়া যাবে না যতক্ষণ তার মধ্যে একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা না থাকবে। আর একাগ্রতা তখনই আসবে যখন ইবাদাতকারীর মানসিক, দৈহিক ও বৈষয়িক নিরাপত্তা থাকবে। আর এ নিরাপত্তা তখনই থাকবে যখন সে প্রকাশ্যে ইবাদাত করার সুযোগ পাবে, এক্ষেত্রে তার উপর কোনোরূপ বাধা-নিষেধ আরোপ করা হবে না এবং কেউ তা করলে তাকে প্রতিরোধ করা হবে। আর এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে একমাত্র হুকুমাত বা রাষ্ট্র। যাকাত প্রদান করা তখনই সম্ভব হবে যখন সম্পদের উপর ব্যক্তি মালিকানা বহাল থাকবে। যদি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র

www.amarboi.org

হয় তাহলে তো সেখানে যাকাত প্রদান করা সম্ভব হবে না। কেননা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে একচ্ছত্র ব্যক্তি মালিকানা স্বীকার করা হয় না। অনুরূপভাবে হাজ্জ পালন করাও তখনি সম্ভব হবে যখন রাস্তা নিরাপদ থাকবে। আর রাস্তার নিরাপত্তা রক্ষা করা হুকুমতেরই দায়িত্ব। মোটকথা, হুকুমত ছাড়া ইসলাম তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে প্রকাশ লাভ করতে পারে না। দণ্ডবিধি হলো ইসলামী আইনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর এটা কে না জানে যে, রাষ্ট্রক্ষমতা ছাড়া দণ্ডবিধির বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অর্থনীতিও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর এটা হুকুমতের দায়িত্ব যে, সে মানুষকে হারাম ও অবৈধ উপার্জন থেকে দূরে রাখবে এবং তাদের সামনে হালাল ও বৈধ উপার্জনের পথ খুলে দেবে।

অতএব এক কথায় বলা যায়, ইসলামের সাথে হুকুমাতের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। ঈসায়ীরা বলতো, শুধু গির্জা হচ্ছে ধর্মের স্থান, আর বাজার হচ্ছে দুনিয়া তথা ব্যবসা-বাণিজ্যের স্থান। এটা সর্বশেষ নবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান যে, তিনি এ ধরাধামে আবির্ভূত হয়ে আপন স্বর্ণালী শিক্ষার মাধ্যমে, দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে ইতিপূর্বে যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করা হয়েছিল তা চিরতরে বিলীন করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একথাটি অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলাম-পূর্ব যুগে হুকুমত ও ইমরাতের মধ্যে তিনটি প্রথা প্রচলিত ছিল এবং প্রকারান্তরে এখনো আছে।

এক ঃ রাজতন্ত্র তথা বাদশাহী প্রথা। এ প্রথা অনুযায়ী পুত্রই পিতার হুকুমতের অধিকারী হবে—চাই সে বিদ্যাবুদ্ধিতে যতই অযোগ্য ও অপরিপক্ক হোক। আর যদি পিতার একাধিক পুত্র থাকে তাহলে তাদের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে 'অলী আহদ' (প্রতিনিধি) মনোনীত করা হবে। অন্যান্য অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়াও এ প্রথার একটি মারাত্মক ত্রুটি এই ছিল যে, পুত্রদের মধ্য থেকে যে কোনো একজনকে 'অলী আহদ' মনোনীত করার পর অন্যান্যরা তার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগত। ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি হতো, যার অনিবার্য পরিণতি দেশব্যাপী চরম বিশৃঙ্খলা ও নিরীহ জনসাধারণের অবর্ণনীয় ভোগান্তি ছাড়া কিছু ছিল না।

দুই ঃ ডিক্টেটরশীপ বা একনায়কত্ব। ডিক্টেটরের স্বভাব হলো, সে যথেচ্ছাচারী। কোনো ব্যাপারেই সে অপরের পরামর্শ গ্রহণের কোনো প্রয়োজন বোধ করে না। ডিক্টেটরের এ আচরণ প্রায় ক্ষেত্রেই জনসাধারণকে বিপন্ন করে তুলে এবং তারা এক দারুণ অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পতিত হয়।

তিন ঃ গণতান্ত্রিক প্রথা। এ প্রথানুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ যেভাবে চাইবে সেভাবেই রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। এমনকি সংখ্যা গরিষ্ঠ জনসাধারণ যদি

www.amarboi.org

সর্বজন-স্বীকৃত একটি কুপ্রথাকেও সঠিক বলে রায় দেয় তাহলে সেটাই সঠিক বলে স্বীকৃত হবে। অর্থাৎ এ গণতান্ত্রিক প্রথায়, মাথার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়, কিন্তু মস্তিষ্কের যথাযথ মূল্য দেয়া হয় না।

গণতান্ত্রিক প্রথারই অপর একটি রূপ 'শুরায়ী-নিযাম' তথা পরামর্শ প্রথা। ন্যায় ও সত্যভিত্তিক এ প্রথাটি শুধুমাত্র ইসলামই বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেছে এবং এ প্রথার জন্য পৃথক কিছু নীতি ও আদর্শ প্রণয়ন করেছে। যথা ঃ-

এক ঃ রাষ্ট্রে শুধুমাত্র আল্লাহর হুকুম ও নিযাম চলবে এবং সবকিছু করা হবে আল্লাহ ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

দুই ঃ শরীআতের নীতি অনুযায়ী ইমাম তথা রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচিত হবেন।

তিন ঃ ইমাম নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করবেন বিজ্ঞ, বিশ্বস্ত, নিরপরাধ ও মান্যবর লোকেরা। দুষ্কৃতিকারী, মিথ্যাবাদী, দাঙ্গাবাজ ও অসৎ লোকেরা এক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবে না।

চার ঃ যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কোনো পদ চাইবে তাকে সে পদ দেয়া হবে না।

পাঁচ ঃ কোনো ব্যক্তিকে যখন হুকুমতরূপী আমানত প্রদান করা হবে তখন তিনি তার ব্যক্তিগত মর্জিমাফিক রাষ্ট্রীয় ভাণ্ডারে কোনোরূপ তসরূপ করতে পারবেন না। উপরন্তু এ ব্যাপারে যে কোনো ব্যক্তি তাকে যে কোনো প্রশ্ন করতে পারবে এবং তিনি এর সন্তোসজনক জবাবদানে বাধ্য থাকবেন।

ছয় ঃ ইমাম জনদরদী, শিক্ষিত, বিজ্ঞ, বিশ্বস্ত ও দূরদর্শী লোকদের সমন্বয়ে একটি 'মজলিসে শূরা' তথা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবেন এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন। ইমাম যে কোনো ব্যাপারে সেই পরামর্শ গ্রহণ করবেন যেটাকে তিনি শরীআতের দলীল-প্রমাণ-ভিত্তিক মনে করবেন।

সাত ঃ ঐ ব্যক্তিকেই ইমাম নির্বাচিত করা হবে যার মধ্যে ইসলামী গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। তিনি অবশ্যই শিক্ষিত, বিজ্ঞ, ন্যায়-বিচারক ও বিচক্ষণ হবেন, তার ইন্দ্রিয়সমূহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্থ-স্বাভাবিক হবে এবং তিনি সাহসী ও নির্ভীক হবেন।

একজন আমীর বা খলীফার গুণাবলী কি হবে তা হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর একটি চিঠি থেকে পরিষ্কার অনুমান করা যায়। হযরত উমর বিন আবদুল আযীয (রহঃ) খলিফা হওয়ার পর এ ব্যাপারে হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর নিকট জানতে চাইলে তিনি তার জবাবে এ চিঠিটি লিখেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন ঃ

www.amarboi.org

"হে আমীরুল মুমিনীন ! প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তাআলা ন্যায়-বিচারক ইমামকে বানিয়েছেন প্রত্যেকটি বাঁকাকে সোজাকারী, প্রত্যেকটি ভ্রান্তপথের অনুসারীকে সঠিক পথে আনয়নকারী, প্রত্যেকটি দুষ্কর্মের সংস্কারকারী, প্রত্যেকটি দুর্বলের সহায়তাকারী, প্রত্যেকটি মজলুমের হক আদায়কারী এবং প্রত্যেকটি দুঃখীর আশ্রয়স্থল। ন্যায় বিচারক ইমাম হচ্ছেন সেই রাখালের ন্যায়, যে তার পশুপালের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল ও করুণাময়। সে তাদের জন্য শ্রেষ্ঠ চারণভূমির অনুসন্ধানে থাকে এবং হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের আক্রমণ ও শীত-গ্রীষ্মের কষ্ট থেকে তাদেরকে রক্ষা করে। ন্যায়-বিচারক ইমাম হচ্ছেন সেই পিতার মত যিনি আপন সন্তানদেরকে সর্বাবস্থায় দেখাশুনা করেন, সন্তানরা যখন ছোট থাকে তখন তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন ; সারা জীবন তাদের জন্য উপার্জন করেন এবং মৃত্যুকালে তাদের জন্যই সবকিছু রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। ন্যায় বিচারক ইমাম হচ্ছেন সেই করুণাময়ী মায়ের মতো, যিনি কষ্টের উপর কষ্ট সহ্য করে আপন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন, অতপর অত্যন্ত কষ্টের সাথে তাকে জন্মদান করেন এবং শিশু অবস্থায় তাকে এমনভাবে প্রতিপালন করেন যে, সে ঘুম থেকে জেগে উঠলে তিনিও জেগে উঠেন এবং সে আরামবোধ করলে তিনিও আরামবোধ করেন। তিনি প্রয়োজনবোধে তাকে স্তন দান করেন, আবার প্রয়োজনবোধে তা থেকে স্তন ছাড়িয়ে নেন। তিনি তার সুখে সুখী হন এবং তার রোগব্যাধিতে হন ব্যথিত। ন্যায়-বিচারক ইমাম হচ্ছেন ইয়াতীমদের রাখাল। তিনি অসহায়দের সহায়, ছোটদের লালন-পালনকারী, আর বড়দের খাওয়া-পরার ব্যবস্থাপক। ন্যায়-বিচারক ইমাম পাঁজরের অভ্যন্তরস্থ হৃদয়ের ন্যায়। এটা সুস্থ থাকলে সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুস্থ থাকে এবং এটা নষ্ট হয়ে গেলে সমগ্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়। ন্যায়-বিচারক ইমাম আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যকার সংযোগ-স্থাপনকারী। তিনি নিজে আল্লাহর অনুগত হন এবং বান্দাদেরকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহ্বান করেন। অতএব হে আমীরুল মুমিনীন (উমর বিন আবদুল আযীয)! আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে সমস্ত জিনিসের মালিক বানিয়েছেন তা ব্যয় করার ক্ষেত্রে তুমি সেই ক্রীতদাসের মত হবে না, যার উপর আস্থা রেখে তার মনিব তাকে আপন ধন-সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছেন এবং সে ঐ আস্থা ভঙ্গ করে সমস্ত মাল আত্মসাৎ করে ফেলেছে এবং সেই সাথে মনিবের পরিবার-পরিজনকেও তাদের ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

হে আমীরুল মুমিনীন ! প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তাআলা মানুষকে নিষিদ্ধ কাজকর্ম ও আচার-আচরণ থেকে রক্ষা করার জন্য কিছু হুদূদ (শরয়ী আহকাম) ও নির্দেশাবলী প্রদান করেছেন। এখন যদি 'হুদূদ' জারী করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে তাহলে আল্লাহ তাআলা কেন তাকে শাস্তি প্রদান করবেন

www.amarboi.org

না ? আল্লাহ তাআলা 'কিসাস' (হত্যাকারীকে প্রাণদণ্ডের)-এর বিধান নাযিল করেছেন, যা হচ্ছে বান্দাদের জীবনরক্ষার কারণ। এখন যদি কিসাস জারী করার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে শুরু করে তাহলে আল্লাহ তাআলা কেন তাকে পাকড়াও করবেন না ?

হে আমীরুল মুমিনীন ! মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী বিপদরাশি এবং ঐ সময়কার সহায়হীন ও বন্ধুহীন অবস্থার কথা স্মরণ কর এবং মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন থেকে শুরু করে 'ফাযাউল আকবর' (মহাভীতি) পর্যন্ত সময়ের জন্য পাথেয় অর্জন কর এবং স্মরণ রাখ যে, বিশ্বের তোমার এ ঘর ছাড়া আর একটি ঘর আছে, যেখানে দীর্ঘকাল তোমাকে অবস্থান করতে হবে। তোমার বন্ধু-বান্ধব গর্তরূপী ঐ ঘরে তোমাকে চিরদিনের জন্য একাকী অবস্থায় রেখে চলে আসবে।

অতএব ঐ দিন শুধুমাত্র যে আসবাব-সামগ্রী তোমার কাজে লাগবে, যে দিন প্রত্যেক ব্যক্তি আপন ভাই, মা, বাবা, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যাকে ছেড়ে চলে আসবে তুমি সর্বদা সেই আসবাব-সামগ্রী সংগ্রহের চেষ্টা কর।

১২. ইসলাম নির্দেশিত ভ্রাতৃত্ব, সাম্য ও স্বাধীনতা

ভ্রাতৃত্ব

জাহিলিয়া যুগে আরবদের সম্প্রদায়গত ঝগড়া-বিবাদ তখনকার সমাজ-বন্ধনকে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। ফিতনা, ফাসাদ, সংঘর্ষ ও রক্তপাত তখনকার মানুষের মজ্জাগত স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু ইসলাম সে স্থলে ভ্রাতৃত্বের যে শিক্ষা দিল তা আজো মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। কুরআন বলে ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ-(الحجرت : ١٠)

"নিশ্চয়ই জেনো, সমস্ত মুমিন একটি ভ্রাতৃসমাজ বৈ আর কিছুই নয়।"

–(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১০)

ইসলামের এ বিপ্লব কোনো রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সংঘটিত হয়নি। কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে লক্ষ্য করুন ঃ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا ص وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ج

www.amarboi.org

"এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে মজবুতভাবে, সকলে একত্রে–আর (সাবধান!) যেন দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়ো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'মাতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা ছিলে পরস্পরের শত্রু এবং সেই (শোচনীয় অবস্থায়) তোমাদের মধ্যে তিনি মনের মিল ঘটিয়ে দিলেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা সকলে ভাই ভাই হয়ে গেলে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৩)

ঐতিহাসিক তাবারী তাঁর তাফসীরের মধ্যে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর নিম্নভাবে করেছেন ঃ আল্লাহর নিয়ামতকে স্মরণ করো, তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে এবং একে অন্যকে হত্যা করতে, আর তোমাদের শক্তিশালীরা শক্তিহীনদের উপর জুলুম-অত্যাচার করতো ; এমতাবস্থায় ইসলাম আবির্ভূত হয়ে তোমাদের মধ্যে মায়া-মহব্বতের সৃষ্টি করলো, তোমাদের দ্বিধাবিভক্ত দলগুলোকে একত্রিত করলো এবং তোমাদেরকে একে অন্যের ভাই করে দিল।

এতো গেল কুরআনের কথা। এবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র বাণীগুলোর প্রতি লক্ষ্য করুন। তিনি বলেছেন, "এক মুসলমান অন্য মুসলমানের জন্য একটি দালান সদৃশ—যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তি পৌঁছায়।"

বিদায় হাজ্জের স্মরণীয় মুহূর্তে তিনি মানুষের যে অধিকার-সনদ ঘোষণা করেন, তাতেও বলেছিলেন–

"ভালোভাবে জেনে নাও, প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই এবং সকল মুসলমানই আপোষের মধ্যে ভাই ভাই।"

এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য, ইসলামের ভৌগলিক কোনো সীমারেখা নেই। কেননা, ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে সবসময়ই পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন সাধিত হচ্ছে। তাই এটা (ভৌগলিক সীমারেখার ধারণা) একটা ঠুনকো জিনিস ছাড়া কিছু নয়। ইসলামের মতে, বর্ণ ও বংশের মধ্যেও কোনো পার্থক্য নেই। অতএব ইসলাম হচ্ছে আন্তর্জাতিক জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে বড় নিশানবরদার। হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) ঘোষণা করেছেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সমস্ত মানুষই পরস্পর ভাই ভাই।"

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় ইসলাম-গ্রহণকারীদের মধ্যে শুধু হিজাজী বা আরবীরাই ছিল না, এর সাথে ছিল ইরানী, রোমীয়, মিসরীয়, হাবশী প্রভৃতি জাতের লোক—যারা পরস্পর একাত্ম হয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবদ্দশায়ই ইসলামকে একটি আন্তর্জাতিক জীবনাদর্শে পরিণত করেছিল।

www.amarboi.org

সংক্ষেপে বলতে গেলে, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইসলাম মাত্র এক হাজার বছরের মধ্যে যে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আনজাম দিয়েছে তা ঈসায়ীমত বা বৌদ্ধমতের পক্ষে দু হাজার বছরেও সম্ভব হয়নি। এটা কি কম আশ্চর্যের কথা যে, একজন ভারতীয় বংশ ও ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও মরক্কোয় পৌঁছে নিজেকে বিদেশী বলে ভাবতে পারে না।

আধুনিক অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে 'ভ্রাতৃত্বনীতির' অতুলনীয় ক্ষমতার কথা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। বিখ্যাত জাপানী ডাক্তার 'কাগাওয়া', যিনি শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কেও কার্যকরী জ্ঞান রাখেন তিনি লিখেছেন, "ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি ও ভ্রাতৃপ্রেমের সাহায্যেই শ্রমিক-মালিক বিরোধের নিষ্পত্তি করতে হবে। অন্যথায়, সমাজ-জীবনকে রক্ষা করা যাবে না ; ভয়, আতঙ্ক এবং বেকার সমস্যার উৎপাত সর্বসময়ই লেগে থাকবে।"

এক্ষেত্রে ইসলাম যে সুন্দর আদর্শ পেশ করেছে তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। মক্কা থেকে হিজরত করার পর মদীনার জীবনে মুসলমানরা ভ্রাতৃত্বের যে কার্যকরী নমুনা পেশ করেছিল এবং তখনকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর তা কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই তা জানা থাকার কথা।

সাম্য

জাহিলিয়া যুগে মক্কার কুরাইশ বংশের লোকেরা নিজেদেরকে অভিজাত এবং অন্যদেরকে হেয় মনে করতো। এভাবে মীদনার সমাজ-জীবনেও বিত্তশালীরা বিত্তহীনদের ঘৃণার চোখে দেখতো। উপরন্তু আরবরা নিজেদেরকে বাকপটু (আরব) এবং অনারবদেরকে 'বোবা' (আজমী) মনে করতো।

শুধু আরবই নয়, আরবের বাইরেও উপরোক্ত হীন মনোবৃত্তির অস্তিত্ব ছিল। গ্রীসের বিখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল বলতেন, জংলী বর্বরদেরকে (অর্থাৎ যারা গ্রীক নয় তাদেরকে) দাস হওয়ার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি আলেকজাণ্ডারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যেন তিনি (আলেকজাণ্ডার) নিজেকে 'গ্রীকদের নেতা' এবং জংলী বর্বরদের 'প্রভু' বলে আখ্যায়িত করেন এবং তিনি যেন গ্রীকদের সাথে বন্ধুসুলভ আর বর্বরদের সাথে পশুসুলভ ব্যবহার করেন। রোমেও ঠিক এ অবস্থা ছিল। প্রাচীন মিসরীয়রা বিভিন্ন পেশাদার লোকদেরকে —বিশেষ করে পশুপালকদেরকে অত্যন্ত হেয় নজরে দেখতো। তারা এদের সাথে পানাহার পর্যন্ত করত না।

www.amarboi.org

অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শ্রেণী-বৈষম্যের নীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) যেহেতু মানব সমাজের পথ-প্রদর্শনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন—যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ○

"এবং (হে রাসূল) আমরা তো তোমাকে প্রেরণ করেছি সমগ্র মানব সমাজের জন্য কেবল (পুণ্যফল সম্বন্ধে) সুসংবাদদাতা ও (পাপফল সম্বন্ধে) সতর্ককারী হিসাবে, কিন্তু অনেক লোকই এটা জানে না।"

–(সূরা আস সাবা ঃ ২৮)

–তাই তিনি উঁচু-নীচু সাদা-কালোর পার্থক্যকে এই বলে নিশ্চিহ্ন করে দিলেন যে, "অনারবের উপর আরবের এবং আরবের উপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই আদম থেকে সৃষ্ট, আর আদমকে মাটি থেকে তৈরী করা হয়েছে।"

ইসলামী আইনের চোখে ধনী-দরিদ্র সকলেই সমান। কুরাইশ সম্প্রদায়ের বনু মাখযূম গোত্রের জনৈকা স্ত্রীলোক চুরিতে ধরা পড়ে। উসামা ঐ স্ত্রীলোকটিকে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে সুপারিশ করলে তিনি বলেছিলেন, "হে লোক সকল ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোনো অভিজাত ব্যক্তি যখন চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো, আর যখন কোনো বিত্তহীন লোক চুরি করতো, তখন তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা চুরি করে তবে মুহাম্মদ তার হাতও কেটে দেবে।"

এ ধরনের আরো অনেক দৃষ্টান্ত ইসলামের স্বর্ণযুগ এবং তার পরবর্তী যুগে পাওয়া যায় এবং এগুলো থেকে পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি লোকই সমমর্যাদার অধিকারী।

সিরিয়ার বিখ্যাত রয়ীস (বরং বাদশাহ) জাবাল্লা গাসসানী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। কাবা প্রদক্ষিণকালে তার চাঁদরের আঁচল জনৈক ব্যক্তির পায়ের নীচে চাপা পড়ে। জাবাল্লা তার মুখের উপর থাপ্পড় মারেন। ঐ লোকটিও সমান প্রতি উত্তর দেয় (অর্থাৎ জাবাল্লাকে থাপ্পড় মারে)। জাবাল্লা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উমরের কাছে আসেন। উমর (রাঃ) তার অভিযোগ শোনার পর বলেন, তুমি যা করেছিলে তার সমুচিত শাস্তিই পেয়েছ। একথা শুনে জাবাল্লা অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলেন, আমি এ পরিমাণ মর্যাদার অধিকারী যে, যে আমার সাথে বেআদবী করে সে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার উপযোগী। উমর

www.amarboi.org

(রাঃ) বলেন, 'জাহিলিয়া যুগে এরূপই ছিল, কিন্তু ইসলাম উঁচু নীচুকে এক করে দিয়েছে। জাবাল্লা বললেন, যদি ইসলাম এমনি ধর্ম হয় যার মধ্যে ভদ্র-অভদ্রের কোনো বাছ-বিচার নেই—তাহলে আমি ইসলামই চাই না।' অতপর তিনি গোপনে কনস্টান্টিনোপলের দিকে চলে যান ; কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) তার খাতিরে ইসলামী ন্যায়-নীতিকে বিসর্জন দিতে রাযী হননি।

আমীরুল মুমিনীন হযরত উমর (রাঃ) বলতেন, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। ইসলামের এ সাম্যনীতি তখনকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর কি পরিমাণ প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বিস্তারিত বর্ণনা অর্থনৈতিক গ্রন্থাদিতে রয়েছে।

স্বাধীনতা

ইসলাম সাম্য এবং স্বাধীনতার বাণী নিয়ে আসে। তখনকার বিশ্বের সভ্যতাগুলো এ দু'টি জিনিসের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। ইসলাম সব রকমের দাসত্ব—চাই তা সামাজিক হোক, অর্থনৈতিক হোক, রাজনৈতিক হোক অথবা মানসিক—মানব সমাজ থেকে দূর করতে চায়। কুরআন মজীদে বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যে গুণ বর্ণনা করা হয়েছে তাহলো ঃ

وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط-(الاعراف : ١٥٧)

"এবং যেসব গুরুতর ভার ও (অন্যায়) বন্ধন তাদের উপর ছিল, সেগুলো হতে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়।"-(সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৭)

একদা হযরত উমর ফারূক (রাঃ)-এর কাছে জনৈক ব্যক্তি মিসর-বিজেতা আমর বিন আস (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে পরাধীনতাসুলভ ব্যবহারের অভিযোগ করলে তিনি আমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ তুমি কবে থেকে তাদেরকে গোলাম (পরাধীন) বানিয়েছো ? তাদের মায়েরা তো তাদেরকে স্বাধীন অবস্থায়ই জন্ম দিয়েছিল।

অতপর এক দু' যুগ পর ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) এ শিক্ষারই পুনরাবৃত্তি করে বলেন, "হে মানুষ ! আল্লাহ তোমাকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। অতএব তুমি স্বাধীন হয়েই থাক।"

ফরাসী বিপ্লবের সময় রুশোর উক্তি, "মানুষ স্বাধীন হয়েই জন্ম নেয়, কিন্তু যেদিকে তাকাও সেদিকেই দেখবে, তারা শৃঙ্খলাবদ্ধ"—ইসলামের উপরোক্ত ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি ছাড়া কিছু নয়।

www.amarboi.org

ইসলামের স্বর্ণযুগে একজন বৃদ্ধাও আবশ্যকবোধে খলীফার সমালোচনা করতে পারতো। ইসলাম-প্রদত্ত সাম্য ও স্বাধীনতার বলেই জনৈক ব্যক্তি হযরত উমর (রাঃ)-কে সম্মিলিত জনতার সামনে প্রশ্ন করেছিল, এর কী কারণ থাকতে পারে যে, আমীরুল মুমিনীন দু'টি কাপড় পান অথচ আমার মত গরীব লোক শুধু একটি কাপড় পায় ? কোনো সাধারণ লোক এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হলে নিশ্চয়ই বেসামাল হয়ে পড়তো। কিন্তু হযরত উমর (রাঃ) প্রথমে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলেন এজন্য যে, মুসলিম জাতির মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে খলীফার সমালোচনা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। অতপর তিনি তাঁর পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন, 'তমিই এ অভিযোগের উত্তর দাও।' তাঁর পুত্র হাসিমুখে দাঁড়িয়ে উত্তর দিল, সাধারণ মুসলমানের মত আমীরুল মুমিনীনও একটি মাত্র কাপড় পেয়েছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি দীর্ঘকায় তাই আমি আমার নিজের কাপড়টি তাঁকে দান করেছি।

১৩. ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর অধিকার ও মর্যাদা

স্ত্রীর অধিকারসমূহ

ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীদের মর্যাদা ছিল অতি নিম্নমানের। তাদের নিজস্ব কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল না। তারা জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষদের অধীন এবং তাদের মুখাপেক্ষী ছিল। নিজ সম্পত্তিতেও তাদের কোনো অধিকার ছিল না। ইসলাম ছাড়া প্রায় সকল ধর্মই নারীর নিন্দা করেছে। ইসলামই প্রথম ধর্ম, যা নারীর মর্যাদা সমুন্নত করেছে, তাদের স্বতন্ত্র অবস্থান নির্ধারণ করেছে, তাদের দাবীসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছে, ওয়ারিসী সম্পত্তিতে তাদের অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত করেছে—অর্থাৎ তাদেরকে তাদের আত্মীয়-স্বজনের সম্পত্তির মালিক বানিয়েছে এবং কতিপয় বিষয় ছাড়া অধিকাংশ বিষয়ে তাদেরকে পুরুষদের সমান অধিকার প্রদান করেছে। যে সমস্ত লোক কন্যা সন্তানদেরকে তাদের জন্মলগ্নেই হত্যা করে ফেলতো, ইসলাম ওদের অন্তরেও তাদের প্রতি দরদ ও ভালবাসার সৃষ্টি করেছে এবং তাদের লালন-পালনকে পুরস্কার ও সাওয়াবের কাজ সাব্যস্ত করেছে। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকারের সমতা কায়েম করেছে, স্ত্রীকে স্বামীর সেবিকার স্থলে তার সম্মানিত জীবনসঙ্গিনী ও গৃহকর্ত্রী বানিয়েছে এবং 'সন্তানের জান্নাত মায়ের পায়ের নীচে রয়েছে' বলে ঘোষণা করেছে। মোটকথা, ইসলাম সকল দিক দিয়ে নারীর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে।

www.amarboi.org

অন্যান্য জাতি ও ধর্মে নারীদের অবস্থান ও অধিকার

গ্রীক ও রোমানদেরকে, স্ব স্ব যুগে বিশ্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতির গুরু বলে বিবেচনা করা হতো। অবশ্য তাদের যুগে নারীরা কিছু কিছু অধিকারও লাভ করেছিল। এতদসত্ত্বেও 'লেকী'-এর ভাষায় তাদের অবস্থা ছিল নিম্নরূপ ঃ

"সমষ্টিগত অবস্থার বিবেচনায় সতী-সাধ্বী গ্রীক নারীর কোনো মর্যাদাই ছিল না। তাদের সমগ্র জীবন গোলামীতে অতিবাহিত হতো। তাদেরকে শৈশবে নিজ পিতা-মাতার, যৌবনে নিজ স্বামীর এবং বৈধব্যে নিজ সন্তানদের গোলামী করতে হতো। ওয়ারিসী সম্পত্তিতে তাদের অনুপাতে তাদের পুরুষ আত্মীয়দের ছিল অগ্রাধিকার। আইনগতভাবে তালাকের অধিকার তাদের অবশ্যই ছিল, তবে কার্যতঃ এর দ্বারা তারা আদৌ লাভবান হতে পারতো না। কেননা, আদালতে নারীদের যবানবন্দী প্রদান করা গ্রীক সভ্যতার দৃষ্টিতে লজ্জা ও সম্ভ্রমের পরিপন্থী ছিল। অবশ্য তারা নিজেদের সাথে যৌতুক নিয়ে আসতো এবং নিজেদের কন্যাদেরকেও বিবাহের সময় যৌতুক প্রদান করা নিজেদের কর্তব্য বলে মনে করতো। প্লেটো নিসন্দেহে পুরুষ ও নারীর সমতার দাবী উত্থাপন করেছিলেন, কিন্তু তার এ দাবী শুধু মৌখিক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ ছিল। কর্মজীবনে এর আদৌ কোনো প্রভাব পড়েনি।" (লেকী রচিত ইউরোপের নৈতিক ইতিহাস ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-১৮২)

রোমান সভ্যতায় নারী

"রোমান আইন নারীর মর্যাদাকে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অতি নিম্নস্তরে ফেলে রেখেছিল। পিতা অথবা স্বামী ছিল পরিবারের কর্তা। তারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং স্ত্রীদেরকে যখন ইচ্ছা ঘর থেকে বের করে দিতে পারতো। কন্যার পিতার অধিকার এতদূর ছিল যে, তিনি যেখানে ইচ্ছা আপন কন্যাকে বিবাহ দিতে পারতেন। কোনো কোনো সময় তিনি সম্পাদিত বিবাহ ভেঙ্গে দেয়ারও ক্ষমতা রাখতেন। পরবর্তীতে এ অধিকার পিতার নিকট হতে স্বামীর নিকট স্থানান্তরিত হয় এবং স্বামীর ক্ষমতা এতই বিস্তৃতি লাভ করে যে, ইচ্ছা করলে স্বামী স্ত্রীকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারতো। ৫২০ সাল পর্যন্ত কেউ তালাকের নাম পর্যন্ত শুনেনি।"-(লেকী রচিত 'ইউরোপের নৈতিক ইতিহাস' ঃ ২য় খণ্ড ঃ পৃষ্ঠা-১৯০)

প্রাচীন যেসব ধর্ম, নৈতিকতার সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানদাতা বলে দাবী করত, সেগুলোও নারীর অবস্থানের মধ্যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন করেনি। যে ইয়াহূদীদের ধর্ম শুধু নৈতিক শিক্ষার প্রচারকই নয়, বরং ইয়াহূদীদের জন্য

www.amarboi.org

জীবনব্যবস্থাও বটে, সেই তারাও নারী-সমাজকে বিবি হাওয়া কর্তৃক হযরত আদম (আঃ)-কে প্ররোচিত করার অপরাধে চিরদিনের জন্য পুরুষদের বাঁদী বানিয়ে রেখেছে। তাদের ধর্মগ্রন্থের ভাষায় ঃ

"আর খোদাবান্দ বললেন, আমি তোমার প্রসব-ব্যথাকে বাড়িয়ে দিব। তুমি ব্যথার মাধ্যমে সন্তান প্রসব করবে এবং তোমার আকর্ষণ নিজ স্বামীর প্রতি হবে, আর সে তোমার উপর কর্তৃত্ব করবে।"-(বাইবেল ঃ পয়দাইশ-তৃতীয় অধ্যায়)

পুরুষের বর্তমানে ওয়ারিসী স্বত্বে নারীর কোনো অংশ নেই। খ্রীস্ট ধর্মে নারীদের সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশ রয়েছে ঃ-

"নারীদের উচিত যে, তারা চুপচাপ পরিপূর্ণ আনুগত্য করে যাবে। আর আমি এ অনুমতি প্রদান করি না যে, নারীরা শিক্ষা প্রদান করুক অথবা নিজে স্বামীর উপর কর্তা সেজে বসুক ; বরং সে সম্পূর্ণ নীরব থাকবে। কেননা, প্রথমে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তার পরে হাওয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং আদম ধোঁকায় পড়েনি ; বরং নারী ধোঁকায় পড়ে পাপে লিপ্ত হয়েছে।"-(তামতাউস-এর নিকট পোলস-এর ১ম চিঠি ঃ ১২তম অধ্যায়)

অন্য এক চিঠিতে পোলস বলেছেন ঃ

"পুরুষের জন্য আপন মস্তক আবৃত করা উচিত নয়। কারণ, সে খোদার আকৃতি ও তার মহিমা। পক্ষান্তরে নারী হলো পুরুষের মহিমা। কারণ, পুরুষ নারী হতে নয়, বরং নারী পুরুষ হতে সৃষ্ট। আর পুরুষ নারীর জন্য নয়, বরং নারী পুরুষের জন্য সৃষ্ট।"-(আফ্রিনাসতুন-এর নিকট পোলস-এর ১ম চিঠি ঃ ১১তম অধ্যায়)

খ্রীস্টধর্মে নারীকে আপাদমস্তক ফিতনা আর অকল্যাণের প্রতিভূ মনে করা হতো। আবিদ ও যাহিদরা নারীদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াত না। বড় বড় সন্ন্যাসীরা নিজেদের মায়ের সাথে সাক্ষাত করা এবং তাদের মুখ দর্শনকে পর্যন্ত পাপ-কর্ম বলে মনে করতো। বৈরাগ্যবাদের ইতিহাস নারীদের প্রতি ঘৃণার ঘটনাসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ। 'লেকী' এ বিষয়ে বহু হৃদয়-বিদারক ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

হিন্দু ধর্মে নারী

হিন্দুধর্মে নারীর অবস্থা ছিল সর্বাধিক করুণ। তাদের কোনো মর্যাদাই ছিল না। তারা জীবনের প্রতিটি স্তরে পুরুষদের অধীন ছিল। মনু সংহিতায় নারী সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিধিমালা বিদ্যমান রয়েছে ঃ-

www.amarboi.org

"নারী কৈশোরে নিজ পিতার অধিকারে, যৌবনে নিজ স্বামীর অধিকারে এবং স্বামীর মৃত্যুর পর নিজ পুত্রদের অধিকারে থাকবে। সে কখনও স্বাধীনভাবে চলাফেরা কিংবা স্বেচ্ছাচরণ করবে না।"-(৫ ঃ ১৪৮)

"নারীর কোনো উপাসনার প্রয়োজন নেই। স্বামীর সেবাই তার জন্য সর্বাপেক্ষা বড় উপাসনা। এটাই মুক্তির উপায়। নারীদের জন্য পৃথক কোনো যোগ, ব্রত ও উপবাস নেই ; সে শুধু স্বামীর সেবার মাধ্যমেই স্বর্গলোকে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করবে।"-(৫ ঃ ১৫৫)

"স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি নেই। তার কর্তব্য এই যে, সে জীবন-ধারণোপযোগী খাদ্য গ্রহণ করে পবিত্রতার সাথে বাকী জীবন কাটিয়ে দেবে।"

নারী তার স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় স্বামীর নাম মুখেও আনবে না। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত অর্ধভোজিনী ব্রহ্মচারী হয়ে কৃশদেহে জীবন অতিবাহিত করবে।-(৪ ঃ ১৫৭ ও ১৫৮)

চানক্য নীতিতে নারী সম্পর্কে নিম্নরূপ ধারণা বিদ্যমান রয়েছে ঃ-

"মিথ্যা বলা, চিন্তা না করে কাজ করা, প্রতারণা, বোকামি, লোভ, অপবিত্রতা এবং নিষ্ঠুরতা হচ্ছে নারীর সহজাত দোষ।"-(দ্বিতীয় অধ্যায়)

"রাজপুত্রদের নিকট হতে শিষ্টাচার, পণ্ডিতদের নিকট হতে মিষ্টি কথা, জুয়াড়ীদের নিকট হতে মিথ্যা কথা এবং নারীর নিকট হতে প্রতারণা শিক্ষা করা উচিত।"-(১২ ঃ ৮)

"আগুন, পানি, অজ্ঞ মূর্খ, সর্প, রাজ-পরিবার, নারী—এসব হচ্ছে বস্তুর ধ্বংসের কারণ। অতএব এগুলো থেকে সতর্ক থাকা উচিত।"-(১৪ ঃ ১২)

"বন্ধু, পরিচারক, নারী—এরা দরিদ্র ব্যক্তির সঙ্গ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু যখন সে পুনরায় বিত্তশালী হয়ে উঠে, তখন ওরা পুনরায় তার কাছে ফিরে আসে।"-(১৫ ঃ ৫)

ইসলামে নারীর অধিকার

ইসলাম নারীকে আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিদর্শন এবং তার একটি বড় নিয়ামত আখ্যা দিয়েছে। ইসলাম প্রশংসা সহকারে নারীর উল্লেখ করেছে এবং তার সাথে উত্তম আচরণ, মিলেমিশে সদ্ভাবে জীবন-যাপন এবং কোমল ও দয়ার্দ্র ব্যবহারের তাকীদ দিয়েছে। মা, কন্যা, বোন ও স্ত্রী হওয়ার বিবেচনায় তার

www.amarboi.org

অধিকারসমূহ নির্ধারিত করেছে, তাকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারে শরীক করেছে তথা তাকে তার নিকটাত্মীয়দের সম্পত্তির মালিক সাব্যস্ত করেছে।

বৈবাহিক জীবনের গুরুত্ব

অধিকাংশ ধর্ম নারীকে সকল ফিতনার উৎসমূল বলে আখ্যায়িত করেছে। আর বিবাহ ও বৈবাহিক সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় পবিত্রতার পরিপন্থী, আর অবিবাহিত জীবন তথা নারীর সাথে সম্পর্কহীনতাকে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার চরম প্রকাশ বলে সাব্যস্ত করেছে। খ্রীস্টানদের সন্ন্যাস ব্রত এবং হিন্দুদের বৈরাগ্যবাদ ও ব্রহ্মচারিতা এরই ফল। ইসলাম এ আকীদাকে বাতিল সাব্যস্ত করেছে। বলেছে, মানুষের সাথে উত্তম আচরণ, সদ্ব্যবহার এবং মানবিক অধিকার ও কর্তব্য পালনই হচ্ছে ধর্ম ও নৈতিকতার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক। এগুলো ছাড়া ধর্ম ও নৈতিকতার পূর্ণতা সাধিত হতে পারে না। দুনিয়া বর্জন ও নিঃসঙ্গতা দ্বারা আধ্যাত্মিক পবিত্রতা সাধিত হতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মানবিক অধিকার ও কর্তব্য আদায় না করা হবে ততক্ষণ মানুষের নৈতিকতার পূর্ণতা সাধিত হতে পারে না। উপরন্তু যে সাধুতা ও পবিত্রতা নৈতিক জীবনের প্রাণ, তা অবিবাহিত জীবনে কতজন কায়েম রাখতে পেরেছে ? ব্যতিক্রমধর্মী গুটি কয়েক উদাহরণ বাদে এ কণ্টকাকীর্ণ উপত্যকায় কতজনের জামার আঁচল নিরাপদ থাকতে পেরেছে ? তারা যে বৈবাহিক পবিত্র জীবনকে পরিত্যাগ করে কলুষতা ও আবর্জনায় লিপ্ত হয়েছে, বৈরাগ্যবাদের ইতিহাসই তার সাক্ষী। অতএব, ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকেই বিবাহ করার হুকুম দিয়েছে। যেমন ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلاَّ تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلاَّ تَعُوْلُوْا ۗ (النساء : ٣)

"তোমরা যদি আশংকা করো যে, ইয়াতীম মেয়েদের প্রতি সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করবে নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভাল লাগে —দুই, তিন, অথবা চার ; আর যদি আশংকা কর যে, সুবিচার করতে পারবে না তবে একজনকে, অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীকে। এতে পক্ষপাতিত্ব না করার অধিকতর সম্ভাবনা।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩)

নবী করীম (সাঃ) বিবাহকে তাঁর সুন্নাত সাব্যস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, "বিবাহ আমার সুন্নাত। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে অস্বীকার করবে সে আমার দলভুক্ত নয়।"

www.amarboi.org

প্রাচীন সমাজে বিধবা ও ক্রীতদাস-দাসীরা সর্বাপেক্ষা বেশী লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত ছিল। কাজেই ইসলাম তাদেরকে বিবাহ দানের ব্যাপারে বিশেষভাবে তাকীদ দিয়েছে। যেমন ঃ

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ ط اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ (النور : ٣٢)

"তোমাদের মধ্যে যারা 'আইয়িম' (বিধবা নারী অথবা বিপত্নীক পুরুষ) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলেও আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন ; আল্লাহ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"-(সূরা নূর ঃ ৩২)

এ আয়াতের এ সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটি বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য যে, বিবাহ না করার একটি কারণ হচ্ছে এর দায়িত্বসমূহ সম্পর্কে অহেতুক ভীতি। কাজেই বলা হয়েছে, যদি তোমরা দারিদ্রের আশঙ্কা কর, তাহলে আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে স্বচ্ছল করে দেবেন। সুতরাং দারিদ্রের ভয়ে বিবাহ হতে নিবৃত্ত থাকার চেষ্টা করো না।

বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু জৈবিক চাহিদা পূরণ করা নয় ; বরং সাধুতা আর পবিত্রতা অর্জনও এর অন্যতম উদ্দেশ্য।

স্ত্রীর মর্যাদা ও অবস্থান

স্ত্রী বা নারী আল্লাহ তাআলার অন্যতম নিদর্শন এবং পুরুষের আরাম ও মানসিক শান্তির উপায়। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ (الروم : ٢١)

"এবং তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদেরকে যাতে তোমরা ওদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে।"
-(সূরা আর রূম ঃ ২১)

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর সত্যিকার বন্ধুত্ব এবং বৈবাহিক জীবনের শান্তি ও আনন্দের সারকথা মাত্র কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে

www.amarboi.org

অত্যন্ত সুনিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াতে আছে ঃ

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ○(الاعراف : ١٨٩)

"তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার সংগিণী সৃষ্টি করেন যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। অতপর যখন সে তার সাথে সংগত হয় তখন সে এক লঘু গর্ভধারণ করে এবং এ নিয়ে সে অনায়াসে চলাফেরা করে ; গর্ভ যখন গুরুভার হয় তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে ঃ যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দাও তবে তো আমরা কৃতজ্ঞ থাকবোই।"

–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৮৯)

স্বামী-স্ত্রীর বৈচিত্রময় ও স্পর্শকাতর সম্পর্ককে পবিত্র কুরআন অত্যন্ত অর্থবোধক ও অলংকারিক ভাষায় বর্ণনা করেছে। এতে ঐসব সূক্ষ্ম দিকও রয়েছে, যা স্বামী-স্ত্রীর মধুর সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেতে পারে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ○

"সিয়ামের রাত্রে তোমাদের জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ বৈধ করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ জানতেন যে, তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করছিলে। অতপর তিনি তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল হয়েছেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এখন

www.amarboi.org

তোমরা তাদের সাথে সংগত হও এবং আল্লাহ যা তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তা কামনা করো। আর তোমরা পানাহার কর যতক্ষণ রাত্রির কৃষ্ণরেখা হতে উষার শুভ্ররেখা স্পষ্টরূপে তোমাদের নিকট প্রতিভাত না হয়। অতপর নিশাগম পর্যন্ত সিয়াম পূর্ণ কর। তোমরা মসজিদে ইতিকাফ-রত অবস্থায় তাদের সাথে সংগত হয়ো না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং এগুলোর নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবে আল্লাহ তার নিদর্শনাবলী মানব জাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা সাবধান হয়ে চলতে পারে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৭)

পবিত্র কুরআন সামাজিক জীবনেও স্বামী-স্ত্রীর অধিকারকে সমান সাব্যস্ত করেছে। যেমন ঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ص وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○ (البقرة : ٢٢٨)

"নারীদের তেমনি ন্যায়-সংগত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের, কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৮)

কিন্তু এ মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব শুধু পরিবারের প্রধান হিসাবে বিবেচ্য। এর কারণে অধিকারের সমতার উপর কোনো প্রভাব পড়ে না। পুরুষ তার সৃষ্টি ও দায়িত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এ শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নারীদের মুকাবালায় পুরুষদেরকে মেধা ও বিচক্ষণতা এবং দৈহিক ও বুদ্ধিগত সৌন্দর্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। বর্তমান নারী-প্রগতির যুগেও পুরুষ এবং নারীর এ স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। পুরুষ পারিবারিক জীবনের সকল দায়িত্বের যামিনদার। এজন্যও সে এ স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। এর উল্লেখ পবিত্র কুরআনের অন্যত্র এভাবে করা হয়েছে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط (النساء : ٣٤)

"পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের একককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ স্ত্রীদের উপর তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৪)

www.amarboi.org

কিন্তু এর দ্বারা স্ত্রীলোকের অধিকারে কোনো পার্থক্য আসে না। গৃহের ব্যাপারাদিতে পুরুষ ও নারীর অবস্থান স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) নির্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ

"তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি আপন অধীনস্থদের তত্ত্বাবধায়ক এবং তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। বাদশাহ তার প্রজাদের তত্ত্বাবধানকারী। তাকে তার প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। পুরুষ তার স্ত্রী-সন্তানদের তত্ত্বাবধায়ক। তার নিকট হতে ওদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রীলোক তার স্বামীর গৃহের তত্ত্বাবধায়ক। তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"-(বুখারী)

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, পুরুষ যেমন তার স্ত্রী ও সন্তানদের যিম্মাদার তেমনি স্ত্রীও তার গৃহের যিম্মাদার। এজন্য গার্হস্থ্য ব্যাপারাদিতে পুরুষ ও নারীর পদমর্যাদা সমান।

স্ত্রীদের সাথে সদাচরণের নির্দেশ

যদি বিবাহের পর স্বামী তার স্ত্রীকে পছন্দ না করে অথবা উভয়ের মধ্যে কোনো কারণে বনিবনা না হয়, তথাপি স্বামী তার স্ত্রীর সাথে উত্তমভাবে মিলে-মিশে বসবাস করবে এবং কোনোক্রমেই অধৈর্য হবে না। যেমন পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاۤءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّاۤ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰۤى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ۝ (النساء : ١٩)

"হে ঈমানদারগণ ! নারীদেরকে জবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয় ; তোমরা ওদেরকে যা দিয়েছ তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা প্রকাশ্যে ব্যভিচার করে। তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে, তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ করো তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ।"-(সূরা নিসা ঃ ১৯)

সাধারণত গার্হস্থ্য ব্যাপারে অনেক ছোটখাট কারণে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে অবনতির ভিত্তি রচিত হয়ে যায়, যা অধিকাংশ স্ত্রীদের নাজুক স্বভাবের পরিণতি।

www.amarboi.org

স্ত্রীদের স্বাভাবিক দুর্বলতাকে অতি সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে এবং এর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ

"তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করো। কারণ, তাদেরকে পাঁজরের বক্র হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তোমরা ওকে সোজা করার চেষ্টা কর তাহলে ভেঙ্গে ফেলবে। তাই এ বক্রতা সত্ত্বেও তাদের সাথে মিলে-মিশে সদ্ভাবে জীবন যাপন করো।"-(বুখারী)

অন্য আরেক হাদীসে আছে ঃ

"তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম।"

মতবিরোধের ক্ষেত্রে আপোষের চেষ্টা

যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়ে যায় অথবা এর আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে যতদূর সম্ভব উভয়ের মধ্যে আপোষ করার চেষ্টা করা উচিত।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো ঃ

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ۚ اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا ۝

"তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা তার পরিবার হতে একজন ও ওর পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে ; তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৩৫)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ (النساء : ١٢٨)

"কোনো স্ত্রী যদি তার স্বামীকে দুর্ব্যবহার ও উপেক্ষার আশঙ্কা করে তবে তারা আপোষ নিষ্পত্তি করতে চাইলে তাদের কোনো দোষ নেই এবং আপোষ নিষ্পত্তিই শ্রেয়।"-(সূরা আন নিসা ঃ ১২৮)

www.amarboi.org

তালাক ও ইদ্দতের হুকুম

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্যের পর যদি আপোষের কোনো উপায় না থাকে এবং উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠে তাহলে আল্লাহ্ উভয়ের মালিক। তিনি উভয়কে পরস্পর অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا ○

"যদি তারা পরস্পর পৃথক হয়ে যায় তবে আল্লাহ্ তার প্রাচুর্য দ্বারা তাদের প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।"

–(সূরা আন নিসা ঃ ১৩০)

যদিও কোনো কোনো পরিস্থিতিতে তালাক অপরিহার্য হয়ে পড়ে, কিন্তু তা শরীআতের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা অপছন্দনীয় বৈধ বিষয় বটে। এজন্য পবিত্র কুরআনে বার বার আপোষের তাকীদ দেয়া হয়েছে এবং তালাকের ক্ষেত্রেও উত্তম প্রক্রিয়ায় তালাক প্রদানের হুকুম দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, তিন তালাক এক সঙ্গে প্রদান করবে না ; বরং বিরতি দিয়ে দিয়ে প্রদান করবে। হয়তো বা এ অবসরে উভয়ের মধ্যে আপোষ ও সমঝোতার কোনো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে এবং স্বামী রুজু করে নিবে। অর্থাৎ বাইন তালাক পতিত হওয়ার পূর্বে স্বামীর কর্তব্য এই যে, ইদ্দত পালনকালে স্ত্রীকে গৃহ হতে বের করে দেবে না এবং ইদ্দত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তার ভরণ-পোষণ করবে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ج

وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ج لَاتُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ

مُّبَيِّنَةٍ ط وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ط وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ط لَاتَدْرِىْ

لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ○ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ط

ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ط وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ

لَّهٗ مَخْرَجًا ○(الطلاق : ١-٢)

www.amarboi.org

"হে নবী ! তোমরা যখন তোমাদের স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে ইচ্ছা কর তাদেরকে তালাক দিও ইদ্দতের প্রতি লক্ষ্য রেখে, ইদ্দতের হিসাব রেখো এবং তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করো ; তোমরা ওদেরকে ওদের বাসগৃহ হতে বহিষ্কার করো না এবং ওরাও যেন বের না হয়, যদি না ওরা লিপ্ত হয় স্পষ্ট অশ্লীলতায় ; এগুলো আল্লাহর বিধান ; যে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে সে নিজেরই উপর অত্যাচার করে। তুমি জান না, হয়তো আল্লাহ এরপর কোনো উপায় করে দেবেন। ওদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি ওদেরকে রেখে দিবে, না হয় ওদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ করবে এবং তোমাদের মধ্য হতে দু'জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখবে, তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে। এদ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেয়া হচ্ছে ; যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার পথ করে দিবেন।"–(সূরা আত তালাক ঃ ১-২)

অন্ধকার যুগে আরবরা চূড়ান্ত বিচ্ছেদের পূর্বে এবং ইদ্দতকালে তাদের স্ত্রীদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিত। এজন্য পবিত্র কুরআন উত্তম পন্থায় স্ত্রীদেরকে তালাক হতে রুজু করার অথবা উত্তম পন্থায় বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং তাদেরকে কষ্ট দিতে নিষেধ করেছে। আর যদি তারা গর্ভবতী হয়, তবে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদেরকে গৃহে স্থান দেয়ার এবং তাদের ভরণ-পোষণের হুকুম দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ ○ (الطلاق : ٦)

"তোমরা তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী যেই স্থানে বাস কর তাদেরকে সেই স্থানে বাস করতে দেবে, তাদেরকে উত্যক্ত করবে না সংকটে ফেলার জন্য, তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত তাদের জন্য ব্যয় করবে, যদি তারা তোমাদের সন্তানদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদেরকে পারিশ্রমিক দেবে এবং সন্তানের কল্যাণ সম্পর্কে তোমরা সংগতভাবে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করবে ; তোমরা যদি নিজ নিজ দাবীতে অনমনীয় হও তাহলে অন্য নারী তার পক্ষে স্তন্য দান করবে।"–(সূরা তালাক ঃ ৬)

www.amarboi.org

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ص وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ط وَلَا تَتَّخِذُوْا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ز وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهٖ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ○(البقرة ٢٣١)

"যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত পূর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দেবে অথবা বিধিমত মুক্ত করে দেবে। কিন্তু তাদের ক্ষতি করে সীমাংলঘনের উদ্দেশ্যে তাদেরকে তোমরা আটকিয়ে রেখো না। যে এরূপ করে, সে নিজের প্রতি জুলুম করে। এবং তোমরা আল্লাহর বিধানকে ঠাট্টা তামাশার বস্তু করো না এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'মাত ও কিতাব এবং হিকমত—যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, যা দ্বারা তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন, তা স্মরণ কর। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে জ্ঞানময়।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩১)

তিন তালাক দেয়ার পর আর রুজু করার অবকাশ নেই। এজন্য প্রথমে দু' তালাক প্রদানের হুকুম দেয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, হয়তো ইত্যবসরে আপোষের কোনো অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাবে। যদি আপোষের কোনো অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তাহলে উত্তম আচরণের মাধ্যমে বিদায় করে দেবে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ص فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ط (البقرة : ٢٢٩)

"এ তালাক দু'বার। অতপর স্ত্রীকে হয় বিধিমত রেখে দেবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২২৯)

মাহ্র আদায় করা

তালাকের পর মাহ্রের অর্থ হৃষ্টচিত্তে পরিশোধ করা উচিত। যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় এর কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তাহলে এতে কোনো দোষ নেই। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَیْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِیْٓـًٔا مَّرِیْٓـًٔا ○ (النساء : ٤)

"তোমরা নারীদেরকে তাদের মাহ্‌র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রদান করবে, সন্তুষ্ট চিত্তে তার মাহ্‌রের কিয়দংশ ছেড়ে দিলে তোমরা তা স্বচ্ছন্দে ভোগ করবে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৪)

স্বামী স্ত্রীকে যত কিছুই দান করে থাকুক, তালাকের পর তা ফিরিয়ে নেয়া উচিত হবে না এবং এর জন্য তার প্রতি কোনোরূপ অপবাদ আরোপ করাও উচিত হবে না। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ ۙ وَّاٰتَیْتُمْ اِحْدٰهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَیْـًٔا ؕ اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِیْنًا ○ وَكَیْفَ تَاْخُذُوْنَهٗ وَقَدْ اَفْضٰی بَعْضُكُمْ اِلٰی بَعْضٍ وَّاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّیْثَاقًا غَلِیْظًا ○ (النساء : ٢٠-٢١)

"তোমরা যদি এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা স্থির কর এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থও দিয়ে থাক, তবুও ওটা হতে কিছুই প্রতিগ্রহণ করো না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ এবং প্রকাশ্য পাপাচরণ দ্বারা ওটা গ্রহণ করবে ? কিরূপে তোমরা ওটা গ্রহণ করবে, যখন তোমরা একে অপরের সাথে সংগত হয়েছ এবং তারা তোমাদের নিকট হতে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিয়েছে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২০-২১)

তালাকপ্রাপ্তাকে দ্বিতীয় বিবাহ হতে বাধাদান নিষিদ্ধ

স্ত্রীদেরকে প্রদত্ত অর্থ-সম্পদ ফেরত নেয়ার জন্য তাদেরকে জোরপূর্বক বন্দী করে রাখা—যাতে তারা দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করতে না পারে—নিতান্ত অসমীচীন ও গর্হিত কাজ। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

یٰٓاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا یَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا ؕ وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَآ اٰتَیْتُمُوْهُنَّ اِلَّآ اَنْ یَّاْتِیْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓی اَنْ تَكْرَهُوْا شَیْـًٔا وَّیَجْعَلَ اللّٰهُ فِیْهِ خَیْرًا كَثِیْرًا ○ (النساء : ١٩)

www.amarboi.org

"হে ঈমানদারগণ ! নারীদেরকে যবরদস্তি তোমাদের উত্তরাধিকার গণ্য করা বৈধ নয়, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তা হতে কিছু আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে অবরুদ্ধ করে রেখো না, যদি না তারা প্রকাশ্য ব্যভিচার করে। তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে, তোমরা যদি তাদেরকে অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ্ যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ।"–(সূরা নিসা ঃ ১৯)

ইদ্দতকাল অতিবাহিত হওয়ার পর স্ত্রীদেরকে দ্বিতীয় বিবাহ্ হতে বিরত রাখা উচিত নয়। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ط (البقرة : ٢٣٢)

"তোমরা যখন স্ত্রীদেরকে তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দতকাল পূর্ণ করে, তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তবে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে বিবাহ্ করতে চাইলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিও না।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৩২)

জাহিলিয়া যুগে পুরুষরা তালাকপ্রাপ্ত নারীদেরকে যেসব পন্থায় কষ্ট দিত উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে সেসব পন্থা প্রতিরোধ করা হয়েছে।

স্ত্রীদের খুলআ' তালাকের অধিকার

যেরূপ স্বামীর জন্য স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অধিকার রয়েছে, সেরূপ বিশেষ অবস্থাদিতে স্ত্রীর জন্যও স্বামীকে কিছু বিনিময় প্রদানপূর্বক তার নিকট হতে অব্যাহতি লাভের অধিকার রয়েছে। এটাকে শরীআতের পরিভাষায় খুলআ বলা হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ط فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ ط تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ج وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ (البقرة : ٢٢٩)

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীকে যা প্রদান করেছ তন্মধ্য হতে কোনো কিছু গ্রহণ করা তোমাদের পক্ষে বৈধ নয়, অবশ্য যদি তাদের উভয়ের আশংকা হয় যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তবে স্ত্রী

www.amarboi.org

কোনো কিছুর বিনিময়ে নিষ্কৃতি পেতে চাইলে তাতে তাদের কারো কোনো অপরাধ নেই। এসব আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা ওটা লঙ্ঘন করো না। যারা এসব সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই জালিম।"-(বাকারা ঃ ২২৯)

এ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসে ঃ

"হাবীবা বিনতে সাহ্ল হতে বর্ণিত, তিনি সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাস এর বিবাহাধীন ছিলেন। একদিন নবী করীম (সাঃ) ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে বের হলে হাবীবা বিনতে সাহ্লকে দেখতে পেলেন, তিনি অন্ধকারে তাঁর ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কে ? হাবীবা উত্তরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি হাবীবা বিনতে সাহ্ল। নবী করীম (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জন্য এসেছ ? তিনি বললেন, আমার ও সাবিত ইবনে কায়েসের পক্ষে এক সঙ্গে বসবাস করা সম্ভব নয়। সাবিত ইবনে কায়িস এলে নবী করীম (সাঃ) তাকে বললেন, এ হচ্ছে হাবীবা বিনতে সাহ্ল। এর যা কিছু বলার, সে বলে ফেলেছে। তখন হাবীবা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, সাবিত আমাকে যা কিছু দিয়েছিল, তার সবই আমার কাছে রক্ষিত আছে। এটা শুনে নবী করীম (সাঃ) সাবিতকে বললেন, তুমি এসব সম্পদ হতে কিছু নিয়ে তার বিনিময়ে হাবীবাকে তালাক দিয়ে দাও। সুতরাং সাবিত কিছু সম্পদ নিয়ে নিলেন এবং হাবীবা তার পিত্রালয়ে চলে গেলেন। এ রেওয়ায়াতটি হুবহু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে অন্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

বিবাহের ব্যাপারে মহিলাদের পছন্দ ও সম্মতি জরুরী

ইসলাম-পূর্ব যুগে বিবাহে মেয়েদের সম্মতি প্রয়োজনীয় মনে করা হতো না। মাতাপিতা অথবা অভিভাবকরা নিজেদের পছন্দ মত মেয়েদেরকে বিবাহ দিতেন। এ ব্যাপারে তাদের আপত্তির কোনো অবকাশ ছিল না। ইসলামই প্রথম ধর্ম, যে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের সম্মতি আবশ্যক সাব্যস্ত করেছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

"স্বামীহীনা নারীগণ (চাই কুমারী হোক অথবা তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা) তাদের অভিভাবকদের মুকাবালায় নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিক হকদার। কুমারীরা মনে মনে সম্মতি প্রদান করবে। তাদের নীরবতাই তাদের সম্মতি।"

অর্থাৎ কুমারীদের জন্য মৌখিক সম্মতি জরুরী নয় ; বরং শুধু তাদের অন্তরের সম্মতিই যথেষ্ট। তাদের নীরবতাই তাদের সম্মতির লক্ষণ।

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে ঃ

www.amarboi.org

"নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, স্বামীহীনা মহিলা অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তা অথবা বিধবা মহিলাকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ দেয়া যাবে না, যতক্ষণ না সে পরিষ্কারভাবে তার সম্মতি জ্ঞাপন করবে। বস্তুত কুমারীদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত বিবাহ দেয়া যাবে না, যতক্ষণ না তার সম্মতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তার সম্মতি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার উপায় কি ? তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন, নীরবতাই তার সম্মতি।"

বলপূর্বক সম্পাদিত বিবাহ ভেঙ্গে ফেলার অধিকার

পিতা যদি তার কন্যাকে বলপূর্বক অর্থাৎ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিয়ে দেয়, তাহলে কন্যা ইচ্ছা করলে সে বিবাহ ভেঙ্গে ফেলতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, জনৈকা মহিলা তার স্বামীর মৃত্যুর পর এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা করছিল, কিন্তু তার পিতা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য এক ব্যক্তির সাথে তাকে বিবাহ দিয়ে দেয়। মহিলাটি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট অভিযোগ করলে তিনি তার পিতাকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তোমার কন্যাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ দিয়েছ ? সে বললো, জী হ্যাঁ, সে যে ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা করছিল, আমি তার চেয়ে উত্তম পাত্রের সাথে তাকে বিবাহ দিয়েছি। এটা শুনে নবী করীম (সাঃ) ঐ নব-দম্পতির বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিলেন।-(মুসনাদে আবু হানীফা)

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, "একজন কুমারী যুবতী নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হয়ে এ মর্মে অভিযোগ করলো যে, তার পিতা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে বিবাহ দিয়েছে। নবী করীম (সাঃ) তার অভিযোগ শ্রবণ করে তাকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এখতিয়ার দিলেন—অর্থাৎ তাকে বিবাহ বহাল রাখার অথবা ভেঙ্গে ফেলার এখতিয়ার প্রদান করলেন।"-(আবু দাউদ)

"বারীরা (রাঃ) একজন ক্রীতদাসী ছিলেন। তার স্বামী মুগীসও ছিলেন ক্রীতদাস। বারীরাকে তার মনিব আযাদ করে দিলে তিনি মুগীসকে পরিত্যাগ করেন। (কারণ, আযাদী লাভের পর স্ত্রীলোকের জন্য তার ক্রীতদাস স্বামীকে পরিত্যাগ করার এখতিয়ার রয়েছে।) মুগীস বারীরাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন বলে অশ্রুসিক্ত নয়নে তার পিছনে পিছনে ঘুর ঘুর করতেন। তার এ করুণ অবস্থা লক্ষ্য করে নবী করীম (সাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন, আশ্চর্য ! বারীরার প্রতি মুগীসের প্রণয় কতই না গভীর, অথচ তার প্রতি বারীরার কত বিরাগ ! তিনি মুগীসের এ

www.amarboi.org

করুণ অবস্থা দেখে বারীরাকে বললেন, তুমি বরং মুগীসের নিকট ফিরে যাও। বারীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এটা কি আপনার হুকুম ? হুযূর জবাব দিলেন, না, বরং এটা একটা সুপারিশ মাত্র। তখন বারীরা বলে উঠলেন, তাহ্লে আমি আর ফিরে যাচ্ছি না।"-(বুখারী)

এ দ্বারা বিবাহের ব্যাপারে স্ত্রীলোকদের স্বাধীনতা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মে।

মীরাসে নারীদের অংশ

ইসলাম-পূর্ব যুগে নারীরা তাদের নিজস্ব সম্পত্তিরও মালিক থাকতে পারতো না। বিবাহের পর স্বামীরা সেগুলোর মালিক হয়ে যেত। সম্পত্তির উত্তরাধিকারে তাদের কোনো অংশ ছিল না। ইসলাম নারীসমাজকে মাতা, কন্যা, ভগ্নি, স্ত্রী হিসাবে মাতা, পিতা, স্বামী, ভাই, বোন এবং পুত্র ও কন্যার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে তাদের অংশও নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর বিস্তারিত বিবরণ পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে। তাদেরকে বিষয়-সম্পত্তির মালিক সাব্যস্ত করা হয়েছে। যেভাবে ইচ্ছা তারা ওটা ব্যয় করতে পারবে।

সতী সাধ্বী নারীদের সম্মান ও সতীত্বের হিফাযত

ইসলাম বিভিন্নভাবে নারীদের ইয্যত ও সম্মানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে এবং তাদের মান-সম্ভ্রম প্রতিষ্ঠিত করেছে। জাহিলিয়া যুগে তাদের প্রতি অপবাদ আরোপ করা একটি সাধারণ ব্যাপার ছিল। ফলে তাদের জীবনটাই বিপন্ন হয়ে উঠতো এবং তাদের গোটা পরিবারও বদনাম ও কলঙ্কের ভাগী হতো। পবিত্র কুরআন অপরাধ আরোপকারীদেরকে ইহ-পরকালে লানত এবং কিয়ামত দিবসে কঠোর শাস্তির যোগ্য বলে ঘোষণা করেছে। যেমন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ـ

وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ○(النور : ٢٣)

"যারা সাধ্বী, সরলমনা ও বিশ্বাসী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য আছে মহাশাস্তি।"
-(সূরা আন নূর ঃ ২৩)

কুরআন শুধু এ ভীতি প্রদর্শন করেই শেষ করেনি ; বরং অপবাদ আরোপকারীরা অপবাদ প্রমাণের স্বপক্ষে চারজন সাক্ষী পেশ করতে ব্যর্থ হলে তাদেরকে ফাসিক ও সাক্ষ্য প্রদানের অযোগ্য সাব্যস্ত করেছে এবং তাদের শাস্তি স্বরূপ আশিটি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন ঃ

www.amarboi.org

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ ○ (النور : ٤)

"যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চার জন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই তো সত্যত্যাগী।"–(সূরা আন নূর ঃ ৪)

নবী করীম (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা

স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)-এর আমল হচ্ছে নারীদের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বড় আদর্শ কাল। তার দৃষ্টিতে নারীদের যে সম্মান ও মর্যাদা ছিল তা প্রমাণের জন্য নিম্নোক্ত হাদীসটিই যথেষ্ট।

"তোমাদের দুনিয়ার বস্তুরাজি হতে আমার জন্য নারী ও সুগন্ধিকে প্রিয় করে দেয়া হয়েছে। তবে আমার চোখের শীতলতা নামাযের মধ্যে।"

নারীদের সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় স্বীকৃতি আর কি হতে পারে?

এক হাদীসে নবী করীম (সাঃ) কাঁচের পাত্রের সাথে নারীর তুলনা করেছেন।

একবার তিনি তার পবিত্রা স্ত্রীদের সাথে নিয়ে সফর করছিলেন। কাফেলার উট-চালক আনজাশা উটগুলোকে দ্রুত চালাবার জন্য হুদী গান গাইতে শুরু করলে নবী করীম (সাঃ) বলেন ঃ "হে আনজাশা ! কাঁচপাত্র (অর্থাৎ মহিলাদের)-কে সতর্কতার সাথে নিয়ে চল।"–(মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ) নামাযের ক্ষেত্রে নারীদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করতেন। হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি নামায দীর্ঘ করতে ইচ্ছা করি, কিন্তু (মুক্তাদী মায়েদের) শিশুদের কান্নার শব্দ শুনে তাদের উৎকণ্ঠার কথা বিবেচনা করে তা সংক্ষিপ্ত করে ফেলি।–(মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ)-এর খিদমতে সবসময় পুরুষদের ভীড় লেগে থাকতো। মহিলারা ওয়ায ও উপদেশ শ্রবণ এবং মাসায়িল জিজ্ঞেস করার বড় একটা সুযোগ পেত না। তারা আবেদন জানালো, যেন তাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। নবী (সাঃ) মহিলাদের সে আবেদন মঞ্জুর করেন।–(বুখারী)

নবী করীম (সাঃ)-এর কোমলতা ও দয়াদ্রতার কারণে মহিলারা তাঁর সাথে কথা বলতে কোনো সংকোচ করতো না। একবার কিছু সংখ্যক ঘনিষ্ট

www.amarboi.org

মহিলা আত্মীয়া সমবেত হয়েছিল এবং তারা নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে পাল্লা দিয়ে কথা বলতে শুরু করেছিল। এমন সময় হযরত উমর (রাঃ) সেখানে এসে পড়লে তারা সবাই উঠে চলে গেল। এতে নবী করীম (সাঃ) হেসে ফেললেন। হযরত উমর (রাঃ) নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আল্লাহ আপনাকে সর্বদা হাসিখুশি রাখুন। আপনি এখন হাসলেন কেন ? হুযুর (সাঃ) বললেন, ঐসব মহিলার কারণে, যারা তোমার সাড়া পেয়েই নীরব হয়ে গেছে। হযরত উমর (রাঃ) সেই সব মহিলাকে বললেন, নিজেদের প্রাণের শত্রুগণ! আমাকে ভয় কর অথচ আল্লাহর রাসূল (সাঃ)-কে ভয় করো না। তারা বললো, আপনার মেযাজ নবী করীম (সাঃ)-এর মেযাজের তুলনায় কঠোর।-(বুখারী)

একদা হুযুর (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন। দিনটি ছিল কোনো এক ঈদের দিন। তাই বালিকারা আনন্দে দফ বাজিয়ে গান করছিল। এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) সেখানে আগমন করলেন এবং বালিকাদেরকে ধমক দিলেন। নবী করীম (সাঃ) তখন বললেন, এদেরকে গাইতে দাও। আজকের দিনটি তাদের ঈদ ও আনন্দের দিন।-(মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ) যখন মহিলাদের কোনো সমাবেশের পাশ দিয়ে গমন করতেন, তখন স্বয়ং তাদেরকে সালাম করতেন। আসমা বিনতে ইয়াযীদ বর্ণনা করেছেন যে, একদা নবী করীম (সাঃ) মসজিদের ভিতরে মহিলাদের সমাবেশের সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তাদেরকে হাতের ইশারায় সালাম করছিলেন।
-(তিরমিযী)

যেসব মহিলার সাথে হুযুর (সাঃ)-এর কোনো প্রকার সম্পর্ক থাকতো, তিনি মাঝে মাঝে তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য গমন করতেন। হযরত আনাস (রাঃ)-এর মাতা উম্মে সুলাইমের গৃহে হুযুর (সাঃ) কখনো গেলে তিনি তার জন্য বিছানা পেতে দিতেন এবং তিনি সেখানে আরাম করতেন। যখন তিনি ঘুম থেকে উঠতেন, তখন উম্মে সুলাইম তাঁর ঘাম একটি শিশিতে জমা করে রাখতেন। তিনি মৃত্যুর সময় অসীয়ত করে গিয়েছিলেন যে, তার কাফনের সুগন্ধির সাথে এই পবিত্র ঘামটুকু যেন মিশিয়ে দেয়া হয়।-(বুখারী)

পবিত্রা স্ত্রীদের সাথে হুযুর (সাঃ)-এর উত্তম আচরণ

নবী করীম (সাঃ) আপন স্ত্রীদের সাথে কিরূপ করুণা ও ভদ্রতার আচরণ করতেন তা তার গার্হস্থ্য জীবনের ঘটনাসমূহ থেকে অনুমান করা যেতে পারে। তাঁর প্রাত্যহিক নিয়ম ছিল যে, তিনি তার পবিত্র স্ত্রীদের গৃহে (যারা খুব কাছাকাছিই বাস করতেন) যেতেন এবং প্রত্যেকের সাথে কিছু সময় অতিবাহিত

www.amarboi.org

করতেন। শেষ পর্যন্ত যে স্ত্রীর গৃহে তার অবস্থানের পালা নির্ধারিত থাকতো, তিনি সেখানেই রাত্রি যাপন করতেন।-(আবু দাউদ)

যুরকানীর বর্ণনায় হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে লিখিত হয়েছে যে, নবী করীম (সাঃ) আসরের সময় পবিত্র স্ত্রীদের গৃহে যেতেন এবং এর সূচনা হযরত উম্মে সালমা (সাঃ)-এর গৃহ হতে করতেন। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে যে, যেদিন যেই পবিত্রা সহধর্মিণীর পালা থাকতো, সেদিন তাঁর গৃহে অন্য সকল পবিত্রা স্ত্রীরা এসে উপস্থিত হতেন এবং দীর্ঘক্ষণ সবাই একত্রে কাটাতেন। রাত্রির কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর সবাই নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেতেন।

নবী করীম (সাঃ)-এর প্রথমা স্ত্রী হযরত খাদীজা (রাঃ) বয়সে তার চাইতে পনর বছরের বড় ছিলেন ; এতদসত্ত্বেও তাঁর প্রতি নবী করীম (সাঃ)-এর অনুরাগ ছিল অত্যন্ত গভীর। তার জীবদ্দশায় তিনি দ্বিতীয় কোনো বিবাহ করেননি। তার মৃত্যুর পর অত্যন্ত বেদনার সাথে তিনি তাকে স্মরণ করতেন এবং যখনই তার কথা আলোচনা হতো তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠতেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমি হযরত খাদীজা (রাঃ)-কে দেখিনি; কিন্তু নবী করীম (সাঃ) তাঁকে এত অধিক স্মরণ করতেন যে, আমি হযরত খাদীজার প্রতি যে পরিমাণ ঈর্ষা পোষণ করতাম, ততটা আর কারো প্রতি করতাম না। নবী করীম (সাঃ) যখন কুরবানী করতেন, তখন তার গোশত সর্বাগ্রে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবীদের নিকট পাঠাতেন।

একদা হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর বোন হালাহ (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করতে এলে ভিতরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তার কণ্ঠস্বর অবিকল হযরত খাদীজার কণ্ঠস্বরের মত ছিল। ওটা শ্রবণ করতেই নবী করীম (সাঃ)-এর মনে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর স্মৃতি প্রকট হয়ে উঠে। তিনি তখন চমকে উঠেন এবং বলেন, মনে হয় সে হালাহ (রাঃ) হবে। হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন হুযুর (সাঃ)-কে বলেন, আপনি কি একজন বৃদ্ধা মহিলাকে স্মরণ করছেন, যিনি দীর্ঘদিন পূর্বেই গত হয়ে গেছেন এবং আল্লাহ আপনাকে তার চাইতে উত্তম স্ত্রী দান করেছেন ?-(মুসলিম)

বদরের যুদ্ধে নবী করীম (সাঃ)-এর জামাতা আবুল আস—যিনি তখন পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেননি—মুসলমানদের হাতে বন্দী হন। তার নিকট মুক্তিপণের অর্থ ছিল না। তিনি তার স্ত্রী হযরত যায়নাব (রাঃ)-এর নিকট (তিনি তখন মক্কায় ছিলেন) মুক্তিপণের অর্থ প্রেরণ করবার জন্য খবর পাঠান।

www.amarboi.org

হযরত যায়নাবের বিবাহের সময় হযরত খাদীজা (রাঃ) তাঁকে একখানা মূল্যবান হার যৌতুক হিসেবে দান করেছিলেন। তিনি সেই হারখানি গলা থেকে খুলে মুক্তিপণ হিসাবে পাঠিয়ে দেন। নবী করীম (সাঃ) যখন ওটা দেখেন তখন দীর্ঘ পঁচিশ বছরের ভালবাসার স্মৃতি-বিজড়িত নানা ঘটনা তার মনে পড়ে যায়। তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেঁদে ফেলেন এবং সাহাবীদেরকে বলেন, তোমাদের যদি আপত্তি না থাকে, তবে আমার কন্যাকে তার মায়ের স্মৃতিচিহ্নখানা ফিরিয়ে দাও। সবাই এক বাক্যে তাতে সমর্থন জানালে সেই হারখানা ফিরিয়ে দেয়া হয়।-(আবু দাউদ)

হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর পরে হযরত আয়েশা (রাঃ) আপন প্রতিভা, বুদ্ধিমত্তা ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যসমূহের কারণে নবী করীম (সাঃ)-এর অত্যধিক প্রিয় পাত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। তিনি বিবাহের সময় নিতান্ত অল্পবয়স্কা ছিলেন। তিনি আপন সমবয়স্কা বালিকাদের সাথে পুতুল খেলা করতেন। তখন নবী করীম (সাঃ) হঠাৎ এসে পড়লে বালিকারা পালিয়ে যেত। তিনি তখন তাদেরকে ডেকে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে পাঠিয়ে দিতেন।-(মুসলিম)

হাবশীরা হেরাব নামক ছোট বর্শার সাহায্যে এক প্রকার খেলা করতো। একবার ঈদের দিনে তারা এ খেলা প্রদর্শন করছিল। হযরত আয়েশা (রাঃ) তা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে নবী করীম (সাঃ) তার সামনে দাঁড়িয়ে যান এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর আড়ালে দাঁড়িয়ে সে খেলা উপভোগ করেন। তিনি ক্লান্ত হয়ে বসে না পড়া পর্যন্ত নবী করীম (সাঃ) একটানা দাঁড়িয়েই ছিলেন।-(বুখারী)

একদিন নবী করীম (সাঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, এসো, দৌড়ে প্রতিযোগিতা করা যাক। হযরত আয়েশা (রাঃ) তখন হালকাদেহী তন্বী ছিলেন। ফলে তিনি নবী করীম (সাঃ)-কে সহজেই পেছনে ফেলে এগিয়ে যান। এর বেশ কিছুকাল পর যখন তার বয়স একটু বাড়লো এবং দেহ ভারী হয়ে উঠলো, তখন আবার দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। এবার আয়েশা (রাঃ) পেছনে পড়ে যান। নবী করীম (সাঃ) তখন বললেন, এটা হচ্ছে সেই দিনের বদলা। -(আবু দাউদ)

একবার নবী করীম (সাঃ) এক ক্রীতদাসীকে সঙ্গে নিয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে আসেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি একে চেন কি? তিনি বলেন, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! হুযুর (সাঃ) বলেন, সে অমুক ব্যক্তির দাসী। তুমি কি এর গান শুনতে চাও? হযরত আয়েশা (রাঃ) আগ্রহ প্রকাশ

www.amarboi.org

করলে দাসীটি তাকে গান গেয়ে শুনালো। নবী করীম (সাঃ) তা শুনে বলেন, এর নাকের ছিদ্রে শয়তান (বাঁশী) বাজায়। অর্থাৎ তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর মন রক্ষার জন্য গান শুনাবার ব্যবস্থা করেছিলেন ; কিন্তু তিনি নিজে তা পছন্দ করেননি।

নবী করীম (সাঃ) প্রায়ই হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে বসে আহার করতেন। একবার যখন তারা উভয়ে আহার করছিলেন, তখন হঠাৎ হযরত উমর (রাঃ) এসে উপস্থিত হন। নবী করীম (সাঃ) তাকেও আহারে শরীক করে নেন।−(আদাবুল মুফরাদ)

নবী করীম (সাঃ) কোনো কোনো সময় হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উরুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তেন। একবার তিনি যখন ঠিক এভাবে আরাম করছিলেন, তখন হযরত আবু বকর (রাঃ) হঠাৎ সেখানে এসে হাযির হন। এতদসত্ত্বেও হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর আরামে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কায় একটুও নড়াচড়া করেননি।−(বুখারী)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এরূপ যে, উভয়ের মধ্যে মর্যাদার যত পার্থক্যই থাক না কেন, নারীসুলভ ভাবভঙ্গি এর উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে নিঃসঙ্কোচে উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন—এমন সময় হযরত আবু বকর (রাঃ) সেখানে এসে উপস্থিত হন। তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর কথা বলার ঐ ভাবভঙ্গি দেখে ভীষণ রাগান্বিত হন এবং তাকে তিরস্কার করতে উদ্যত হন। নবী করীম (সাঃ) তখন তাকে নিরস্ত করেন এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেন, দেখলে তো, তোমাকে কেমন করে বাঁচিয়ে দিলাম।−(আবু দাউদ)

হযরত সাফিয়া (রাঃ) খায়বারের সরদার হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা ছিলেন। খায়বরের যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের হাতে বন্দী হন এবং গনীমত হিসাবে নবী করীম (সাঃ)-এর ভাগে পড়েন। নবী করীম (সাঃ) তার মর্যাদার বিবেচনায় তাকে বিবাহ করে নেন। তিনি ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত ছিলেন। এজন্য অন্যান্য বিবিগণ তাকে এর উপর খোঁটা দিতেন। একবার যখন তিনি এ খোঁটার কারণে ক্রন্দন করছিলেন তখন নবী করীম (সাঃ) সেখানে আসেন এবং তাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করেন। হযরত সাফিয়া (রাঃ) বলেন, হযরত হাফসা (রা) [হযরত ওমর (রাঃ)-এর কন্যা] আমাকে প্রায়ই এই বলে খোঁটা দেন যে, তুমি ইয়াহূদীর কন্যা। তখন নবী করীম (সাঃ) তাঁকে খুশী করার জন্য বলেন, তুমি নবীর কন্যা [হযরত হারুন (আঃ)-এর বংশধর], তোমার

www.amarboi.org

চাচা অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) নবী ছিলেন এবং তুমি নিজে একজন নবীর সহধর্মিণী। অতএব হাফসা তোমার উপর কিভাবে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। পরে হুযুর (সাঃ) হযরত হাফসা (রাঃ)-কে বলেন, হাফসা, আল্লাহকে ভয় কর।

অন্য আরেকটি রেওয়ায়াতে আছে, হযরত হাফসা ও হযরত আয়েশা (রাঃ) তাকে (হযরত সাফিয়াকে) বলেছিলেন, আমরা দুজন তোমার তুলনায় অধিক সম্ভ্রান্ত। এজন্য যে, আমরা একদিকে নবী করীম (সাঃ)-এর সহধর্মিণী, আবার অন্য দিকে তাঁরই চাচাত বোন (অর্থাৎ একই বংশের লোক)। তিনি নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ করলে নবী করীম (সাঃ) বলেন, তুমি কেন এ জবাব দিলে না যে, তোমরা কেমন করে আমার চেয়ে অধিক মর্যাদাবান হতে পার এমতাবস্থায় যে, আমার স্বামী মুহাম্মদ (সাঃ), আমার পিতা হারুন (আঃ) এবং আমার চাচা হযরত মূসা (আঃ)।-(তিরমিযী)

এ ধরনের আরও অনেক ঘটনা রয়েছে, যা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, পবিত্রা স্ত্রীদের সাথে নবী করীম (সাঃ)-এর সম্পর্ক কতই না মধুর ছিল এবং তিনি কতই না তাদের মন রক্ষা করে চলতেন।

বিধবাদের বিবাহের নির্দেশ

ইসলামের পূর্বে নারীদের মধ্যে বিধবারাই ছিল সর্বাপেক্ষা অত্যাচারিত শ্রেণী। স্বামীর মৃত্যুর পর তাদের জীবনের উপর দুর্বিসহ যন্ত্রণা, হতাশা ও নৈরাশ্য নেমে আসতো। স্বামী, পিতামাতা কিংবা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তাদের কোনো অংশ ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তারা সারা জীবনের জন্য তাদের উত্তরাধিকারীদের মুখাপেক্ষী ও দাসী হয়ে থাকতো। এমনকি তারা তাদের স্বামীদের ওয়ারিসদের সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হতো। ওরা তাদের সাথে যেমন খুশী ব্যবহার করতো। ভারতবর্ষে বিধবাদের দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি ছিল না। তারা স্বামীর শবদেহের সাথে চিতায় জ্বলে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাত অথবা সকল স্বাদ ও আনন্দ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে সারাটা জীবন বিধবার সাজে কাটিয়ে দিতে বাধ্য হতো।

ইসলাম এই অত্যাচারিত শ্রেণীর সাহায্যেও এগিয়ে আসে। তাদের সারা জীবনের শোক পালনের সীমা সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ চার মাস দশ দিনে নির্ধারণ করে দেয়। অবশ্য সে গর্ভবতী হলে এর সময়সীমা ছিল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। এ সীমা নির্ধারণ এজন্য ছিল, যাতে এ অবসরে তার দুঃখ-বেদনা কিছুটা হালকা হয়ে যায় এবং সে তার ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে

www.amarboi.org

পারে। অতপর সে দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার প্রাপ্ত হয়। যদি তার মাহ্‌র পরিশোধ করা না হয়ে থাকে, তবে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে সর্বাগ্রে তা পরিশোধ করা জরুরী সাব্যস্ত করা হয়। বিধবার জন্য স্বামীর সম্পত্তির অষ্টমাংশ এবং কোনো সন্তানাদি না থাকলে চতুর্থাংশ নির্ধারণ করা হয়—যাতে সে স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ সহায়-সম্বলহীন হয়ে না পড়ে। এভাবে ইসলাম বিধবাদেরকে বৈধব্যের বিপদাপদ এবং স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের অত্যাচার, গঞ্জনা ও গোলামী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়। ইসলাম মহিলাদেরকে শুধু দ্বিতীয় বিবাহেরই অনুমতি প্রদান করেনি ; বরং মুসলমান পুরুষদের প্রতিও এ নির্দেশ প্রদান করে ঃ

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ○(النور : ٣٢)

"তোমাদের মধ্যে যারা 'আইয়িম' (বিধবা নারী কিংবা বিপত্নীক পুরুষ) তাদের বিবাহ সম্পাদন কর এবং তোমাদের দাস ও দাসীদের মধ্যে যারা সৎ তাদেরও। তারা অভাবগ্রস্ত হলে আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করে দেবেন; আল্লাহ্ তো প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।-(আন নূর ঃ ৩২)

বিধবাদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ

ইসলাম বিধবাদের সাথে উত্তম আচরণ করাকে ইবাদাত সাব্যস্ত করেছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ

"বিধবা ও মিসকীনদের প্রতি সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায় অথবা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সারা দিন রোযা রাখে এবং সারা রাত নামায পড়ে।"

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে ঃ

"বিধবা ও মিসকীনদের প্রতি সাহায্যকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায়। [রাভী বলেন, আমার মনে হয়, নবী করীম (সাঃ) এও বলেছেন যে,] সেই নামাযীর ন্যায়, যে কখনও নামায আদায়ে ক্লান্ত হয় না এবং সেই রোযাদারের ন্যায়, যে কখনও রোযা ভঙ্গ করে না।"

স্বয়ং নবী করীম (সাঃ)-এর আদর্শ এই ছিল যে, তিনি তার যৌবনের প্রারম্ভে —যে সময়টা যৌবনের স্পৃহা ও উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ থাকে—একজন বিগত-যৌবনা নারী [হযরত খাদীজা (রাঃ)]-কে বিবাহ করেন, যিনি বয়সে তার চাইতে পনর বছরের বড় ছিলেন। তিনি তার সাথে এত গভীর অনুরাগ ও

www.amarboi.org

ভালবাসাপূর্ণ দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করেন যে, তার জীবদ্দশায় আর কোনো বিবাহ্ করেননি।

কুরআন যদিও বিধবাদেরকে বিবাহের অনুমতি দিয়েছে, কিন্তু যেসব বিধবা নিজেদের ছোট ছোট ইয়াতীম সন্তানদের ভালবাসার কারণে দ্বিতীয় বিবাহ্ না করে এবং ওদের লালন-পালনে নিয়োজিত থেকে একাকী বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে চায়, তাদেরকে পুনঃ বিবাহে বাধ্য করেনি ; বরং নবী করীম (সাঃ) অনুরূপ নারীর প্রশংসা করেছেন এবং তাদের মর্যাদা অনেক উর্ধে বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

"কিয়ামতের দিন আমি সর্বাগ্রে জান্নাতের দরজা খুলব। তখন দেখবো, একজন স্ত্রীলোক আমারও পূর্বে ভিতরে প্রবেশ করতে চাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করবো, তুমি কে ? সে বলবে, আমি একজন বিধবা, যার কয়েকজন ইয়াতীম শিশু ছিল।"-(আবু দাউদ)

১৪. আরব কেন ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র ভূমি ?

মহাজ্ঞানী ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাআলা যখন চান, যেখানে চান, যাকে দিয়ে চান এবং যেভাবে চান, যে কোনো কাজ করিয়ে নিতে পারেন। তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার সীমা-পরিসীমা নেই। তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে টু শব্দ করে এমন স্পর্ধা কার আছে ? তাঁরই ইচ্ছানুযায়ী আরবের মত পশ্চাৎপদ মরু অঞ্চলে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিশ্বধর্ম ইসলাম নিয়ে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)।

আল্লাহরই নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে বিশ্বজগত। এ জগত অত্যন্ত বাস্তব ও সুশৃংখল। এতে অবান্তর, অহেতুক বা খাপছাড়া কিছু নেই। এতদসত্ত্বেও নিছক চিত্ত-প্রশান্তির জন্য যদি কেউ প্রশ্ন করে, এতসব উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ থাকতে আরব ও মক্কাকে বিশ্বজনীন ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি রূপে নির্বাচন করা হলো কেন—তাহলে তার উত্তরে বলা যেতে পারে, যদিও এর প্রকৃত কারণ আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন, তবে এর পিছনে এমন অনেক বাহ্যিক কারণও রয়েছে, যা মানুষের কাছে সহজেই বোধগম্য। আর তাহ্লো ঃ

১. ভৌগলিক কারণ

বিশ্বের প্রাচীন মানচিত্রের উপর চোখ বুলালে দেখা যাবে যে—এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এতদসংশ্লিষ্ট ভূভাগের মধ্যে আরব উপদ্বীপই ছিল সব

www.amarboi.org

দিক দিয়ে কেন্দ্রস্থল হবার যোগ্য। কেননা এটা এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও আফ্রিকা এবং ইউরোপের অত্যন্ত নিকটবর্তী। বিশেষ করে ঐ দুই মহাদেশের তৎকালীন সুসভ্য অঞ্চল গ্রীক, মিসর এবং রোম আরবের কেন্দ্রভূমি মক্কাকে 'ভূমণ্ডলের নাভি' আখ্যা দিয়ে পরোক্ষভাবে আরব ভূখণ্ডকেই বিশ্বের কেন্দ্রভূমি হিসাবে মেনে নিয়েছিল।

কোনো কেন্দ্র থেকে তার প্রত্যেকটি প্রান্তিক অঞ্চল নিকটতর হয়ে থাকে। ফলে সেখান থেকে সর্বত্র পৌঁছা যায় অতি সহজে। আবহাওয়া মানুষের স্বভাব ও চরিত্রের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে থাকে, তা আজ সর্ববাদিসম্মত। প্রকৃতিগতভাবে প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন পাহাড় ও মরু অঞ্চলের অধিবাসীরা অধিক পরিশ্রমী, আর উর্বর অঞ্চলের অধিবাসীরা উন্নত সভ্যতা-সংস্কৃতির অধিকারী হয়ে থাকে। হিজায একটি অত্যন্ত সীমিত ভূভাগ, অথচ তার মধ্যে রয়েছে মক্কার মত তরুলতাহীন মরু অঞ্চল, তায়েফের মত সবুজ শ্যামল প্রান্তর এবং মদীনার মতো উর্বর ভূখণ্ড। এছাড়াও আরো অনেক কারণে হিজায ছিল বিশ্বের মধ্যে তুলনাহীন। আর একটি বিস্ময়কর ব্যাপার এই ছিল যে, এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার সাথে স্বভাবগত সামঞ্জস্য থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মকালে, আরব ঐ তিন মহাদেশের রাজনৈতিক প্রভাবের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কনস্টান্টিনোপলের রোমানরা উত্তর আরব, ইরানীরা পূর্ব আরব এবং আবিসিনীয়রা দক্ষিণ-পশ্চিম আরব দখল করে রেখেছিল। আর আরব ছিল ঐ তিন শক্তির তথা তিন মহাদেশের সঙ্গমস্থল এবং তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রভূমি।

২. সাংস্কৃতিক কারণ

বিশ্ব ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, চরম অবনতি এবং বর্বরতার পরই একটি জাতি দ্রুতবেগে ধাবিত হয় উন্নতির দিকে এবং তাদের হাতেই গড়ে উঠে নতুন সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তিমূল। আর যখন কোনো জাতি উন্নত ও ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠে, তখন তাদের মধ্যে অনাচার দেখা দেয় এবং ক্রমে ক্রমে তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, তারা নিজেরা আর নিজেদের শোধ্রাতে পারে না। ফলে বিশ্ব থেকে তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লোপ পায়। প্রধানতঃ অসভ্য এবং যাযাবররা নিজেদের নিঃস্বতা সত্ত্বেও দুনিয়ার সভ্য জাতিগুলোকে পদানত করেছে। জার্মানরা রোমান সাম্রাজ্যকে এবং তুর্কমানরা যে চীনাদের পর্যুদস্ত করেছে, তা কে না জানে। অতএব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুগের সভ্য দুনিয়াকেও যে আরবের বেদুঈনদের মাধ্যমে শায়েস্তা করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, তাতে বিচিত্র কি !

www.amarboi.org

কোনো দেশে যখন পুরোপুরি সভ্য ও শহুরে জীবন গড়ে উঠে তখন তাতে প্রাণ-সঞ্চারক নতুন চারা উদ্ভূত করার আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু মাঠ-প্রান্তর বিচরণকারী যাযাবরদের আশেপাশে কোথাও যখন শহুরে জীবনের সূচনা হয়, তখন সে এলাকা নিজের দিকে যাযাবরদের আকৃষ্ট করে তড়িৎ গতিতে দিগন্ত প্রসারী সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। এ কথাটি আরবদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

বিশ্বের তিনটি অঞ্চলে জনসংখ্যার অতিবর্ধন লক্ষ্য করা গেছে। আর সে তিনটি অঞ্চল হলো গোবি মরু অঞ্চল, জার্মানী এবং আরব। হাজার হাজার বছর ধরে এ সমস্ত অঞ্চল থেকে দেশত্যাগী জনতরঙ্গ উত্থিত হয়ে আশেপাশের অঞ্চলসমূহে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। কেননা এদের মধ্যে জনবসতি প্রবৃদ্ধির শক্তি ছিল প্রচুর, কিন্তু জনতার খাদ্য-উপাদানের অভাব ছিল প্রকট। আরব যেহেতু দুনিয়ার কেন্দ্রভূমি তাই উপরিউক্ত কথাটি আরবদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

আরবে–বিশেষ করে হিজাযে তখন পর্যন্ত কোনো নবীর আগমন হয়নি। তাই সেখানকার অধিবাসীরাও নিজেদের মননশক্তিকে কোনো কাজে নিঃশেষ করে বসেনি। তারা তখন পর্যন্ত পরিপূর্ণ কর্মস্পৃহার অধিকারী ছিল। নেপোলিয়নের মতে, দেশব্যাপী হাজার হাজার বছর ধরে গৃহযুদ্ধ, অশান্তি এবং বিশৃংখলা বিরাজমান থাকার কারণে কঠোর পরিশ্রম, আত্মোৎসর্গ, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, সারল্য এবং এ ধরনের অন্যান্য উন্নত গুণাবলী দ্বারা—যা একটি উন্নয়নশীল জাতির জন্য অতীব প্রয়োজনীয়, আরবরা পরিপূর্ণভাবে ভূষিত ছিল। অন্যান্য আরো অনেক কারণে প্রতিশ্রুতি রক্ষা, আত্মসম্মানবোধ প্রভৃতি গুণাবলীও ছিল তাদের মধ্যে অত্যন্ত সুদৃঢ়। যাযাবর জীবনযাপন এবং মুক্ত প্রান্তরে বসবাস করার কারণে তাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়-ক্ষমতাও ছিল শহুরেদের অনুপাতে অস্বাভাবিক ধরনের তীব্র। হাতে গোনা যায় এমন পনেরো বিশজন লোকের কথা বাদ দিলে তাদের মধ্যে লেখাপড়ার কোনো প্রচলন ছিল না বললেই চলে। তাই তাদের স্মরণশক্তিও ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। মরু অঞ্চলে বসবাসের দরুন তাদের পানাহার ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ধরনের। তাই বহু বছরেও তাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হতো না। কৃষিজীবীরা থাকে তাদের জন্মভূমি তথা কৃষিক্ষেত্রের সাথে ওতপ্রোত। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তারা অভিযানপ্রিয়তা, যে কোনো মুহূর্তে দূর-দূরান্তে গমনের স্পৃহা এবং এ ধরনের অন্যান্য উদ্যোগ-কেন্দ্রিক গুণাবলীর অধিকারী হয় না। শিল্প এবং কারিগরির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্যও তাদের জন্মভূমি যথেষ্ট। তাই তারাও বিদেশ গমনের কথা চিন্তা করে না। শুধুমাত্র বাণিজ্যের সাথে

www.amarboi.org

জড়িত ব্যক্তিরাই বিদেশ গমনে অনুপ্রাণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তাদের পরিবেশই তাদেরকে বিদেশ গমনে বাধ্য করে এবং তারা প্রকৃতিগতভাবে এর উপর অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। কুরআনের ভাষায়, মক্কাবাসীদের বসতি হচ্ছে একটি 'ক্ষেতহীন' উপত্যকা। এখানে শুধু কৃষি নয়, বরং শিল্প এবং কারিগরিরও কোনো সুবিধা নেই। খাদ্য, পরিচ্ছদ সবকিছুই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। অতএব এমন একটি অঞ্চলের অধিবাসীরা বিদেশ গমনের জন্য সদাপ্রস্তুত থাকবে, তাতে বিচিত্র কি।

রাজ্যজয়, রাজ্য বিস্তার এবং শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে গতিশীলতার (Mobility) গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যে যুগে একমাত্র সমুদ্রযান ছাড়া কোনো যান্ত্রিক পরিবহন ছিল না, যে যুগে বিদ্যুৎ এবং বাষ্পের উপর মানুষ তাদের কর্তৃত্ব খাটাতে পারতো না, তখন অশ্বই ছিল সবচেয়ে দ্রুতগামী পরিবহন। আর উট ছিল একটি অতি উপকারী পণ্যবাহী জন্তু। কেননা শ্রমের ক্ষেত্রে ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, পানাহারের ক্ষেত্রে সারল্য ও অত্যল্পতা, ভার বহনের ক্ষেত্রে অসাধারণ ক্ষমতা—সর্বোপরি তার দুধ-গোশত প্রভৃতির খাদ্যোপযোগিতা উটকে মানুষের পরম উপকারী সাথীতে পরিণত করেছে। অশ্ব এবং উটের ক্ষেত্রে আরবদের বৈশিষ্ট্যের কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। হাজার হাজার সৈন্য-সম্বলিত আরব বাহিনী যেরূপ লম্বা পদক্ষেপে এবং তড়িৎগতিতে মাঠ-প্রান্তর পাড়ি দিয়ে শত্রু-সৈন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, তা ইতিহাস পাঠক মাত্রেরই জানা আছে। আর উট ছিল তাদের ঐ ক্ষিপ্রগতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ এবং এ বিশেষ কারণেই যুদ্ধবিশারদরা প্রাচীন আরবদের উপর ছিল দারুণভাবে ঈর্ষান্বিত।

চীন এবং ভারতবর্ষের বাণিজ্য-কাফেলা আরব ভূমি পাড়ি দিয়ে তবে ইউরোপে যেতো। আরব-বাণিজ্যের উপর কুরাইশদের প্রাধান্য, মিসর, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, ইয়ামন, আম্মান, আবিসিনিয়া, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের সাথে তাদের চুক্তি সম্পাদন এবং শীত ও গ্রীষ্মকালের বাণিজ্য যাত্রার (রিহ্‌লাতাশ শিতায়ী ওয়াস্ সাইফ) কারণে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের সাথে তাদের সংযোগ রক্ষার কথা সবারই জানা। তাছাড়া অন্যান্য জাতির মন-মেযাজ অনুধাবন, অন্যান্য দেশের রাস্তাঘাট ও অন্যান্য বিষয়ের উপর অবগতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশ্বের বহু কম লোকই তখন আরবদের সমকক্ষ ছিল।

৩. প্রশাসনিক কারণ

আরবের মক্কা, তায়েফ, অতঃপর মদীনায় কমবেশী যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল, সৌভাগ্যবশত তা ছিল সামাজিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নেতৃত্ব এবং

www.amarboi.org

কর্তৃত্বকে অবলম্বন করে সেখানে বর্ণবৈষম্যের কোনো অটুট বন্ধন গড়ে উঠেনি। ঐ সমস্ত অঞ্চলের সব লোকই ছিল স্বাধীন এবং সমমর্যাদার অধিকারী। শুধুমাত্র জ্ঞানবুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই কাউকে না কাউকে নেতা নির্বাচিত করা হতো। উপরিউক্ত পরিবেশে অভ্যস্ত হওয়ার দরুন যখন আরবরা বিশ্বকে শাসন করার সুযোগ পেল, তখন তাদের কাছ থেকেই মানব-সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার আশা করা যেত এবং এ-ও আশা করা যেত যে, একমাত্র তারাই বর্ণ, ভাষা এবং অঞ্চল ভিত্তিক বৈষম্যকে দূর করতে পারবে। অপরদিকে ব্রাহ্মণ্য মতবাদ, ইরানী মতবাদ ও রোমান মতবাদের মধ্যে যেভাবে শ্রেণীবৈষম্য বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল, তাতে ঐসব মতবাদের অনুসারীদের কাছ থেকে সামাজিক সাম্য আশা করা ছিল দুরাশারই শামিল।

৪. ভাষাগত কারণ

আরবী ভাষাও (আরব থেকে নবী নির্বাচনের) একটি কারণ হয়ে থাকবে। কেননা এর মধ্যে ভাব-প্রকাশ, সহজবোধ্যতা, শব্দ-ঝংকার এবং এতদসংশ্লিষ্ট গুণাবলী তখনকার পাহলভী, গ্রীক, সংস্কৃত, ল্যাটিন, চীনা এবং অন্যান্য উন্নত ভাষার চেয়ে অধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল।

৫. ব্যক্তিগত কারণ

কয়েকটি উপকূলীয় অথবা সীমান্তবর্তী অঞ্চল ছাড়া আরবে এ যাবত বহিঃশক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বরং সে স্বীয় স্বাধীনতা বজায় রাখার সাথে সাথে চিরদিন বাইরের আশ্রয় গ্রহণকারীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছিল। বস্তুতপক্ষে বিশ্বকে সৎপথ-প্রদর্শনের জন্য সাধারণ মনোবৃত্তির অধিকারী কোনো জাতির স্থলে এ জাতিতেই অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা হয় যারা গতানুগতিক স্বাধীনতার চাইতে অধিক স্বাধীনতা কামনা করে।

৬. অবস্থানগত কারণ

ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে এবং প্রাচীন বিশ্বের পাশাপাশি তিনটি মহাদেশের কেন্দ্রস্থলেই মক্কা নগরীর অবস্থান। অতএব বিশ্বব্যাপী কোনো আন্দোলন পরিচালনার পক্ষে এর চেয়ে উত্তম কোনো স্থান হতে পারে না। আক্রমণকারীদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে গোপন করে রাখার উদ্দেশ্যেই যেমন উষর মরুপ্রান্তরে ছিল এর অবস্থান, তেমনি শীত ও গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্যিক অভিযানের মাধ্যমে প্রচুর ধন-সম্পদ এসে জমা হতো এখানে। যে মরু-প্রান্তরে মহানগরী মক্কা অবস্থিত, সামান্য ভূভাগ ছাড়া তার চারদিক ছিল অটুট দুর্গের মত দুর্গম ও দুর্জ্ঞেয় উচ্চ পর্বতশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রতিরক্ষার জন্যে এর

www.amarboi.org

চাইতে উত্তম ব্যবস্থা আর কি হতে পারে ? উষর মক্কা ও তার পার্শ্ববর্তী 'সুজলা সুফলা' তায়েফ নগরীর মিশ্রিত আবহাওয়া এখানকার অধিবাসীদের প্রকৃতিতে এমন সব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর সৃষ্টি করেছিল যার সমাহার অন্যত্র খুব কমই পরিলক্ষিত হয় ; যার ফলে রোমীয়, ইরানী ও হাবশী সম্রাটদের দুর্বার আক্রমণের মুখেও আরবরা তাদের ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রকে স্বাধীন ও সার্বভৌম হিসেবেই টিকিয়ে রেখেছিল। ফলে কখনো সেখানে বিদেশীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

৭. রাজনৈতিক কারণ

মক্কা ছিল স্বায়ত্বশাসিত নগর রাষ্ট্র। এর আবাসিক এলাকার বিস্তৃতি কয়েক বর্গমাইলের অধিক ছিল না। তবে পার্শ্ববর্তী যেসব অঞ্চলে এর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল এবং যে স্থানকে মক্কাবাসীরা 'হরম' হিসেবে অভিহিত করতো তা প্রায় সোয়া শ বর্গমাইলের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। এখানে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন গোত্রের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সৃষ্টিকূল শিরোমণি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের সময় এখানকার নেতৃত্ব কুরাইশ গোত্রের হাতেই ন্যস্ত ছিল। তবে এখানে কখনো কোনো ব্যক্তি-শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রপিতামহের পিতামহ কুসাই অনেকটা বাদশাহের মর্যাদা লাভ করেছিলেন; কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি তাঁর সামাজিক বা প্রশাসনিক ক্ষমতা স্বীয় পুত্রদের মধ্যে বন্টন করে দিলে পর পুনরায় তা কোনো একক ব্যক্তির হাতে আর ফিরে আসেনি। ফলে বহু ব্যক্তির শাসনই এখানে চলতে থাকে। 'ইবনে আবদে রাব্বিহি'র মতানুসারে মক্কানগরীতে দশটি গোত্রের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ দশটি গোত্রের প্রধানগণ প্রত্যেকেই যেন ছিলেন এক একজন মন্ত্রী। তাঁদের মধ্যে বাদশাহ কেউই ছিলেন না। খানায়ে কা'বার সংসদীয় বিভাগের দায়িত্ব একজনের উপর ন্যস্ত ছিল, তো অপরজনের উপর ন্যস্ত ছিল এর উপাসনা বিভাগের দায়িত্ব। একজন জাতীয় পতাকাবাহী ও সেনাপতি হিসেবে কাজ করতেন, তো অন্যজন 'যেমান' বা ক্ষতিপূরণের অর্থ নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করতেন। একজন পররাষ্ট্র দফতরের কাজ করতেন এবং প্রয়োজনবোধে নিজেই রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিদেশে চলে যেতেন। এভাবে কর আদায় ও ব্যয় নির্বাহের দায়িত্বও হয়ত এক একজনের উপর ন্যস্ত ছিল। এই ছিল তখনকার মক্কার শাসনব্যবস্থা। এ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলার অবকাশ এখানে নেই। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে বুদ্ধিমান কুরাইশরা এমন একটি বিশেষ উন্নতমানের রাষ্ট্রীয় সংবিধান প্রণয়ন করেছিল, যাতে সংযোজিত হয়েছিল প্রত্যেকটি মৌলিক ও প্রয়োজনীয় বিষয়। ভাবীকালে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারীদের মধ্যে এসব গুণাবলী থাকার প্রয়োজনও ছিল।

১৬—

www.amarboi.org

মক্কাবাসীরা ক্রীতদাস ও ভৃত্যদের সমন্বয়ে গড়ে তুলেছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও প্রতিষ্ঠিত সেনাবাহিনী, যা গোত্রীয় যুদ্ধবিগ্রহে অংশগ্রহণ করতো এবং নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে বিদেশে গমনাগমন করতো। বিচার-ব্যবস্থার ব্যাপারে যতটুকু জানা যায় তাহলো, গোত্র-প্রধানরা সাধারণত বিচারকের কাজ করতেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে খানায়ে কাবায় লটারীর ব্যবস্থা করা হতো এবং কোনো কোনো সময় লটারীর মাধ্যমে সালিসও নিয়োগ করা হতো। এসব ছাড়াও ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সেখানে একটি স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা গঠন করা হয়েছিল। 'হিলফুল ফুযুল' নামক এ সংস্থার সদস্যরা পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল যে, নগরীর অভ্যন্তরে স্থানীয় অথবা বিদেশী কারো উপর কাউকে জুলুম করতে দেয়া হবে না এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তারা অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, যতক্ষণ না অত্যাচারী অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত হয়।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মক্কাবাসীরা আশপাশের গোত্রসমূহের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। এ ব্যবস্থা সামরিক কারণে যেমন ছিল গুরুত্বপূর্ণ, অর্থনৈতিক কারণেও তেমনি ছিল অর্থবহ। এটা বাণিজ্যিক কাফেলাসমূহে নিরাপদে গমনাগমনের পথ করে দিতো। মক্কাবাসীদের ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি তখন এত বেড়ে গিয়েছিল যে, দূর-দূরান্ত তথা মদীনা ও অন্যান্য অঞ্চলের গোত্রসমূহ তাদের সাথে মৈত্রীচুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতো।

কুরাইশদের হাতে মক্কার শাসনভার অর্পিত হওয়ার পর তাদের নেতাদের মধ্যে একমাত্র কুসাই-ই ছিলেন উন্নতমানের নেতৃত্বের অধিকারী। তাঁর মৃত্যুর পর প্রশাসন-ক্ষমতা তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ও পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবের প্রাক্কালে আবদে মনাফ বংশের বনী হাশিম ও বনী উমাইয়া গোত্রদ্বয়ের মধ্যে প্রতিহিংসা বিরাজমান ছিল। আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর আবু তালিবের দৈন্যদশা ইত্যাদি বনী উমাইয়ার বাহুকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। আবু সুফইয়ানের মত জন্মগত নেতা ও উসমান গণীর মত বাণিজ্য-বিশেষজ্ঞ ছিলেন এই গোত্রেরই লোক। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজে যদিও হাশিমী বংশোদ্ভূত ছিলেন, কিন্তু একদিকে যেমন তিনি আবদুল মুত্তালিবের জ্যেষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না, ঠিক তেমনি অন্য কোনো প্রচলিত প্রথানুযায়ীও তিনি গোত্রের নেতৃত্ব লাভের অধিকারী ছিলেন না, বরং তিনি ইয়াতীম হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং পিতৃব্য কর্তৃক লালিত পালিত হয়েছিলেন।

www.amarboi.org

হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে নয়, বরং প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি অপেক্ষাকৃত ছোট পরিবারের কনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে নবী হিসেবে গ্রহণ করা বনী উমাইয়া কেন, বনী হাশিমের বয়জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছেও অস্বাভাবিক মনে হতো। অত্যাচারী পিতৃব্য আবু লাহাবই নয়, পরম হিতৈষী ও পৃষ্ঠপোষক পিতৃব্য আবু তালিবের নিকটও আজীবন নিজের চেয়ে কনিষ্ঠ ব্যক্তির মান-মর্যাদা স্বীকার করে নেয়া আত্মসম্মানের পরিপন্থী ছিল। কুরাইশদের অন্যান্য গোত্রেও বিরাট বিরাট ব্যক্তিত্বশালী লোক ছিলেন। মাখযূম গোত্রের আল ওয়ালিদ বিন আল মুগীরাহ ও তাঁর পুত্র খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আবু জাহল, জাহিলিয়া যুগে এমন সব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, যার উল্লেখ না করে উপায় নেই। তাবারীর বর্ণনানুসারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন নুবুওয়াতের দাবী করলেন তখন কুরাইশরা বলে উঠলো ঃ কুরাইশ-কুসুম ওয়ালীদই এ কাজের জন্য অধিকতর যোগ্য। খালিদ যদিও অল্পবয়স্ক ছিলেন ; তবু তাঁর সম্পর্কে হযরত উমর (রাঃ)-এর মন্তব্য ছিল 'খালিদের মত সন্তান পুনরায় জন্ম দিতে রমণীগণ অক্ষম ; ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও উপস্থিত যে কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী হওয়ার কারণে জাহিলিয়া যুগে আবু জাহলকে 'আবুল হাকাম' নামে অভিহিত করা হতো। দারুন্ নাদ্ওয়া, যেখানে চল্লিশ বছরের কম বয়স্ক লোক সদস্য হতে পারতো না, সেখানে বিশেষ বিবেচনাধীনে ত্রিশ বছর বয়সেই আবু জাহলকে সদস্য করা হয়েছিল। অহংকার তার মনের মধ্যে শিকড় গেড়ে বসেছিল। তবে তার জনসেবা ও দানশীলতার কথা ছিল সর্বজনবিদিত। এ সম্পর্কে 'মুনতামিক' প্রভৃতি গ্রন্থে ইবনে হাবীব অনেক কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

তখনকার সামাজিক প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও দ্বন্দ্ব-কলহের অবস্থা জানা না থাকলে ইসলাম-বিরোধী কুরাইশ নেতাদের ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়।

৮. শিক্ষাগত কারণ

মক্কায় লেখাপড়ার চর্চা মোটেই ছিল না। শুধুমাত্র দশ-বারজন লোকই লেখাপড়া জানতো। তবে কাব্য, ভাষাশৈলী ও বাগ্মিতার চর্চা ছিল সর্বত্র। আরবী ভাষা শেখার জন্য তারা তাদের শিশু-সন্তানদের নিজ গৃহের পরিবর্তে বেদুঈন পরিবারে পাঠিয়ে দিত। পবিত্র কাবাগৃহ ছিল মক্কার জাতীয় উপাসনালয়। সুরচিত কবিতা এখানে ঝুলিয়ে রাখা হত এবং তা 'মুআল্লাকাত' (ঝুলানো কবিতা)-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে সবিশেষ মর্যাদা লাভ করতো। 'ওকায'-এর বার্ষিক আন্তঃআরব সাহিত্য সম্মেলন ছিল কুরাইশদেরই পৃষ্ঠপোষকতার ফলশ্রুতি। কাবায় হাজ্জ পালন আরবের ভাষাসমূহের মধ্যে

www.amarboi.org

ঐক্য স্থাপনে এবং কুরাইশী অঞ্চলের ভাষাকে মান-নির্ধারক ভাষায় পরিণত করার ক্ষেত্রে নীরব অথচ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল। এটা কুরাইশদের সাহিত্য চর্চারই ফলশ্রুতি যে, তাদের জন্য হযরত মূসা (আঃ)-এর শুভ্র হস্তের মুজিযা কিংবা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ফুঁক দিয়ে জীবনদানের মত অলৌকিক বস্তুর প্রয়োজন ছিল না। বরং এমন একটি উন্নত সাহিত্যিক অবদানের প্রয়োজন ছিল, যা শুনে তারা ভাবের নেশায় ঝিমাতে শুরু করে এবং নিজেদের নযীর-বিহীন বিরোধিতা সত্ত্বেও এর তিলাওয়াত শোনার জন্য চুপে চুপে তিলাওয়াতকারীর পিছনে ছুটে।

সাহিত্য সাধনার প্রতি আরবদের অনুরূপ আসক্তি থাকলেও লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা ছিল যেন তাদের বংশ-পরম্পরাগত বৈশিষ্ট্য। তবে নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে, বিশেষ করে ব্যবসায়িক হিসাব-নিকাশ, ঋণগ্রহীতাদের নামধাম ও পরিমাণ-পরিমাপ স্মরণ রাখার কারণে বাধ্যতামূলকভাবে তারা তাদের স্মৃতিশক্তিকে এমনি অসাধারণভাবে উজ্জীবিত করে তুলেছিল, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে সত্যি বিরল। এসব কারণেই কুরআনের আয়াতসমূহ এবং সুদীর্ঘ হাদীসসমূহ তারা অবলীলাক্রমেই তাদের স্মৃতিতে হুবহু গেঁথে রাখতে সমর্থ ছিল।

৯. অর্থনৈতিক কারণ

উষর মরু প্রান্তরের বাশিন্দাদের জীবিকা নির্বাহের জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়া অন্য কোনো উপায় ছিল না। শিল্প-কারখানার জন্যে যেসব কাঁচামালের প্রয়োজন ছিল, তা তাদের মোটেই ছিল না। এ কারণে তারা তাদের যোগ্যতাকে অত্যন্ত একাগ্রচিত্তে ব্যবসা-বাণিজ্যেই কেন্দ্রীভূত করে রেখেছিল। তখনকার সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ঐ পেশা গ্রহণের ফলাফল ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপদসংকুল।

আরব ছিল একটি মরু অঞ্চল। তাই এ অঞ্চলের প্রতি বহির্বিশ্বের লোকেরা বলতে গেলে, ভ্রূক্ষেপই করতো না ; বরং আরবরাই ছড়িয়ে পড়তো পৃথিবীর দিক-দিগন্তে নিজেদের গরজে তথা জীবন ও জীবিকার সন্ধানে। ভারতবর্ষের মত বিশাল উপমহাদেশের সমগ্র আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত কুরাইশরাই। তারাই হয়ে উঠেছিল প্রধানত এ অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যের হর্তাকর্তা।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রপিতামহ আমর ইবনে আবদে মানাফ (যিনি জনসেবার কারণে 'হাশিম' উপাধি লাভ করেছিলেন) এমন সুদক্ষ ও বিচক্ষণ ব্যবসায়ী ছিলেন যে, রোমের কায়সার, ইরানের কিসরা, আবিসিনিয়ার নাজ্জাশী

www.amarboi.org

ও ইয়ামনের আকইয়ালের নিকট থেকে, তাদের দেশে পণ্যসামগ্রী নিয়ে যাওয়ার 'অবাধ অনুমতি' লাভ করেন। মক্কা হতে ইরাক, ওমান (যেখান থেকে সমুদ্র পথে বেলুচিস্তান, সিন্ধু ও হিন্দুস্তানের সাথে যোগাযোগ করা যেত), ফিলিস্তিন, সিরিয়া, মিসর, আবিসিনিয়া (হাবশা), ইয়ামন তথা হাজার হাজার মাইল দূরবর্তী বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রান্তে প্রান্তে শীত ও গ্রীষ্মকালীন বাণিজ্যাভিযান পরিচালিত হতো। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও অনুরূপ বাণিজ্যের কল্পনা অনেকটা লোমহর্ষক ব্যাপার বলেই মনে হয়। কিন্তু কুরাইশ বণিকরা সেই প্রাচীন যুগেও এ ধরনের বাণিজ্যাভিযান সাফল্যজনকভাবে পরিচালনা করতো। রাস্তার দূরত্ব অতিক্রম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও উপবাসের সাথে লড়াই ছাড়াও তাদেরকে পথে পথে অভাবগ্রস্ত অথচ দুর্ধর্ষ গোত্রসমূহের সাথে বরাবরই মুকাবালায় নামতে হতো। এসব কারণে তারা বিভিন্ন দেশ ও গোত্রের সাথে শক্তিশালী 'মৈত্রীচুক্তি' সম্পাদন ও নিজেদের লোক নিয়ে রক্ষীবাহিনী গঠনের ব্যবস্থা করেছিল। আরবের যে কোনো বণিককে পণ্যসামগ্রী নিয়ে হিজায, নাজদ ইত্যাদি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাসকারী মিসরীয় গোত্রসমূহকে অতিক্রম করার সময় কুরাইশী রক্ষীবাহিনীর ছত্রছায়া গ্রহণ করতে হতো। 'ত্বাই' ও 'কলব' গোত্রদ্বয়ের সাথে কুরাইশদের মৈত্রীচুক্তি ছিল। উত্তর আরবের খায়বার ও দুমাতুল জন্দলের বিশেষ বিশেষ স্থানে ওরা বসবাস করতো এবং তাদের অঞ্চল দিয়েই ইরাক, সিরিয়া ও মিসরের পথ অতিক্রম করতে হতো। বনী আমর ইবনে মারশদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকার কারণে রাবীয়া সম্প্রদায়ের অঞ্চলটিও ছিল কুরাইশদের জন্য নিরাপদ। ফলে বাহরাইন, ওমান তথা সমগ্র পূর্ব আরবের উল্লেখযোগ্য স্থানসমূহে গমনাগমনের সুযোগ তারা লাভ করেছিল। যে কেউ বাণিজ্য ব্যাপদেশে বাহরাইনের মুশকর মেলায় যেতে চাইলে, তাকে কুরাইশের রক্ষীবাহিনীকে অবশ্যই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হতো। মুহরা ও হাদ্রামাউত এ দু'টি এলাকা দক্ষিণ আরবে অবস্থিত। মুহরা বাজারে যেতে হলে বনী মুখাবির গোত্রের রক্ষীবাহিনী সংগ্রহ করতে হতো। হাদ্রামাউতের রাবিয়া হাটে যেতে হলে কুরাইশরা সংগ্রহ করতো আকলুল মুরাবের রক্ষীবাহিনী এবং অন্যরা সংগ্রহ করতো কানদাহের আলে মাসরূকের রক্ষীবাহিনী। কিন্তু কুরাইশদের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে আকলুল মুরার, অন্যান্য গোত্রসমূহের উপর অপেক্ষাকৃত অধিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিল। মোদ্দাকথা, আরবের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যভাগ তথা সব অঞ্চলই ছিল কুরাইশদের অবাধ বাণিজ্য-শিকলে আবদ্ধ। কুরআন করীমে তাদের মেলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের এ সাফল্যকে বর্ণনা করা হয়েছে 'উপবাসের স্থলে আহার' এবং 'সন্ত্রাসের স্থলে নিরাপত্তা'—এ কয়টি চমৎকার শব্দ দ্বারা।

www.amarboi.org

সংক্ষেপে বলতে গেলে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ কোনো না কোনোভাবে কুরাইশদেরকে সমগ্র আরবের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। হাজ্জের জন্য কাবায় এবং আরাফাতের ময়দানে আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার লোক এসে ভিড় করতো। এটাও ছিল বহির্দেশের সাথে আরবদের যোগাযোগ সৃষ্টির একটি সুবর্ণ সুযোগ। উল্লেখিত কারণেই অন্যান্য দেশে গমনাগমনে তাদের দুশ্চিন্তার কোনোই কারণ ছিল না।

১০. ধর্মীয় কারণ

মক্কাবাসীরা ছিল প্রতিমা-পূজারী, কিন্তু প্রতিমাকে তারা আসল আল্লাহ নয় বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম বলেই মনে করতো। আসলে তারা আল্লাহকে আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং একক ও অদ্বিতীয়ই মনে করতো। প্রতিমাদের প্রতি তাদের মনোভাব যে অত্যন্ত সহনশীল ছিল, তা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। এজন্যে কাবাগৃহে তাদের স্থানীয় মূর্তি 'হোবল'ই কেবলমাত্র স্থান পায়নি ; বরং সাফা-মারওয়ায়, কাবার অভ্যন্তরে ও অঙ্গন-প্রাঙ্গনে সমস্ত গোত্রসমূহের ৩৬০টি মূর্তি অধিষ্ঠিত হয়েছিল। এছাড়া কাবাগৃহের অভ্যন্তরে এসব প্রতিমা ও প্রতিকৃতি ছাড়া শুধুমাত্র হযরত ইবরাহীম (আঃ)-ই নয় বরং হযরত মারইয়াম (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতিকৃতিও স্থান পেয়েছিল। এতে বোঝা যায়, ইয়াহূদী ধর্মের প্রতিও আরবদের সম্পর্ক ছিল সহানুভূতিশীল। তাদের একই পরিবারের কেউ ছিল প্রতিমা-পূজারী, কেউ ছিল খ্রীস্টান, কেউ ছিল নাস্তিক, আবার কেউ ধর্মনিরপেক্ষ। এসবের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে 'মুআরিফে ইবনে কুতায়বা' ও আরযাকীর 'তারীখে মক্কা' ইত্যাদি গ্রন্থে।

মূর্তিপূজার সাথে সাথে বার্ষিক হাজ্জের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও তারা পালন করতো। কাবাগৃহের তাওয়াফ ও আরাফার ময়দানে উপস্থিত হওয়া ছাড়া আরও বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানে তারা যোগ দিতো। ধর্মনীতির সাথে যে অর্থনীতির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এ তথ্য সকল দেশে ও সকল যুগেই মানুষের বোধগম্য ছিল। হাজ্জের মওসুমে অনুষ্ঠিত আন্তঃআরব মহাবাণিজ্যিক মেলায়ও এর পরিষ্কার প্রমাণ মেলে। কেবলমাত্র হাজ্জের মাসই (যিলহাজ্জ) নয়, বরং হাজ্জ-পূর্ব এক মাস এবং হাজ্জ-উত্তর এক মাস এই মোট তিন মাস এ মেলা জারী থাকতো। এ মাসত্রয়কে 'হারাম মাস' বলা হতো এবং এ সময়ে হত্যা ও রক্তপাত সর্বতোভাবে ছিল হারাম ও নিষিদ্ধ। এমন কি হত্যার প্রতিশোধ পর্যন্ত নেয়া হতো না এ সময়কালে। যিলহাজ্জের মহামেলায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাণিজ্যিক কাফেলাগুলোর মক্কায় আগমন ও মেলা শেষে পূর্ণ নিরাপত্তার সাথে স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তনের

www.amarboi.org

জন্য তিন মাস সময়ের প্রয়োজনও ছিলো না। এ দীর্ঘ নিরাপদ সময়ে যেসব মেলা ও উৎসব উদযাপিত হতো, তার সবগুলোরই কেন্দ্রস্থল ছিল মহানগরী মক্কা। সুতরাং মহানগরী মক্কার গুরুত্ব কোনোমতেই খাটো করে দেখা চলে না।

১১. চরিত্রগত কারণ

ইসলামের আবির্ভাবের ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে তখনকার সভ্য জাতিসমূহের মধ্যে বাঞ্ছিত যেসব সদগুণ বিদ্যমান ছিল তার সব কয়টিই বিদ্যমান ছিল আরববাসীদের মধ্যে। তারা ছিল একাধারে দানশীল, বীর, অভিযানপ্রিয়, কষ্ট-সহিষ্ণু এবং দূর-দূরান্ত সফরে অভ্যস্থ। সততা ও বিশ্বস্ততা-রূপ গুণাবলীকে তারা অত্যন্ত আপন করে নিয়েছিল। অঙ্গীকার পালনেও ছিল তারা অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। মোটকথা, তাদের মধ্যে সব গুণই ছিল, কিন্তু সবকিছুই যেন এক অজানা পর্দার অন্তরালে। তাদের শক্তি-সামর্থ ছিল, কিন্তু তা সঠিকভাবে প্রয়োগ না করায় তার তেমন কোনো মূল্যই ছিল না। জীবন হরণ ও জীবন দানে তারা কুণ্ঠাবোধ করতো না। তবে আদর্শহীনতার ফলে এ মহান গুণাবলী তাদেরকে মহীয়ান করে তোলার চেয়ে বরং পশুর কাতারে নিয়ে দাঁড় করিয়েছিল। তারা চিন্তাশক্তির অধিকারী ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে স্থিরতার অভাব ছিল প্রকট। তাদের সামনে এমন কোনো জীবনাদর্শ ছিল না, যার মাধ্যমে তারা বিশ্বমানবতার সেবায় সত্যিকার কোনো অবদান রাখতে পারে। তাদের বীরত্ব ছিল, কিন্তু তা ছিল গৃহযুদ্ধের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত ; ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল, কিন্তু তা ছিল নীতি-বহির্ভূত তথা শুধুমাত্র বিত্তবানদের মধ্যে পারস্পরিক আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণের ক্ষেত্রে। তাদের সাহিত্য-প্রতিভা ছিল, কিন্তু তা কেন্দ্রীভূত ছিল শুধুমাত্র সৌখিন কবিতা চর্চার মধ্যে। মোদ্দাকথা, কোনো মহৎ লক্ষ্যকে সামনে রেখে নয় বরং সাধারণ ও নগণ্য উদ্দেশ্য লাভের জন্যই তারা সর্বদা ব্যস্ত থাকতো। তারা যেন খরগোশ শিকারের জন্য বাঘের অস্ত্র ব্যবহার করছিল। তারা যেন পশু হিসেবে জন্মলাভ করতো এবং আহার-বিহার শেষে পশুর মতই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতো। তাদের জন্ম বা মৃত্যুতে বিশ্বমানবতার যেন কিছুই যেত আসতো না।

কিন্তু ইসলাম আরবদের যোগ্যতার উৎকর্ষ সাধন করে তাদেরকে অনুপ্রাণিত করে তুলে দুনিয়ার বুক থেকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার নিশ্চিহ্ন করে একমাত্র আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার প্রতি। আল্লাহ ছাড়া অন্যসব কিছুর প্রভুত্ব খতম করে সারা দুনিয়ায় শান্তি ও স্বস্তির পরিবেশ সৃষ্টি করাই ছিল ইস-লামের উদ্দেশ্য। এ মহৎ উদ্দেশ্য সাধন ও এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দেয়ার

www.amarboi.org

জন্যে তখনকার দিনে সারা বিশ্বে কুরাইশদের চেয়ে অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠী ছিল না।

এবার যদি কেউ প্রশ্ন করে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বিশ্বনবী হিসাবে নির্বাচন করা হলো কেন—তাহলে তার উত্তরেও বলা যেতে পারে যে, এর প্রকৃত কারণ আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন। তবে এর পিছনে এমন অনেক বাহ্যিক কারণও রয়েছে, যা মানুষের কাছে সহজেই বোধগম্য। যেমন—

[১] মক্কায় কুরাইশদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব ছিল সর্বজনস্বীকৃত। তবে বিশেষজ্ঞদের গবেষণালব্ধ অভিমত হলো, নেতৃত্বের ধারা কোনো বিশেষ বংশের মধ্যে দীর্ঘদিন নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকলে মাটির উর্বরা শক্তির মতো সে নেতৃত্বের যোগ্যতা ও প্রখরতাও ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব নিসন্দেহে একজন নেতা ছিলেন। তাঁর জীবদ্দশায়ই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পিতা আবদুল্লাহ পরলোক গমন করেন।

সুতরাং আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর অন্তঃসত্তা স্ত্রীর কোলে যে সন্তান জন্ম নেন, বাস্তবতার নিরিখে সেই সন্তানের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব লাভের কোনোই সম্ভাবনা ছিল না। উপরন্তু আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর সম্পদ ও বৈষয়িক জ্ঞান ইত্যাদির অভাবে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব কুরাইশদের অন্যান্য শাখায়-বিশেষ করে বনী উমাইয়াদের হাতে চলে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিবের নেতৃত্বও আবদুল মুত্তালিবের কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ লাভ করতে পারেননি। যার ফলে তাঁর একমাত্র ইয়াতীম সন্তানের পক্ষেও পিতার পক্ষ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে কোনোরূপ নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব লাভের আশা আকাশ-কুসুম কল্পনা ছাড়া কিছু ছিল না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের কয়েক বছর পর আবদুল মুত্তালিব ইন্তেকাল করলে আবু তালিব বংশের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সামাজিক নেতৃত্বের যোগ্যতা যতটুকু ছিল বাণিজ্যিক নেতৃত্বের যোগ্যতা ততটুকু ছিল না। নেতৃত্বকে সম্বল করে বৈষয়িক সম্পদকে কিভাবে কাজে লাগাতে হয়, তা তিনি জানতেন না। আবু তালিবের সন্তানরাও নেতৃত্বের জন্য যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল না। তাই তারা তাদের পিতার মৃত্যুর পর তাদের নিষ্ঠুর চাচা আবু লাহাবের কাছ থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিতে পারেনি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হিজরত করতে বাধ্য হলে দারিদ্রের কারণে আকীল বিন আবু তালিব রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর (বিবি খাদীজার) বাড়ীঘর পর্যন্ত বিক্রি করে ফেলতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

যাহোক, নেতৃত্বের খুন তাদের ধমনীতে প্রবাহিত থাকলেও নেতৃত্ব লাভের সম্ভাবনা তাঁদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। এমতাবস্থায় পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে

www.amarboi.org

যে ব্যক্তি নেতৃত্ব গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেন তিনি কিছুটা অতুলনীয় গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকেন। অহংকার, শঠতা, আরামপ্রিয়তা, অদূরদর্শিতা ইত্যাদি যেসব নেতৃত্ব-প্রতিকূল দোষত্রুটি আছে, তা থেকে তিনি থাকেন মুক্ত। পিতামাতার আদর-যত্ন, সহচরদের তোষামোদ, ব্যক্তিগত ভোগবিলাস ইত্যাদি কখনো তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। এ পরিস্থিতিতে একটি কনিষ্ঠ পরিবারের কনিষ্ঠ সন্তানও সারা বংশের আশার আলোতে পরিণত হতে পারেন।

উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে বিদ্যমান থাকাটা অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ব্যাপারটা ছিল আরো বেশী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইয়াতীম হিসেবে জন্মগ্রহণ করার কারণে স্বাভাবিক অহংকার ও স্নেহ-মমতা থেকেও তিনি বঞ্চিত ছিলেন। গোত্রীয় প্রথার কারণে তাঁকে মায়ের তত্ত্বাবধান ও মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে হয় এবং কয়েক বছর পর্যন্ত অপরিচিতা ধাত্রী হালিমার কোলে ভিন্ন পরিবেশে সম্পূর্ণভাবে একজন বেদুঈনের জীবন-যাপন করতে হয়। বিবি হালিমার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় তাঁর পরিবারের সবার পক্ষে মিতব্যয়ী ও স্বাবলম্বী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। বাল্যকাল যে কোনো শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল ও উপযুক্ত সময়। আর বেদুঈন ও যাযাবর জীবন-পরিবেশের চেয়ে অধিক অনুকূল পরিবেশ আর কি থাকতে পারে, যা মানুষকে 'সারা বিশ্বই আমার জন্মভূমি'—এ উদার শিক্ষা দিতে পারে ? কোথাও নির্দিষ্ট কোনো গৃহ নেই, এমন কি নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ড নেই। যেখানে সৃষ্টিকর্তার কৃপায় পানি ও আশ্রয়স্থল পাওয়া গেল সেখানেই তাঁবু খাটানো হলো ; আবার যখন প্রতিকূল আবহাওয়া দেখা দিলো অর্থাৎ অঞ্চলটি অনুর্বর হয়ে উঠলো তখন সেখান থেকে তাঁবু উঠিয়ে আল্লাহর বিশাল পৃথিবীর অন্য যে কোনো অনুকূল স্থানের দিকে যাত্রা শুরু হলো—এ-ই ছিল মরুবাসী বেদুঈনের জীবনধর্ম।

কয়েক বছর এ ধরনের বেপরোয়া জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন, তার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় নিজের মাতা ও পিতামহের স্নেহ-মমতা থেকেও চিরবঞ্চিত হন। সুতরাং বাধ্য হয়েই তিনি অধিক সন্তানের অধিকারী পিতৃব্য আবু তালিবের গৃহে আশ্রয় নেন। অতএব এ ধরনের একজন ব্যক্তিত্বের মধ্যে নেতৃত্বের অহমিকা দেখা দেয়া কল্পনারও অতীত ছিল।

২ মাতামহের দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সম্পর্ক ছিল মদীনাবাসীদের সাথে এবং মামাদের দিক দিয়ে ছিল তায়েফবাসীদের সাথে। মক্কা, মদীনা, তায়েফ—এ তিনটি নগর প্রাকৃতিক ও মানবিক উভয় দিক দিয়েই ছিল ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ তিনটি নগরের সাথে সমপরিমাণ সম্পর্ক রাখার

www.amarboi.org

কারণেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিজের সীমিত জন্মভূমির পরিবর্তে অসীম বিশ্বের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই সংবেদনশীল হতে দেখা গিয়েছিল। বস্তুতঃ একজন বিশ্ব-পথপ্রদর্শকের জন্য এর প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে।

৩ স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বাল্যকালেই পশু চরানোর কাজ করতে হয়। নির্বাক ও নিরীহ মেষ-ছাগলের রাখালীর মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়েছিল তাঁর মধ্যে সদাতৎপরতা, দায়িত্ববোধ, সময়ানুবর্তিতা, নম্রতা ও কষ্ট সহিষ্ণুতার মহৎ গুণাবলী। 'জাতির সেবকই জাতির নেতা'—এ শিক্ষা লাভ করেছিলেন তিনি উপরিউক্ত কাজের মাধ্যমেই। এখানেই অর্জিত হয়েছিল তাঁর হিদায়াতের ও নেতৃত্বের সত্যিকার গুণাবলী।

৪ পশু চরানোর কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে হয় ব্যবসা-বাণিজ্যে। ক্রেতাদের মনোবৃত্তির পরিচয়, সুস্থ মানসিকতার পরিমাপ, সততা, কষ্ট-সহিষ্ণুতা ইত্যাদি ব্যবসায়-সংশ্লিষ্ঠ অপরিহার্য গুণাবলী তিনি এভাবেই লাভ করছিলেন। সর্বমতানুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন একজন উত্তম ব্যবসায়ী। ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করার পর শীঘ্রই তাঁকে ফিলিস্তিন, ইয়ামন ও ওমানের মত উত্তর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের আনাচে কানাচে সফর করতে হয় এবং রোমীয়, ইরাকী ও হামিরীয় অঞ্চলসমূহের বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ তথ্যটি কতটুকু সত্য জানি না, তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আবিসিনিয়া গমন করেছিলেন এবং সমুদ্র-সফরও করেছিলেন। অতএব এ ধরনের দেশ-বিদেশে ভ্রমণকারী অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের উপর চল্লিশ বছরের পরিপক্ক বয়সে বিশ্ব-নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পিত হলে তিনি তা যে কোনো ব্যক্তির চেয়ে যে উত্তমভাবে সম্পাদন করতে পারবেন, তা বলাই বাহুল্য।

৫ প্রশিক্ষণ মানুষকে সত্যিকার মানুষে পরিণত করে—বিকশিত করে তার মানবীয় প্রতিভাসমূহকে। এখন লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এসব ছাড়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মধ্যে আর কি কি প্রাকৃতিক প্রতিভার সমাবেশ ঘটেছিল?

দুর্বলকে সাহায্য করা, সত্য প্রতিষ্ঠায় অগ্রগামিতা, সত্য গোপনে পশ্চাৎগামিতা, সারল্য, সদাচার, একনিষ্ঠতা, বদান্যতা, পরিশ্রম, দায়িত্ববোধ, সময়ানুবর্তিতা ইত্যাদি গুণাবলী অর্থাৎ 'অনুপম চরিত্রের' প্রতিটি গুণাবলীই আল্লাহ তাঁকে দান করেছিলেন। শৈশবকাল থেকেই এসব গুণাবলী তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিল। উপরে যেসব বিপদাপদ ও প্রতিকূল অবস্থার কথা আলোচনা করা হয়েছে, তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে এমনভাবে সহনশীল করে তুলেছিল, যার দরুন নুবুওয়াত লাভের পূর্বেই জনগণ তাঁকে 'আল-আমীন' উপাধিতে ভূষিত

www.amarboi.org

করে পরোক্ষভাবে তাঁর নেতৃত্বকেই স্বীকার করে নিয়েছিলো। আবু তালিবের একটি কবিতার মাধ্যমে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল, যার মর্মার্থ ঃ

"স্ফটিক বর্ণ সে, তার মুখমণ্ডলের দোহাই দিয়ে
বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়।
সে নিঃস্ব অনাথের শরণ, সে দুঃখিনী বিধবার রক্ষক।"

এ কবিতাটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মানবিক গুণাবলী ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের সাক্ষ্য বহন করে। এসব গুণাবলীর কোনো কোনোটি অন্যদের মধ্যেও থাকতে পারে ; কিন্তু একই সাথে সব কয়টি গুণ অন্য কারো মধ্যে ছিলো না—থাকতে পারে না। তবে ইতিহাস স্পষ্ট সাক্ষ্য দেয় এবং শত্রু-মিত্র সবাই একবাক্যে স্বীকার করে যে, এসব গুণাবলী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মধ্যে ছিল এবং পুরামাত্রায়ই ছিল। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিশ্বনবী রূপে নির্বাচন করেছিলেন।

১৫. ত্রিধর্ম ঐক্য

আমাদের দেশে ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ধর্মের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী স্থাপনের একটি প্রচেষ্টার কথা শুনা যায়। এ প্রচেষ্টা কতটা ধর্মীয় আর কতটা রাজনৈতিক তা বলা মুশকিল ; তবে এর মধ্যে এ মর্মে একটি যৌক্তিকতা ও সম্ভাব্যতা রয়েছে এ পটভূমিতে যে, আজকাল ইসলাম ছাড়া অন্যান্য সব ধর্মের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে হোক অথবা পরোক্ষভাবে হোক, প্রতীকবাদিতা বা পৌত্তলিকতার কমবেশী অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তবে যে উদ্দেশ্যেই হোক, তাদের মধ্যে এ ঐক্য ও মৈত্রী স্থাপনের পথে পৌত্তলিকতা-বিরোধী তাওহীদপন্থী মুসলমানদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কোনো কারণ নেই। কেননা অকারণে অন্য যে কোনো ধর্মের যে কোনো পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার ইসলাম তাদেরকে দেয়নি।

কিন্তু আজ পাশ্চাত্য দেশসমূহে ইসলাম, খ্রীস্টিয় ও ইয়াহূদী এ তিনটি ধর্মের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রী স্থাপনের যে আওয়াজ উঠেছে তা একজন মুসলমানের কাছে যেমন আপত্তিজনক তেমনি হাস্যকর। যারা এ মৈত্রী স্থাপনের আওয়াজ তুলেছেন তাদের যুক্তি এই যে, এ তিনটি ধর্ম আসমানী গ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্য কথায়, এগুলোর অনুসারীরা হচ্ছে 'আহলে কিতাব'। এবং তাদের জন্য এটি এমন একটি কেন্দ্রবিন্দু, যার ভিত্তিতে তারা পরস্পর মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাদের উপাসানলয়সমূহ তথা মসজিদ, গির্জা ও হায়কল

www.amarboi.org

বিশ্ববিদ্যালয়, বিমান বন্দর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনস্থলে একই জায়গায় নির্মাণ করতে পারে, একই পুস্তকে পবিত্র কুরআন, ইনজীল ও তাওরাত ছাপাতে পারে ; উপরন্তু প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিভিন্ন সংস্থা কায়েম করে তাতে মাঝে মাঝে সেমিনার ও বিভিন্ন জনসমাবেশের আয়োজন করে উল্লেখিত তিনটি ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যাতে মৈত্রী ও সখ্যতার সম্পর্ক সুদৃঢ় হয় সে ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

তিনটি ধর্মকে এক করার এ প্রচেষ্টাকে 'ওয়াহ্‌দাতুল আদইয়ান' আন্দোলন নামে অভিহিত করা হচ্ছে। তবে বিশ্বের দূরদর্শী উলামা মাত্রেই একমত যে, এটা তিন ধর্মকে ঐক্যসূত্রে বন্ধনের প্রচেষ্টা নয়, বরং ঐ আসমানী তিন ধর্মের যে মূলমন্ত্র তথা তাওহীদকে বিকৃত করার এক কূটকৌশল মাত্র।

বিশ্বে আল্লাহর কাছ থেকে যত ধর্ম এসেছে তার মূল ও আদি শিক্ষা হলো তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ব। আল্লাহকে এক এবং একক মানার অর্থ হলো, তিনি সকলের প্রভু, তিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ (প্রভু বা সর্বময় কর্তা) নেই। তার কোনো শরীক নেই। তিনি সকলের ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য। একমাত্র এ বাণীর মাধ্যমেই মানুষের মধ্যে সত্যিকার সাম্য ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি হতে পারে এ অর্থে যে, আল্লাহ ছাড়া সবাই সমান। তারা কেউ কারো প্রভু নয়, আবার কেউ কারো দাসও নয়। তাদের চলার পথে আল্লাহ যে আদেশ-নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো মানার নিরিখেই তাদের মর্যাদা নিরোপিত হবে। এখানে বংশ, বর্ণ বা গোত্রের ভিত্তিতে কোনো ভেদাভেদ নেই। আল্লাহ তাআলা হলেন সবকিছুর স্রষ্টা, তিনি ছাড়া আসমান-যমীনে যা কিছু আছে সবকিছুই তার সৃষ্টি। অতএব আল্লাহ ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সামনে মাথা নত করা চলবে না, তিনি ছাড়া কারো ইবাদাত করা চলবে না। এ শিক্ষা শুধু কুরআনের নয় বরং অন্যান্য আসমানী গ্রন্থেরও। কিন্তু কুরআন ছাড়া অন্যান্য আসমানী গ্রন্থে কমবেশী পরিবর্তন-পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে এবং সেগুলো নাযিল হওয়ার পর শত শত, এমনকি হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হওয়ার কারণে অবস্থা শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়িয়েছে যে, তাতে আসমানী গ্রন্থের মূল শিক্ষা তথা তাওহীদ আর অক্ষত অবস্থায় নেই। কিন্তু কুরআনের ব্যাপারটি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। খোদ আল্লাহ তাআলা কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বলে কুরআনের মধ্যে আজ পর্যন্ত কোনো পরিবর্তন-পরিবর্ধন হয়নি এবং ভবিষ্যতে হবার কোনো সম্ভাবনাও নেই। অতএব এখন শুধু তিন ধর্মাবলম্বীকে একত্রিত করার আন্দোলন করলেই চলবে না, বরং তিন ধর্মের মূল শিক্ষাকে পুনরায় সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধরতে হবে। আর এটা করলেই তিন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ঐক্য ও বন্ধুত্ব স্থাপনের আন্দোলন সার্থক ও সফল হবে। পবিত্র কুরআন

www.amarboi.org

যখন নাযিল হয় তখন—অর্থাৎ ইসলামের সেই প্রারম্ভিক যুগেও আহলে কিতাবদেরকে তাওহীদের ভিত্তিতে একই পতাকা তলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। অতএব ঐক্যের এ আবেদন মোটেই নতুন কিছু নয়। আহলে কিতাবদেরকে ঐক্যের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যা বলেছিলেন, পবিত্র কুরআনের ভাষায় তাহলো ঃ

يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

"হে কিতাবীগণ, এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি, কোনো কিছুকেই তার শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকেও যেন আল্লাহ্ ছাড়া প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ৬৪)

এটাই হলো মুসলিম ও কিতাবীদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের একমাত্র মাপকাঠি। এটাই হলো ইসলামের সার-নির্যাস। আর এ কারণেই পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○ (ال عمران : ٨٥)

"কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো কবুল করা হবে না এবং সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।"

এ মাপকাঠিতে কেউ যদি মুসলমানদের সাথে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হতে না চায় তাহলে কুরআনের ভাষায় তাদের উদ্দেশ্যে একজন মুসলমানের পরিষ্কার ঘোষণা হচ্ছে ঃ

يٰاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ○ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ○ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ○ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ○ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ○ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ ○

"হে কাফিরগণ, আমি তার ইবাদাত করি না যার ইবাদাত তোমরা কর এবং তোমরাও তার ইবাদাতকারী নও যার ইবাদাত আমি করি, আমি ইবাদাতকারী নই তার, যার ইবাদাত তোমরা করে আসছো। আর তোমরাও তার ইবাদাতকারী নও যার ইবাদাত আমি করি। তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার।"–(সূরা কাফিরূন ঃ ১-৬)

----

www.amarboi.org

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাহাবা কিরাম ও উম্মতে মুসলিমা

১. সাহাবা কিরাম (রাঃ)

রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবীগণ বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তাদের জীবন আমাদের জন্য উজ্জ্বল প্রজ্জল তারকারাজির ন্যায় কল্যাণ ও মঙ্গলপথের দিশারী। তাদের অনুসরণ আমাদের জন্য নাজাত ও পরিত্রাণের কারণ।

কুরআন মজীদের অনেক জায়গায় সাহাবা কিরাম (রাঃ)-এর মর্যাদা ও প্রকৃষ্টতা বর্ণিত হয়েছে। যেমন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰىهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○(الاعراف : ١٥٧)

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইঞ্জীল, যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে, অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃংখল হতে যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৭)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার সাহাবীদের নিয়ে যখন উমরা পালনের জন্য মক্কায় আসেন তখন মক্কার কাফিররা তাকে বাধা প্রদান করে। বিষয়টির একটি আপোষ মীমাংসার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হযরত উসমান (রাঃ)-কে আপন

www.amarboi.org

প্রতিনিধি হিসাবে মক্কার কাফিরদের কাছে পাঠান। তখন এ সংবাদ রটে যে, হযরত উসমান (রাঃ) মক্কার কুফরদের হাতে শাহাদাত বরণ করেছেন। এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে সাহাবা কিরাম (রাঃ)-এর মধ্যে এক দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তখন হযরত রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে চৌদ্দ শ সাহাবী ছিলেন (কারো কারো মতে পনেরো শ)। তারা সকলে উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে বাইআত করেন। আল্লাহ তাআলা বাইআতকারী ঐ সমস্ত সাহাবীদের প্রতি যে ভাষায় তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন তাহলো ঃ

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ○ (الفتح : ١٨)

"মুমিনরা যখন গাছতলায় তোমার কাছে বাইআত করলো তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন, তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন আসন্ন বিজয়।"-(সূরা আল ফাতাহ ঃ ১৮)

উল্লেখিত বাইআতের অর্থ হুদাইবিয়ার বাইআত। এ বাইআতে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে এই বলে যে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ط يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ج

"যারা তোমার বাইআত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহরই বাইআত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত ওদের হাতের উপর।"-(সূরা আল ফাতাহ ঃ ১০)

এ আয়াতও সে সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিল এবং উপরোক্ত কথাকে আরো জোরদার করছে। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঐ বাইআতে অংশগ্রহণকারীদের উপর আপন রেযা বা সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন। তাই এ বাইআতকে 'বাইআতে রিযওয়ান'ও বলা হয়ে থাকে। বুখারী-মুসলিম উভয় গ্রন্থে হযরত জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন, হুদাইবিয়ার দিন আমাদের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ শ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'আনতুম খাইরু আহলিল আরদি'—তোমরা হচ্ছ সমগ্র বিশ্বের মানুষের চাইতে শ্রেষ্ঠ। সহীহ মুসলিমে হযরত উম্মে বাশার (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যারা এ গাছের নীচে বাইআত করেছে তাদের কেউই জাহান্নামে যাবে না (মাযহারী)। এ কারণে এ বাইআতে অংশগ্রহণকারীরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদেরই মত। কুরআন ও হাদীসে বদর যুদ্ধে

www.amarboi.org

অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুসংবাদ এসেছে তেমনি বাইআতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কেও এ সুসংবাদ এসেছে।

কুরআন মজীদে গরীব এবং নিঃস্ব সাহাবীদের ফযীলত ও প্রকৃষ্টতা বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে কাসীর, ইমাম ইবনে জারীরের একটি রেওয়ায়াতের বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, একদা উতবাহ, শায়বাহ, ইবনে রাবীআহ, মুতইম বিন আদী, হারিস বিন নাওফাল প্রমুখ ধর্মদ্রোহী কুরাইশ, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা আবু তালিবের কাছে এসে বলে, আপনার ভাতিজা মুহাম্মদের কথা শুনার পথে আমাদের জন্য আর একটি প্রতিবন্ধকতা এই যে, তার আশপাশে সর্বদা যে সমস্ত লোক থাকে তারা হয় আমাদের ক্রীতদাস ছিল যাদেরকে আমরা মুক্ত করে দিয়েছি, নয়তো এমন লোক যারা আমাদের করুণা ও দয়া-দাক্ষিণ্যের উপর জীবন অতিবাহিত করতো। আর এই সমস্ত ছোট লোকেরা থাকা অবস্থায় আমরা তো তার মজলিসে বসতে পারি না। আপনি তাকে বলে দিন, যদি আমাদের আগমনকালে সে ঐ সমস্ত লোকদেরকে তার মজলিস থেকে তাড়িয়ে দেয় তাহলে আমরা তার কথা শুনতে পারি এবং তা নিয়ে চিন্তাভাবনাও করতে পারি।

আবু তালিব যখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে একথা বলেন তখন হযরত উমর (রাঃ) এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, এতে তো বাধার কিছু নেই। কিছুদিন আপনি তাই করুন। এ সমস্ত লোক তো আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ। কুরাইশ সরদারদের আগমনকালে তারা আপনার মজলিস থেকে উঠে যাবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ط مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○ (الانعام : ٥٢)

"যারা তাদের প্রতিপালককে সকালে ও সন্ধ্যায় তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ডাকে তাদেরকে তুমি বিতাড়িত করো না। তাদের কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তোমার নয় এবং তোমার কোনো কর্মের জবাবদিহির দায়িত্ব তাদের নয় যে, তুমি তাদেরকে বিতাড়িত করবে ; করলে তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"-(সূরা আল আনআম ঃ ৫২)

মোটকথা, গরীব মুসলমানদের সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে নিষেধ করে দেয়া হয়। ফলে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হওয়ার পর

www.amarboi.org

হযরত উমর (রাঃ) একথা স্বীকার করতে বাধ্য হন যে, এ ব্যাপারে তিনি যে অভিমত দিয়েছিলেন তা সঠিক ছিলো না।

যে সমস্ত গরীব সাহাবীদের সম্পর্কে উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় তারা ছিলেন হযরত বিলাল হাবশী, সুহায়ব রুমী, আম্মার বিন ইয়াসির, সালিম মাওলা আবি হুযাইফা, সাবীহ মাওলা উসায়দ, হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, মিকদাদ বিন আমর, যুশ-শিমালাইন (রাঃ) প্রমুখ।

একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছু সংখ্যক কুরাইশ সরদারকে ইসলাম সম্পর্কে কিছু বুঝাচ্ছিলেন এমন সময় একজন অন্ধ মুসলিম (হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম) সেখানে এসে হাযির হন এবং নিজের দিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন এই বলে যে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অমুক আয়াত থেকে কিছু শিখান, যা আল্লাহ তাআলা আপনাকে শিখিয়েছেন। অসময়ে তার এ জিজ্ঞাসা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে অপছন্দনীয় ঠেকে। তিনি মনে মনে এ ধারণা করেছিলেন ঃ আমি এ মুহূর্তে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত আছি। কুরাইশের এই বড় বড় সরদাররা যদি আমার কথা সঠিকভাবে বুঝে নিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে এদের মাধ্যমে আরো অনেক লোকের ইসলাম গ্রহণের আশা আছে। ইবনে উম্মে মাকতুম তো একজন মুসলমান। আমার কাছ থেকে তার কোনো কিছু বুঝার ও শেখার তো ঢের সুযোগ রয়েছে। সে কি বুঝতে পারছে না যে, এখন আমার কাছে এমন সব প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বসে আছেন, যারা হেদায়াত প্রাপ্ত হলে তাদের মাধ্যমে হাজার হাজার লোক সঠিক পথে চলে আসতে পারে ? আমি তাদেরকে বুঝাচ্ছি অথচ সে তার কথাই বলে যাচ্ছে। সে এতটুকুও বুঝে না যে, যদি আমি এই সমস্ত লোকদের থেকে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেই তাহলে ব্যাপারটি এদের কাছে কতই না অপছন্দনীয় ঠেকবে। এমনও হতে পারে যে, অতপর তারা আমার কোনো কথাই আর শুনতে চাইবে না। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কিছুটা বিরক্ত হন এবং সে বিরক্তির চিহ্ন তার চেহারায় ফুটে উঠতে থাকে। ঠিক তখনি তার উপর এ আয়াতগুলো নাযিল হয় ঃ

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ۝ اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰى ۝ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ۝ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۝ وَاَمَّا مَنْ جَاۤءَكَ يَسْعٰى ۝ وَهُوَ يَخْشٰى ۝ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ۝

"সে (রাসূলুল্লাহ) ভ্রুকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। কারণ তার নিকট অন্ধ লোকটি আসলো। তুমি কেমন করে জানবে—সে হয়ত

১৭—

www.amarboi.org

পরিশুদ্ধ হতো, অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে উপদেশ তার উপকারে আসতো। পক্ষান্তরে যে পরওয়া করে না, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিয়েছ। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোনো দায়িত্ব নেই ; অন্যপক্ষে যে তোমার কাছে ছুটে আসলো, আর সে সশংকচিত্ত, তুমি তাকে অবজ্ঞা করলে।"–(সূরা আবাসা ঃ ১-১০)

বর্ণিত আছে যে, অতপর যখন ঐ অন্ধ সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে আসতেন তখন তিনি (রাসূলুল্লাহ) তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং বলতেন, স্বাগত সেই ব্যক্তিকে যার কারণে আমার প্রভু আমাকে বকুনী দিয়েছেন।–(তাফসীরে উসমানী)

সাহাবা কিরাম (রাঃ)-কে আল্লাহ তাআলা নিজের দল বা বাহিনী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের গৌরবময় কার্যকলাপ আজো মুসলমানদের জন্য পথপ্রদর্শনকারী। রাসূল (সাঃ)-কে সাহায্য প্রদানে এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তারা না তাদের পিতা-মাতার পরওয়া করেছেন, আর না তাদের সন্তান-সন্ততির। কুরআন মজীদে অতি সুন্দরভাবে তাদের এ গুণাবলী তুলে ধরা হয়েছে। যেমন ঃ

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ط اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ ط اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ (المجادلة : ٢٢)

"তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়, যারা ভালোবাসে আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারীকে—হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা-পুত্র, ভ্রাতা অথবা এদের জ্ঞাতি গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ সুদৃঢ় করেছেন ঈমান এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তার পক্ষ হতে রূহ (হিদায়াতের আলো, যার দ্বারা অন্তর শক্তিশালী হয় অথবা জিবরাঈল) দ্বারা। তিনি এদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত ; সেখানে এরা স্থায়ী হবে ; আল্লাহ এদের প্রতি

www.amarboi.org

প্রসন্ন এবং এরাও তাতে সন্তুষ্ট, এরাই আল্লাহর দল। জেনে রেখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।"–(সূরা মুজাদালা ঃ ২২)

অর্থাৎ যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে ছিল সাহাবীরা ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে—চাই তার পিতা হোক অথবা সন্তান হোক ; আল্লাহ ও রাসূলের ব্যাপারে তারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পরওয়া করতেন না। এ পটভূমিতে উহুদ যুদ্ধে হযরত আবু ওবায়দা (রাঃ) নিজের পিতাকে হত্যা করেছিলেন। একই কারণে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) নিজের পুত্র আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। হযরত মুসআব বিন উমায়র (রাঃ) আপন ভাই ওবায়দ বিন উমায়রকে, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) আপন মামা আস বিন হিশামকে, হযরত আলী বিন আবি তালিব, হযরত হামযা এবং হযরত ওবায়দা বিন হারিস (রাঃ) তাদের নিকটাত্মীয় উতবা, শায়বা এবং ওয়ালীদ বিন উতবাকে হত্যা করেছিলেন। মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে নিবেদন করেছিলেন, হে আল্লাহর রাসূল, যদি আপনি নির্দেশ দেন তাহলে আমি আমার পিতার দেহ থেকে তার মস্তক বিচ্ছিন্ন করে আপনার খেদমতে পেশ করবো। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে তা থেকে বিরত রাখেন।–(তাফসীরে উসমানী)

সাহাবীদের ঈমানী শক্তির এ দৃঢ়তার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের ঈমানকে দৃষ্টান্ত তথা মাপকাঠি হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا ج

"অতএব তারা যদি ঈমান আনে তোমাদের ঈমান আনার মত তবে তারা সুপথ পাবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৩৭)

এখানে 'তোমাদের' বলতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তার সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং সাহাবা (রাঃ)-এর ঈমানকে 'নমুনা' সাব্যস্ত করে বলা হয়েছে, আল্লাহ তাআলার কাছে মকবুল এবং গ্রহণযোগ্য শুধু সেই ধরনের ঈমান, যার অধিকারী ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তার সাহাবা কিরাম (রাঃ)।

এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি বিখ্যাত বাণীর উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন, 'আমার সাহাবীরা আকাশের নক্ষত্ররাজির মত। তোমরা ওদের যে কারো অনুসরণ করবে সেই তোমাদেরকে সঠিক পথে নিয়ে যাবে।'

www.amarboi.org

২. উম্মতে মুসলিমার বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে পূর্ববর্তী সকল উম্মতের উপর প্রকৃষ্টতা দান করেছেন। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-এর পূর্বে যত নবী-রাসূল আগমন করেছেন তাদের সকলেরই দাওয়াত (সত্যের প্রতি আহ্বান) আপন এলাকা অথবা আপন সমসাময়িক লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে সকল নবীরই দাওয়াতের হাকীকত এবং প্রকৃতি ছিল এক। এতে কোনোরূপ পরিবর্তন হত না। যদিও নবীদের শরীআত (জীবন ব্যবস্থা) সমূহের মধ্যে সময় ও অবস্থা ভেদে কিছু কিছু বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হতো।

যাহোক, মুসলিম উম্মাহ, অন্যান্য উম্মতের উপর যেসব কারণে প্রকৃষ্টতার অধিকারী হয়েছে, পবিত্র কুরআনের ভাষায় তার প্রধান কারণ হলো, এরা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্য নিষেধ করে। অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মানব জাতিকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখা এবং ভাল কাজে উদ্বুদ্ধ করার যে গুরু দায়িত্ব পূর্ববর্তী আম্বিয়া কিরাম পালন করতেন সে গুরু দায়িত্ব মুসলিম উম্মাহর সাধারণ লোকেরাও পালন করবে।

মুসলিম উম্মাহর প্রকৃষ্টতার আর একটি কারণ এই যে, হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)-কে আল্লাহ তাআলা মিরাজের রাতে বাইতুল হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গিয়ে তাকে সমগ্র আম্বিয়া কিরামের ইমামত ও নেতৃত্বের সম্মান প্রদান করেন। তাছাড়া তিনি সর্বশেষ নবী এবং কিয়ামতের দিন গুনাহ্গারদের শাফাআতকারী। যেহেতু হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) সকল নবীদের সরদার এবং সকলের চেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন তাই তার উম্মতও অন্যান্য সকল উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

মুসলিম উম্মাহর প্রকৃষ্টতার আর একটি কারণ, যা পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে তা হলো ঃ

كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ قف لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ قف

-(البقرة : ٢٨٥)

"তাদের (মুমিনদের) সকলে আল্লাহে, তার ফেরেশতাগণে, তার কিতাবসমূহে এবং তার রাসূলগণে ঈমান এনেছে। তারা বলে, আমরা আল্লাহর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করি না।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৫)

www.amarboi.org

অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহ জোর গলায় ঘোষণা করে যে, মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর যা নাযিল হয়েছে আমরা শুধু তা মান্য করি না, বরং যে সমস্ত আদেশ-নির্দেশ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন আজ সেগুলোও যদি আমাদেরকে দেয়া হয়, তাহলে আমরা তাও মান্য করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছি। মুসলিম উম্মাহর এ অসাধারণ ঔদার্য নিসন্দেহে তার প্রকৃষ্টতার একটি বড় প্রমাণ।

সাহাবা কিরাম এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ঈমানের পরিপূর্ণতার যে অতি সুন্দর রূপটি সূরা বাকারার শেষ রুকূতে ফুটে উঠেছে তেমনি তাদের চরিত্রের তথা ঈমান-বিশ্বাসের আর একটি অতি লক্ষণীয় রূপ ফুটে উঠেছে এর প্রথম রুকূতে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۝ (البقرة : ٢-٤)

"এটা সেই কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই ; মুত্তাকীদের জন্য এটা পথ-নির্দেশ যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে এবং তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা হতে ব্যয় করে এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরকালে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২-৪)

যেন বলা হচ্ছে, হে ইয়াহূদী, খ্রীস্টান ও সমগ্র বিশ্ববাসী! কুরআন সেই সত্য গ্রন্থ, যা ঐসব মুত্তাকীদের পথপ্রদর্শন করে, যারা কোনো কিছু না দেখেই (আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কথার উপর) তাতে বিশ্বাস করে, যারা সালাত কায়েম করে এবং আল্লাহ তাদের যে জীবনোপকরণ দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করে। আর তারা বিশ্বাস করে যা মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উপর নাযিল হয়েছে এবং যা নাযিল হয়েছে তার পূর্ববর্তী আম্বিয়া কিরামের উপর। আর তারা পরকালে দৃঢ় বিশ্বাসী। এখানে মুসলিম উম্মাহর একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আর তা এই যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে যে হুকুমই আসে তারা তা বিনা দ্বিধায় মেনে নেয়—ইয়াহূদী ও খ্রীস্টানদের মত আল্লাহর বিধি-নিষেধ নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয় না এবং সেটার উপর আমল করা থেকে গা বাঁচাবার জন্য কোনো প্রকার ধূর্তামিরও আশ্রয় নেয় না। তারা যখনই জেনে নেয় যে, কোনো ঘটনা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটেছে কিংবা কোনো

www.amarboi.org

আদেশ-নিষেধ আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তখনি তা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়—চাই সে ঘটনা যতো অবিশ্বাস্য রকমের হোক, আর চাই সে আদেশ-নিষেধ যতো কঠোর বা কষ্টসাধ্যই হোক।

এটা শুধু মুখের বুলি বা কথার কথা নয়, বরং সাহাবা কিরাম নিজেদের কথা ও কাজ দ্বারা এর অসংখ্য প্রমাণ রেখে গেছেন। প্রসঙ্গত একটি মাত্র ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

মিরাজের ঘটনার পরদিন আবু জাহল, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ)-কে উপহাসের ছলে যখন বলেছিল, হে আবু বকর ! মুহাম্মদ যে বলছেন, তিনি গত রাতে বাইতুল্লাহ্ থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস এবং বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে সিদারাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গিয়েছেন এবং সেখান থেকে আবার ফিরে এসেছেন—এটা কি তোমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় ? আবু বকর (রাঃ) সাথে সাথে জবাব দেন, 'যদি মুহাম্মদ (সাঃ) তা-ই বলে থাকেন তাহলে এটা নিসন্দেহে সত্য।' এটাকেই বলে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের উপর প্রকৃত বিশ্বাস। আর মুসলমানরা এ বিশ্বাসে বলীয়ান বলে তারা অন্যান্য সকল উম্মতের উপর প্রকৃষ্টতার অধিকারী।

আধুনিক বিজ্ঞান আজ মিরাজের সত্যতাকে মেনে নিতে শুরু করেছে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের আদেশ-নিষেধের যথার্থতাও কোনো না কোনো ভাবে মেনে নিচ্ছে, কিন্তু সাহাবা কিরাম আধুনিক বিজ্ঞান বা দর্শনের উপর ভিত্তি করে নয়, বরং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কথার উপর আস্থা রেখেই রাসূলের মাধ্যমে সংঘটিত যাবতীয় ঘটনাকে সত্য এবং তার মাধ্যমে প্রাপ্ত যাবতীয় বিধি-নিষেধকে অবশ্য পালনীয় বলে নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। আর এ কারণেই তারা ছিলেন অতীতের যাবতীয় মানবগোষ্ঠীর উপর প্রকৃষ্টতার অধিকারী ও সমসাময়িক বিশ্বের উপর নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মালিক।

এ বৈশিষ্ট্যকে মুসলিম উম্মাহ্ আজ হারাতে বসেছে বলে তারা যেমন অতীত জাতিসমূহের কাছে নিজেদেরকে হাস্যাস্পদ করে তুলেছে তেমনি সমসাময়িক বিশ্বের উপরও তাদের কোনো নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব নেই। তারা এ বিষয়টি যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করতে পারবে ততই মঙ্গল।

৩. মুসলমানদের পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবে গৃহযুদ্ধ ছিল একটি নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপার। প্রত্যেকটি গোত্র একে অন্যের শত্রু ছিল। অতি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র

www.amarboi.org

করেও তাদের তরবারি ঝনঝনিয়ে উঠতো এবং একটি দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। যতক্ষণ পর্যন্ত এক গোত্র অন্য গোত্র হতে পূর্ণ প্রতিশোধ নিতে না পারতো ততক্ষণ তাদের জিঘাংসা নিবৃত্ত হতো না। 'প্রতিশোধের পর প্রতিশোধ' -এর এ ধারা পুরুষানুক্রমে অব্যাহত থাকতো। এটাই তাদের শক্তিকে খণ্ড বিখণ্ড করে দিয়েছিল। এসব যুদ্ধ-বিগ্রহ আরবের জাহিলিয়া যুগের ইতিহাসের এক একটি গুরত্বপূর্ণ অধ্যায়।

ইসলামী ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব

আরবদের উপর ইসলামের এটি একটি বিরাট অনুগ্রহ যে, সে পরস্পর রক্তলোলুপ শত্রুদেরকে দ্বীনী ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করে এমন ঐক্যবদ্ধ করে দিয়েছিল যে, তারা পুরাতন শত্রুতা ভুলে একে অন্যের ভাই এবং একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তাদের এ অনুপম ভ্রাতৃত্ব দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীতে একটি প্রবাদ হিসাবে বিরাজ করে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ص وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَآءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًا ج وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ط كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ۝ (ال عمران : ١٠٢ - ١٠٣)

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় কর এবং তোমরা আত্মসমর্পণকারী না হয়ে কোনো অবস্থায় মরো না। এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ কর ঃ তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের প্রান্তে ছিলে, আল্লাহ ওটা হতে তোমাদের রক্ষা করেছেন। এরূপে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন স্পষ্টভাবে বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পার।"

–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২-১০৩)

অপর আয়াতে নবী করীম (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ

قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ○ (الانفال : ٦٣)

"এবং তিনি তোমাদের পরস্পরের হৃদয়ের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের হৃদয়ে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না ; কিন্তু আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন ; তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।"–(সূরা আল আনফাল ঃ ৬৩)

মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির ব্যাপারটি ইসলামের দৃষ্টিতে এত গুরুত্বপূর্ণ যে, সে এর সব কয়টি ছিদ্রপথই বন্ধ করার চেষ্টা করেছে এবং মুসলমানদেরকে অনৈক্য ও কলহ-বিবাদের করুণ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পরস্পর দলাদলি থেকে তাদেরকে বিরত রাখার প্রয়াস চালিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ

اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ○ (الانفال : ٤٦)

"আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে ও নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না, করলে তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের শক্তি বিলুপ্ত হবে। তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে ; আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"
–(সূরা আল আনফাল ঃ ৪৬)

যখন মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ অথবা মতবিরোধ দেখা দেয় তখন তা নিরসনের জন্য তাদের আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল (সাঃ)-এর নির্দেশের দিকে ফিরে যাওয়া উচিত। যেমন বলা হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ○ (النساء : ٥٩)

"হে মুমিনগণ ! যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্র, আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে ক্ষমতার অধিকারী ; কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে ওটা উপস্থাপিত কর আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৫৯)

www.amarboi.org

যদি দু' দলের ঝগড়া শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের আকার ধারণ করে তাহলে সাধারণ মুসলমানদের কর্তব্য হবে, তারা উভয় দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের চেষ্টা করবে। অতপর যে দল বাড়াবাড়ি করবে, সেই দলকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে বাধ্য করবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ইনসাফ বর্জন করা যাবে না। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

"মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে ; অতপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে ; যদি তারা ফিরে আসে তাঁদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয় আল্লাহ সুবিচারকারীদেরকে ভালোবাসেন। মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।"–(সূরা আল হুজুরাত ঃ ৯-১০)

এখানে একটি কথা লক্ষণীয় যে, মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত দৃঢ়। যুদ্ধ বিগ্রহে তা নষ্ট হয় না ; বরং এর পরও তারা পরস্পর ভাই ভাই-ই থাকে। নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা উপরোক্ত আয়াতটির ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য কর —চাই সে অত্যাচারী হোক অথবা অত্যাচারিত। সাহাবীগণ নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! অত্যাচারিত ব্যক্তির তো সাহায্য করা যেতে পারে ; কিন্তু অত্যাচারীর সাহায্য কিভাবে করা যাবে ? হুযূর (সাঃ) উত্তর দিলেন, এভাবে যে, তাকে অত্যাচার হতে বাধা দান কর।

দু'জন মুসলমানের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেয়া নফল ইবাদাত হতেও উত্তম কাজ। একবার নবী করীম (সাঃ) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় বলে দেব, যা নামায, রোযা এবং সদকা হতেও উত্তম। সাহাবা কিরাম নিবেদন করলেন, জী হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল।

www.amarboi.org

হুযুর (সাঃ) বললেন, দু' ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও। এর জন্য প্রয়োজনবোধে মিথ্যা বলারও অনুমতি রয়েছে।-(আবু দাউদ)

নবী করীম (সাঃ) একতা, ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসা ও সহানুভূতির প্রতি বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও উদাহরণের মাধ্যমে মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সকল মুসলমান একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায়। একজনের ব্যথায় সবাই ব্যথা পেয়ে থাকে।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ মুসলমানদের পারস্পরিক ভালবাসা ও অনুগ্রহের উদাহরণ একটি দেহের ন্যায়। যখন ওটার একটি অঙ্গে কোনো ব্যথা হয়, তখন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

অন্য আরেক রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ মুসলমানদের উদাহরণ একটি ব্যক্তির ন্যায় ; যদি তার চোখ অসুস্থ হয়, তবে সারাটা দেহে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলমানরা একে অন্যের জন্য একটি অট্টালিকার বিভিন্ন অংশের ন্যায়, যেগুলোর সমন্বয়ে পুরো অট্টালিকা সুদৃঢ় ও মজবুত হয়ে থাকে।

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের জন্য যেন একই অট্টালিকা, যার একাংশ অপরাংশকে সুদৃঢ় রাখে।

অর্থাৎ যেরূপ একটি ইট অন্য আরেকটি ইটের সাথে মিলিত হয়ে অথবা একটি অট্টালিকার একাংশ অপরাংশের সাথে মিলিত হয়ে পুরো অট্টালিকাকে শক্ত ও মজবুত করে তুলে সেরূপ ইসলামী উম্মাহ্ নামক অট্টালিকা মুসলমানদের একতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় হয়ে থাকে। যদি তাদের মধ্য হতে কোনো একটি ইট আপন জায়গা হতে খসে পড়ে তবে পুরো অট্টালিকাই দুর্বল ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

মুসলমানদের মধ্যে নিম্নোক্ত গুণগুলো অবশ্যই বিদ্যমান থাকবে ঃ

১. তারা হবে পরস্পর অত্যন্ত দয়াশীল।

২. তারা হবে একে অন্যের প্রতি অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী।

আর এ কারণেই তারা একে অন্যের জন্য দুআ করে থাকে। তারা বলে ঃ

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ০(الحشر : ١٠)

www.amarboi.org

"হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাদেরকে ক্ষমা করো এবং মুমিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি তো দয়াদ্র, পরম দয়ালু।"-(সূরা আল হাশর ঃ ১০)

মুসলমানদের হত্যা করা হারাম

যদি কোনো মুসলমান তার কোনো মুসলমান ভাইকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে, তবে সে আল্লাহর ক্রোধ এবং তাঁর লানতের যোগ্য হয়ে যায়। তার শাস্তি জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব, যা কাফিরদের জন্য নির্দিষ্ট। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء : ٩٣)

"কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুমিনকে হত্যা করলে তার শাস্তি জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে লানত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।"-(সূরা নিসা ঃ ৯৩)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, মুসলমানকে গালি দেয়া গুনাহর কাজ এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করা কুফর।

নবী করীম (সাঃ) অন্যত্র বলেছেন, যে আমাদের (মুসলমানদের) উপর হাতিয়ার উত্তোলন করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।-(মুসলিম)

মুসলমানের পরিচয় এই যে, তার হাত ও জিহ্বা দ্বারা কোনো মুসলমানদের ক্ষতি সাধিত হবে না। যেমন বলা হয়েছে, "প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত হতে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।"

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এক ব্যক্তি নবী করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করে, হে আল্লাহর রাসূল, সর্বাপেক্ষা উত্তম ইসলাম কি ? অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা ভাল মুসলমান কে ? হুযুর (সাঃ) উত্তর দেন, যার জিহ্বা ও হাত হতে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।-(বুখারী)

মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতির ব্যাপারটি হুযুর (সাঃ)-এর দৃষ্টিতে এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, তিনি বিদায় হাজ্জের ভাষণে মুসলমানদেরকে যেসব বিষয়ের অসীয়ত করেছিলেন তন্মধ্যে একটি এও ছিল ঃ

"আমার পরে তোমরা কাফির হয়ে যেও না যে, একে অন্যের গর্দান কাটতে আরম্ভ কর।"

www.amarboi.org

ইসলাম এ ব্যাপারে এত সাবধানতা অবলম্বন করেছে যে, যদি কাফির শত্রুও শুধু মৌখিকভাবে ইসলামের স্বীকারোক্তি করে, তবে কোনো মুসলমানের জন্য তার সে স্বীকারোক্তি অস্বীকার করার এবং তার উপর হাত উঠানোর কোনো অধিকার নেই। বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ز فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ط كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ○ (النساء : ٩٤)

"হে মুমিনগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে যাত্রা করবে তখন পরীক্ষা করে নেবে এবং কেউ তোমাদেরকে সালাম করলে ইহজীবনের সম্পদের আকাঙ্খায় তাকে বলো না, তুমি মুমিন নও ; কারণ আল্লাহর নিকট অনায়াসলভ্য সম্পদ প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে, অতপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন ; সুতরাং পরীক্ষা করে নেবে। তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।–(সূরা নিসা ঃ ৯৪)

এ আয়াতের সাথে সম্পর্কিত ঘটনাটি এই যে, এক সাহাবী কোনো যুদ্ধে এক কাফিরকে বাগে পেয়ে তার উপর আক্রমণ করে বসলে কাফির যোদ্ধা উচ্চস্বরে কালিমাহ্ পাঠ করে। সাহাবী মনে করলেন যে, সে প্রাণ বাঁচাবার জন্য কালিমাহ্ পাঠ করছে। সুতরাং তিনি তাকে হত্যা করে ফেললেন। নবী করীম (সাঃ)-এর নিকট এ সংবাদ পৌছলে তিনি উক্ত সাহাবীকে ডেকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সাহাবী বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে প্রাণের ভয়ে কালিমাহ্ পাঠ করেছিল। তখন হুযুর (সাঃ) বললেন, তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছিলে ?–(বুখারী)

এতে এ বিষয়টিও প্রমাণিত হয়ে গেল যে, কোনো মুসলমানকে উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাফির বলা উচিত নয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যখন কোনো মুসলমান ভাই তার অপর মুসলমান ভাইকে কাফের বলে, তখন 'কুফর' তাদের দু'জনের মধ্যে হতে কোনো একজনের উপর প্রযোজ্য হয়ে যায়।–(বুখারী)

অর্থাৎ যদি সেই মুসলমান প্রকৃতপক্ষে 'কুফ্র'-এর কোনো কাজ করে থাকে, তবে উক্তিকারী সত্যিই বলেছে। আর যদি তদ্রূপ না হয়, তাহলে মুসলমানকে কাফের বলা স্বয়ং এক প্রকারের 'কুফ্র'।

www.amarboi.org

ইসলাম মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টিকারী প্রতিটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার চেষ্টা করেছে। তাদের পরস্পর বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃভাব, সম্প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক সুদৃঢ় করার জন্য একে অন্যের উপর এত অধিকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব আরোপ করে দিয়েছে যে, যদি সেগুলো যথাযথভাবে পালন করা হয়, তবে মুসলমানরা প্রকৃতপক্ষে একই দেহে পরিণত হয়ে যাবে এবং মুসলিম উম্মাহ্ এক অপরাজেয় দুর্গে পরিণত হবে। এসব অধিকার, কর্তব্য এবং দায়-দায়িত্বের বিবরণ এত দীর্ঘ যে, একটি প্রবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে তা সামাল দেয়া সুকঠিন। কাজেই দৃষ্টান্ত হিসাবে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

এক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের অধিকার ও কর্তব্য

এক মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইয়ের জানমাল এবং ইয্যত-আব্রুর হিফাযতকারী ও আমানতদার। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের ধন-সম্পদ, ইয্যত-আব্রু ও রক্ত হারাম। কোনো মুসলমানের জন্য এ পাপই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে ঘৃণা ও অবহেলার চোখে দেখে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, মুসলমানের ইযযত-আব্রুর উপর হস্তক্ষেপ করাই সর্বাপেক্ষা বড় সুদ।-(আবু দাঊদ ঃ ২য় খণ্ড)

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুনাফিকের মুকাবালায় কোনো মুসলমানকে সাহায্য করে এবং তাকে রক্ষা করে আল্লাহ্ তার জন্য একজন ফিরিশতা নিয়োজিত করে দেবেন, যিনি কিয়ামতের দিন তাকে দোযখের আগুন হতে রক্ষা করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ইয্যত-আব্রু নষ্ট করার উদ্দেশ্যে তার প্রতি অপবাদ আরোপ করে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে জাহান্নামে পুলসিরাতের উপর আটকিয়ে রাখবেন—যতক্ষণ না সে তার শাস্তি ভোগ করে।-(আবু দাঊদ ঃ ২য় খণ্ড)

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যদি কোনো মুসলমান অপর মুসলমানকে এমন জায়গায় অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করে, যেখানে তার সম্মানহানির আশংকা রয়েছে, আল্লাহ তাকেও এমন জায়গায় পরিত্যাগ করবেন, যেখানে তার, আল্লাহর সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে। আর যদি কোনো মুসলমান অপর মুসলমানকে এমন জায়গায় সাহায্য করে, যেখানে তার সম্মানহানির আশংকা রয়েছে, তাহলে আল্লাহ তাকেও যথাস্থানে সাহায্য করবেন।"-(আবু দাঊদ ঃ ২য় খণ্ড)

www.amarboi.org

একজন মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের ধন-সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কসমের মাধ্যমে কোনো মুসলমানের হক গ্রাস করে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, যদি তা কোনো মামুলী বস্তু হয়, হুযুর (সাঃ) উত্তর দিলেন, তা বাবুল বৃক্ষের একটি ডালই হোক না কেন? এক মুসলমানের ধন-সম্পদের হিফাযত করা অন্য মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য।–(মুসলিম)

নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য আয়না স্বরূপ। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই, সে তার মাল-সম্পদ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে এবং তার অনুপস্থিতিতে সেগুলোর হিফাযত করে।–(আদাবুল মুফরাদ)

বিপদে একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা

হযরত সালীম (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে না তার উপর জুলুম করবে এবং না তাকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দিবে। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের কষ্ট দূর করবে এবং তাকে বিপদমুক্ত করবে, আল্লাহও তার মুশকিল আসান করে দেবেন।–(আবু দাউদ)

অন্য রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পার্থিব কোনো দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তাআলা ক্বিয়ামতের দিন তার বিপুল পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোনো দরিদ্র মুসলমানের জন্য সচ্ছলতা সৃষ্টি করে দেবে এবং কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন করবে, আল্লাহ তাআলা ইহ-পরকাল উভয় স্থানে তার দোষ-ত্রুটি গোপন করবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সাহায্যে নিয়োজিত থাকে, আল্লাহও তার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন।–(আবু দাউদ)

অনৈক্য ও কলহ বিবাদের কারণসমূহ হতে দূরে থাকার তাকীদ

মুসলিম শরীফের একটি রেওয়ায়াতে আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমরা পরস্পর হিংসা পোষণ করো না, একে অন্যকে আতংকগ্রস্ত করো না, কারো প্রতি বিদ্বেষ রেখ না, অসাক্ষাতে কাউকে মন্দ বলো না, একে অপরের বিপরীতে দাম বাড়িও না, বরং ওহে আল্লাহর বান্দাগণ ! পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাক। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। না তার উপর কোনো

www.amarboi.org

জুলুম করবে, না তাকে অসহায় অবস্থায় ত্যাগ করবে, আর না তাকে অবজ্ঞা করবে। অতপর তিনি বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'তাকওয়া এখানে'। মানুষের জন্য এ দোষ যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবহেলার চোখে দেখে। প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের জানমাল ও তার আব্রু হারাম।-(মুসলিম)

বুখারী শরীফে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমরা পরস্পর হিংসা রেখো না, বিদ্বেষ পোষণ করো না, অসাক্ষাতে একে অন্যকে মন্দ বলো না ; বরং আল্লাহর বান্দা এবং ভাই ভাই হয়ে থাক। একজন মুসলমানের, তার অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক বর্জন করে থাকা বৈধ নয়।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, তোমরা একে অন্যের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাক। খারাপ ধারণা পোষণ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বিষয়। একজন অপর জনের দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না। অসাক্ষাতে মন্দ বলো না ; বরং আল্লাহর বান্দা এবং ভাই ভাই হয়ে থাকো।-(বুখারী)

আবু দাউদ শরীফে আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, তোমরা মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়িয়ো না। যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়াবে, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটির খোঁজ করবেন। আর স্বয়ং আল্লাহ যার দোষ-ত্রুটির খোঁজ করবেন, তাকে তার গৃহের মধ্যে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন।

হুযূর (সাঃ) বলেছেন, সেই ব্যক্তি মুমিন বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য নয়, যে তার মুমিন ভাইয়ের জন্য সেই বস্তু পছন্দ করে না, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।-(বুখারী)

যেসব মুসলমান একে অন্যের প্রতি ভালবাসা পোষণ করে না, তারা জান্নাতের উপযুক্ত নয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না (পরিপূর্ণ) ঈমানদার হবে এবং একে অন্যকে ভালবাসবে। আমি তোমাদেরকে এমন একটি বিষয় শিখিয়ে দিচ্ছি, যদি এর উপর আমল কর তাহলে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। আর তাহলো তোমরা একজন অপরজনকে সালাম কর।-(আবু দাউদ)

মুসলমানদের সাথে আন্তরিকতা পোষণ করা এবং তাদের মঙ্গল কামনা করা প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। নবী করীম (সাঃ) অন্যান্য জরুরী বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়েও বাইয়াত গ্রহণ করতেন। হযরত জারীর ইবনে

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, 'আমি নবী করীম (সাঃ)-এর হাতে তিন বিষয়ে বাইয়াত করেছি ঃ নামায, যাকাত এবং প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি আন্তরিকতা ও ভালবাসা পোষণ এবং তার মঙ্গল কামনা।-(বুখারী)

এক মুসলমানের, অপর মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী সালাম-কালাম বর্জন করে থাকা জায়িয নয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ এক মুসলমানের, অপর মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক-ছিন্ন অবস্থায় থাকা হারাম। তিন দিন পর যখন উভয়ে সামনা-সামনি হবে, তখন একজন আগে বেড়ে অপরজনকে সালাম দেবে। যদি দ্বিতীয় জন সালামের উত্তর দেয়, তবে দু'জনই পুণ্য লাভ করবে ; অন্যথায় যে সালামের উত্তর দানে বিরত থাকবে, সে গুনাহ্গার হবে।

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্ক বর্জন করে কাটাল, সে যেন তাকে হত্যা করলো।-(আবু দাউদ)

সালাম দ্বারা ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। আর মুসাফাহা (করমর্দন) দ্বারা গুনাহ মাফ হয়। সুতরাং যখন দু'জন মুসলমানের সাক্ষাত হয়, তখন পরস্পর সালাম বিনিময় ও মুসাফাহা করা উচিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ যখন দু'জন মুসলমান পরস্পর মিলিত হয় এবং একে অন্যের সাথে মুসাফাহা করে, তখন তারা পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।-(আবু দাউদ)

প্রত্যেক মুসলমানের উপর তার মুসলমান ভাইয়ের পাঁচটি হক রয়েছে ঃ (১) তাকে সালাম দেয়া অথবা তার সালামের উত্তর দেয়া (২) সে হাঁচি দিয়ে 'আলহামদু লিল্লাহ' (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) বললে তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার উপর কৃপা করুন) বলা (৩) তার দাওয়াত কবুল করা (৪) সে অসুখে পড়লে তাকে দেখতে যাওয়া এবং (৫) তার জানাযায় শরীক হওয়া। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে ছয়টি হকের উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ হকটি হলো, সে কোনো পরামর্শ চাইলে তাকে সৎ পরামর্শ দেয়া।

মুসলিম শরীফে আছে, যখন কোনো মুসলমান তার অসুস্থ ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে যতক্ষণ পর্যন্ত ফিরে না আসে ততক্ষণ জান্নাতের পথে অবস্থান করে।

এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের শেষ হক এবং শেষ খিদমত হলো তার জানাযায় শরীক হওয়া।

www.amarboi.org

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি ঈমান ও আন্তরিকতার সাথে কোনো মুসলমানের জানাযায় শরীক হয় এবং নামায ও দাফন পর্যন্ত তার সাথে থাকে, সে দুই কীরাত সওয়াব লাভ করবে। এক কীরাত হচ্ছে উহুদ পাহাড়ের সমান। আর যে ব্যক্তি শুধু জানাযার নামাযে শরীক হয় এবং দাফনের পূর্বে ফিরে আসে, সে এক কীরাত সওয়াব লাভ করবে।-(বুখারী) এ উদাহরণ দ্বারা সওয়াবের আধিক্য বুঝানোই উদ্দেশ্য।

তিরমিযী শরীফে আছে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি জানাযার নামাযে শরীক হয় এবং তিনবার জানাযা বহনে কাঁধ লাগায়, সে তার মুসলিম ভাইয়ের হক আদায় করেছে।

---

www.amarboi.org

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নৈতিক, চারিত্রিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলী

১. মানবতা

যারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইসলামী সভ্যতা ও তার আনুষঙ্গিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবেন, তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, ইসলামী সভ্যতার শিরা-উপশিরায় মানবতার প্রবল স্রোতধারা যেভাবে সঞ্চালিত, তাতে তা বিশ্বের যাবতীয় সভ্যতার শীর্ষে স্থান পাবার যোগ্য। প্রকৃতপক্ষে মানবতাই ইসলামী সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের প্রভাবেই ইসলাম মানবজাতিকে দলাদলি, রেষারেষি ও পক্ষপাতিত্বের সংকীর্ণ পরিবেশ ও বর্ণবৈষম্যের ঘিঞ্জি গলি থেকে এমন এক মুক্ত পরিবেশে নিয়ে আসে যেখানে আছে শুধু শালীনতা ও বন্ধুত্বের প্রাণ-মাতানো সমীরণ, আর প্রেম প্রীতি ও ভালবাসার সুমধুর সুরলহরী—যেখানে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর, এক গোত্র অপর গোত্রের উপর, একদল অপর দলের উপর কিংবা এক জাতি অন্য জাতির উপর জুলুম-অত্যাচারের কোনো সুযোগই পায় না। ইসলামের এ অনুপম বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে কিংবা তার ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেই নয়, বরং সামাজিক আইন-কানুন ও শান্তি-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। ইসলামী সভ্যতার প্রতিটি বিভাগ ও প্রতিটি স্তর এ বৈশিষ্ট্যের মহিমায় মহিমান্বিত। ইসলামের সত্যিকার অনুসারীদের কর্মজীবন তো এ বৈশিষ্ট্যের এক একটি বাস্তব উদাহরণ ছাড়া কিছু নয়।

ইসলামী সভ্যতায় মানবতার প্রভাব সর্বপ্রথম নজরে পড়ে তখন, যখন দেখা যায়, সে গোটা মানবজাতিকে একই পিতার সন্তান বলে ঘোষণা করেছে। কুরআন বলে–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج (النساء : ١)

"হে মানব! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা হতে তার সংগিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন।"–(সূরা নিসা ঃ ১)

www.amarboi.org

অর্থাৎ মানুষ মাত্রেই একই বংশের অন্তর্গত। তাদের মধ্যে জাতিগত যে পার্থক্য রয়েছে তা মোটেই লক্ষণীয় বিষয় নয়। কেননা এ পার্থক্য একই ঔরসজাত সন্তানের পার্থক্যের সমান। মানুষ শাখা-প্রশাখায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও মূল তাদের একই। গোটা মানবজাতি যখন একই বংশোদ্ভূত তখন তাদের মধ্যে পরস্পর স্নেহ-ভালবাসা, সাহায্য-সহায়তা ও উপকার সাধনের প্রবল আগ্রহ থাকাটা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অতপর ইসলাম এক অভিনব পদ্ধতিতে মানবতার আর একটি দিক বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। এ বিশেষ দিকটির প্রতি মানব জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে কুরআন ঘোষণা করছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط

"হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে একই পুরুষ ও একই নারী হতে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।"-(সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

অতপর ইসলাম মানব জীবনের আর একটি বিশেষ অবস্থার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আর তাহলো, এ জীবন-সংগ্রামে কেউ জয়ী হয়, কাউকে আবার পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করতে হয়। কেউ প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে, কারো আবার অন্নবস্ত্রেরই সংস্থান হয় না। কেউ শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়, কাউকে আবার বাধ্যতামূলকভাবে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করতে হয়। কারো গায়ের রং কালো, কারো সাদা, কারো হলদে, কারো বা অন্য কিছু।

ইসলামের মতে, মানব-জীবনে এ সমস্ত পার্থক্য থাকাটা একান্ত স্বাভাবিক। পার্থিব জীবনের সাথে এই সমস্ত বৈপরীত্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, যারা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত কিংবা শক্তি-সামর্থ ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী তারা তাদের পার্থিব মর্যাদা বা ক্ষমতাবলে, ক্ষমতাহীন কিংবা শাসিতদের দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে বসবে। এর অর্থ এও নয় যে, শেতাঙ্গরা কৃষ্ণাঙ্গদের দেখলে নাক সিটকাবে। প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ এই যে, খোদার দৃষ্টিতে সকল মানুষই সম মর্যাদার অধিকারী। তবে হ্যাঁ, সততা ও খোদাভীতির তারতম্য অনুসারে তাদের মর্যাদারও তারতম্য ঘটতে পারে।

কুরআন বলে ঃ

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط-(الحجرت : ١٣)

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে।"-(সূরা হুজুরাত ঃ ১৩)

www.amarboi.org

অর্থাৎ আইনের চোখে সবাই সমান। একমাত্র তাকওয়া ও সততার ভিত্তিতেই মানুষের মধ্যে তারতম্যের সৃষ্টি হতে পারে।

সমাজের প্রত্যেক লোকই সম-মর্যাদার অধিকারী। অতএব সবল দুর্বলকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দিতে পারে না—এবং কিছু সংখ্যক লোককে দুঃখ সাগরে ভাসিয়ে বাকী লোক আমোদ-স্ফূর্তিতে ডুবে থাকতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পরস্পর ভালবাসা ও সহানুভূতির দিক দিয়ে মুসলমানরা যেন একই দেহের বিভিন্ন অংশ। যখন এই দেহের কোনো একটি অংশে আঘাত লাগে, তখন গোটা দেহেই ছড়িয়ে পড়ে তার প্রতিক্রিয়া—প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাতনায় ছটফট করতে থাকে।

শুধুমাত্র উপরোক্ত কথাগুলোই নয়, বরং কুরআন-হাদীসে এমন আরো অনেক কথা আছে, যা মানবজাতির সমজাতীয়তা ও সমগোত্রীয়তার এক একটি অকাট্য দলীল।

কুরআন মানবজাতিকে 'হে বনী আদম' 'হে মানবজাতি' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছে। আর যখন ইসলামপন্থীদের সম্বোধন করার আবশ্যক বোধ করছে তখন 'হে মুসলিমগণ' বা এ জাতীয় কোনো শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেছে। 'হে পরাক্রমশালী মানবগোষ্ঠী' বা 'হে শ্বেতাঙ্গ মুমিনগণ'—এ জাতীয় শব্দের কোনো সম্বোধন কুরআন-হাদীসের কোথাও নেই।

কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তর বা মৌলিক বিষয়সমূহেই নয়, বরং ইসলামী আইনের প্রত্যেকটি ধারা-উপধারা এবং প্রত্যেকটি আদেশ-নির্দেশেই মানবতার গভীর অনুভূতি বিদ্যমান। প্রথমে নিখুঁত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কথাই ধরুন। নামাযের মধ্যে, ইসলাম সমস্ত মানবজাতিকে একই সারিতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ তাআলার বন্দেগী করার নির্দেশ দিয়েছে। আমির-উমারা কোনো বিশেষ সারিতে দাঁড়াবেন—এমন ব্যবস্থা ইসলাম-বহির্ভূত। রমযান মাসে ইসলাম সকলকেই ভূখা থাকার নির্দেশ দিয়েছে। এক্ষেত্রে রাজা-বাদশাহ কিংবা বিত্তশালীদের কোনোরূপ কনসেশনের ব্যবস্থা নেই। হাজ্জের মধ্যে সকলকে একই পোশাক পরিধান করতে হয়, একই স্থানে দাঁড়িয়ে যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতে হয়। আরব-অনারব, দেশী-বিদেশী কিংবা বিশিষ্ট-অবিশিষ্টের কোনো প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হয় না।

শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং ইসলামী মূলনীতির প্রত্যেকটি ধারা-উপধারা প্রণীত হয়েছে মানবতা তথা ন্যায়নীতিকে কেন্দ্র করে। ইসলামী আইন মজলুম ও উৎপীড়িতের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে, আর যুদ্ধ ঘোষণা করেছে

www.amarboi.org

জালিম ও শোষকদের বিরুদ্ধে। ইসলামী দণ্ডবিধি শাসক-শাসিত কিংবা উঁচু-নীচুর মধ্যে কোনো তফাত করে না। উচ্চবংশ কিংবা পার্থিব উচ্চমর্যাদার আবদার এখানে খাটে না। যে কেউই হত্যার অপরাধে অপরাধী হবে, ইসলামী আইন তার উপর তৎক্ষণাৎই মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারী করবে—হোক না সে যতবড় বিত্তশালী কিংবা শৌর্যবীর্যের মালিক। যে কেউ চৌর্যবৃত্তির অপরাধে অপরাধী হবে, ইসলামী আইন তাকে নির্দ্বিধায় যথাযোগ্য শাস্তি প্রদান করবে। অভিযুক্ত ব্যক্তি শিক্ষিত না মূর্খ, কৃষক না ব্যবসায়ী, স্বদেশী না বিদেশী, ধনী না নির্ধন, প্রাচ্য দেশীয় না পাশ্চাত্য দেশীয়, শ্বেতাঙ্গ না অশ্বেতাঙ্গ—এ সমস্ত অবান্তর প্রশ্ন ইসলামী আদালতে উত্থাপিত হতে পারে না।

ইসলাম বর্ণ, ধর্ম কিংবা এ জাতীয় কোনো কিছুর দিকেই তাকায় না, সমতা তথা মানবতাকেই সবকিছুর উর্ধে স্থান দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ হিসাবে প্রতিটি মানুষই সম্মানিত এবং সমমর্যাদার অধিকারী।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে যেভাবে উচ্চসম্মান ও উচ্চমর্যাদার অধিকারী করেছেন তাতে প্রতিটি মানুষ অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা তথা দুনিয়ার যাবতীয় মৌলিক অধিকারের সমান অধিকারী। ইসলামী শাসন-ব্যবস্থা তাদেরকে এসব জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না, বরং অত্যন্ত কড়াকড়িভাবে তা সংরক্ষণেরই ব্যবস্থা করে।

ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইনের ধারা-উপধারা কেবলমাত্র মানবতার প্রতি সম্মান-প্রদর্শন করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং মানুষের সংকল্প ও নিয়্যাতকে যাবতীয় কর্মের পরিণাম-নিয়ন্তা ঘোষণা করে মানবতাকে যেরূপ উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছে তা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে মানুষ মাত্রেই নিজেকে গৌরবান্বিত ও স্রষ্টার সার্থক সৃষ্টি না ভেবে পারে না। ইসলাম বলে, 'কাজের শাস্তি বা পুরস্কার মানুষের নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল।' ইসলামের দৃষ্টিতে বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান বা আন্তরিকতাশূন্য কাজের কোনোই মূল্য নেই।

প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিয়্যাত অনুসারেই কাজের ফলাফল পাবে। মানুষ কেবলমাত্র ঐ সমস্ত কাজের পুরস্কার পাবে, যার মধ্যে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভ ও মানুষের হিতসাধনের সদিচ্ছা রয়েছে। যে কাজে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্য নিহিত, ইসলামের দৃষ্টিতে সে কাজের কোনো মূল্য নেই।

সৎকাজে–যা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে করা হয়, তাতে দাতা, গ্রহীতার নিকট হতে কোনোরূপ প্রতিদান কিংবা কৃতজ্ঞতা লাভের আশা রাখে না। কুরআনের ভাষায় খাঁটি মুমিনের সংজ্ঞা হলো, 'যারা আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে, এবং বলে ঃ

www.amarboi.org

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا -(الدهر : ٩)

"কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।"
–(সূরা আদ দাহ্র ঃ ৯)

উপরোক্ত সংজ্ঞা দ্বারা মুমিনদের অন্তরে মানবতাবোধ জাগ্রত করাই আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য। ইসলাম মানুষকে আরো একটি মহান স্তরের দিকে আহ্বান করে, যার কথা দুনিয়ার যাবতীয় সভ্যতার কাছে প্রায় অবিদিত রয়ে গেছে। ইসলাম বলে, মনুষ্যজগত, জীবজগত, বস্তু ও জড়জগত তথা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অণু-পরমাণু আল্লাহ তাআলার দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা যেদিকে পরিচালনার ইচ্ছা করেন প্রতিটি বস্তু বিনা দ্বিধায় সেদিকেই চলতে শুরু করে। নামাযের প্রতিটি রাকআতে মুমিনরা যে সত্য—অতি সত্য কথাটি বারবার উচ্চারণ করে থাকে তাহলো, "একমাত্র আল্লাহ তাআলাই যাবতীয় প্রশংসা পাবার যোগ্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক, করুণাময়, পরম দয়ালু।"

অতি সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় কুরআন একথাটি ঘোষণা করতে চায় যে, মানুষ ঐ সৃষ্টিরই অংশ বিশেষ, যার স্রষ্টা মহান প্রভু আল্লাহ তাআলা। তিনি বিশ্বপালক ও পরম দয়ালু। কুরআন মুসলমানদের এটাও স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ পৃথিবী ক্ষণস্থায়ী। এখানে নিজের স্বার্থকে এত বড় করে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। মুসলমানরা মানবজাতির হিতসাধনে নিয়োজিত হয়ে আল্লাহ তাআলার মহৎ গুণ 'করুণাকে' দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করুক—এটাই আল্লাহ তাআলার একান্ত ইচ্ছা। আর আল্লাহ তাআলার যে অফুরন্ত নি'মাত ভোগ করছে তা থেকে মানব জাতিকে কখনো যেন বঞ্চিত না রাখে।

উপরের বর্ণনা থেকে বিবেকবান মাত্রেই আশা করি বুঝতে পেরেছেন, মানবতার প্রতি ইসলামী সভ্যতার কী গভীর আকর্ষণই না রয়েছে। এক কথায় বলতে গেলে, ইসলামী সভ্যতা হচ্ছে মানবতারই প্রতিচ্ছবি। এতদসত্ত্বেও কেউ কেউ এ ভ্রান্তমত পোষণ করতে পারেন যে, ইসলাম নিছক নীতি প্রচারের খাতিরেই মানবতার প্রতি এত দরদ দেখিয়েছে। বাস্তব ক্ষেত্রে যখন ইসলাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হলো এবং এর জয়ডঙ্কা বেজে উঠলো দিকে দিকে—তখন সে এ সমস্ত উদারনীতিকে কার্যকরী করেছিলো বলে তো মনে হয় না। ইসলামী সভ্যতার এ ঘোষণা জাতিসংঘের মানবাধিকার সনদের মতও তো হতে পারে। বিশ্বের প্রায় সব রাষ্ট্রই আজ অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে মানবাধিকার দিবস পালন করে থাকে, অথচ বছরের প্রতিটি মাসে, মাসের প্রতিটি দিনে এবং

www.amarboi.org

দিনের প্রতিটি ঘণ্টায়ই তারা জালিমের মত পদদলিত করে চলেছে মানবাধিকারের পবিত্র সনদকে।

এটাও তো হতে পারে যে, ইসলাম মানুষকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যেই মানবতার শ্লোগান তুলেছিল। এর মূলে কোনো আন্তরিকতা ছিল না, যেমন দুনিয়ার কোনো কোনো বৃহৎ শক্তি নিজ নিজ দেশে স্বাধীনতার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে দুনিয়াবাসীর সস্তা তারীফ কুড়াবার প্রয়াস পাচ্ছে, অথচ বহির্জগতে তারা নির্দ্বিধায় এমন সব কাজ করছে, যার সাথে অন্যের স্বাধীনতা রক্ষা তথা মানবতার দূর-দূরান্তের সম্পর্কও নেই। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতাকামী জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে পিষে মারার ক্ষেত্রে মানবতার ধ্বজাধারী ঐ কপটেরা আজ অগ্রদূতের ভূমিকাই পালন করছে।

কেবলমাত্র এতটুকুই নয়, বরং ইসলাম সম্পর্কে এ ধরনের আরো অনেক ভ্রান্ত ধারণাই অন্তরে স্থান পেতে পারে। কিন্তু যখন ইতিহাসের কষ্টিপাথরে মুসলমানদের অতীত কার্যাবলী যাঁচাই করা হবে তখন এ সমস্ত ভুল ধারণার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না। নিসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, ইসলামের কথা ও কাজের মধ্যকার সমন্বয় শুধু কথার কথা নয়, বরং প্রামাণিক ইতিহাসেরই বাস্তব ঘটনা। নিম্নে অতি সংক্ষেপে এ ধরনেরই কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা গেল।

॥ এক ॥

হযরত আবু যর (রাঃ) আরবের গিফার বংশের লোক ছিলেন। কোনো কারণবশত একদা তিনি হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কৃষ্ণকায় দাস (মুক্তিপ্রাপ্ত) হযরত বিলাল (রাঃ)-এর উপর কোনো কারণে চটে যান। উভয়ের মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি হয়। আবু যর (রাঃ) বেসামাল হয়ে পড়েন। বিলাল (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলে উঠেন, 'হে হাবশী মায়ের সন্তান।' উভয়েই হযরত রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবী। হযরত বিলাল (রাঃ) এ বিদ্রূপাত্মক সম্বোধন সহ্য করতে না পেরে, রাসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে আবু যরের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করেন। তখন তিনি (সাঃ) কি বললেন জানেন? তিনি আবু যর (রাঃ)-কে তৎক্ষণাৎই ডেকে পাঠিয়ে বললেন, আবু যর! তুমি তোমার ভাই বিলালের বংশের উপর কটাক্ষ করে তাকে লজ্জা দিলে? দেখছি, তোমার মধ্যে এখনো অসভ্যতার গন্ধ রয়ে গেছে। আবু যর (রাঃ) যিনি মনে করতেন, প্রবৃত্তির দাসত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার নামই অসভ্যতা এবং এর মধ্যে শুধুমাত্র যুবকরাই জড়িয়ে পড়তে পারে—প্রত্যুত্তরে বললেন, হুযূর, এ বৃদ্ধ বয়সেও কি আমার মধ্যে অসভ্যতার গন্ধ থাকতে পারে? রাসূলে করীম (সাঃ) বললেন,

www.amarboi.org

হ্যাঁ, তুমি বিলালের সাথে যে আচরণ করেছ তা অসভ্যতাই বটে, ইসলামের দৃষ্টিতে বিলাল তোমার আপন ভাই।

এতে আবু যর (রাঃ) অত্যন্ত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হন। তিনি বিলাল (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেন, ভাই! আমাকে এখনই ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দাও এবং তোমার পায়ের গোড়ালি দিয়ে আমার দেহে আঘাত করতে থাক।

॥ দুই ॥

বনি মাখযূম, কুরাইশ বংশেরই এক শাখা। বনী মাখযূমের একজন স্ত্রীলোক চুরিতে ধরা পড়ে। তাকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির করা হয়। কুরাইশ বংশের লোক এতে অপমান বোধ করে। তারা তৎক্ষণাৎই হযরত উসামা (রাঃ)-এর শরণাপন্ন হয় এবং সুপারিশের জন্য তাঁকে জড়িয়ে ধরে। হযরত উসামা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশ্বস্ত বন্ধু। তিনি সুপারিশ করলে হয়তো স্ত্রীলোকটি দণ্ডাদেশ থেকে অব্যাহতি পাবে। হযরত উসামা (রাঃ) সুপারিশ করলেনও। কিন্তু শেষ নবী (সাঃ) তখন কি বলেছিলেন ? তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ তাআলা স্বয়ং যে শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তাতেও কি তুমি সুপারিশ করার স্পর্ধা রাখ ? কী দুঃসাহস তোমার, উসামা !

অতপর সভা ডেকে তিনি (সাঃ) এ মর্মে ভাষণ দিলেন, "তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণ এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো বিত্তশালী কিংবা উচ্চপদস্থ লোক চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হতো তখন তাকে বেকসুর খালাস দেয়া হতো। আর কোনো সাধারণ লোক যখন ঐ অপরাধ করতো তখন সর্বসম্মতিক্রমে তার উপর দণ্ডাদেশ জারী করা হতো। আমি আল্লাহ তাআলাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আজ মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তাহলেও প্রাপ্য শাস্তি ভোগ না করে সে এক পা-ও এগোতে পারতো না। আমি দ্বিধাহীন চিত্তে তারও হস্ত কর্তনের আদেশ জারী করতাম।"

॥ তিন ॥

একদা হযরত সালমান ফারসী, সুহায়ব রুমী ও বিলাল হাবশী (রাঃ) আনসারী সাহাবীদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় কায়স বিন মুআভিয়া নামক জনৈক মুনাফিক সেখানে আসে। সে সাহাবীদের মধ্যে পরস্পর ভালোবাসা ও ভ্রাতৃসুলভ আচরণ প্রত্যক্ষ করে ঈর্ষায় জ্বলে ওঠে এবং মুনাফিকীর সুরে বলতে শুরু করে, আওস ও খাযরাজ গোত্র মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সাহায্যে এগিয়ে আসবে—এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা। কেননা এ গোত্রের যথেষ্ট শক্তি

www.amarboi.org

সামর্থ রয়েছে ; কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, এ অথর্ব লোকগুলো (সালমান, সুহায়িব, বিলাল) মুহাম্মদ (সাঃ)-এর কি কাজে আসবে ? হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) কায়েসের এ মানবতা বিরোধী উক্তিটি বরদাশত করতে পারলেন না। তৎক্ষণাৎই ঘাড় ধরে তাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, হুযুর ! এ মুনাফিক একথা বলেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এটা শুনে অত্যন্ত রাগান্বিত হন, গায়ের চাদর অর্ধ-পরিহিত অবস্থায় রেখেই তিনি মসজিদের দিকে পা বাড়ান। চলার সময় তাঁর চাদরের আঁচল মৃত্তিকা স্পর্শ করছিল। মসজিদে পৌঁছেই সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন ঃ বন্ধুগণ, তোমরা যখন একই প্রভুর দাস, একই পিতার বংশধর এবং একই দ্বীনের অনুসারী, তখন এই সমস্ত বর্ণ-বৈষম্য ও ভেদাভেদ সৃষ্টির মধ্যে কি কোনো সার্থকতা থাকতে পারে ?

॥ চার ॥

আদী বিন হাতিম তায়ী মুসলমান হওয়ার পূর্বে একবার মদীনায় এসেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোনো একটি যুদ্ধ হতে সবেমাত্র প্রত্যাবর্তন করেছেন। সাহাবীরা যুদ্ধের পোশাক পরিহিত অবস্থায় তখনও তাঁকে ঘিরে রয়েছে। এমন সময় আদী বিন হাতিম হুযুর (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হন। এ জংগী পরিবেশে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি সাহাবীদের ঐকান্তিক ভক্তি ও আন্তরিক শ্রদ্ধা দেখে তার মনে হলো, যেন তিনি কোনো মহাপরাক্রমশালী বাদশাহের দরবারে হাযির হয়েছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মদীনার একজন দরিদ্র বাঁদী হুযুরের খেদমতে হাযির হলো। নিবেদন করলো ঃ হুযুর, আমি একান্ত নিভৃতে কয়েকটি কথা আপনার গোচরীভূত করতে চাই।

তিনি সাথে সাথে বলে উঠলেন ঃ বহুত আচ্ছা, তুমি আমাকে মদীনার যে গলির দিকেই চলতে ইংগিত কর, তোমার কথা শুনবার জন্য আমি সেদিকেই চলতে রাজী আছি। এই বলে তিনি বাঁদীর অনুসরণ করলেন এবং অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে তার বক্তব্য শুনে স্বস্থানে ফিরে এলেন।

একদিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বীর সিপাহীদের ভক্তিভাজন সেনাপতি এবং অন্যদিকে একজন সামান্য বাঁদীর সরল ও সহানুভূতিশীল সঙ্গী হিসাবে দেখতে পেয়ে আদী বিন হাতিম যারপর নেই আশ্চর্যান্বিত হন। আখেরী নবীর এ মানবতাসুলভ আচরণ তাকে সেদিন এমনভাবে অভিভূত করে যে, পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে তার অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোনো অবকাশই ছিল না।

www.amarboi.org

॥ পাঁচ ॥

একুশ বছর পর্যন্ত অশেষ জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিজয়ী বেশে মক্কা নগরীতে প্রবেশ করলেন। যারা এতদিন তাঁর বিরুদ্ধাচারণ করেছিল, তাঁকে জন্মভূমি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল এবং তাঁর বিরুদ্ধে অনবরত যুদ্ধ পরিচালনা করেছিল—আজ তিনি ইচ্ছা করলে অনায়াসেই তাদের শায়েস্তা করতে পারেন। প্রতিশোধ গ্রহণ করার এটাই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, আখেরী নবী সেদিন প্রতিশোধ গ্রহণের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন অতীতের এ সমস্ত ঘটনা তাঁর অন্তরে মোটেই রেখাপাত করতে পারেনি। যে ইসলামী দাওয়াতকে কার্যকরী করার জন্য সুদীর্ঘ তেরটি বছর তিনি অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে মক্কায় প্রচার-অভিযান চালিয়েছিলেন এবং এ পথে তাঁকে যথেষ্ট দুর্ভোগও পোহাতে হয়েছিল—আজ পুনরায় তিনি সেই দাওয়াতেরই কাজ আরম্ভ করলেন। যে কুরাইশ বংশ পার্থিব প্রভাব ও বংশগত মর্যাদার উপর ভিত্তি করে নিজেদেরকে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠী বলে মনে করতো, তিনি তাদের সতর্ক করে বললেন ঃ হে কুরাইশ! আমি আজ তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার শেষ ফায়সালা শুনিয়ে দিচ্ছি। তোমরা তোমাদের অন্তর হতে সমস্ত অসভ্য আচরণ মুছে ফেল। বংশগত গর্বের যুগ চলে গেছে। আল্লাহ্ তাআলা এ সমস্ত মানবতাবিরোধী আচরণ মোটেই পছন্দ করেন না। গোটা মানবজাতি একই আদমের সন্তান। জেনে রেখ, আদমকে মাটি থেকেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর কাঁধে মুসলিম রাষ্ট্রের দায়িত্ব অর্পিত হয়। ইতিহাস বলে, তিনি এমন একজন আদর্শ রাষ্ট্রনেতা ছিলেন, যাঁর অন্তর ছিল মানবতার দরদে ভরপুর। তিনি ছিলেন যেন মানবতার মূর্তপ্রতীক। খেলাফতের গৌরবময় আসনের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে ঘরে ঘরে গিয়ে আশ্রয়হীন বালক-বালিকাদের বকরী দোহন করতে দেখা যেত। যে সমস্ত বালক-বালিকাদের পিতা জিহাদে শাহাদাত বরণ করেছিলেন, তাদের বকরী দোহনের ভার তিনি স্বেচ্ছায় আপন কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। মানবতার তাড়নায় এ ভার তিনি আজীবন বহনও করে গেছেন। এতে কোনোদিন তিনি এতটুকুও অবহেলা প্রদর্শন করেননি। এ ব্যাপারে কেউ কিছু বললে উত্তর দিতেন ঃ খলীফা হওয়ার পূর্বে যে কাজ নিয়মিত করে এসেছি, তা এখন ছাড়ি কি করে ?

হযরত উমর (রাঃ)-এর গৌরবময় কার্যকলাপ ঐতিহাসিক মাত্রেরই জানা আছে। তিনি ছিলেন একজন মানবতাবাদী ন্যায়নিষ্ঠ খলীফা। দেশের প্রত্যেকটি

www.amarboi.org

নাগরিককে তিনি অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখতেন। তিনি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দিতেন অকাতরে এবং জালিমকে দমন করতেন কঠোর হস্তে। জনসাধারণের ক্ষুধা নিবারণ করতে গিয়ে তিনি নিজে জনসাধারণের অবস্থা জানার চেষ্টা করতেন। যে রাতে জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি ওয়াকেফহাল হতে পারতেন না, সে রাতে তাঁর সুনিদ্রা হতো না। এ সম্বন্ধে এমন অনেকগুলো ঘটনারই উল্লেখ করা যায়, যা স্বর্ণপাতে খোদাই করে রাখার যোগ্য।

একদা উমর (রাঃ) একজন বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে বললেন, ভাই আপনি একী কাণ্ড করছেন ? বৃদ্ধ উত্তরে বললো, আর কী করি বলুন, বৃদ্ধ মানুষ, গায়ে তেমন জোর-শক্তি নেই। নিয়মিত খাটতে পারি না, এদিকে আবার 'জিযিয়া' দিতে হয়। তাই দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াই। যা পাই তা দিয়ে জিযিয়া প্রদান করি। কোনোমতে খাওয়া-পরাও চলে।

বৃদ্ধ লোকটি মদীনারই একজন ইয়াহূদী। হযরত উমর (রাঃ) তার উত্তর শুনে একেবারে থ' হয়ে গেলেন। বললেন, ভাই, আমি আপনার সাথে ন্যায়-বিচার করিনি। শক্তি ও সামর্থ থাকাকালীন আপনার নিকট হতে জিযিয়া আদায় করেছি এবং এ বৃদ্ধ বয়সেও আপনাকে দারুণ লাঞ্ছনার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি।

অতপর তিনি বৃদ্ধের হাত ধরে তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন। নিজের খাওয়ার জন্য যা কিছু রাখা ছিল তার সবটুকু তাকে খাওয়ালেন। অতপর বায়তুলমালের খাজাঞ্চীকে আদেশ দিলেন, এই ব্যক্তি এবং এর অনুরূপ প্রজাসাধারণের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ভাতা বরাদ্দ করে দাও, যাতে এদেরকে খাওয়া-পরার ব্যাপারে কখনো অন্যের দ্বারস্থ হতে না হয়।"

একদিন হযরত উমর (রাঃ) মদীনার গলি দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় একটি অতি ক্ষীণকায় অস্থি-চর্মসার বালিকা তাঁর চোখে পড়লো। হযরত উমর (রাঃ) আক্ষেপের সুরে বললেন, আহা ! এ ছোট মেয়েটি কার ? তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) নিবেদন করলেন, আমীরুল মুমিনীন ! আপনি চিনতে পারেননি ? এ যে আপনারই কন্যা। তিনি বললেন, এ আবার আমার কোন্ কন্যা ? আবদুল্লাহ উত্তর দিলেন, আপনারই ছেলে আবদুল্লাহর (অর্থাৎ আমার) কন্যা। আপনি আমাদেরকে বঞ্চিত করেন বলেই তো তার এ দূরবস্থা। উমর (রাঃ) বললেন, ব্যস ! খোদার কসম, অন্যান্য মুসলমানের অনুপাতে আমি তোমাদের জন্য যা বরাদ্দ করেছি, তা হতে এক কপর্দকও বেশী দিতে পারবো না। এটা তোমাদের জন্য যথেষ্ট হোক অথবা না হোক। আল্লাহ তাআলার কিতাব আমার এবং তোমাদের জন্য এ ফায়সালাই দিয়েছে।

www.amarboi.org

একবার একদল বণিক মদীনায় আগমন করে। তাদের সাথে বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক এবং শিশু-কিশোর ছিল। হযরত উমর (রাঃ) আবদুর রহমান বিন আউফ (রাঃ)-কে বললেন, তুমি কি আজ রাতে এদেরকে পাহারা দিতে পারবে? হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) তাতে সম্মত হন। অতপর উভয়ে এক সাথে সমস্ত রাত্রি পাহারা দেন এবং ফাঁকে ফাঁকে নফল নামাযও পড়তে থাকেন। হঠাৎ একটি শিশুর ক্রন্দনের আওয়াজ তাঁদের কর্ণগোচর হয়। হযরত উমর (রাঃ) দ্রুতবেগে সেদিকে ছুটে যান এবং শিশুটির মাকে সম্বোধন করে বলেন ঃ হে আল্লাহর দাসী! মহান প্রভুকে ভয় কর, শিশুটিকে কষ্ট দিও না, তাকে অমন করে কাঁদাচ্ছ কেন? এই বলে তিনি স্বস্থানে ফিরে আসেন। কিন্তু পর-মুহূর্তে আবার শিশুটির ক্রন্দনের সুর ভেসে আসে। তিনি আবার সেদিক যান এবং মাকে পুনরায় সতর্ক করে দিয়ে স্বস্থানে ফিরে আসেন। শেষ রাতে আবার ক্রন্দন শোনা যায়। হযরত উমর (রাঃ) ব্যস্ত হয়ে সেদিকে ছুটে যান। মাকে সম্বোধন করে বলেন, তোমার সর্বনাশ হোক, শিশুটি সমস্ত রাত কেঁদে কাটালো অথচ তুমি তার জন্য কিছুই করলে না।

পাহারাদার লোকটি যে স্বয়ং মুসলমানদের খলীফা মহান উমর–সে কথা ছিল স্ত্রীলোকটির ধারণারই অতীত। সে বিরক্তির সুরে হযরত উমর (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বললো, হে আল্লাহর বান্দা, তুমি আমাকে সারা রাতই অযথা জ্বালাতন করলে। আমি একে স্তন্যপান হতে বিরত রাখার চেষ্টা করছি। তাই সে বার বার কাঁদছে। হযরত উমর (রাঃ) বললেন, কেন?

সে উত্তর দিল, স্তন্যপান না ছাড়া পর্যন্ত খলীফা উমর শিশুর জন্য কোনো ভাতা বরাদ্দ করেন না। হযরত উমর (রাঃ) শিশুটির বয়স জিজ্ঞেস করলেন। স্ত্রীলোকটি উত্তর দিল, কয়েক মাস মাত্র। তিনি তখন বললেন, আল্লাহর বান্দী, এজন্য আর তোমাকে তাড়াহুড়া করতে হবে না।

তখন ফজরের সময় হয়ে গিয়েছিল। হযরত উমর (রাঃ) নামায পড়ার জন্য মসজিদে চলে যান। নামাযের মধ্যে কেঁদে কেঁদে তিনি এত অস্থির হয়ে পড়েন যে, তাঁর কিরাত (কুরআন পাঠ) মোটেই শোনা যাচ্ছিল না। সালাম ফিরিয়েই (নামায শেষ করেই) তিনি উচ্চস্বরে বলে উঠলেন, হতভাগা উমর, তুমি বড় নিষ্ঠুর। তুমি যে কত শিশুর সর্বনাশ করেছ, তা একবার ভেবে দেখেছ কি?

অতপর তিনি এই ঘোষণা সমগ্র রাষ্ট্রব্যাপী প্রচার করে দিলেন, "নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই শিশুকে স্তন্যপান হতে কেউ বঞ্চিত করো না। আমি শিশুদের জন্য তাদের জন্মগ্রহণের সাথে সাথেই ভাতা নির্ধারণ করে দেব।"

www.amarboi.org

এর চেয়ে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে? বিদেশী লোক সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজনসহ রাজধানীতে এলো। সাথে সাথে রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি আমিরুল মুমিনীন তাদের পাহারায় নিযুক্ত হলেন, আপনজনের মত তাদের সকল অভাব-অভিযোগ ও সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে গেলেন।

রাত্রি জাগরণ ও পাহারাদারীর জন্য তিনি এক ব্যক্তিকে আপন সংগী করে নিলেন বটে, কিন্তু কর্তব্য পালনে শুধুমাত্র তাকেই সজাগ-সতর্ক দেখা গেল। সংগীকে না ডেকে তিনি বার বার ক্রন্দনরত শিশুটির পানে ছুটে গেলেন। তার মাকে বার বার সতর্ক করলেন। আমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছেন যিনি এরূপ অপরিচিত একটি কাফেলার শিশুদের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে অনুরূপ সহানুভূতি দেখাতে পারবেন? আমরা তো কোন্ ছার? বিশ্ব-ইতিহাসও মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে উমর (রাঃ)-এর মত আর একটি ব্যক্তিত্ব তার অতীত, বর্তমান, এমন কি ভবিষ্যৎ অধ্যায়েও খুঁজে পাবে কি না সন্দেহ।

২. সালাম

মানুষ সামাজিক জীব। যে সমাজে স্নেহ-ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ-সম্প্রীতি যত বেশী, সে সমাজ তত সুন্দর, তত আশীর্বাদপুষ্ট। আদিকাল থেকেই মানুষ সুন্দর ও সুখী সমাজ গড়ে তোলার ব্যাপারে সদা-সচেষ্ট। কেননা এর উপরই মানব জাতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সুখ-শান্তি নির্ভরশীল।

একজন মানুষ কোনো না কোনো ব্যাপারে অপর মানুষের মুখাপেক্ষী। তাই সে অন্যের সাথে মিলিত হতে বাধ্য। আর মানুষের এ পরস্পর মিলন যত সুন্দর ও সৌহার্দপূর্ণ হয় তত সুন্দর ও সন্তোষজনক হয় তাদের পরমুখাপেক্ষিতার সমাধান। তাই দেখা যায়, বিশ্বের প্রত্যেকটি ধর্ম ও প্রত্যেকটি সমাজের লোক যখন পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তখন তারা তাদের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করার পূর্বে সংক্ষেপে এমন কোনো কথা বলে বা এমন কোনো ভাবভঙ্গী করে, যার দ্বারা সম্বোধনকারী-সম্বোধিতের মধ্যে ভক্তি ভালবাসার সম্বন্ধ গড়ে উঠতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, খ্রীস্টান সমাজে প্রচলিত রয়েছে পরস্পর মিলনের বিভিন্ন রীতি-পদ্ধতি। প্রথম রীতি হলো, যখন তারা পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তখন আপন আপন মাথার টুপি খুলে ফেলে, কিন্তু মুখে কোনো কথা বলে না। প্রধানতঃ ইংরেজ খ্রীস্টানদের মধ্যে এ রীতি প্রচলিত। দ্বিতীয় রীতি হলো, তারা একে অন্যকে লক্ষ্য করে হাত উঠায় এবং পরস্পর করমর্দন করে। এ

www.amarboi.org

রীতি শুধু ইংরেজদের মধ্যে নয় বরং বর্তমান বিশ্বের অন্যান্য জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেও কমবেশী প্রচলিত। তৃতীয় রীতি হলো, তারা একে অন্যকে লক্ষ্য করে 'গুড মর্নিং' (শুভ সকাল) 'গুড ইভিনিং' (শুভ সন্ধা), 'গুড নাইট' (শুভ রাত্রি) ইত্যাদি বলে। অর্থাৎ দিবা রাত্রির যে প্রহরে তারা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছে সে প্রহরটি যাতে শুভ হয় তারা সে কামনাই করে। শিখেরা যখন পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তখন বলে 'ওয়াহ্ গুরুজী'। সম্ভবত এ শব্দ দ্বারা ভগবানের কাছে বিজয় কামনা করা হয়।

সনাতনধর্মী প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজের রীতি হলো, সাক্ষাতকারী, সাক্ষাতদাতার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে কিংবা বলে 'রাম রাম' অথবা 'জয় হরি'। আর্য সমাজীরা—যারা নিজেদেরকে ধর্মীয় ব্যাপারে সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ বলে মনে করে এবং যারা যুগের চাহিদা মেটাতে গিয়ে হিন্দুধর্মের মধ্যে বেশ কিছু পরিবর্তনও এনেছে—যখন পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তখন যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে বলে 'নমস্তে' (বাংলায় নমস্কার)। এর অর্থ আমি তোমাকে সম্মান করি। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি ও ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে পরস্পর শুভেচ্ছা বিনিময়ের অন্য যেসব রীতি প্রচলিত রয়েছে তাও উপরে বর্ণিত কোনো না কোনো রীতিরই প্রায় অনুরূপ।

কিন্তু মুসলিম রীতি ও অন্যান্য রীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বিদ্যমান। তাই আমরা এখানে মুসলিম রীতি সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাব। প্রথমতঃ মুসলিমদের রীতি সামাজিক তথা মানব-তৈরী নয়, বরং নিখাদ ধর্মীয়। যখন এক মুসলিম অন্য মুসলিমের সাথে সাক্ষাত করে তখন পরস্পরকে বলে, 'আসসালামু আলাইকুম'—যার অর্থ, তোমার উপর বর্ষিত হোক সর্বাংগীন শান্তি ও মঙ্গল। মুসলিমদের মধ্যে আজকাল অন্য যেসব রীতির প্রচলন দেখা যায় (যেমন মাথা ঝুঁকানো, চুমো খাওয়া কিংবা 'আদাব আদাব', 'সালাম সালাম', 'হযরত সালামত' ইত্যাদি বলা) তা ধর্মীয় তথা ইসলাম-অনুমোদিত রীতি নয়।

ইসলামী রীতির সাথে অন্যান্য রীতির তুলনা করলে যে পার্থক্য পরিষ্কার নজরে পড়ে তাহলো, হিন্দুদের 'পায়ের উপর লুটিয়ে পড়া' আর আর্য সমাজীদের 'নমস্তে' বলার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য একই। আর তাহলো, সম্বোধিত ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন। এ কারণেই হিন্দু পণ্ডিতরা নিজেরা 'নমস্তে' দ্বারা সম্বোধিত হন এবং এটাকে নিজেদের প্রাপ্য বলেই মনে করেন, কিন্তু অন্যদেরকে 'নমস্তে' বলেন না বা বলা পছন্দও করেন না। শিখদের 'ওয়াহ গুরুজী' আর হিন্দুদের 'জয় হরি'-এর অর্থ প্রায় একই। এগুলো এমন ধরনের কথা, যা একজন লোক তার শত্রুকেও সম্বোধন করে বলতে পারে। মুখে বললো, 'জয় হরি' বা 'ভগবান

www.amarboi.org

জয় দিন' আর অন্তরে বললো, 'ভগবান আমাকে (ওর উপর) জয় দিন' তাহলে সঠিক অর্থেই বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। খ্রীস্টানদের 'গুড মর্নিং' শব্দগুলোও অনুরূপ দ্ব্যর্থবোধক হতে পারে। কার 'শুভ সকাল' কামনা করা হচ্ছে—সম্বোধনকারী, না সম্বোধিত ব্যক্তির—তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কারো পক্ষে জানা বা বুঝা সম্ভব নয়।

কিন্তু ইসলামী রীতির সম্ভাষণ বাক্য 'আস্‌সালামু আলাইকুম' মোটেই দ্ব্যর্থবোধক নয়। এতে সম্বোধিত ব্যক্তির জন্য শান্তি ও মঙ্গলের যে আকুতি, তা যেমন সর্বাংগীন তেমনি সর্বকালের জন্য। (সালাম অর্থ শান্তি। আসসালাম অর্থ সর্বাংগীন শান্তি। আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী 'আস্‌সালামু আলাইকুম' 'জুমলা ইসমিয়া'। আর জুমলা ইসমিয়া সর্বকালীন অর্থে ব্যবহৃত হয়।) অর্থাৎ সম্বোধনকারী পরিষ্কার ভাষায় সম্বোধিতের শান্তি ও মঙ্গল কামনা করে এবং তাকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়। তার জবাবে সম্বোধিত ব্যক্তি সম্বোধনকারীকে বলে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' অর্থাৎ তোমার উপরও সর্বাংগীন শান্তি ও মঙ্গল বর্ষিত হোক। এ পরস্পর বাক্য বিনিময়ের মাধ্যমে যেন তারা একে অপরের শুভাকাংখীতে পরিণত হয় এবং একে অন্যকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়। এখন যদি সম্বোধিত ব্যক্তি সম্বোধনকারীর কট্টর শত্রুও হয় এবং তারা 'আস্‌সালামু আলাইকুম'-এর অর্থ ও তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য রেখে পরস্পরের মধ্যে তা বিনিময় করে তাহলে তারা ক্রমে ক্রমে পরস্পরের বন্ধুতে যে পরিণত হবে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশই নেই। আর যে সমাজে অনুরূপ অবস্থা তথা পরিবেশ গড়ে উঠবে সে সমাজই তো আদর্শ মানব সমাজ।

ইসলাম যে শান্তির ধর্ম, সাম্যের ধর্ম—'আস্‌সালামু আলাইকুম'-এর মাধ্যমে পরস্পর সম্বোধন বা শুভেচ্ছা বিনিময় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। তাই কুরআন-হাদীসে সালাম করার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরস্পর সালাম বিনিময় এমনি একটি রীতি, যার সৌন্দর্য, ঔদার্য ও অনুপমতা অমুসলিম মনীষীরাও এক বাক্যে স্বীকার করেছেন।

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় গিয়ে পৌঁছেন তখন ইয়াহূদীদের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় নেতা আবদুল্লাহ্ বিন সালাম অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদেরকে সম্বোধন করে বলছিলেন, 'লোক সকল, সালাম ছড়িয়ে দাও, নিঃস্বদের খাবার দাও এবং রাতের বেলা যখন সকলে শুয়ে থাকে তখন উঠে নামায পড়।'

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ্ বিন সালাম বলেন, যখন আমি একথাগুলো শুনলাম তখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, যে মুখ দিয়ে একথাগুলো বের হচ্ছে সে মুখ কখনো মিথ্যা নুবুওয়াতের দাবী করতে পারে না। অতএব আমি মুসলমান হয়ে গেলাম।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা কখনো খাঁটি মুসলমান হবে না, যতক্ষণ না পরস্পর পরস্পরকে ভালবাস। (আর এ পরস্পর ভালবাসা সৃষ্টির মাধ্যম হলো, যখন তোমরা পরস্পরের সাথে মিলিত হও তখন 'আস্সালামু আলাইকুম' বলবে।) আল্লাহ্ তাআলা যখন হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন তখন তাকে বলেন, 'ঐ যে ফিরিশতারা বসে আছে, তুমি তাদেরকে 'আস্সালামু আলাইকুম' বল, অতপর দেখ তারা তোমাকে কি বলে উত্তর দেয়। তারা যে উত্তর দেবে তাই হবে তোমার বংশধরদের ঐ মুহূর্তের তুহফা (উপঢৌকন) যখন তারা পরস্পরের সাথে মিলিত হবে।' অতএব আদম (আঃ) ফিরিশতাদেরকে সম্বোধন করে বলেন, 'আস্সালামু আলাইকুম'। ফিরিশতারা উত্তরে বলে, 'আস্সালামু আলাইকা ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ' (তোমার উপর শান্তি ও মঙ্গল এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ বর্ষিত হোক)।'-(বুখারী)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ حَسِيبًا ○ (النساء : ٨٦)

"তোমাদেরকে যখন অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তা অপেক্ষা উত্তম প্রত্যাভিবাদন করবে অথবা তারই অনুরূপ করবে. আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৮৬)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা কোনো মজলিসে যাও তখন সালাম কর এবং যেখানে জায়গা পাও সেখানেই বসে পড়। আর যখন ফিরে আস তখনো সালাম কর। এটা মনে করো না যে, প্রথম সালামই যথেষ্ট। কেননা প্রথম সালাম দ্বারা দায়িত্ব পালন করা হয়, আর দ্বিতীয় সালাম দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।-(তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা পরস্পরের সাথে মিলিত হও তখন 'আসসালামু আলাইকুম' বল। যদি পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে পরক্ষণেই আবার মিলিত হও—চাই তোমাদের মধ্যে একটা দেয়ালই আড়াল হোক—

www.amarboi.org

তাহলে প্রথম সালাম নিয়ে সন্তুষ্ট থেকো না, বরং দ্বিতীয়বার সালাম কর।-(আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি 'আসসালামু আলাইকুম' বলে না, তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিও না।-(আহমদ, বায়হাকী)

একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ কর তখন 'আসসালামু আলাইকুম' বল। কেননা এ সালাম তোমাদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনের কল্যাণ ও বরকতের কারণ হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে ঘরে প্রবেশ করে আল্লাহ তাআলা সেই ঘরের আপোষকামিতা ও পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির ঘরে ঝগড়াঝাটি ও অশান্তির সৃষ্টি হয় না।-(তিরমিযী)

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সালামের উপর এতই গুরত্ব আরোপ করেছেন যে, তা মুসলমানদের একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-এর একটি ঘটনা বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) কোনো কাজ না থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই বাজারে চলে যেতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করে, এর পিছনে কি কারণ রয়েছে যে, আপনি কোনো কাজ ছাড়াই বাজারের মধ্যে ঘুরাঘুরি করেন? তিনি উত্তর দেন, আমি বাজারে ঘুরাঘুরি করি শুধু এজন্য যে, লোকদেরকে 'আস্সালামু আলাইকুম' বলবো। আর যদি কেউ আমাকে 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে তাহলে আমি তার জবাব দেব। আর এতে ভারী হবে আমার পুণ্যের পাল্লা।-(আবু দাউদ)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথমে সালাম দেয়া সুন্নাত, আর সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য)। সালাম করার সময় মুসাফাহা বা করমর্দন করাও সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মুসাফাহা দ্বারা সালাম পরিপূর্ণতা লাভ করে।-(তিরমিযী)

তিনি (সাঃ) আরো বলেন, যখন দু'জন মুসলমান পরস্পরের সাথে মুসাফাহা করে তখন একজনের হাত থেকে অপরজনের হাত ছাড়া পাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়ের গুনাহ মাফ করে দেন।-(আহমদ, তিরমিযী)

সালাম দেয়ার সময় মাথা ঝুঁকানো উচিত নয়। যদি কোনো ব্যক্তি দূর-দূরান্ত থেকে আসে বা দীর্ঘদিন পর কারো সাথে দেখা হয় তাহলে সালাম,

www.amarboi.org

মুসাফাহা ছাড়াও তার সাথে 'মুআনাকা' (গলাগলি) করা যেতে পারে। গায়র-মাহ্রাম পুরুষও যদি বিশুদ্ধ নিয়্যাতে কোনো স্ত্রীলোককে সালাম করে বা অন্যের মাধ্যমে তার কাছে সালাম পৌছায় তাহলে তা বৈধ। চিঠির প্রারম্ভে 'আস্সালামু আলাইকুম' লেখা সুন্নাত। যদি দুই দল পরস্পরের সাথে মিলিত হয় তাহলে ক্ষুদ্র দল বৃহৎ দলকে সালাম করবে। অনুরূপভাবে ছোট বড়কে, আরোহী পদাতিককে এবং চলন্ত ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম করবে। অবশ্য এর বিপরীত করাও বৈধ। স্ত্রীলোকেরাও যখন পরস্পরের সাথে মিলিত হবে তখন একে অপরকে 'আস্সালামু আলাইকুম' বলবে।

মোটকথা, একে অপরকে 'আস্সালামু আলাইকুম' বলা এমন একটি রীতি, যা বন্ধুর বন্ধুত্বকে কেবল গাঢ় করে না, শত্রুর শত্রুতাকেও বিনষ্ট করে দেয় এবং কঠিন শত্রুও একদিন অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে পরিণত হয়। আর একমাত্র ভাগ্যবান লোকেরাই এ গুণের অধিকারী হতে পারেন। প্রসংগক্রমে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন ঃ

وَلَا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِىْ بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ ○ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَا
اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○ (حم السجدة : ٣٤-٣٥)

"ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল, এ গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান।"

–(সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ঃ ৩৪-৩৫)

অনেক ভাল ব্যবহার ও আচার-আচরণ আছে যার দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করা যেতে পারে। কিন্তু সালামের চেয়ে ভাল, নিরাপদ ও নি-খরচা আচরণ আর দ্বিতীয়টি নেই।

৩. ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধ

সমাজ জীবনে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে 'ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধ'-এর গুরুত্ব অপরিসীম।

কুরআনের মতে, পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল ও পুণ্যবান লোকের আবির্ভাব হয়েছে তাঁরা সকলেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের সংগ্রামে অগ্রদূতের

www.amarboi.org

ভূমিকা পালন করেছেন ; কোনো বিপদ-বাধাই তাঁদেরকে এ পথ থেকে রুখে রাখতে পারেনি। তাঁরা নিজেরা অত্যন্ত ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে যেমন এ দায়িত্ব পালন করেছেন তেমনি এটাকে যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে জারী রাখার জন্য আপন সন্তান-সন্ততিকেও বিশেষভাবে উপদেশ দিয়ে গেছেন। কুরআন বলে ঃ

يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ أَصَابَكَ ط

إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ ○ (لقمن : ١٧)

"(হযরত লুকমান তার পুত্রকে উপদেশ দিলেন) হে বৎস, নামায কায়েম কর, সৎকর্মের নির্দেশ দাও, অসৎ কর্ম হতে বারণ করো এবং তোমার প্রতি যাই ঘটুক না কেন, তাতে ধৈর্যধারণ করো ; নিশ্চয় এটা অতি দৃঢ়তার কাজ।"-(সূরা লুকমান ঃ ১৭)

যারা কাফির ও অবিশ্বাসী তারা তাদের অবাধ্যতা ও সীমালঙ্ঘনের কারণে আল্লাহ্ ও তার রাসূলগণ কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছে। আর তাদের অভিশপ্ত হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো, তাদের সমাজে যেসব অন্যায় ও গর্হিত কাজ হতো তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করতো না।

মুনাফিক বা কপট বিশ্বাসীরা তো ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের ক্ষেত্রে শুধু অনীহাই প্রদর্শন করে না, বরং উলটো অসৎকর্মেরই নির্দেশ দেয় এবং সৎকর্ম হতে বারণ করে। আর প্রধানত এ অসামাজিক ও অমানবিক কার্যের দরুন তারা বঞ্চিত হয় আল্লাহর রহমত এবং করুণা থেকে।

আর যারা মুমিন বা বিশ্বাসী তাদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, তারা সৎকর্মের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকর্ম হতে বারণ করে। এক্ষেত্রে তারা পরস্পরের বন্ধুরূপে কাজ করে—ব্যক্তিগত, দলগত উভয় পর্যায়ে এবং পরিণামে অধিকারী হয় আল্লাহর অসীম কৃপা ও অফুরন্ত নি'মাতের।

প্রকৃতপক্ষে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ মানুষ মাত্রেরই যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক দায়িত্ব তা একমাত্র মুমিনরাই সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করতে পারেন এবং তারা পার্থিব ক্ষমতার অধিকারী হোন অথবা নাই হোন, এ দায়িত্ব পালনের কথা কখনো বিস্মৃত হন না। কুরআন বলে ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ إِسْرَآئِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ط

ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ○ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ط

لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ○ (المائدة : ٧٩-٧٨)

www.amarboi.org

"বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম-তনয় (ঈসা) কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল—এটা এজন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যে সব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে একে অন্যকে বারণ করতো না। তারা যা করতো নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট।
-(সূরা আল মায়েদা ঃ ৭৮-৭৯)

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ م يَأْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ط نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ط اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ (التوبة : ٦٧)

"মুনাফিক নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ। তারা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয়, সৎকর্ম থেকে বারণ করে এবং নিজেদের হাত বন্ধ রাখে দান থেকে। তারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে তিনিও তাদের বিস্মৃত হয়েছেন। মুনাফিকরা তো সত্যত্যাগী।"-(সূরা আত তাওবা ঃ ৬৭)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ م يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ۝ (التوبة : ٧١)

"বিশ্বাসী নরনারী একে অপরের বন্ধু তারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ্ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে ; আল্লাহ্ এসব লোকদের কৃপা করবেন, তিনি (আল্লাহ) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।-(সূরা তাওবা ঃ ৭১)

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ط وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ۝ (الحج : ٤١)

"তারা (বিশ্বাসীরা) এরূপ লোক যে, যদি আমি তাদেরকে দুনিয়াতে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকর্মের আদেশ দেবে এবং অসৎকর্ম হতে বারণ করবে এবং সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহরই ইখতিয়ারে।"-(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৪১)

কুরআন ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, যারা কুরআনের সত্যিকার অনুসারী তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হবে

www.amarboi.org

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন। আর যারা এ দুটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় তারাই প্রকৃতপক্ষে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করতে পারে। তারাই শ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠী—মানুষের মঙ্গলের জন্যই তাদের আবির্ভাব। কুরআন বলে ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ـ (ال عمران : ١١٠)

"তোমরাই (কুরআনের সত্যিকার অনুসারীরাই) শ্রেষ্ঠ দল, মানব জাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করো এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখ।"

—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

৪. শান্তি-শৃঙ্খলা

বিশ্বে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং তা অক্ষুণ্ন রাখার উপর কুরআন অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআন মানবজাতিকে শান্তির পথ অনুসরণ ও অশান্তির পথ পরিহার করতে বলেছে এবং বার বার সাবধান করে দিয়েছে অশান্তি সৃষ্টির অশুভ পরিণাম সম্পর্কে।

বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টি হয় নানা কারণে। তবে মূল কারণ হলো, আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস এবং তার আদেশ-নির্দেশ পালনে অনীহা। মানুষ যদি আল্লাহ তাআলাকে সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করে, তার আদেশ-নির্দেশ পালন করে এবং তিনি মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের প্রতি যেরূপ সম্পর্ক রাখার আদেশ দিয়েছেন সেরূপ সম্পর্ক রাখে এবং যেরূপ আচরণ করার আদেশ দিয়েছেন সেরূপ আচরণ করে তাহলে বিশ্বে কোনো অশান্তি কিংবা বিশৃঙ্খলা থাকে না—থাকে না জুলুম, অত্যাচার, প্রতারণা, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি দুষ্কর্মের মাধ্যমে একে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের অপচেষ্টা। আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের অর্থই হলো তাঁকে একমাত্র প্রভু এবং উপাস্য বলে স্বীকার করা এবং তাঁরই প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী বিশ্বে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করা।

উপরোক্ত কারণেই কুরআন সর্বপ্রথম এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর আরাধনা এবং তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। অতপর দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার

www.amarboi.org

জন্য মানব জাতিকে সাবধান করে দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দুনিয়ায় যত নবী-রাসূল এসেছেন তাঁরা সকলেই এ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। কুরআন বলে ঃ

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ط قَالَ يَٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ط قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ط ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ○ (الاعراف : ٨٥)

"আর আমি মাদইয়ানবাসীদের কাছে তাদের ভাই শুআইবকে পাঠিয়েছিলাম। সে বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহর আরাধনা কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে, সুতরাং তোমরা মাপ-ওজন ঠিকভাবে দেবে, লোকদেরকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দেবে না এবং দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।"-(সূরা আল আরাফ ঃ ৮৫)

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ط إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ○ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ط إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ○ (الاعراف : ٥٥ـ٥٦)

"তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাক। তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর বিপর্যয় ঘটাবে না, তাঁকে ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।"-(সূরা আল আরাফ ঃ ৫৫-৫৬)

আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের সাথে সাথে মুমিন বা বিশ্বাসী ব্যক্তি, আল্লাহর সমীপে বিশ্বে শান্তি স্থাপনেরও অঙ্গীকার প্রদান করে। যারা দৃঢ়তার সাথে এ অঙ্গীকার রক্ষা করে তাদের মানব জীবন সফল, তারা শুভ পরিণামের অধিকারী। আর যারা এ অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ্ মানুষ ও অন্যান্য জীব-জন্তুর প্রতি যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ দিয়েছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য রয়েছে অভিশাপ আর দুর্গতি।

যাদের বিশ্বাসে কপটতা রয়েছে তাদের পরিণামও অত্যন্ত অশুভ। ওরা মুখে মুখে আল্লাহকে সাক্ষী রেখে সুন্দর সুন্দর নীতিকথা আওড়ালেও আসলে

www.amarboi.org

পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করে বেড়ায় এবং আল্লাহকে ভয় না করে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত হয়। কুরআন বলে,

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۝ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۝ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۝ (الرعد : ٢٠-٢٢)

"যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না, আল্লাহ্ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে, যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য কষ্ট বরণ করে, নামায কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দের মুকাবালা করে তাদের জন্য শুভ পরিণাম।"–(সূরা আর রাদ ঃ ২০-২২)

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ ۙ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝

"যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য আছে অভিশাপ এবং মন্দ আবাস।"–(সূরা আর রাদ ঃ ২৫)

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ ۙ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۝ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝ (البقرة : ٢٠٤-٢٠٥)

"এবং এমন কতক লোক আছে—যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, কিন্তু আসলে সে তোমার ঘোর বিরোধী। যখন সে

www.amarboi.org

তোমার কাছ থেকে চলে যায় তখন পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে ; কিন্তু আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। যখন তাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর' তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। অতএব জাহান্নামই তার যোগ্য স্থান। নিশ্চয় ওটা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।−(সূরা বাকারা ঃ ২০৪-২০৬)

যারা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে তারা প্রকৃতপক্ষে অমান্য করে আল্লাহ ও তার রাসূল প্রদত্ত জীবনব্যবস্থাকে। তাদের আচরণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই শামিল। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়, কুরআন তাদের শাস্তি নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছে ঃ

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ط ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝

"তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা এবং পরকালে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।"−(সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৩)

৫. আমানত প্রত্যর্পণ

ইসলামের দৃষ্টিতে আমানত একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এমন প্রত্যেকটি জিনিসকেই আমানত বলা হয় যার সাথে কারো না কারো হক সম্পৃক্ত রয়েছে এবং সে হক প্রত্যর্পণ করা অত্যন্ত জরুরী। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ـ (النساء : ٥٨)

"আমানতসমূহ তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করার জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।"−(সূরা আন নিসা ঃ ৫৮)

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমানত প্রত্যর্পণ করে না তার ঈমান পরিপূর্ণ নয় এবং যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার দ্বীন পরিপূর্ণ নয়।

www.amarboi.org

আমানতের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সম্পত্তি, সন্তান, পদ, পদবী, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা—এসবই এক একটি আমানত। মানুষের প্রাণ, মানুষের সুন্দর ও বলিষ্ঠ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তার ইন্দ্রিয়সমূহও এক একটি আমানত। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে এ সমস্ত আমানতের অধিকারী করেছেন ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই এগুলোকে ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় এটা 'আমানতের খিয়ানত' বলে গণ্য হবে এবং পরিণামে মহান দাতা আল্লাহ তাআলার কাছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জবাবদিহি করতে হবে। এ কারণেই ইসলাম আত্মহত্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ج ـ(البقرة : ١٩٥)

"তোমরা নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৫)

আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেই নিজেকে হত্যা করবে সে কিয়ামতের পরও অনুরূপভাবে নিজেই নিজেকে হত্যা করতে থাকবে। কোনো ব্যক্তি যদি নিজেই নিজেকে ধারালো ছুরি দ্বারা হত্যা করে ফেলে তাহলে কিয়ামতের পরও সে অনুরূপভাবে সর্বক্ষণ নিজেই নিজেকে হত্যা করতে থাকবে। কারণ, মানুষের প্রাণ তার কাছে আল্লাহ তাআলার আমানত ছাড়া কিছু নয়। অতএব এটাকে ধ্বংস করার বা এর অপব্যয় করার কোনো অধিকার মানুষের নেই। বরং আল্লাহর এ দানের মধ্যে যার যে হক বা অধিকার রয়েছে তা যথাযথভাবে তাদের কাছে প্রত্যর্পণ করাই মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব। অনুরূপভাবে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক, সন্তান, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ইত্যাদিও এক একটি আমানত ছাড়া কিছু নয়।

অনুরূপভাবে বিদ্যাও একটি আমানত। এটা দানের সাথে যিনি সংশ্লিষ্ট—অর্থাৎ যিনি শিক্ষক তার প্রত্যেকটি ছাত্র তার কাছে এক একটি আমানত। ছাত্রদের প্রতিভাও শিক্ষকের কাছে একটি আমানত। ছাত্রদের সময়ও তার কাছে একটি আমানত। অতএব শিক্ষক যদি ছাত্রদের শিক্ষা-দীক্ষার সঠিক ব্যবস্থা না করেন, তাদের প্রতিভা এবং তাদের সময়কে যথাযথভাবে কাজে না লাগান তাহলে আল্লাহ তাআলার কাছে তাকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় পদ-পদবী তথা নেতৃত্ব, কর্তৃত্বও একটি বিরাট আমানত। যার হাতে আল্লাহ তাআলা এ আমানত অর্পণ করেছেন তাকে যেন তিনি আপন বান্দাদের প্রতিপালনের জন্য এ দুনিয়ায় নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে আল্লাহর বান্দাদের

www.amarboi.org

প্রতিপালনের যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করে না তাকে তো এজন্য আখিরাতে জবাবদিহি করতেই হবে—বরং প্রায় ক্ষেত্রে দেখা গেছে এবং বিশ্ব-ইতিহাসও সাক্ষ্য দেয় যে, এ দুনিয়ায়ও তাকে চরম লাঞ্ছনার শিকারে পরিণত হতে হয়েছে। সম্ভবত এর কারণ এই যে, এটি হচ্ছে মানুষকে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার এমন একটি বিরাট আমানত যার উপর আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ 'প্রতিপালন' তথা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল নির্ভর করে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতারূপী আমানতের সদ্ব্যবহার কিভাবে করতে হবে তার স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা রয়েছে আল্লাহর কিতাবে ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতে। আর তার বাস্তব উদাহরণ রয়েছে খুলাফা-ই-রাশেদীনের জীবনে। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) এ আমানত প্রত্যর্পণে কিরূপ আন্তরিক ছিলেন তা একটি মাত্র ঘটনা থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায়। তিনি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, আমার কাছে একটি হাবশী দাস, একটি উট ও একটি চাদর রয়েছে। এগুলো হচ্ছে বায়তুলমালের আমানত। অতএব আমার মৃত্যুর পর তোমরা এগুলো বায়তুলমালে প্রত্যর্পণ করবে।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারূক (রাঃ) তো এ আমানত যথাযথভাবে পালন করতে গিয়ে মদীনার এক বিকলাঙ্গ বৃদ্ধার পানি রাতের বেলা নিজেই কূয়া থেকে উঠিয়ে দিতেন এবং তার আটার বস্তাও আপন পিঠে করে তার ঘরে পৌঁছিয়ে দিতেন। রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার কারণেই মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য রাতভর মদীনার অলি-গলিতে তাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত।

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট থেকে জনৈক ইয়াহূদী একটি বর্ম নিয়েছিল। কিন্তু সে এর মূল্য পরিশোধ করেনি, এমন কি শেষ পর্যন্ত দাবী করে বসে যে, এটা তারই বর্ম। শেষ পর্যন্ত হযরত আলী (রাঃ) তাঁরই নিযুক্ত বিচারক হযরত শুরায়হ (রাঃ)-এর আদালতে ইয়াহূদীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। অভিযুক্ত ও অভিযোগকারী আদালতে হাযির হলে বিচারক হযরত আলী (রাঃ)-কে তার পক্ষে সাক্ষী পেশ করতে বলেন। তখন তিনি আপন দাসকে সাক্ষী হিসেবে পেশ করলে হযরত শুরায়হ (রাঃ) তার সাক্ষ্য গ্রহণ করেননি এ যুক্তিতে যে, ইসলামী শরীআতে আপন পুত্র ও আপন দাসের সাক্ষী গ্রহণীয় নয়। অগত্যা হযরত আলী (রাঃ) বিচারকের সে রায়ই নত মস্তকে মেনে নেন। কিন্তু আদালত থেকে বেরিয়ে আসার সাথে সাথে ইয়াহূদী, হযরত আলী (রাঃ)-এর কাছে বর্মটি প্রত্যর্পণ করে এবং ইসলামের এ ন্যায় বিচার এবং ন্যায়-বিচারের সামনে রাষ্ট্রনায়কের এ আত্মসমর্পণ প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধচিত্তে ইসলাম গ্রহণ করে।

www.amarboi.org

আল্লাহর দ্বীন ইসলাম হচ্ছে মানুষকে প্রদত্ত আল্লাহ তাআলার একটি আমানত এবং সবচেয়ে বড় আমানত। সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর সাহাবা কিরাম, অতপর পরবর্তী ওলামা কিরামের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার এ বিরাট আমানতটি আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। এ আমানতের বাহক বলেই আমরা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি। এ আমানতের সদ্ব্যবহার করলে বিশ্বে যে সত্যিকার শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্ব ইতিহাস তার সাক্ষী। এমতাবস্থায় আমরা যদি এ আমানতের সদ্ব্যবহার না করি তাহলে যেমন আমাদের নিজেদের জীবনেও শান্তি-মঙ্গল আসবে না তেমনি সমগ্র বিশ্ববাসীও চিরদিন অশান্তিতে ভুগতে থাকবে এবং এজন্য আমাদেরকেই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

৬. সৎকর্মে প্রতিযোগিতা

মানুষের মনে সৎকর্ম সম্পাদনের উৎসাহ-উদ্দীপনা বা প্রবৃত্তির সঞ্চার সব সময় হয় না। অতএব যখনই সৎকর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা জাগে তখন সংগে সংগে সে ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করতে হয়। যখনই সৎকর্ম সম্পাদনের সুযোগ আসে সাথে সাথে সে সুযোগ কাজে লাগাতে হয়। এতে কোনোরূপ টালবাহানা করা উচিত নয়। কেননা আমাদের জীবনকাল খুবই সংক্ষিপ্ত। এ সংক্ষিপ্ত জীবনকালের মধ্যেই আমাদের অনেক কিছু করতে হবে। অতএব যখনই যে সৎকাজ সামনে আসবে তখনই তা করে ফেলা উচিত। আজকের কাজ আজকের মধ্যেই করতে হবে। 'কাল' যখন আসবে তখন সে সাথে করে তার কাজও নিয়ে আসবে। অতএব, সাধারণভাবে আজকের কাজ আগামীকাল সম্পাদন করার সুযোগ তেমন একটা থাকে না।

তাছাড়া শয়তান মানুষের পেছনে লেগে আছে। সে সবসময় তাকে সৎকাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে। মুমিন, কাফির সকলের সাথেই শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। তবে কোনো পুণ্য কাজ সম্পর্কে শয়তান মুমিনকে একথা বলে না যে, এটা খারাপ কাজ, অতএব তুমি এটা করো না। কেননা শয়তান জানে, অনুরূপ কথায় মুমিন কখনো বিভ্রান্ত হবে না। তাই সে মুমিনের মনে এ প্রবৃত্তির সঞ্চার করে যে, এ সৎকাজটি করা ভাল এবং করা উচিতও। তবে আজ নয় বরং কাল থেকে কাজটি শুরু করো। কিন্তু এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে যে, যখন 'কাল' আসে তখন এমনি পরিবেশ-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, এ কাজটি শুরু করা তার পক্ষে আর সম্ভব হয় না। অতপর দেখা যায়, তার আয়ুষ্কাল শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ঐ সৎকাজটি সম্পাদন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

www.amarboi.org

কাফির তার জীবনকালের মূল্যায়ন যেভাবেই করুক-কিন্তু মুমিনের কাছে তার জীবনকালের মূল্যায়ন এই যে, এটা হচ্ছে আখিরাত তথা পরকালের একটি কর্মক্ষেত্র। মানুষের আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হলেও এর মধ্যেই তাকে যাবতীয় ঐ সব দায়িত্ব পালন করতে হয় যার মাধ্যমে সে আল্লাহর ক্ষমা, জান্নাত তথা ইহকাল-পরকালের প্রকৃত শান্তি ও মঙ্গলের অধিকারী হবে। অতএব কোনো সৎকর্ম সম্পাদনে একজন মুমিন কখনো অলস হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সে সবসময় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। আর এটাই হচ্ছে মুমিনের প্রতি তার প্রভুর নির্দেশ। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط-(البقرة : ١٤٨)

"তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৮)

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ لا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ○ (ال عمران : ١٣٣)

"তোমরা ধাবমান হও আপন প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৩)

অর্থাৎ যখনই তোমাদের হাতে সৎকর্ম সম্পাদনের সুযোগ আসে অথবা তোমাদের মনে সৎকর্ম সম্পাদনের উৎসাহ-উদ্দীপনা বা প্রবৃত্তির সঞ্চার হয় তখন প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে সে কাজে আত্মনিয়োগ করো। কেননা এমনও হতে পারে যে, এই সৎকর্ম সম্পাদনের সুযোগ তুমি জীবনে আর কখনো পাবে না। কিংবা তোমার মনে এখন তা সম্পাদনের যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বা প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়েছে, নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে পড়ে তুমি তা চিরদিনের জন্য বিস্মৃত হয়ে যাবে।

ইসলামের স্বর্ণযুগে সৎকর্মে প্রতিযোগিতার যে সমস্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তার অনেকগুলোই সৎকর্মশীলদের কাছে চির স্মরণীয় ও চির অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ তাবুক অভিযানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এমন একটি মুহূর্তে তাবুক অভিযানের ঘোষণা প্রদান করা হয় যখন ছিল ভরা গ্রীষ্ম মওসুম। গরমে মাটি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। আকাশ যেন বর্ষণ করছিল অগ্নিশিখা। পথের দৈর্ঘ দু' দশ কিলোমিটার নয় বরং ছিল কম সে কম বারো শ কিলোমিটার। অপরদিকে এটা ছিল খেজুর পাকার ভরা মওসুম। গাছে গাছে খেজুর পেকে উঠেছিল। ঠিক সময়ে গাছ থেকে এই খেজুর তুলতে না পারলে

www.amarboi.org

সারা বছরের খোরাকী হারিয়ে মদীনাবাসীদের দারুণ কষ্টে নিপতিত হবার আশংকা ছিল। উপরোক্ত অবস্থার প্রেক্ষিতে তাবুক অভিযান ছিল মুসলমানদের জন্য এক কঠোর অগ্নি পরীক্ষা তুল্য। কিন্তু সে অগ্নি পরীক্ষায় তারা শুধু উত্তীর্ণই হননি, বরং সৎকর্মে প্রতিযোগিতার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কঠোর অভিযানে উদার হস্তে দান করার জন্য যখন মুসলমানদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান তখন তাদের মধ্যে এক দারুণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। হযরত উসমান (রাঃ) একাই সমগ্র মুসলিম বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ সৈন্যের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন, হযরত উমর (রাঃ) তার যাবতীয় সম্পদের অর্ধেক অংশ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে তুলে দেন, আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আল্লাহর নামে উৎসর্গ করেন তার ঘরের সমুদয় মালামাল। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, ঘরে কি রেখে এসেছ? তখন তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলকে রেখে এসেছি।

এ ছিল স্বর্ণযুগের মুসলমানদের সৎকর্মে প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত। অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন বলেই তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

৭. সদাচরণ

সদাশয়তা, সদ্ব্যবহার, পরোপকার ইত্যাদি গুণাবলী সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত। সদাচরণের মাধ্যমে অতি সহজেই শত্রুকে মিত্র এবং পরকে আপন করে নেয়া যায়। সদাচরণ মানুষের সামাজিক পরিবেশকে সুস্থ, সুন্দর ও উপভোগ্য করে তোলে। তাই অতি সঙ্গত কারণেই কুরআন সদাচরণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তার উপাসনার সাথে সাথে সদাচরণেরও নির্দেশ দিয়েছেন ; সদ্ব্যবহারের অঙ্গীকার নিয়েছেন তার নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সকল উম্মতের কাছ থেকে।

কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সম্মান এবং মর্যাদার অধিকারী হতে হলে মানুষের প্রতি সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে, যারা সদ্ব্যবহার, সদালাপ প্রভৃতি গুণাবলী থেকে বঞ্চিত, পার্থিব জীবনে রয়েছে তাদের জন্য শুধু দীনতা আর হীনতা এবং শেষ বিচারের দিন নিক্ষিপ্ত হবে তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে। কুরআন বলে ঃ

www.amarboi.org

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ لا وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًاo

"তোমরা আল্লাহর উপাসনা করবে ও কোনো কিছুকে তার শরীক করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সংগী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসদাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। যে দাম্ভিক, আত্মগর্বী, আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন না।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৩৬)

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاۤئِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ج يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَo(النحل : ٩٠)

"আল্লাহ্ ন্যায়পরায়নতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন থেকে। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"-(নাহল ঃ ৯০)

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِيْۤ اِسْرَآئِيْلَ لَا تَعْبُدُوْنَ اِلَّا اللّٰهَ قف وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ط ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَoوَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُوْنَ دِمَاۤءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُوْنَ اَنْفُسَكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ اَقْرَرْتُمْ وَاَنْتُمْ تَشْهَدُوْنَoثُمَّ اَنْتُمْ هٰۤؤُلَآءِ تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُوْنَ فَرِيْقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ ز تَظٰهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ط وَاِنْ يَّاْتُوْكُمْ اُسٰرٰى تُفٰدُوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ ط اَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتٰبِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ ج فَمَا جَزَآءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذٰلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰۤى اَشَدِّ الْعَذَابِ ط وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَo(البقرة : ٨٣ـ٨٥)

www.amarboi.org

"স্মরণ কর, যখন ইসরাঈল-সন্তানদের অংগীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না। মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের প্রতি সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে ; কিন্তু স্বল্পসংখ্যক লোক ছাড়া তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে। যখন তোমাদের অংগীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং আপনজনকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করবে না, অতপর তোমরা এটা স্বীকার করেছিলে, আর এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী। তোমরাই তারা যারা অতপর একে অন্যকে হত্যা করছ এবং তোমাদের এক দলকে স্বদেশ হতে বহিষ্কার করছ, তোমরা নিজেরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করছ এবং তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয় তখন তোমরা মুক্তিপণ দাও ; অথচ তাদের বহিষ্কারই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর ? তোমাদের যারা এরূপ করে তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং শেষ বিচারের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ৮৩-৮৫)

প্রত্যেকটি কাজেরই একটা না একটা প্রতিক্রিয়া আছে। আর এ প্রতিক্রিয়া শুভ, অশুভ উভয়ই হতে পারে। কিন্তু সদাচরণ এমন একটি কাজ যার প্রতিক্রিয়া কখনো অশুভ হয় না। উত্তম পুরস্কার ছাড়া সদাচরণের কোনো প্রতিদানই নেই। কুরআন বলে ঃ

هَلْ جَزَاءُ الْاِحْسَانِ اِلاَّ الْاِحْسَانُ ۝ (الرحمن : ٦٠)

"সৎকাজ ও সদাচরণের জন্য উত্তম পুরস্কার ছাড়া কি হতে পারে ?"
-(সূরা আর-রহমান ঃ ৬০)

আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে তার উপাসনা করার সাথে সাথে সর্বশ্রেণীর মানুষের প্রতিও সদ্ব্যবহার করতে হবে। কারো কোনো উপকার করে বা কাউকে কিছু দান করে প্রতিদান চাওয়া বা কোনো না কোনোভাবে তাকে কষ্ট দেয়া সদাচরণ বিরোধী কাজ। অনুরূপ আচরণ, দাতার দানকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল করে দেয়। যারা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে দান করে একমাত্র তাদের জন্যই রয়েছে পরম পুরস্কার। তারাই অধিকারী হবে আল্লাহর অফুরন্ত নি'মাতের ইহকাল, পরকাল সর্বকালে। কুরআনে এ সম্পর্কে যে সুন্দর উপমাটি তুলে ধরা হয়েছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যেমন ঃ

www.amarboi.org

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ لَايَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ۢ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ اَيَوَدُّ اَحَدُكُمْ اَنْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ لَهٗ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَاَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهٗ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآءُ ۖ فَاَصَابَهَآ اِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ؕ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ۝ (البقرة : ٢٦٤ـ٢٦٦)

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা প্রতিদান দাবী করে এবং কষ্ট দিয়ে ঐ ব্যক্তির ন্যায় আপন দানকে নিষ্ফল করো না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপর কিছু মাটি থাকে, অতপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা, কোনো উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয়, তবে শিশিরই যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকুক, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে, আর সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয়, এবং তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, অতপর ঐ বাগানকে এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আক্রমণ করে ও তা জ্বলে যায়? এভাবে আল্লাহ্ তার নিদর্শন তোমাদের জন্য ব্যক্ত করেন সুস্পষ্টভাবে যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৪-২৬৬)

www.amarboi.org

৮. ন্যায় বিচার

কুরআন শান্তির বার্তাবাহী। আর ন্যায়-বিচার হচ্ছে মানব-সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। তাই কুরআন যে কোনো ত্যাগের বিনিময়ে মানুষকে —বিশেষ করে বিশ্বাসীগণকে ন্যায় বিচারে অটল থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

কুরআনের মতে, যেহেতু ন্যায় বিচারের স্থান সব কিছুর উপরে, তাই ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার খাতিরে যদি নিজের আত্মীয়-স্বজন পিতা-মাতা, এমন কি নিজের বিরুদ্ধেও সাক্ষ্য দিতে হয়—তবু ইতস্ততঃ করা চলবে না। যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হবে সে বিত্তশালী হোক অথবা বিত্তহীন, তাতে কিছু যায় আসে না। সর্বাবস্থায় ন্যায় এবং সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকতে হবে।

ব্যক্তিগত অথবা সম্প্রদায়গত শত্রুতা, ন্যায়-বিচারের উপর যাতে কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্যও কুরআন মুমিনদের সতর্ক করে দিয়েছে।

পার্থিব কামনার বশবর্তী হয়ে ন্যায়-বিচার থেকে বিরত থাকা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যারা কথার মারপেঁচে পরোক্ষভাবে ন্যায়বিচারকে এড়িয়ে চলে, কুরআনের মাধ্যমে খোদ আল্লাহ তাআলা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কুরআন বলে ঃ

قُلْ اَمَرَ رَبِّىْ بِالْقِسْطِ قف وَاَقِيْمُوْا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّادْعُوْهُ

مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ط كَمَا بَدَاَكُمْ تَعُوْدُوْنَ ۝ (الاعراف : ٢٩)

"বলো, আমার প্রতিপালক ন্যায়-বিচারের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক নামাযে তোমার লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই অনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে, তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ২৯)

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوِ

الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ ج اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا قف فَلَا تَتَّبِعُوا

الْهَوٰۤى اَنْ تَعْدِلُوْا ج وَاِنْ تَلْوٗۤا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা ন্যায়বিচারে অটল থাকবে, তোমরা সাক্ষ্য দেবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে, যদিও তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং

www.amarboi.org

আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়, সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়ে যাও তবে জেনে রাখো, তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১৩৫)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ○

"আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করতে আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়-পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট ! আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৫৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ○ (المائدة : ٨)

"হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে, কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে অবিচার করতে বাধ্য না করে ; সুবিচার করবে, এটা আত্মসংযমের নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় করবে, তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।"

–(সূরা আল মায়েদা ঃ ৮)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ○ (النحل : ٩٠)

"আল্লাহ ন্যায়-বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালংঘন করতে, তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।"

–(সূরা আন নাহল ঃ ৯০)

দু'দল লোকের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহের সৃষ্টি হলে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে তার মীমাংসা করে দিতে হবে। একটি মীমাংসায় উপনীত হওয়ার পরও যদি একদল অপর দলকে আক্রমণ করে তাহলে ন্যায়-নীতির খাতিরে সেই

www.amarboi.org

আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে লড়তে হবে, যতক্ষণ না ওরা আল্লাহর (ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত) নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করে। তবে যখনই ওরা আত্মসমর্পণ করবে তখন তাদের সাথে আর যুদ্ধ বা বাড়াবাড়ি করা চলবে না। বরং ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে পুনরায় বিষয়টির ফায়সালা করে দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে যাতে সুবিচার হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কুরআন মুমিনদের সম্বোধন করে বলছে ঃ

وَاِنْ طَائِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ج فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِ ج فَاِنْ فَآءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ○

"বিশ্বাসীদের দুই দল দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতপর তাদের একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করে—যদি তারা আত্মসমর্পণ করে, তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবে। যারা ন্যায়-বিচার করে আল্লাহ্ তাদের ভালবাসেন।"–(সূরা হুজুরাত ঃ ৯)

কুরআনের মতে, যে ন্যায়পথে চলে এবং ন্যায়-বিচারের নির্দেশ দেয় সেই প্রকৃত সামর্থবান এবং সত্যিকারের বাকপটু। সে আল্লাহ তাআলার প্রিয়পাত্র এবং সার্থক মানব-জীবনের অধিকারী।

অপরদিকে যে ন্যায়-নীতির ধার ধারে না, অন্যকেও ন্যায়-বিচারের নির্দেশ দেয় না, বাকশক্তি থাকা সত্ত্বেও সে মূক ; সে বোবা শয়তান। সে ঐ নির্বোধ নিষ্কর্মা ভৃত্যের মতো যে তার মনিবের বোঝাস্বরূপ। তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন, সে কোনো ভাল কাজ করে আসতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে যে উদ্দেশ্যে দুনিয়াতে পাঠান সে তা পূরণ করতে পারে না। ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় তার মানব-জীবন। কুরআন বলে ঃ

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ اَحَدُهُمَآ اَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلٰى شَيْءٍ وَّهُوَ كَلٌّ عَلٰى مَوْلٰهُ لا اَيْنَمَا يُوَجِّهْهُ لَا يَاْتِ بِخَيْرٍ ط هَلْ يَسْتَوِىْ هُوَ لا وَمَنْ يَّاْمُرُ بِالْعَدْلِ لا وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ (النحل : ٧٦)

www.amarboi.org

"আল্লাহ্ আরো উপমা দিচ্ছেন দু' ব্যক্তির ঃ ওদের একজন মূক, কোনো কিছুরই শক্তি রাখে না এবং সে তার মনিবের বোঝাস্বরূপ, তাকে যেখানে পাঠানো হোক না কেন, সে ভাল কিছুই করে আসতে পারে না, সে কি সমান হবে ঐ ব্যক্তির, যে ন্যায়-বিচারের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে ?"–(সূরা আন নাহ্ল ঃ ৭৬)

৯. জনসেবা

জনসেবা হচ্ছে মানব সভ্যতার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রধানত জনসেবার উপরই নির্ভর করে সমাজের শান্তি, মঙ্গল ও নিরাপত্তা। তাই অতি সঙ্গত কারণেই শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম ইসলাম জনসেবার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে।

কুরআনের দৃষ্টিতে যেসব গুণের অধিকারী হলে একজন মানুষকে (ঈমানের দাবীর ব্যাপারে) প্রকৃত সত্যবাদী এবং খাঁটি মুত্তাকী (আল্লাহ সম্পর্কে সাবধানী) আখ্যা দেয়া যায়, জনসেবা হচ্ছে তার অন্যতম। যারা অনাথ, ইয়াতীম এবং কাঙ্গালের সেবা করে না তারা প্রকৃতপক্ষে পরকালকেই অস্বীকার করে।

কুরআন বলে ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ ۚ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ○ (البقرة : ١٧٧)

"পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোনো পুণ্য নেই ; কিন্তু পুণ্যবান সে, যে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশতা, কিতাবসমূহ এবং নবীগণকে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর ভালবাসায় আত্মীয়, অনাথ, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক (যে রিক্তহস্ত) ও সাহায্য-প্রার্থীদেরকে এবং দাসত্বমোচনে অর্থদান করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয়, কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণ করে

www.amarboi.org

এবং অর্থ-সংকটে-দুঃখ-দারিদ্রে ও সংগ্রাম-সংকটে ধৈর্য ধারণ করে। এরাই প্রকৃত সত্যবাদী এবং এরাই খাঁটি মুত্তাকী।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭৭)

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

"তুমি কি এমন ব্যক্তিকে দেখেছ যে প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করে? (যদি না দেখে থাক তাহলে তার পরিচয় জেনে নাও) সে হলো ঐ ব্যক্তি, যে অনাথ-ইয়াতীমকে বিতাড়িত করে এবং কাঙ্গাল-ভোজনে অপরকে উদ্বুদ্ধ করে না। আক্ষেপ সেই নামাযীদের জন্য যারা নিজেদের নামায সম্বন্ধে অমনোযোগী, যারা লোক দেখানোর জন্য সৎকাজ করে এবং (প্রতিবেশীর সাহায্যে) সাধারণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস দেয় না।"

–(সূরা মাউন ঃ ১-৭)

কুরআনের মতে, আসমান-যমীনে যাকিছু আছে তার সবই আল্লাহ তাআলা মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষেরই অধীন করে দিয়েছেন। আর গোটা মানবগোষ্ঠী হচ্ছে একই বংশোদ্ভূত—পরস্পর ভাই। অতএব মানবীয় প্রয়োজন পূরণে ভাগ্যহতরা—চাই তারা ভিন দেশী হোক অথবা ভিনধর্মী –ভাগ্যবানদের কাছ থেকে ভাই হিসেবে যথার্থ সাহায্য পাওয়ার অধিকারী।

এক মানুষ বিপদে পড়লে অন্য মানুষের কর্তব্য হলো তাকে সাহায্য করা। বিপন্ন ব্যক্তি পাপী না নিষ্পাপ, হেদায়েতপ্রাপ্ত না পথভ্রষ্ট—এসব চিন্তা করা তখন অবান্তর। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে, তার কোনো নিরন্ন অসহায় বান্দাকে সাহায্য করলে তিনি তার যথার্থ প্রতিদান দেবেন। যেহেতু বান্দাকে সৎপথে নিয়ে আসার সম্পূর্ণ ইখতিয়ার আল্লাহর হাতে, তাই অভাবগ্রস্তকে দান করার সময় সে হেদায়াতপ্রাপ্ত কিনা, দাতাকে তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই।

কুরআন বলে ঃ

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۝ (البقرة : ٢٧٢)

"ওদেরকে হেদায়াত করার ব্যাপারে তোমার উপর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, আল্লাহ্ যাকে খুশী হেদায়াত করবেন। তোমরা যা কিছু দান কর তা তোমাদের নিজেদের উপরকারের জন্যই ; আর তোমরা যা কিছু দান কর তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই করো। তোমরা যা কিছু দান কর তার পূর্ণ প্রতিদান তোমরা অবশ্যই পাবে—এতে বিন্দুমাত্র কম করা হবে না।"
—(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭২)

যারা প্রকৃত পুণ্যবান তাদের সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী এবং সর্বহারাদেরও অংশ রয়েছে বলে তারা মনে করেন। তারা সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায়ই দান করেন। দান করেন গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহ্ তাআলার কাছে সেই দানই গ্রহণীয় যে দানের কথা দাতা বলে বেড়ায় না এবং গ্রহীতাকে কোনোরূপ মনোকষ্ট দেয় না।

কুরআন বলে ঃ

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ○(الذريت : ١٩)

"তাদের (পুণ্যবানদের) ধন-সম্পদে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিতদের অংশ রয়েছে।"—(সূরা আয যারিয়াত ঃ ১৯)

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ ○(ال عمران : ١٣٤)

"(তারাই পুণ্যবান) যারা সচ্ছল এবং অসচ্ছল উভয় অবস্থায়ই দান করে।"—(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৪)

وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً ـ(الرعد : ٢٢)

"আমি তাদের যে উপজীবীকা দিয়েছি তা থেকে তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে।"—(সূরা আর রাদ ঃ ২২)

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا○اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ

لِوَجْهِ اللّٰهِ لَانُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا○(الدهر : ٨ـ٩)

"আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, অনাথ ও বন্দীকে তা দান করে এবং বলে, 'কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যেই আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।"—(সূরা আদ্ দাহ্র ঃ ৮-৯)

www.amarboi.org

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَآ اَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَآ اَذًى لا
لَّهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○(البقرة : ٢٦٢)

"যারা আল্লাহর পথে আপন ধন ব্যয় করে এবং যা ব্যয় করে তার কথা বলে বেড়ায় না ও ক্লেশ দেয় না, তাদের পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬২)

ইসলাম জনসেবা ও অন্যান্য পুণ্য কাজের উপর শুধু গুরুত্বই আরোপ করেনি বরং তা ত্বরান্বিত করার জন্যও মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছে। কেননা মানুষের জীবনের কোনো স্থায়িত্ব নেই। আর মৃত্যুর পর তাকে সেই বিচার দিনের সম্মুখীন হতে হবে যেদিন, সে দুনিয়ায় আল্লাহপ্রদত্ত নি'মাতসমূহ কোথায় কিভাবে ব্যয় করেছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কুরআন বলে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا
خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط (البقرة : ٢٥٤)

"হে বিশ্বাসীগণ, যেদিন কোনো প্রকারের বেচা-কেনা সম্ভব হবে না এবং যেদিন বন্ধুত্ব ও সুপারিশ কোনো কাজে আসবে না সেই বিচারের দিন (রোজ কিয়ামত) আসার আগে তোমরা আমার দেয়া ধন-দৌলত (পুণ্য কাজে) ব্যয় কর।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৪)

বিশ্বের রহমতরূপে আবির্ভূত সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) জনসেবার উপর যে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা তার কথা ও কাজ দ্বারা সুস্পষ্ট-রূপে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেছেন ঃ

"রোজ কিয়ামতে মুমিনের মাথার উপর তার দান-খয়রাত ছায়া প্রদান করবে।"

"দান-খয়রাত কবরের উষ্ণতাকে শীতল করে। রোজ কিয়ামতে বিশ্বাসীরা তাদের দান-খয়রাতের ছায়াতলে আশ্রয় নেবে।"

"যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের অভাব দূর করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাআলা তার অভাব দূর করবেন। যে ব্যক্তি আপন ভাইয়ের বিপদ দূর করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার কঠিনতম বিপদ দূর করবেন।"

www.amarboi.org

"ঐ ব্যক্তি মুমিন নয় যে নিশ্চিন্তে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।"

"সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর আত্মীয়। ঐ ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় যে আল্লাহর আত্মীয়ের (বান্দার) সাথে ভাল ব্যবহার করে।"

"কোনো ভুখা ব্যক্তিকে খাওয়ানো সবচেয়ে বড় সওয়াবের কাজ।"

"যারা অন্যের প্রতি সমবেদনা ও করুণা দেখায় আল্লাহ্ তাদের উপর দয়া করেন।"

"যারা যমীনের উপর আছে তাদের উপর দয়া কর, যিনি আকাশে আছেন, তিনি তোমার উপর দয়া করবেন।"

"যে অন্যকে দয়া করে না, সে অন্যের দয়া পায় না।"

"একজন মুমিনের উপর অন্য একজন মুমিনের ছয়টি দাবী রয়েছে। যথা ঃ (ক) একজন রুগ্ন হলে অন্যজন তার সেবা করবে ; (খ) একজনের মৃত্যু হলে অন্যজন তার জানাযায় শরীক হবে ; (গ) একজন ডাকলে অন্যজন তাতে সাড়া দেবে ; (ঘ) পরস্পর সাক্ষাত হলে একে অন্যের মঙ্গল কামনা করবে (অর্থাৎ সালাম বিনিময় করবে); (ঙ) একজনের হাঁচি উঠলে অন্যজন বলবে ঃ আল্লাহ তোমার উপর দয়া করুন এবং (চ) একজন অন্যজনের সামনে থাক বা না থাক, সর্বদা পরস্পরের মঙ্গল কামনা করবে।"

"যখন তুমি গোশত খরিদ কর কিংবা হাঁড়িতে কিছু বসাও তখন তাতে কিছু বেশী করে ঝোল ঢালো এবং এ থেকে কিছু তোমার অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশীকেও দান করো।"

"পরস্পর সহানুভূতি, ভালবাসা এবং সহৃদয়তায় মুমিনরা একই দেহ সদৃশ। যদি এ দেহের কোনো অংশে ব্যথা হয় তাহলে রাত্রি জাগরণ এবং জ্বর ভোগের ক্ষেত্রে সমস্ত দেহটাই সমভাবে যন্ত্রণা অনুভব করে।"

"যে আল্লাহর বান্দা কোনো বিধবা ও নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক এবং কোনো অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির উপকার সাধনের চেষ্টা করবে, সে প্রতিদান-প্রাপ্তি ও সওয়াব অর্জনের ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তিরই সমতুল্য যে আল্লাহর পথে জিহাদ করছে।"

"সমস্ত সৃষ্টিই আল্লাহর পোষ্য। অতএব আল্লাহ তাআলা ঐ সমস্ত বান্দাদেরকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন যারা তাঁর পোষ্যদের কল্যাণ সাধন করে।"

www.amarboi.org

"যে আমার কোনো উম্মতকে খুশী করার জন্য তার অভাব মোচন করলো সে আমাকেই যেন খুশী করলো এবং যে আমাকে খুশী করলো সে যেন আমার আল্লাহকেই খুশী করলো। আর যে আল্লাহকে খুশী করে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করেন।"

একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেভাবে জনসেবার দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন ঃ

আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম যখন যমীন সৃষ্টি করেন তখন তা থরথরিয়ে কাঁপছিলো। আল্লাহ তাআলা যখন পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে তাকে সুদৃঢ় করে দিলেন তখন ফিরিশতারা অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলো–

ঃ হে প্রভু ! তোমার সৃষ্টির মধ্যে পাহাড়ের চেয়েও শক্তিশালী কি কোনো বস্তু আছে ?

ঃ হ্যাঁ, লোহাই অধিক শক্তিশালী। কেননা, এটা পাহাড়কেও চুরমার করে দিতে পারে।

ঃ হে প্রভু ! তোমার সৃষ্টির মধ্যে লোহার চেয়েও শক্তিশালী কি কোনো বস্তু আছে ?

ঃ হ্যাঁ, আগুনই এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী। কেননা, এটা লোহাকেও গলাতে পারে।

ঃ হে প্রভু ! তোমার সৃষ্টির মধ্যে আগুনের চেয়েও শক্তিশালী কি কোনো বস্তু আছে ?

ঃ হ্যাঁ, পানিই এর চেয়ে বেশী শক্তিশালী। কেননা এটা আগুনকেও দমন করতে পারে।

ঃ হে প্রভু ! তোমার সৃষ্টির মধ্যে পানির চেয়েও শক্তিশালী কি কোনো বস্তু আছে ?

ঃ হ্যাঁ, বাতাসই এর চেয়ে অধিক শক্তিশালী। কেননা, এটা পানিকেও উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ঃ হে প্রভু ! তোমার সৃষ্টির মধ্যে বাতাসের চেয়েও শক্তিশালী কি কোনো বস্তু আছে ?

ঃ হ্যাঁ, এমন একজন হৃদয়বান মানুষ, যে ডান হাতে (মানুষের মঙ্গলার্থে) দান করে এবং বাঁ হাতে তা লুকিয়ে রাখে (অর্থাৎ দানের কথা প্রচার করে না); সে-ই আমার সৃষ্টি জগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী শক্তিশালী।

www.amarboi.org

যারা সত্যিকারের অক্ষম, যারা অনাথ, অন্ধ, পঙ্গু অথবা নিরাশ্রয়—ইসলাম তাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব মুসলমানদের উপর ন্যস্ত করেছে। ইসলামের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুসলমানরা এক্ষেত্রে যেসব দৃষ্টান্ত কায়েম করে গেছেন তা যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকবে। আমরা নিম্নে কয়েকটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করছি।

১ হযরত আবু বক্কর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে একবার আরবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ঠিক তখনই পণ্য বোঝাই এক হাজার উট সিরিয়া থেকে মদীনায় আসে। উট এবং উটের উপর বোঝাইকৃত পণ্য-সামগ্রীর মালিক ছিলেন হযরত উসমান (রাঃ)। উটগুলো মদীনায় পৌঁছার সংগে সংগে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সেগুলোর বয়ে আনা পণ্য খরিদ করার উদ্দেশ্যে হযরত উসমান (রাঃ)-এর চারদিকে জড় হয় এবং দামদস্তর শুরু করে। হযরত উসমান কোনো দামেই পণ্য বিক্রি করতে রাজী হলেন না। কেবল বলতে লাগলেন, এ দামে আমার পোষাবে না, আমি আরো বেশী দাম চাই। অনেক দরদস্তুরের পর মদীনার ব্যবসায়ীরা উসমান (রাঃ)-কে বললো ঃ আপনি আর কত চান ? আমরা মদীনার সব ব্যবসায়ীরাই তো এখানে উপস্থিত। এর চেয়ে বেশী দাম আর কে দেবে ?—হযরত উসমান বলে উঠেন, একমাত্র আল্লাহই তা দিতে পারেন। কেননা আল্লাহ্ একের বদলে দশ কিংবা এর চেয়ে বেশীও দিতে পারেন। তোমরা সবাই সাক্ষী থাক, আমি সমস্ত পণ্যসামগ্রী আল্লাহর ওয়াস্তে গরীব ও অসহায় লোকদেরকে দান করলাম।

২ হযরত উমর (রাঃ)-এর আর্থিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না। তাই রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাঁকে খায়বার অঞ্চলের এক খণ্ড জমি প্রদান করা হয়। হযরত উমর (রাঃ) জমিপ্রাপ্তির সংবাদ শুনে সোজাসুজি রাসূল (সাঃ)-এর খেদমতে গিয়ে নিবেদন করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! এত মূল্যবান জিনিসের অধিকারী আমি জীবনেও হইনি। এর দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা আমাকে এক মহা পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। অতএব আপনি নির্দেশ দিন, কিভাবে আমি একে জনসাধারণের সেবায় নিয়োজিত করতে পারি।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি ইচ্ছা করলে মূল সম্পত্তি নিজ দখলে রেখে এর উপস্বত্বটুকু জনসেবায় নিয়োজিত করতে পার। হযরত উমর (রাঃ) একথা শোনা মাত্র জমির যাবতীয় উপস্বত্ব অসহায়, পঙ্গু এবং দুস্থ লোকদের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলেন। অবশ্য তিনি এ শর্তও আরোপ করলেন যে, ওয়াক্‌ফের রক্ষণাবেক্ষণকারীও এর আয় থেকে নিজের আবশ্যকীয় খরচ-পত্রাদি চালাতে পারবে।

www.amarboi.org

৩ মদীনা শহরের একটি নিভৃত অঞ্চলে জনৈকা অন্ধ স্ত্রীলোক বাস করতো। বার্দ্ধক্যের ভারে তাঁর দেহ নেতিয়ে পড়েছিল। তাঁকে দেখা-শুনা করার মতও কোনো লোক ছিল না।

হযরত উমর (রাঃ) প্রতিদিন ভোরে উঠে স্ত্রীলোকটির সেবা-শুশ্রূষা এবং আবশ্যকীয় কাজ-কর্মাদি করে দিয়ে আসতেন। কিছুদিন পর তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর আগেই কে একজন লোক, বৃদ্ধার সমস্ত কাজকর্ম করে দিয়ে চলে যায়। বৃদ্ধা চক্ষুহীনা। তাই ঐ লোকটি সম্পর্কে সে হযরত উমর (রাঃ)-কে সঠিক কিছু বলতে পারলো না।

হযরত উমর (রাঃ) লোকটির পরিচয় জানার জন্য অত্যন্ত কৌতুহলী হয়ে উঠলেন। পরদিন অতি প্রত্যুষে তিনি বৃদ্ধার ঘরে গিয়ে দেখেন যে, সমস্ত কাজকর্ম সেরে দিয়ে স্বয়ং খলীফা আবু বকর (রাঃ) বৃদ্ধার পর্ণকুটির থেকে বেরিয়ে আসছেন।

হযরত উমর (রাঃ) বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, হে মহানবীর খলীফা, আপনিই তাহলে প্রত্যেক দিন আমার আগে বৃদ্ধার এখানে এসে পৌছান।

৪ একদা খলীফা উমর (রাঃ) হিমসের গভর্নর সায়ীদ বিন আমীরের কাছে এক হাজার দিনার পাঠিয়েছিলেন। সায়ীদ তখন অত্যন্ত অভাব-গ্রস্থ ছিলেন। না ছিল তার পরিধানের জন্য কোনো কাপড়, আর না ছিল তার ঘরের কাজের জন্য কোনো ভৃত্য।

সায়ীদের স্ত্রী এতগুলো দিনার দেখে যারপর নাই খুশী হলেন এবং স্বামীকে বললেন ঃ খুব ভাল হয়েছে ; এ অর্থ দিয়ে আমরা ঘরের কাজের জন্য একটি দাসও কিনে নিতে পারবো।

সায়ীদ বললেন ঃ এ অর্থ দিয়ে আমরা এর চেয়ে ভাল কাজও তো করতে পারি।

স্ত্রী বললেন ঃ আপনি কিরূপ কাজের কথা বলছেন ?

সায়ীদ বললেন ঃ চল আমরা সবগুলো দিনারই ঐ সমস্ত লোকদের জন্য খরচ করি যারা আমাদের চেয়ে বেশী অভাবগ্রস্ত এবং অসহায়।

স্ত্রী উত্তরে বললেন ঃ উত্তম প্রস্তাবই বটে।

www.amarboi.org

অতপর সায়ীদ কোন্ খাতে কি পরিমাণ খরচ করতে হবে তার একটি চূড়ান্ত তালিকা তৎক্ষণাতই তৈরী করে নিলেন।

৫ খলীফা উমর (রাঃ) একদিন দেখতে পেলেন যে, একজন অন্ধ ইয়াহূদী দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে। তিনি দয়াপরবশ হয়ে তার কাছে গেলেন এবং কেন তার এরূপ দুরবস্থা হয়েছে সে সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ইয়াহূদী বললো, জিযিয়া কর, পারিবারিক অভাব-অভিযোগ এবং বার্ধক্যই আমার এ দুর্দশার মূল কারণ। হযরত উমর (রাঃ) তাকে আপন ঘরে নিয়ে গিয়ে ঐদিনকার আবশ্যকীয় জিনিসপত্র দিয়ে বিদায় দিলেন। অতপর তিনি বায়তুলমালের খাজাঞ্চীকে এই ইয়াহূদী এবং এর মত অন্যান্য অসহায় লোকদের উপর থেকে জিযিয়া কর রহিত করে তাদের জন্য বায়তুলমাল থেকে নিয়মিত ভাতা প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

৬ হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে একবার আরবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জরুরী অবস্থা মুকাবালার জন্য হযরত উমর (রাঃ) সিরিয়া এবং মিসর থেকে প্রচুর পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করেন। তাঁরই নির্দেশে সিরিয়া থেকে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) চার হাজার উট বোঝাই খাদ্যশস্য মদীনায় প্রেরণ করেন। হযরত আমর বিন আস (রাঃ)-এর মাধ্যমে মিসর থেকেও এক শ' খাদ্য বোঝাই নৌকা এসে পৌছে।

হযরত উমর (রাঃ) ঐ সমস্ত খাদ্যশস্য অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে দুস্থ জনসাধারণের মধ্যে বন্টনের ব্যবস্থা করেন। তবু তাঁর মনে যেন শান্তি ছিল না। জনসাধারণের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি ঘি, গোশত এবং ময়দার রুটি খাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েছিলেন। কেননা এ সমস্ত জিনিস খাবার মত সামর্থ তখন দেশের গরীব জনসাধারণের ছিল না। তিনি ঐ সময় কেবল যবের রুটি দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি করতেন। কখনো কখনো এর সাথে সামান্য জয়তুন তেল মিশিয়ে নিতেন। রুচি না হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত এ সমস্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে তাঁর দেহের রং বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইসলাম শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ের জনসেবার উপরই গুরুত্ব আরোপ করেনি, বরং মানুষের জন্য জনসেবা-ভিত্তিক এমন একটি সর্বাংগ-সুন্দর জীবন-ব্যবস্থা দিয়েছে যার অর্থনৈতিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসৃত হলে সমাজে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে অর্থনৈতিক অসাম্য থাকে না—থাকে না দুঃস্থদের আর্তনাদ, প্রয়োজন বোধ করে না এক মানুষ অন্য মানুষের প্রতি ভিক্ষার হাত বাড়াবার। কেননা যারা অসহায়, যারা নিরন্ন ও নিরাশ্রয় তাদের জীবিকার দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রই বহন করে।

www.amarboi.org

১০. আদাবে মুআশিরাত

দ্বীনের মোটামুটি পাঁচটি অঙ্গ বা শাখা রয়েছে। যথা–আকায়িদ, ইবাদাত, মুআমালাত, বাতিনী আখলাক সংশোধন এবং আদাবে মুআশারাত তথা সামাজিক শিষ্টাচারসমূহ। প্রথমোক্ত চারটি শাখা বা বিষয়ের প্রতি উলামা, মাশায়িখ এবং সাধারণ মুসলমানরা মোটামুটিভাবে সতর্ক রয়েছেন বলা চলে। কিন্তু শেষোক্ত বিষয়ের প্রতি তারা ততটা মনোযোগী নন। এমনকি এ ব্যাপারে তাদের অবজ্ঞা বা অমনোযোগিতা প্রত্যক্ষ করে কখনো কখনো মনে হয়, যেন তারা এ বিষয়টিকে ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনেই করেন না। প্রকৃতপক্ষে আজকাল মুসলমানদের পারস্পরিক সৌহার্দ ও ভালবাসার মধ্যে যে অভাব বা ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়—আমাদের মতে, তাদের উপরোক্ত মনোবৃত্তি হচ্ছে এর অন্যতম প্রধান কারণ।

'আদাবে মুআশারাত' একটি ব্যাপকার্থক শব্দ। এর অর্থ সামাজিক শিষ্টাচার, সুষ্ঠু সামাজিকতা, অন্যের সাথে মার্জিত ও সৌজন্যমূলক আচরণ তথা এমন ব্যবহার যার দ্বারা অন্যের মনে কোনোরূপ আঘাত না লাগে বা সে কোনোরূপ কষ্ট না পায়।

কুরআন-হাদীস দ্বারাই পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, আদাবে মুআশারাত দ্বীনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। চলাফেরা, উঠাবসা, খানাপিনা তথা প্রত্যেকটি কাজকর্মে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল মুসলমানদেরকে 'আদাবে মুআশারাত'-এর প্রতি লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا ـ(المجادلة : ١١)

"হে মুমিনগণ, যখন তোমাদেরকে মজলিসে (অন্যের বসার সুবিধার্থে) স্থান করে দিতে বলা হয় তখন তোমরা স্থান করে দেবে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য স্থান করে দেবেন। আর যখন তোমাদেরকে (অন্যের সুবিধার্থে) কোনো স্থান হতে উঠে যেতে বলা হয় তখন তোমরা উঠে যাবে।"–(সূরা মুজাদালা ঃ ১১)

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ط ـ(النور : ٢٧)

www.amarboi.org

"হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কারো ঘরে, ঘরের মালিকের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করবে না।"–(সূরা আন নূর ঃ ২৭)

হুযুর (সাঃ) বলেন, যারা রসুন এবং পেঁয়াজ (কাঁচা) খাবে তারা যেন আমাদের মজলিস থেকে দূরে থাকে। তিনি আরো বলেন, অতিথির জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে আতিথ্যকারীর কাছে সেই পরিমাণ সময় অবস্থান করবে যাতে সে বিরক্তিবোধ করে। তিনি আরো বলেন, অন্যের সাথে পানাহার করার সময় যদি পেট ভরেও যায় তবু অন্যের পানাহার শেষ না হওয়া পর্যন্ত হাত গুটিয়ে নেবে না। কেননা এতে সেও (অন্য পানাহারকারীও) লজ্জাবশতঃ হাত গুটিয়ে নেবে এমতাবস্থায় যে, তার হয়ত আরো কিছু খাবার গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আরো বলেন, এমন দু' ব্যক্তির কাছে গিয়ে পূর্ব অনুমতি ছাড়া তাদের ঠিক মাঝখানে বসা উচিত নয় যারা (ইচ্ছাপূর্বক) পাশাপাশি বসে আছে। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, সাহাবীদের কাছে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চেয়ে অধিক প্রিয়জন আর কেউ ছিলেন না। কিন্তু যখন তিনি (সাঃ) মজলিসে আগমন করতেন তখন কেউ (তার উদ্দেশ্যে) দাঁড়াতেন না। কেননা তিনি (সাঃ) এরূপ করাটা পছন্দ করতেন না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ অভ্যাস ছিল যে, যখন তার হাঁচি আসতো তখন তিনি তার মুখ কাপড় অথবা হাত দিয়ে ঢেকে নিতেন।

সাহাবীরা হুযুর (সাঃ)-এর মজলিসে এসে যেখানে জায়গা পেতেন সেখানেই বসে যেতেন। তারা বিনা কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একেবারে ধার ঘেঁষে বসার চেষ্টা করতেন না।

হযরত ইবনে আব্বাস ও হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা কোনো রোগীকে দেখতে গেলে তার কাছে বেশী সময় বসবে না, বরং কিছু সময় বসেই যথাশীঘ্র সম্ভব চলে আসবে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, হুযুর (সাঃ) বিছানা থেকে নিঃশব্দে উঠতেন, নিঃশব্দে জুতা পরতেন, নিঃশব্দে দরজা খুলতেন, নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হতেন, অতপর নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিতেন (যাতে আমার ঘুমের মধ্যে কোনোরূপ ব্যাঘাত না ঘটে)।

একটি রেওয়ায়াতে আছে, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শয়নরত কয়েকজন অতিথির নিকট দিয়ে যাবার সময় তাদেরকে অনুচ্চ স্বরে সালাম করেছিলেন— যাতে তাদের মধ্যে যিনি জাগ্রত আছেন তিনি তা শুনেন, আর যিনি নিদ্রিত আছেন তার ঘুমের মধ্যে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।

www.amarboi.org

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আদাবে মুআশারাত সম্পর্কিত আরো অনেক কথা আছে যেগুলো জানা এবং তা যথাযথভাবে কার্যে পরিণত করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, হুসনে মুআশারাত তথা মার্জিত ও সৌজন্যমূলক আচরণের মূল উদ্দেশ্য হলো, এমন কোনো কথা না বলা বা এমন কোনো আচরণ না করা যা অন্যের কাছে অপছন্দনীয় ঠেকে, তার মনে আঘাত লাগে কিংবা সে লজ্জাবোধ করে। আর একথাটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীতে অতি সুন্দরভাবে ফুঠে উঠেছে। তিনি (সাঃ) বলেন, সে-ই প্রকৃত মুসলিম, যার জিহবা ও হাতের অনিষ্ট হতে অন্য মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, আদাবে মুআশারাত ইসলামের এমন একটি অঙ্গ, যা আমাদের সামাজিক সম্পর্ককেও শুধু মধুর ও সৌহার্দপূর্ণ করে না, বরং ইসলামের সার্বিক সৌন্দর্যকেও সকলের চোখের সামনে আরো সুন্দর, আরো আকর্ষণীয় করে তোলে।

১১. গোপনীয়তা রক্ষা

হযরত সাবিত হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (আনাস) বলেন, একদা আমি ছেলেদের সাথে খেলাধূলা করছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেখানে যান। তিনি (সাঃ) প্রথমে আমাকে সালাম করেন, অতপর কোনো একটি প্রয়োজনীয় কাজে কোনো একটি জায়গায় আমাকে পাঠিয়ে দেন। আমি সেখানে যাই। ফলে সেদিন আমার মায়ের কাছে পৌঁছতে দেরী হয়ে যায়। মা তখন বললেন, কি কারণে তুমি আজ আমার কাছে পৌঁছতে এত দেরী করলে ? আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কোনো একটি প্রয়োজনীয় কাজে আমাকে (কোনো একটি জায়গায়) পাঠিয়েছিলেন। মা বললেন, কি প্রয়োজনে তিনি (সাঃ) তোমাকে পাঠিয়েছিলেন ? আমি বললাম, এটি একটি গোপন কথা। তখন মা বললেন, আল্লাহ-রাসূলের গোপন কথা তুমি কখনো কারো কাছে প্রকাশ করবে না। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, যদি ঐ গোপন কথা আমি কাউকে বলতাম তাহলে হে সাবিত, আমি তোমাকে অবশ্যই তা বলতাম।

গোপনীয়তা রক্ষা করা মানুষের শুধু একটি বৈশিষ্ট্যই নয় বরং একটি দায়িত্বও বটে। এজন্য ধৈর্য, আন্তরিকতা ও বিরাট মননশক্তির প্রয়োজন।

www.amarboi.org

গোপনীয়তা রক্ষা করা যার তার পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি ঐ ব্যক্তিকেও গোপনীয়তা রক্ষাকারী বলা যাবে না, যে কারো কাছে অন্যের গোপন কথা ফাঁস করে দেয়ার পর বলে, 'সাবধান তুমি কিন্তু একথা কাউকে বলো না।'— কেননা এভাবে গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় না, বরং সুকৌশলে তা অন্যের কাছে ফাঁস করে দেয়া হয় মাত্র। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, যদি তুমি কারো গোপনীয়তা রক্ষা করতে চাও তাহলে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সাথে সাথে তা ভুলে যাও। ফলে অন্যের কাছে তা প্রকাশ করার কোনো সুযোগই আর থাকবে না।

যে কোনো পরিস্থিতিতে অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা মানুষের একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য। যে ব্যক্তি এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী সে সকলের কাছে বিশ্বস্ত ও একান্ত বিশ্বাসভাজন—যেমন বিশ্বাসভাজন ছিলেন হযরত আনাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চোখে। আনাস (রাঃ) এ গুণের অধিকারী ছিলেন বলেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে কোনো একটি জায়গায় পাঠিয়েছিলেন। যেহেতু ঐ উদ্দেশ্যের কথা গোপন করা বাঞ্ছনীয় ছিল তাই আনাস (রাঃ) তার মায়ের কাছেও তা প্রকাশ করেননি, বরং নির্দ্বিধায় বলে উঠেন, এটি একটি গোপন বিষয়। আনাস (রাঃ)-এর মা-ও ছিলেন সমভাবে এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, তাই তিনি ছেলের কাছ থেকে ঐ গোপনীয় বিষয় জানার জন্য শুধু অনাগ্রহই দেখাননি, বরং ছেলেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ রহস্য কখনো কারো কাছে প্রকাশ না করার উপদেশ দেন। ফলে দেখা যায়, আনাস (রাঃ) পরবর্তী সময়ে হযরত সাবিতকে বলেছেন, আল্লাহর কসম, এটি একটি গোপন কথা। যদি আমি ঐ গোপন কথা কাউকে বলতাম তাহলে হে সাবিত, আমি তোমাকে অবশ্যই তা বলতাম।

হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সেই হবে আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম ব্যক্তি, যে স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা অন্যের কাছে ফাঁস করে দেয়।-(মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সহধর্মীণীগণ তাঁর সাথে বসাছিলেন। এমন সময় হযরত ফাতিমা (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এরই ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে সেখানে এসে হাযির হন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাকে দেখতেই সাদর অভ্যর্থনা জানান এবং নিজের ডান পাশে অথবা বাম পাশে তাকে বসান। অতপর তিনি (সাঃ) চুপে চুপে তার কাছে এমন একটি কথা বলেন যা শুনার সাথে সাথে ফাতিমা (রাঃ) ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তার এ ভয়ার্ত ও বিচলিত অবস্থা লক্ষ্য করেন তখন

www.amarboi.org

চুপি চুপি তার কাছে অপর এমন একটি কথা বলেন, যা শুনে ফাতিমা (রাঃ) হাসতে থাকেন। [হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন,] ফাতিমা (রাঃ) যখন সেখান থেকে চলে যেতে উদ্যত হলেন, তখন আমি তাকে বললাম, আল্লাহ্র রাসূল তোমার কাছে এমন কী কথা বলছিলেন, যার কারণে তুমি একবার কাঁদছিলে এবং পুনরায় হাসছিলে? ফাতিমা (রাঃ) তখন উত্তর দেন, আমি আল্লাহ্র রাসূলের গোপন রহস্য ফাঁস করতে চাই না।”—(বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসের অপর অংশ থেকে জানা যায় যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বার বার চাপ দেয়ায় হযরত ফাতিমা (রাঃ) হুযুর (সাঃ)-এর ওফাতের পর ঐ দু'টি গোপন কথা তার কাছে প্রকাশ করেছিলেন, যার একটি ছিলো হুযুর (সাঃ)-এর ওফাত সম্পর্কিত এবং সে কথাটি তার ওফাতের পূর্বে প্রকাশ করা বাঞ্ছনীয় ছিলো না। আর অপর কথাটি ছিল খোদ হযরত ফাতিমা (রাঃ)-এর সত্তা সম্পর্কিত, যা প্রকাশ করাটা ছিল তার সম্পূর্ণ এখতিয়ারাধীন। কোনো গোপন কথা, যা কারো ব্যক্তিসত্তার সাথে সম্পর্কিত, তা প্রকাশ করা বা না করা সম্পূর্ণরূপে তারই ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কিন্তু অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা যে কোনো অবস্থায়ই একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা গোপন কথা হচ্ছে একটি আমানত। আর আমানতের হিফাযত করা একটি ঈমানী দায়িত্ব। তাছাড়া এটি একটি বৈশিষ্ট্য, যার মাধ্যমে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা যায়। এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তির কাছে মানুষ তার যে কোনো গোপন কথা প্রকাশ করতে মোটেই সংকোচবোধ করে না।

মোটকথা, গোপনীয়তা রক্ষা করা এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যার উপর গর্ব করা চলে। কেননা এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হলে এমন ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও মননশক্তির প্রয়োজন, যার অধিকারী একজন যেই সেই লোক কখনো হতে পারে না। হযরত আলী (রাঃ) যথার্থই বলেছেন, অন্যের গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে আমি হচ্ছি সেই পাথর, যা কখনো বিদীর্ণ হয় না।

১২. অঙ্গীকার পালন

প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার পালন একটি অতি পছন্দনীয় চরিত্র। যদি কাউকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, আমি তোমার অমুক কাজ করে দেব বা অমুক সময়ে তোমার সাথে সাক্ষাত করবো তাহলে সে প্রতিশ্রুতি পালন করা অত্যন্ত জরুরী। এ প্রতিশ্রুতি পালন শুধু প্রশংসনীয় কাজ নয় বরং আভিজাত্যের একটি বড় লক্ষণও বটে। ইসলাম এ প্রতিশ্রুতি পালনের উপর অত্যন্ত গুরত্ব আরোপ করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا (بنى اسرائيل : ٣٤)

"প্রতিশ্রুতি পালন করো (কেননা) প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।"-(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৪)

পূর্ববর্তী ধর্মসমূহেও প্রতিশ্রুতি পালনের উপর গুরুত্ব প্রদান করা হতো। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রশংসায় বলেছেন ঃ

وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى -(النجم : ٣٧)

"এবং ইবরাহীম, যে পালন করেছিলো তার অঙ্গীকার।"
-(সূরা আন নাজম ঃ ৩৭)

নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে হযরত আবদুল্লাহ বিন আবী সামা (রাঃ) কোনো একটি জিনিস কিনেছিলেন এবং তার মূল্যের কিছু অংশ অনাদায়ী রয়ে গিয়েছিল। আবদুল্লাহ (রাঃ) প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তিনি ওটা অমুক সময়ে ও অমুক জায়গায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে পৌঁছিয়ে দেবেন। কিন্তু তিনি তার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যান। ওদিকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঐ নির্দিষ্ট জায়গায় তার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। তৃতীয় দিন ঐ প্রতিশ্রুতির কথা যখন আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর স্মরণে আসে তখন তিনি অবিলম্বে সেখানে যান এবং দেখতে পান যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জন্য প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিন দিন যাবৎ সেখানে অপেক্ষা করছেন। নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ ওয়াদা পালন নিসন্দেহে তার শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় লক্ষণ। তিনি সেখানে তার ব্যক্তিগত পাওনা আদায়ের জন্য অপেক্ষা করছিলেন এমন কথা বলা চলে না। কেননা এজন্য সেখানে তাকে তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না ; বরং পরবর্তীতে যে কোনো সময়ে তিনি তার পাওনা আদায় করে নিতে পারতেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর ওয়াদা বাস্তবায়নের জন্য সেখানে অপেক্ষা করেছিলেন এমন কথা বলাও খুব একটা যুক্তিযুক্ত নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি অপেক্ষা করেছিলেন এজন্য যে, তিনিও তো আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর প্রতিশ্রুতির উপর পরোক্ষভাবে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আমি সেখানে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। মূলত এ প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যই তিনি সেখানে তিন দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন এবং হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) না আসা পর্যন্ত সে স্থান ত্যাগ করেননি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময় যদি তা রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্প থাকে কিন্তু পরবর্তী সময়ে কোনো বিশেষ অসুবিধার কারণে তা রক্ষা করা

www.amarboi.org

সম্ভব না হয় তাহলে ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে সেজন্য কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা হবে না। তেমনিভাবে যদি কেউ সে প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে যায় তাহলে তাকেও সেজন্য পাকড়াও করা হবে না। তবে যখনই প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়বে তখন অনতিবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সে সম্পর্কে অবহিত করতে হবে। কিন্তু কোনো রূপ প্রতিবন্ধকতা বা ওজর ছাড়াই যদি কেউ তার প্রতিশ্রুতি পালন না করে তাহলে মনে করতে হবে যে, তার মধ্যে ঈমানের স্থলে নিফাক বা কপটতা ঢুকে পড়েছে। যেমন—রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যার মধ্যে চারটি অভ্যাস থাকবে সে নির্ঘাত মুনাফিক। আর যদি তার মধ্যে এ চারটি অভ্যাসের একটি থাকে তাহলে বলা হবে যে, তার মধ্যে মুনাফিকের একটি চরিত্র রয়েছে, যতক্ষণ না সে ওটাকে পরিত্যাগ করে। আর এ চারটি চরিত্র হলো ঃ (১) যখন তার কাছে কোনো আমানত রাখা হয় সে তাতে খিয়ানত করে, (২) যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে, (৩) যখন সে প্রতিশ্রুতি দেয় তখন তা পুরণ করে না, (৪) যখন সে ঝগড়া করে তখন গালিগালাজের পর্যায়ে নেমে যায়।

শুধু শান্তিকালীন সময়ে নয়, বরং যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অঙ্গীকার পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন—এমনকি সে অঙ্গীকার যদি জবরদস্তিমূলকও হয়।

হযরত হুযাইফা বিন ইয়ামান (রাঃ) বলেন, আমি বদর যুদ্ধে শুধুমাত্র এজন্য অংশগ্রহণ করতে পারিনি যে, আমি ও আবু হাসীল যখন মক্কা থেকে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হই তখন কুরাইশের কাফিররা আমাদেরকে বন্দী করে ফেলে এবং এই বলে চ্যালেঞ্জ করে যে, তোমরা নিশ্চয়ই মুহাম্মদের কাছে যাচ্ছ। তখন আমরা বলি, 'না, আমরা শুধু মদীনায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখি।' ওরা শেষ পর্যন্ত আমাদেরকে এ অঙ্গীকারের উপর ছেড়ে দেয় যে, আমরা যেন (তাদের বিরুদ্ধে আসন্ন) যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে অংশগ্রহণ না করি। আমরা মদীনায় পৌঁছার পূর্বেই জানতে পারি যে, বদর নামক স্থানে কুরাইশদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের যুদ্ধ হচ্ছে। আমরা দ্রুত সেখানে গিয়ে পৌঁছি এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আমাদের বন্দী হওয়ার ঘটনাটি ব্যক্ত করে উক্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করি। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, তোমরা সোজা মদীনায় চলে যাও এবং কুরাইশদেরকে প্রদত্ত তোমাদের অঙ্গীকার রক্ষা করো। কেননা আমরা কাফিরদেরকে প্রদত্ত অঙ্গীকারও রক্ষা করে থাকি। কাফিরদের অনুপাতে সংখ্যায় আমরা অল্প হলেও তাদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার সাহায্যই আমাদের জন্য যথেষ্ট।-(মুসলিম)

www.amarboi.org

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) কোনো ব্যক্তিকে মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করতেন তখন তাকে তাক্ওয়ার ও সাধারণ সৈন্যদের সাথে সদ্ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। অতপর বলতেন, আল্লাহ্র নাম নিয়ে আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করবে শুধু তাদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ্কে অস্বীকার করে, গনীমতের মালে কোনোরূপ খিয়ানত করবে না, সর্বাবস্থায় অঙ্গীকার পালন করবে, কারো সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। কারো হাত, পা, নাক, কান কাটবে না (কাউকে বিকলাঙ্গ করবে না) এবং শিশুদেরকে হত্যা করবে না।–(মুসলিম)

কুরাইশরা একদা জনৈক ব্যক্তিকে দূত হিসাবে রাষ্ট্রপতি মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করে। কিন্তু সে মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পবিত্র চেহারা দেখামাত্র ইসলামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং অকপটে বলে উঠে, 'আমি কিয়ামত পর্যন্ত আপনার এ দোরগোড়া ছেড়ে অন্য কোথাও যাচ্ছি না।' কিন্তু যেহেতু এটা ছিল তার প্রেরকদের সাথে ঐ দূতের অঙ্গীকার ভঙ্গেরই শামিল ; কেননা তারা তাকে এখান থেকে কোনো না কোন সংবাদ নিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়েছে, এখানে থেকে যাবার জন্য নয়—তাই হুযুর (সাঃ) ঐ দূতকে বলেন, আমি তোমাকে এখানে থাকার অনুমতি দিয়ে অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে পারবো না। তুমি এখান থেকে ফিরে যাও। যদি তোমার অন্তরে ইসলামের প্রতি সত্যিকার আসক্তি থেকে থাকে তাহলে দূতালির কাজ সেরে পুনরায় এখানে ফিরে এসো। শেষ পর্যন্ত ঐ দূত মক্কায় ফিরে যেতে বাধ্য হয় এবং সেখানে তার দূতালি-সম্পর্কিত সব ব্যাপার-স্যাপার বুঝিয়ে দিয়ে পুনরায় মদীনায় ফিরে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।–(আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অন্যান্য মহৎ গুণাবলীর সাথে সাথে অঙ্গীকার পালনের যে সুদৃঢ় চরিত্র-কাঠামো আপন সাহাবীদের সামনে পেশ করেছিলেন তারা তা নির্বিঘ্নে ও নির্দ্বিধায় আজীবন অনুকরণ ও অনুসরণ করে গেছেন।

হযরত আমীর মুআভিয়া (রাঃ) তার খেলাফত আমলে রোমানদের সাথে এ মর্মের একটি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হন যে, তারা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদকাল পর্যন্ত একে অন্যকে আক্রমণ করবেন না। আমীর মুআবিয়া (রাঃ) ঐ চুক্তি ভঙ্গ করতে চাননি বটে, তবে কূটকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে চুক্তিকালীন সময়ের মধ্যেই রোমানদের সাথে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং আগেভাগেই একটি বাহিনী নিয়ে রোম সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন, যাতে করে চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু সে বাহিনী কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই জনৈক ব্যক্তি দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে এসে তাদেরকে রুখে দাঁড়ায় এবং উচ্চস্বরে বলতে থাকে, 'আল্লাহু আকবার !

www.amarboi.org

তোমরা এ কী করছো ? অঙ্গীকার ভঙ্গ করা কি মুসলমানদের জন্য শোভা পায়? তোমাদের অবশ্যই অঙ্গীকার পালন করা উচিত।'

ঐ দুঃসাহসী ব্যক্তিটি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাহাবী হযরত আমর বিন এনাব (রাঃ)। যখন আমীর মুআবিয়ার কাছে এ সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি আমর (রাঃ)-কে ডেকে পাঠান এবং মুসলিম বাহিনীকে এভাবে তার বাধা প্রদানের কারণ জিজ্ঞেস করেন। আমর (রাঃ) তখন বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোনো ব্যক্তি কোনো জাতির সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলে সে যেন ঐ অঙ্গীকারের গ্রন্থি শক্তও না করে, আবার ঢিলেও না করে (অর্থাৎ তাতে প্রত্যক্ষ হোক অথবা পরোক্ষ হোক, কোনোরূপ হস্তক্ষেপ যেন না করে) যতক্ষণ না ঐ অঙ্গীকারের মেয়াদ (পুরোপুরি) অতিক্রান্ত হয় কিংবা উভয় পক্ষ থেকে প্রকাশ্যে চুক্তিভঙ্গের ঘোষণা দেয়া হয়।

একথা শুনে আমীর মুআভিয়া (রাঃ) ভাবাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং আমর (রাঃ)-এর সাথে কোনোরূপ তর্ক বিতর্ক না করেই সেখান থেকে আপন বাহিনীসহ সোজা রাজধানীতে ফিরে আসেন।

একটি শিশুকেও কোনো প্রতিশ্রুতি দিলে তা পূরণ করতে হয়। যেমন আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, একদা আমার মা আমাকে কিছু দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের ঘরে ছিলেন। তিনি (সাঃ) আমার মাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তাকে কি দিতে চাচ্ছিলে ? আমার মা নিবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি তাকে একটি খেজুর দিতে চাচ্ছিলাম। হুযুর (সাঃ) তখন বলেন, স্মরণ রাখ, যদি তোমার সন্তানকে তুমি কিছু না দিতে তাহলে তোমার আমলনামায় একটা মিথ্যা লেখা হতো।

সাধারণভাবে ছোট শিশুদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তাদেরকে একটা কিছু দেয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি পালন করা হয় না এবং সেটাকে কোনো অপরাধ বলেও গণ্য করা হয় না। কিন্তু যে কাউকে যে কোনো প্রতিশ্রুতিই দেয়া হোক না কেন, তা অবশ্যই পালন করতে হবে—চাই সে বড় হোক, ছোট হোক, সুস্থ হোক অথবা উন্মাদ হোক। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপরোক্ত বাণী থেকে সুস্পষ্টভাবে একথাই বুঝা যাচ্ছে।

অনেক লোক এমন আছে যারা প্রতিশ্রুতি পালনকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বলে মনে করে না। এ ধরনের লোকই একই সময়ে বিভিন্ন লোকের সাথে বিভিন্ন জায়গায় সাক্ষাত করবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু কারো সাথেই সাক্ষাত করে না এবং এটাকে কোনো জরুরী জিনিস বলে মনেই করে না।

www.amarboi.org

কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত যে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা শুধু একটা ধর্মহীন বা কপটের কাজ নয় বরং একটা অসভ্য ও অভদ্রের কাজও বটে। তাছাড়া প্রতিশ্রুতি পালনের মধ্যেই ব্যক্তি, গোষ্ঠী তথা সমাজের সর্বাঙ্গীন স্বার্থ নিহিত। প্রতিশ্রুতি পালন করলে শুধু এক পক্ষ নয় বরং উভয় পক্ষই উপকৃত হয়। অতএব সমাজে যদি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের প্রবণতা দেখা দেয় তাহলে পরিণামে সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এ কারণেই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল প্রতিশ্রুতি পালনের উপর যারপর নেই গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

১৩. শালীনতা

শালীনতা একটি মহত গুণ। কুরআন বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন ভঙ্গিতে শালীনতার গুরুত্ব তুলে ধরেছে মানব জাতির সামনে। কুরআনের ভাষায়, শুধুমাত্র মহাভাগ্যবানরাই শালীনতা নামক অনুপম নৈতিক গুণের অধিকারী হতে পারে। কুরআন বলে ঃ

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ط اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ ○ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا ج وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ○ (حم السجدة : ٣٤-٣٥)

"ভাল এবং মন্দ সমান হতে পারে না। মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট (শালীন ব্যবহার) দ্বারা। ফলে, তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। আর এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা ধৈর্যশীল, এই চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয় যারা মহাভাগ্যবান।"
–(সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ঃ ৩৪-৩৫)

মানুষকে অবজ্ঞার চোখে দেখা, পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে চলাফেরা করা, কর্কশ স্বরে কথা বলা, একে অন্যকে উপহাস করা, মন্দ নামে ডাকা, একে অপরের প্রতি দোষারোপ করা, নিশ্চিত না হয়ে একে অন্যের সম্পর্কে কল্পনা-প্রসূত বা অনুমান-ভিত্তিক কথা বলা, একে অন্যের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করা, একে অপরের নিন্দা করা, কথায় কথায় শপথ করা, একের কথা অন্যের কাছে লাগানো, একে অন্যের সাথে রূঢ় আচরণ করা ইত্যাকার কার্যকলাপ শালীনতা বিরোধী। আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে এ সমস্ত কার্যকলাপ থেকে বারণ করেছেন অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এবং যারা অনুরূপ আচরণ করে তাদের অশুভ পরিণাম সম্পর্কেও সতর্ক করে দিয়েছেন সকলকে। কুরআন বলে ঃ

www.amarboi.org

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ط إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝ (لقمن : ١٨ ـ ١٩)

"অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। কারণ আল্লাহ কোনো উদ্ধত, অহংকারীকে ভালবাসেন না। তুমি পদক্ষেপ করো সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো, স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"-(লুকমান ঃ ১৮-১৯)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ج وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ط بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ج وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ز إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ط وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝

"হে বিশ্বাসীগণ! কোনো পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী অপর কোনো নারীকেও যেন উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারূপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ হতে নিবৃত্ত হয় না তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা বহুবিধ অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুমান পাপ এবং তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না, আর একে অপরের পেছনে নিন্দা করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে চাইবে ? বস্তুত তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তাওবাগ্রহণকারী, পরম দয়ালু।"

-(সূরা হুজুরাত ঃ ১১-১২)

www.amarboi.org

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ۝ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ۝ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۝ (القلم : ١٠-١٤)

"এবং অনুসরণ করো না তার যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, পেছনে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের কাছে লাগায়, যে কল্যাণকর কাজে বাধা দান করে, যে সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত।"–(সূরা কলম ঃ ১০-১৪)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا ۝ (بنى اسرائيل : ٣٦-٣٧)

"যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না ; কান, চোখ, অন্তর—এদের প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হবে। ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ কারো না। তুমি তো কখনই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত-প্রমাণ হতে পারবে না।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৬-৩৭)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ۝ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

"দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে পিছনে ও সামনে নিন্দা করে, যে অর্থ জমায় এবং বার বার তা গণনা করে। সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর করে রাখবে। কখনো না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুতামায়। হুতামা কি তা তুমি কি জান ? এ হচ্ছে আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত হুতাশন যা হৃদয়কে গ্রাস করবে ; নিশ্চয়ই তা ওদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে, দীর্ঘায়িত স্তম্ভে।"
–(সূরা হুমাযা ঃ ১-৯)

আল্লাহর উপর যার বিশ্বাস যত দৃঢ় মানুষের সাথে তার ব্যবহার তত শালীন। মুমিন বিশ্বাসীরা সর্বাবস্থায়ই শালীনতা বজায় রেখে চলেন। অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের সম্বোধন করে অশালীন উক্তি করলেও তারা তা উপেক্ষা করেন

www.amarboi.org

প্রশান্তভাবে। শালীনতার খাতিরে এবং স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তারা সব রকম অসার ক্রিয়াকলাপ পরিহার করে চলেন। কুরআন বলে ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝ .... وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ۝ (الفرقان : ٦٣ ـ ٧٢)

"করুণাময়ের (প্রকৃত) দাস তারাই যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে পৃথিবীতে এবং তাঁদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম (শান্তি) ------- (করুণাময়ের প্রকৃত দাস তারাই) যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অসার ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে স্বীয় মর্যাদা রক্ষার্থে তা পরিহার করে চলে।"-(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৩-৭২)

মুমিনদের কাছে ঈমানের চেয়ে মূল্যবান বস্তু আর নেই। মানব জাতিকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করাকে তারা তাদের জীবনের প্রধান কর্তব্য এবং যারা এ আহ্বানে সাড়া দেয় তাদেরকে একান্ত আপনজন বলে মনে করেন। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি এ আহ্বানে সাড়া না দেয় এবং সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে চলে তাহলেও মুমিনদের জন্য কুরআনের শিক্ষা হলো, ওদের সাথেও শালীনতা বজায় রেখে কথা বলতে হবে।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে মুমিনদেরকে তাদের বিরুদ্ধবাদী তথা সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের সাথে কথা বলার যে ধরন বা পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া হয়েছে তা নিসন্দেহে ভদ্রতা ও শালীনতার এক একটি অনুপম উদাহরণ। এক্ষেত্রে কুরআনের নিম্নের সূরাটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۝ لَاۤ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۝ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝ وَلَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۝ وَلَاۤ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَاۤ اَعْبُدُ ۝ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۝

"বলো, হে সত্য প্রত্যাখ্যানকারীগণ! আমি তার উপাসনা করি না যার উপাসনা তোমরা করো এবং তোমরাও তার উপাসনাকারী নও, যার উপাসনা আমি করি এবং আমি উপাসনাকারী নই তার, যার উপাসনা তোমরা করে আসছ এবং তোমরাও উপাসনাকারী নও তার, যার উপাসনা আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার।"

-(সূরা আল কাফিরূন ঃ ১-৬)

www.amarboi.org

শালীনতা ও পর্দা প্রসংগে পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ط ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ○ وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ص وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَآءِ ص وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ط وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"মুমিনদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হিফাযত করে, এটাই তাদের জন্যে উত্তম। ওরা যা করে আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। মুমিন নারীদেরকেও বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হিফাযত করে ও নিজেদের সৌন্দর্য সবার কাছে না দেখায়, কেবল সে সব জিনিস ছাড়া যা আপনা হতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত্ত করে ; তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অংগ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো নিকট তাদের আবরণ প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"-(সূরা আন নূর ঃ ৩০-৩১)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

"হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে ও বিশ্বাসীদের স্ত্রীদেরকে বলো, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের মুখমণ্ডলের উপর

www.amarboi.org

টেনে দেয়। এতে তাদের চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না ; আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"–(সূরা আল আহযাব ঃ ৫৯)

১৪. ইবাদাত ও আখলাক

বিশ্বের সকল ধর্মই 'হুসনে আখলাক' বা সদাচারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। দুনিয়ায় যত নবী এসেছেন সকলেই মানুষকে সদাচার শিক্ষা দিয়েছেন। তারা সকলেই বলেছেন, সত্য ভাল এবং মিথ্যা খারাপ, ন্যায়-বিচার ভাল এবং জুলুম-অত্যাচার খারাপ, চুরি-ডাকাতি গুনাহ এবং দান-খয়রাত সওয়াব। হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) তো 'হুসনে আখলাক' বা সদাচারের পূর্ণতা সাধনের জন্য আবির্ভূতই হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষা অনুযায়ী আখলাক বা সদাচারের মর্যাদা ইবাদাতেরও উপরে। আখলাক বা আচরণ হচ্ছে 'হুকুকুল ইবাদ'—অর্থাৎ এমন কাজ যা বান্দার সাথে সম্পর্ক রাখে। আর ইবাদাত হচ্ছে এমন কাজ, যা আল্লাহ্ তাআলার সাথে সম্পর্ক রাখে। আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ ব্যাপক, সীমাহীন। তার রহমতের দরজা সবসময়ই উন্মুক্ত থাকে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং ঘোষণা করেছেন ঃ

يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَاتَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ○(الزمر : ٥٣)

"হে আমার বান্দাগণ ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ—আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না ; আল্লাহ্ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"–(সূরা আয যুমার ঃ ৫৩)

তিনি আরো ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ط

"আল্লাহ্ তার শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না ; এটা ছাড়া সবকিছু যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১১৬)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলা হচ্ছেন 'আরহামুর রাহিমীন'—শ্রেষ্ঠ দয়ালু। তিনি কোনো না কোনো বাহানায় তার বান্দাকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার এ ক্ষমা ও অনুগ্রহ 'হুকুকুল্লাহ' তথা আল্লাহর অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত—'হুকুকুল ইবাদ' তথা বান্দার অধিকারের সাথে নয়। 'হুকুকুল ইবাদ'–এর ক্ষেত্রে কোনো ত্রুটি হলে সেটা ক্ষমা করার অধিকার আল্লাহ্ তাআলা তার

www.amarboi.org

হাতে রাখেননি, বরং আপন বান্দাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। অতএব এক ব্যক্তি যদি অন্য ব্যক্তির উপর জুলুম করে তাহলে সে মজলুম ব্যক্তির কাছ থেকে সহজে ক্ষমা প্রাপ্তির আশা করতে পারে না—যেরূপ পারে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার কাছে, যিনি কোনো ব্যাপারেই কারো মুখাপেক্ষী নন, অথচ সকলেই সর্ব ব্যাপারে তার মুখাপেক্ষী। মোটের উপর প্রত্যেকটি আদেশ-নির্দেশে আল্লাহ তাআলা বান্দার 'হুকুক' (অধিকার সমূহ)-কে নিজের 'হক'-এর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইবাদাত ও আখলাক যেন ঈমানরূপী দেহের ডান হাত এবং বাম হাত। ঈমানের পূর্ণতার জন্য এ দু'টি অংগই অপরিহার্য। অন্য কথায় এ দু'টি অংগের সম্মিলিত রূপই হচ্ছে ইসলাম।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীতে যেমন ছিলেন উৎসর্গীকৃত-প্রাণ তেমনি তার আখলাক বা সদাচারও ছিল সর্বাঙ্গ সুন্দর-এক কথায় অনুপম। খোদ আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ-(القلم : ٤)

"তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত।"–(সূরা কলম ঃ ৪)

বান্দার প্রতি সর্বাবস্থায় যাতে তার হক আদায় করা হয় সে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বার বার তার উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

একদা তিনি সাহাবা কিরাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, নিঃস্ব কে তা কি তোমরা জান ? সাহাবীরা উত্তরে বললেন, আমরা তো ঐ ব্যক্তিকে নিঃস্ব মনে করি যার কাছে পয়সা-কড়ি বা মাল-সামান নেই। তিনি (সাঃ) বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিঃস্ব হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিন অগণিত নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে উঠবে। কিন্তু তার অবস্থা এমন হবে যে, সে দুনিয়ায় কাউকে গালি দিয়েছে, কারো অপবাদ রটনা করেছে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়েছে, কাউকে হত্যা করেছে কিংবা প্রহার করেছে। তখন ঐ ব্যক্তির সওয়াবসমূহ কিছু কিছু করে ঐ সমস্ত হকদারকে দেয়া হবে। এভাবে দিতে দিতে যখন তার সমস্ত সওয়াব শেষ হয়ে যাবে এবং তা সত্ত্বেও মানুষের পাওনা বাকী থেকে যাবে তখন ঐ সমস্ত হকদারদের গুনাহসমূহ তার নামে লিখে দেয়া হবে। ফলে সে (এত সওয়াব অর্জন করা সত্ত্বেও) হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

একদা তিনি (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহর কসম, ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়, আল্লাহর কসম ঐ ব্যক্তি মুমিন নয়।' তখন

www.amarboi.org

সাহাবা কিরাম (রাঃ) তার কথার প্রতি অত্যন্ত মনোযোগী হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, সে কে, হে আল্লাহর রাসূল ? তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন; যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টকারিতা থেকে নিরাপদ নয়।

এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন উক্তির মাধ্যমে এবং কর্মের মাধ্যমে চরিত্র-মাহাত্ম্য তথা হুকুকুল ইবাদের গুরুত্বকে মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন। আমরা যদি সে অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করি তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন যেমন শান্তি ও নিরাপত্তায় ভরে উঠবে তেমনি আখিরাতেও আমরা আল্লাহর অফুরন্ত নি'মাতের অধিকারী হতে পারবো।

১৫. কথা বলার রীতি

মানুষ শব্দের মাধ্যমে তার মনের ভাব প্রকাশ করে। ভাব প্রকাশের এ ভঙ্গি প্রকৃতপক্ষে তার স্বভাব-প্রকৃতি, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও মন-মানসিকতার দর্পণ বিশেষ। এজন্যই অত্যন্ত সঙ্গত কারণে আল্লাহ তাআলা মানুষের হেদায়াতের জন্য যে সমস্ত নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন তাদেরকে তাদের ভাব প্রকাশের তথা কথা বলার কায়দা-কানুনও শিখিয়ে দিয়েছেন। যখন হযরত মূসা ও হারূন (আঃ)-কে দ্বীনের দাওয়াত দেয়ার জন্য প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ ফিরআউনের কাছে পাঠানো হয় তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ফিরআউনের সাথে কথা বলার যে কায়দা শিখিয়ে দেন তাহলো ঃ

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۝ (طه : ٤٤)

"তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে, (তাহলে) হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা (আল্লাহকে) ভয় করবে।"-(সূরা ত্বা-হা ঃ ৪৪)

বলা বাহুল্য, এখানে শুধু কথা বলার ভঙ্গিই শিখিয়ে দেয়া হয়নি, সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তর্নিহিত উপকারিতার কথাও বলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা সাধারণ মানুষকেও কথা বলার রীতিনীতি শিক্ষা দিয়েছেন। যেমন বলা হয়েছে,

وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ـ(البقرة : ٨٣)

"তোমরা মানুষের সাথে ভাল কথা বলবে (সদালাপ করবে)।"
-(সূরা আল বাকারা ঃ ৮৩)

www.amarboi.org

অর্থাৎ সাধারণ মানুষের সাথে—চাই সে তোমাদের কাছে অনুগৃহীতই হোক—এমন ভঙ্গিতে কথা বলবে না, যাতে তোমাদের দাম্ভিকতা প্রকাশ পায় এবং তার মনে আঘাত লাগে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَّمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَّتْبَعُهَا أَذًى ط ـ(البقرة : ٢٦٣)

"দান-খয়রাত করার পরে কোনো কষ্ট দেয়ার চেয়ে ভাল (মিষ্টি) কথা বলা এবং ক্ষমা করা উত্তম।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৩)

ইসলাম মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছে যেন তারা কর্কশ স্বরে কথা না বলে, তাদের উচ্চারণ-ভঙ্গি যেন এমন না হয়, যাতে বিনয় ও নম্রতার পরিবর্তে অশিষ্টতা ও রুক্ষতা প্রকাশ পায়। পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার নির্দেশ দেয়া হয়েছে,

وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ط اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ○(لقمن : ١٩)

"তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করো ; সুরের মধ্যে গাধার সুর সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর।"–(সূরা লুকমান ঃ ১৯)

একজন মুমিন যখন কথা বলে সত্য কথা বলে। তার প্রতিটি কথা ও কাজে বিজ্ঞতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিশুদ্ধ-চিত্ততার ছাপ থাকে। তার কথা হয় ওজনদার, বলিষ্ঠ, তাৎপর্যপূর্ণ। অনর্থক ও আজেবাজে কথা কখনো তার মুখ দিয়ে বের হয় না। পবিত্র কুরআনে মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসংগে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ○(المؤمنون : ٣)

"তারা বাজে কথা ও অসার ক্রিয়াকলাপ হতে মুখ ফিরিয়ে রাখে।"
–(সূরা মুমিনুন ঃ ৩)

আল্লাহ তাআলা মানুষের ইহ জীবনের জন্য একটি মাপকাঠি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেই মাপকাঠিতেই তার প্রতিটি কথা ও কাজ মাপা হয়। আখিরাতে তাকে তার প্রতিটি কথা ও কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। সেখানে তার প্রতিটি কথা ও কাজের পুংখানুপুংখ হিসাব নেয়া হবে। সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার অসীম জ্ঞান ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি থেকে নিজের কোনো কথা বা কাজ গোপন রাখা মানুষের সাধ্যের অতীত। পবিত্র কুরআনে পরিষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ○ (ق : ١٨)

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য তৎপর প্রহরী (ফিরিশতা) তার নিকটেই রয়েছে।"–(সূরা ক্বাফ ঃ ১৮)

www.amarboi.org

ইসলাম মানুষকে নির্দেশ দিয়েছে, যেন তারা নিজেদের জিহ্বাকে ভাল কথা ও ভাল কাজে ব্যবহার করে। প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের উপর যাদের ঈমান রয়েছে, যারা বিশ্বাস করে যে, একদিন তাদেরকে আল্লাহ্ তাআলার সামনে হাযির হতে হবে এবং নিজের প্রতিটি কথা ও কাজের পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে তারা তাদের জিহ্বাকে হয় ভাল কাজে ব্যবহার করে, নয়তো চুপচাপ থাকে। আর এটাই হচ্ছে ইসলামের রীতি।

সমাজে ভাল, খারাপ, পণ্ডিত, মূর্খ, সভ্য, অসভ্য সব ধরনেরই লোক থাকে। আর ইসলাম প্রত্যেকটি লোকের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। ইসলামের নির্দেশ হলো, যখন নির্বোধ ও মূর্খরা অশিষ্ট ভাষায় তোমাকে সম্বোধন করে তখন তাদেরকে খারাপ কথা বলা বা তাদের সাথে ঝগড়াঝাটি করা উচিত নয়। পবিত্র কুরআনে মুমিনদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসংগে অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ۝(الفرقان : ٦٣)

"তাদেরকে যখন অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা (তাদের শান্তি কামনা করে) বলে, 'শান্তি'।"-(সূরা ফুরকান ঃ ৬৩)

মোটকথা, ইসলাম মানুষকে কথা বলার এমন একটি সুন্দর রীতি শিক্ষা দিয়েছে, যা অনুসরণ করে তারা পরস্পরের শত্রু হিসাবে নয়, বরং ভাই ভাই রূপে পৃথিবীতে একটি সুখী সুন্দর জীবন কাটাতে পারে এবং পরকালেও অধিকারী হতে পারে আল্লাহর পরম নি'মাত ও পুরস্কারের।

১৬. মিতব্যয়িতা

পবিত্র কুরআনের পূর্ণতা ও সামগ্রিকতা এজন্য সর্বজনস্বীকৃত যে, এর মধ্যে হেদায়াত ও পথ-প্রদর্শনের প্রত্যেকটি উপাদান মওজুদ রয়েছে। পবিত্র কুরআন শুধু নামায, রোযা, যাকাত এবং হাজ্জের হুকুম-আহকাম বর্ণনা করেনি, বরং জীবনের প্রত্যেকটি দিক এবং প্রত্যেকটি সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কেও আলোচনা করেছে। সরকারী প্রাসাদ থেকে আরম্ভ করে ফকিরের ঝুপড়ি পর্যন্ত মানব-জীবনের এমন কোনো স্তর বা পর্যায় নেই যা কুরআনের আলোচনা থেকে বাদ পড়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা মানব-জীবনের প্রত্যেকটি শাখা-প্রশাখার বিধি-বিধান বিধৃত হয়েছে কুরআনে। কুরআন

www.amarboi.org

যেখানে ইতিকাদ, দর্শন, ইবাদাত, আখলাক, লেনদেন ও রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় বিষয়ের সংস্কার সাধন করেছে সেখানে এমন একটি অর্থনীতির ভিতও রচনা করেছে, যা সব দিক দিয়ে মানুষের উন্নতি ও সাফল্যের চাবিকাঠি বলে বিবেচিত। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইসলাম ধন-সম্পদ সম্পর্কে এমন একটি স্পষ্ট হেদায়াত প্রদান করেছে যা বাহ্যতঃ খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও নিসন্দেহে এর প্রভাব সুদূর-প্রসারী। আর সে হেদায়াতটি হলো, যে সম্পদই মানুষের অধিকারে রয়েছে তা আল্লাহ-প্রদত্ত একটি আমানত ছাড়া কিছু নয়। আর ঐ সম্পদের সদ্ব্যবহার করার জন্যে আল্লাহ তাআলা মানুষকে এক একজন ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করেছেন মাত্র। অতএব মানুষ অবশ্যই আল্লাহ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী ঐ সম্পদ খরচ করবে। আর এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হলো ঃ

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○(الاعراف : ٣١)

"খাও এবং পান করো, কিন্তু অমিতাচার করো না। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) অমিতাচার পছন্দ করেন না।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ৩১)

ইসলাম একদিকে জাতির সমগ্র সদস্যদের মধ্যে সম্পদ আবর্তিত হওয়ার এবং সম্পদহীনদেরকেও তার অংশীদার করার ব্যবস্থা যেমন করেছে অন্যদিকে তেমনি সম্পদশালীদেরকে তাদের সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা ও মিতব্যয়িতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা খরচ করবে তা যেন তার আয় অনুপাতে হয়। এমন যেন না হয় যে, আয়ের চেয়ে ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়ে তথা নিজের সম্পদের মধ্যে অপব্যয় ও অপচয় করে পরিণামে সে নিজেরই প্রয়োজন মেটাবার জন্য অন্যের দিকে হাত পাততে বাধ্য হয়। আবার সে যেন এমন কৃপণও না হয় যে, তার আয়-আমদানী তাকে যে পরিমাণ ব্যয় করার অনুমতি দেয় সে সেই পরিমাণ খরচ থেকেও হাত গুটিয়ে নেয়। তবে নিজের আয়ের সীমার মধ্যে থেকে ব্যয় করার অর্থ এই নয় যে, সে তার যাবতীয় আয়-আমদানী শুধুমাত্র নিজের আয়েশ-আরামের মধ্যে লুটিয়ে দেবে। এ ধরনের স্বার্থপরতামূলক খরচকেও ইসলাম অপব্যয় বলেই গণ্য করে।

প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন একটি স্বভাবসিদ্ধ ও কার্যোপযোগী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে এসেছেন যা সম্পদ ও সম্পদ অর্জনের উপাদানসমূহে মালিকানা স্বীকার করে নিয়ে তা ব্যয় করার সীমা নির্ধারণ করে দেয়। এ নির্ধারণের শর্তসমূহ এমনি যে, সেগুলোর উপস্থিতিতে ইসলামী সমাজে কোনো প্রকারের অব্যবস্থা বা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয় না। বরং অর্থনৈতিক কাজ-কারবার সঠিক পন্থায় চলতে পারে। মধ্যপন্থার এ বিশেষ রূপটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর

www.amarboi.org

শিক্ষাব্যবস্থার কারণে সৃষ্টি হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা এটাকে মুসলমানদের একটি বিশেষ গুণ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَاۤ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ۝

"এবং যখন তারা (মুসলমানরা) ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করে না, কার্পণ্য করে না, বরং তারা আছে এতদুভয়ের মাঝে মধ্যপন্থায়।"

–(সূরা ফুরকান ঃ ৬৭)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে নিকৃষ্টতম লোক হচ্ছে তারা, যারা নি'মাতের (আয়েশ-আরামের) কোলে জন্ম নেয়, এর মধ্যে বেড়ে উঠে, রং-বেরংয়ের খাবার খায়, নানা জাতের কাপড় পরে, নানা ধরনের পরিবহন ব্যবহার করে এবং অধিক থেকে অধিকতর খরচ করে।

তিনি আরো বলেছেন, ঐ ব্যক্তি কখনো অভাবী (পরমুখাপেক্ষী) হয় না, যে মধ্যপন্থা (মিতব্যয়িতা) অবলম্বন করে এবং অপচয় থেকে দূরে থাকে।

ইসলাম যেখানে অপচয় করা থেকে বারণ করেছে সেখানে আয়েশ-আরামের যিন্দেগী থেকেও রুখে রেখেছে এবং সহজ-সরল জীবন অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছে। কেননা আয়েশ-আরামের যিন্দেগী, তার সাথে অসংখ্য বিপদ-আপদ নিয়ে আসে, সে মানুষকে আল্লাহর যিক্‌র থেকে বিরত রাখে, এক মানুষকে অন্য মানুষ থেকে দূরে ঠেলে দেয়—সর্বোপরি মানুষকে শ্রম নামক মূল্যবান গুণ থেকে বঞ্চিত রাখে।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন তাকে ইয়ামনের প্রশাসক করে পাঠান তখন বলেন, সাবধান ! আয়েশ-আরামের জীবন থেকে দূরে থাকবে। কেননা আল্লাহর প্রকৃত বান্দা আয়েশ-আরামের যিন্দেগীতে ডুবে থাকে না। এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হচ্ছে ঃ

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا ۝ (بنى اسرئيل : ٢٩)

"তুমি তোমার হাত গ্রীবায় আবদ্ধ করে রেখ না এবং তা সম্পূর্ণ প্রসারিতও করো না, তাহলে নিন্দিত ও নিঃস্ব হবে।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৯)

অর্থাৎ কার্পণ্য ও অপব্যয় কোনোটিই বাঞ্ছিত নয়। মানুষ যেন এমনি মধ্য পন্থা অবলম্বন করে যে, কৃপণ হয়ে সে যেন তার সম্পদের আবর্তনকে বন্ধ করে না দেয়, আবার অপব্যয় ও অপচয় করে আপন আর্থিক ক্ষমতাকেও যেন ধ্বংস

২২—

www.amarboi.org

করে না দেয়। আল্লাহ্ তাআলা এক ব্যক্তিকে ধন-সম্পদ প্রদান করলেন, অথচ সে এমনভাবে তার জীবন অতিবাহিত করলো, যেন তার কাছে কিছুই নেই। অর্থাৎ সে তার অবস্থার অনুপাতে নিম্নমানের জীবন অতিবাহিত করে, আল্লাহ্-প্রদত্ত ধন-সম্পদ না নিজের জন্য খরচ করে, আর না নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য, না কোনো অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করে, আর না কোনো জনকল্যাণমূলক কাজে তা ব্যয় করে। অন্য কথায়, তার এ নিম্নমানের জীবন-ধারণ-পদ্ধতি দেখে এমন মনে হয় যে, আল্লাহ তাআলা যেন তাকে কিছুই দেননি। নিসন্দেহে এটা আল্লাহর নি'মাতের প্রতি তার সীমাহীন কৃতঘ্নতা ছাড়া কিছু নয়। হাদীসে আছে—হুযুর (সাঃ) বলেছেন, যখন আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দাকে তার নি'মাত প্রদান করেন তখন তিনি এটা চান যে, এ নি'মাতের প্রভাব বান্দার উপর পতিত হোক। অর্থাৎ তার পানাহার, বসবাস, পোশাক-পরিচ্ছদ সবকিছু থেকেই যেন আল্লাহর নি'মাত প্রকাশ লাভ করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র বাণী হলো ঃ

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُوْنَ مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ

"(আল্লাহ তাআলা এমন লোককেও পছন্দ করেন না,) যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গোপন করে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৩৭)

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ ۭ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا ۝

"যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় কৃতঘ্ন।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৭)

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি অতি মূল্যবান ও সর্বব্যাপী বাণী হলো, "ব্যয়ের ক্ষেত্রে যারা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে তারা কখনো নিঃস্ব হয় না।"

১৭. আল্লাহর পথে ব্যয়

আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টি, একটি থেকে অপরটি ভিন্ন। প্রত্যেক প্রজাতির জীব-জন্তুর মধ্যেও এ পারস্পরিক ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। মানব জাতির প্রত্যেকটি সদস্যও আকারে-প্রকারে, রূপেবর্ণে, বুদ্ধি-বিবেচনায়, আগ্রহ-উৎসাহে, সাহস-হিম্মতে তথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই একে অপর থেকে ভিন্ন। আর্থিক দিক দিয়েও সব সময় তাদের মধ্যে ভিন্নতা বিরাজ করে। তাদের কেউ উচ্চবিত্ত, কেউ মধ্যবিত্ত, কেউ সম্পূর্ণ নিঃস্ব। উচ্চবিত্তরা তো সবসময়ই সচ্ছল। মধ্যবিত্তরাও মোটামুটি

www.amarboi.org

স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করে। কিন্তু নিম্নবিত্ত ও নিঃস্বদের পক্ষে অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সংসার নির্বাহ করা কঠিন।

এ প্রকৃতগত ভিন্নতা ও বৈষম্যের কারণে প্রত্যেকটি ধর্মেই গরীব ও নিঃস্বদের সাহায্য করা সচ্ছল ব্যক্তি ও সমষ্টির একটি অপরিহার্য দায়িত্ব বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। প্রত্যেক দেশ এবং প্রত্যেক জাতি নিম্নবিত্ত, দরিদ্র ও নিঃস্বদের সাহায্যের জন্য জায়গায় জায়গায় সাহায্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে থাকে। কিন্তু এ দায়িত্বটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ইসলাম যে ব্যবস্থা দিয়েছে তা নিসন্দেহে অতুলনীয়। যদি এ ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে কার্যকর করা হয় তাহলে দেশ ও জাতি দারিদ্র ও নিঃস্বতার অভিশাপ থেকে মুক্তি লাভ করবে এবং কোথাও রিক্ত-নিঃস্ব ও বঞ্চিতদের হাহাকার ধ্বনি পরিশ্রুত হবে না। পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ٥ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ٥

"ওদের (সচ্ছলদের) সম্পদে নির্ধারিত 'হক' (অধিকার) রয়েছে ভিখারী ও বঞ্চিতদের।"–(সূরা মাআরিজ ঃ ২৪-২৫)

যারা আল্লাহ তাআলার পথে ব্যয় করে, গরীব ও নিঃস্বদের সাহায্য করে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয় মুত্তাকীদের তালিকায়। কেননা পবিত্র কুরআনে মুত্তাকীদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ–(البقرة : ٣)

"(তারাও মুত্তাকী) যারা ব্যয় করে সেই জীবনোপকরণ থেকে, যা আমি তাদেরকে দান করেছি।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ৩)

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আপন ন্যায়ভাবে অর্জিত সম্পদ থেকে একটি খেজুর পরিমাণ জিনিসও দান করে—আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ তাআলা শুধু হালাল পবিত্র মালই গ্রহণ করেন—আল্লাহ তাআলা সে জিনিসটি আপন ডান হাতে তথা অত্যন্ত সন্তুষ্টির সাথে গ্রহণ করেন। অতপর তিনি সেটাকে বর্ধিত করেন যেমন তোমরা ঘোড়ার একটি বাচ্চাকে অত্যন্ত যত্নের সাথে লালন-পালন করে থাক—এমনকি ঐ জিনিসটি বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত উহুদ পাহাড়ের ন্যায় বিরাট আকার ধারণ করে (জাওয়াহিরুল বুখারী)। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনেও ঘোষণা করা হয়েছে,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ

www.amarboi.org

سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ط وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ٥ (البقرة : ٢٦١)

"যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি শস্যবীজ, যা সাতটি শীষ উৎপাদন করে, প্রত্যেকটি শীষে একশত শস্যকণা। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।" –(সূরা আল বাকারা ঃ ২৬১)

ধন-সম্পদ থেকে কি পরিমাণ ব্যয় করা হবে—এ সম্পর্কে সাহাবা কিরাম (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলে আল্লাহ তাআলা তার জবাবে বলেনঃ

قُلِ الْعَفْوَ ط - (البقرة ٢١٩)

"(হে মুহাম্মদ!) তাদেরকে বলো, যা উদ্বৃত্ত তা যেন তারা ব্যয় করে।" –(সূরা আল বাকারা ঃ ২১৯)

আর 'আল্লাহর পথে ব্যয়' শুধু অভাবী ও দরিদ্রদের জন্য নয়, বরং সময় ও পরিস্থিতি অনুযায়ী জাতি ও রাষ্ট্রের জন্যও তা করতে হবে। কেননা জাতি ও রাষ্ট্রকে যদি ধ্বংস ও পতন থেকে রক্ষা করা না যায় তাহলে নিজের ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ج - (البقرة : ١٩٥)

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৫)

বছরের পর বছর জুলুম-অত্যাচার সহ্য করার পর যখন আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে কাফিরদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের অনুমতি দেন তখনই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়—যার মর্মকথা হচ্ছে, জিহাদে শুধুমাত্র প্রাণ-উৎসর্গই নয়, বরং ধন-সম্পদ উৎসর্গেরও প্রয়োজন রয়েছে। এক্ষেত্রে কার্পণ্য করা চলবে না, বরং মুজাহিদদের সাহায্যের জন্য মুক্ত হস্তে দান করতে হবে। যদি এটা করা না হয় তাহলে জাতি ও রাষ্ট্র এবং সেই সাথে তোমাদের পতনও অনিবার্য।

এখানে এ মর্মেও একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, এ ব্যয় যেন শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হয়—বিশ্ববাসীর প্রশংসা কুড়ানো, নিজের বদান্যতা প্রদর্শন কিংবা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যেন না হয়।

www.amarboi.org

অন্য কথায় বলতে গেলে, কে কি নিয়্যাতে বা উদ্দেশ্যে দান করলো আল্লাহ তাআলার কাছে সেটাই লক্ষণীয়। কে কি দিল বা কি পরিমাণ দিল সেটা লক্ষণীয় নয়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) তাবূক যুদ্ধ উপলক্ষে তার যাবতীয় সম্পদ এবং হযরত উমর (রাঃ) তার অর্ধেক সম্পদ দান করেন। অন্যান্য সাহাবা কিরামও দান করেন অকাতরে। ফলে মাল-সম্পদের যেন এক পাহাড় গড়ে উঠে। একজন গরীব সাহাবী সারা রাত অন্যের বাগানে পানি উত্তোলন করে পারিশ্রমিক স্বরূপ যে দু সা' খেজুর পেয়েছিলেন তা থেকে এক সা' নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য রেখে বাকি এক সা' দান হিসাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে পেশ করলে হুযুর বলেন, এই এক সা' খেজুর সমগ্র স্তুপের উপর ছড়িয়ে দাও। কেননা এ খেজুরের দানার মধ্যে বেশুমার কল্যাণ ও বরকত রয়েছে এবং যে উদ্দেশ্যে ও উদ্দীপনা নিয়ে এটা দান করা হয়েছে তা আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয়।

১৮. পানাহারে সংযম

আজ পৃথিবীর বেশীর ভাগ লোকই খাদ্য সমস্যায় জর্জরিত। অনেকে রাত দিন খেটেও নিজের এবং নিজের পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করতে পারছে না। ফলে পুষ্টির অভাবে তারা অকালে মৃত্যুবরণ করছে, অথবা নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলছে। অপরদিকে এমন লোকের সংখ্যাও কম নয় যারা মাত্রাধিক খেয়ে জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মূলে কুঠারাঘাত করছে।

আজ খাদ্য সমস্যা যেমন দুনিয়ার সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে তেমনি মাত্রাধিক পানাহারও কোনো কোনো দেশের ভয়ানক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইষ্টার এফ, ফিপার্ড ও রিলে এইচ, কার্বির মতে, মাত্রাধিক খাবার গ্রহণের দরুন আজ আমেরিকার শতকরা ২৫জন অধিবাসীর দেহের ওজন অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। ফলে তাদের দেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। লেখকদ্বয়ের মতে, বদহজমী আজ আমেরিকানদের একটি সাধারণ ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

কেবল আমেরিকাতেই নয় বরং অন্যান্য দেশেও (এমনকি খাদ্য ঘাটতি দেশগুলোতেও) এ বদ্-অভ্যাসের অস্তিত্ব আছে। বিশেষ করে আজকালকার পার্টিগুলোতে মাত্রাধিক পানাহারের ছড়াছড়ি দেখে বিবেকসম্পন্ন লোকমাত্রই অস্বস্তি বোধ করবেন। এ সমস্ত পার্টির বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে লণ্ডনের 'টাইম্স' পত্রিকায় বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডাঃ স্যার জর্জ ম্যাক রবার্টেস

www.amarboi.org

একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। স্যার জর্জ তার চিঠির এক জায়গায় লিখেছেন, "বিদেশী দূতাবাসগুলোর মধ্যে আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যে সমস্ত নিমন্ত্রণ বা পার্টির আয়োজন করা হয় তা দূতাবাস কর্মচারীদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ভীষণ আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। চিকিৎসকদের উচিত, তাঁরা যখন দূতাবাস কর্মচারী বা তাঁদের স্ত্রীদের রোগ পরীক্ষা করেন তখন যেন এ বিষয়টির প্রতিও বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন।

মানুষ ভাত না পেয়ে যেমন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তেমনি অধিক ভাত (বা যে কোনো খাদ্য) খেয়েও রসাতলে যায়। ইসলাম পানাহারের ব্যাপারে যে ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ও সময়োপযোগী মনে করে আমরা সে সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ বাঁচার জন্য খায়, খাবার জন্য বাঁচে না। ইসলাম মানুষকে পরিমিত খাবার গ্রহণের নির্দেশ দেয় এবং অপব্যয়ী হতে নিষেধ করে। কুরআন বলে ঃ

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلاَ تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لاَيُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○ (الاعراف : ٣١)

"খাও, পান কর, (কিন্তু) অপব্যয় করো না। আল্লাহ্ তাআলা অপব্যয়ীদের মোটেই ভালবাসেন না।"-(সূরা আল আরাফ ঃ ৩১)

অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তি যেন শুধু এই পরিমাণ খাবার গ্রহণ করে যা, তার জীবন ধারণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যকীয়। অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ করা মোটেই উচিত নয়। কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের সমর্থনে নিম্নে কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করা হলো।

১. হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যারা মাত্রাধিক পেট পূর্তি করে, তারা জঘন্যতম লোক। একজন মানুষের জন্য ঠিক ততটুকু খাবারই যথেষ্ট যা তাকে সোজা (সবল ও কর্মক্ষম) রাখতে পারে।-(তিরমিযী, ইবনে মাজা)

২. হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অত্যধিক স্থূলদেহবিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখে বলেছিলেন ঃ আহা ! এ লোকটি তার চেষ্টা-চরিত্রকে (কেবল পানাহারের মধ্যে নিয়োজিত না করে) অন্য ভাল কাজে নিয়োজিত করলে কত ভালই না হতো।-(তাবারানী)

৩. হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ অত্যধিক পানাহার ঈমান থেকে দূরে সরে যাওয়ার আলামত (চিহ্ন)।

www.amarboi.org

৪. হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ বিশ্বাসী (মুমিন) খায় এক পেটে আর অবিশ্বাসী খায় সাত পেটে।
–(বুখারী, মুসলিম)

৫. হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার বলেছিলেন ঃ আমি তোমাদের ব্যাপারে ভ্রষ্টতাপূর্ণ ভোগলিপ্সা যা পেট এবং যৌনাংগের সাথে সংশ্লিষ্ট, ছাড়া অন্য কোনো কিছুতেই শংকিত নই।
–(আহমদ, তাবারানী)

৬. হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার আমার এখানে এসে দেখলেন, এক টুকরা রুটি নীচে পড়ে আছে। তিনি তা উঠিয়ে পরিষ্কার করে খেয়ে নিলেন। অতপর বললেন, সম্মানীর সম্মান কর। কেননা আল্লাহ্ তাআলা যখন কোনো জাতির রিয্ক (খাদ্য) কেড়ে নেন, তখন তা আর ফিরে আসে না।–(ইবনে মাজা)

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে এটাই বুঝা যায় যে, যে পরিমাণ খাবার মানুষকে সুস্থ সবল এবং কর্মক্ষম রাখতে পারে ঠিক সেই পরিমাণ খাবারই গ্রহণ করা উচিত। অতিরিক্ত খাওয়া মোটেই উচিত নয়। যারা পানাহার এবং আয়েশ-আরামকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে, 'খাও, দাও, স্ফূর্তি কর'–এই যাদের জীবনের শ্লোগান একমাত্র তারাই রাতদিন পানাহারের পিছনে লেগে থাকে এবং পরিণামে নিজেরাই সর্বনাশ ডেকে আনে।

ইসলাম খাবারের মধ্যে যে কোনো প্রকার অপব্যয়ের ঘোর বিরোধী। আহারের পাত্রে কিছু রেখে দেয়া (যা আজকাল একটা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে) মোটেই সমীচীন নয়। গম থেকে আটা কিংবা ধান থেকে চাল বের করবার সময়ও অনেকে অনেক প্রকার অপব্যয় (যেমন তুষের সাথে খুদ ও চালের ছোট ছোট টুকরা ফেলে দেয়া) করে থাকে। এটাও (বিশেষ করে এ খাদ্য ঘাটতির যুগে) মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। গত মহাযুদ্ধের সময় বৃটেন, গম থেকে আটা বের করার সময় যাতে কোনো প্রকার অপব্যয় না হয় সে সম্পর্কে গমের মিলগুলোর উপর এক কড়া নির্দেশ জারী করে। ফলে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, গম থেকে শতকরা ৭০ ভাগের স্থলে শতকরা ৯৫ ভাগ আটা পাওয়া যাচ্ছে। জাপানের এক পরিসংখ্যানেও দেখা গেছে যে, ধান থেকে চাল বের করার সময় খুদ ও চালের যে ছোট ছোট টুকরাগুলো ফেলে দেয়া হয়, সতর্কতা অবলম্বন করলে এগুলোর প্রায় অর্ধেক পরিমাণ মানুষের খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

www.amarboi.org

মোটকথা; পানাহারের ব্যাপারে ইসলাম যে নির্দেশ দিয়েছে তা মানব জাতির সুখ-সম্পদ এবং সর্বোপরি তাদের খাদ্য সমস্যা সমাধানে যে অনেক খানি সহায়তা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১৯. শোক্‌র

মানুষ তার জীবন-যাপনের পথে দু'টি অবস্থার সম্মুখীন হয়। হয় বিপদ ও কষ্টের, নয়ত সুখ ও প্রাচুর্য্যের। যদি সে বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে তার কর্তব্য হলো ধৈর্য ধারণ করা। আর যদি সে সুখের সম্মুখীন হয় তাহলে তার কতর্ব্য হলো আল্লাহর শোক্‌র তথা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। আর শোক্‌র তিন ভাবে হতে পারে। যথা, মুখের শোক্‌র, অন্তরের শোক্‌র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শোক্‌র। মুখের শোক্‌র হলো, আল্লাহ্ প্রদত্ত নি'মাতের কথা মুখে স্বীকার করা, এটাকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা এবং একথা স্পষ্ট স্বীকার করা যে, এ নি'মাত আল্লাহর বিশেষ দান ও অনুগ্রহ ছাড়া কিছু নয়। এটাকে আপন সত্তার (চেষ্টা-প্রচেষ্টার) দিকে, আপন বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার দিকে, আপন বিদ্যা ও কলাকৌশলের দিকে কিংবা অন্য কোনো সৃষ্টির দিকে সম্পর্কিত করলে চলবে না। কেননা যে সমস্ত পথ ও মাধ্যমের সাহায্যে এ নি'মাত তোমার কাছে এসে পৌঁছেছে সেগুলো তো স্রেফ মাধ্যম ছাড়া কিছু নয়। নি'মাত দান করার কোনো ক্ষমতা বা যোগ্যতা সেগুলোর নেই। প্রকৃতপক্ষে এসব বস্তু বা সত্তা নি'মাত-দানকারী মোটেই নয় ; তবে নি'মাত দান করার মাধ্যম বটে। আর একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এ মাধ্যমগুলোকে মাধ্যম করার সমস্ত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার আল্লাহরই হাতে। এগুলোকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন, কর্ম সম্পাদনের যোগ্যতা প্রদান এবং মানুষের কাজে নিয়োজিত করার ক্ষমতা আল্লাহরই ইখতিয়ারে। এ ব্যাপারে মানুষের কোনো হাত নেই। যাবতীয় নি'মাত আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রদত্ত। আল্লাহর এসব নি'মাত ও অবদানের কথা মুখে স্বীকার করতে হবে এবং কোনো সৃষ্টির দিকে এগুলোকে সম্পর্কিত করা চলবে না। যদি কেউ এগুলোকে কোনো মানুষ, কোনো জীবজন্তু বা কোনো জড় পদার্থের দিকে সম্পর্কিত করে তাহলে সে বুদ্ধিমান নয়। কেননা বুদ্ধিমান হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে কাজের পরিণাম ও তার প্রকৃত অবস্থা দেখে এবং সে অনুযায়ী বিচার-বিবেচনার পর যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতএব যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জিনিসের শুধু বাহ্যিক অবস্থা দেখে সেটার দিকে আপন কার্যের ফলাফল সম্পর্কিত করতে থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে, সে নি'মাতের আসল উৎসের কথা ভুলে গেছে এবং যে মহান সত্তার নিকট থেকে নি'মাতসমূহ

www.amarboi.org

জারী হচ্ছে তার কাছে পৌছার মত বুদ্ধি ও বিচারশক্তি তার নেই। অতএব সে নিজেকে বুদ্ধিহীন বলেই প্রমাণিত করলো।

সাধারণত দেখা যায়, মানুষের হাতে যখন নি'মাত এসে পৌছে তখন সে এটাকে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করে না, বরং কেউ করে এর মাধ্যমসমূহের দিকে, কেউ করে নিজের বুদ্ধিমত্তার দিকে, কেউ করে নিজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার দিকে, আবার কেউ করে অন্য কিছুর দিকে। এটা তাদের বুদ্ধিহীনতা ও অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক। কেননা আল্লাহ তাআলা পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন ঃ

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ز وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ ـ

"কল্যাণ যা তোমার হয় তা আল্লাহর নিকট হতে এবং অকল্যাণ যা তোমার হয় তা তোমার নিজের কারণে।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৭৯)

যদিও অকল্যাণও আল্লাহর পক্ষ থেকেই মানুষের কাছে পৌছে, কিন্তু এর পিছনে হাত রয়েছে মানুষের অশুভ ইচ্ছা ও দুর্ভাগ্যজনক ক্রিয়াকাণ্ডের। কিন্তু কল্যাণের ব্যাপারটি এর বিপরীত। এতে মানুষের কোনো হাত নেই। এটা স্রেফ আল্লাহ তাআলার দান।

মোটকথা, যাবতীয় মাধ্যম ও কার্যকারণ, যেগুলোকে অবলম্বন করে নি'মাতসমূহ মানুষের কাছে পৌছে সেগুলোর আবিষ্কারক ও অস্তিত্বদানকারী হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা। তাই একমাত্র আল্লাহ তাআলারই শোক্‌র আদায় করতে হবে। তবে হ্যাঁ, যে সমস্ত মানুষ কোনো নি'মাতের মাধ্যমে পরিণত হয় তারাও ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের শোক্‌র আদায় করে না সে আল্লাহরও শোক্‌র আদায় করে না।

দ্বিতীয় প্রকারের শোক্‌র হলো অন্তরের শোকর। অর্থাৎ মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে অন্তরেও এ বিশ্বাস স্থাপন করা যে, যাবতীয় কর্মচাঞ্চল্য, যাবতীয় উঠাবসা, যাবতীয় নড়াচড়া, যাবতীয় শক্তি, যাবতীয় ক্ষমতা, যাবতীয় যোগ্যতা —মোটকথা যাবতীয় বস্তু ও যাবতীয় নি'মাত আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। অন্তরে এ বিষয়টিকে সবসময় হাযির রাখতে হবে।

আর তৃতীয় প্রকারের শোক্‌র হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শোক্‌র। অর্থাৎ কারো জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আন্দোলিত করা যাবে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হচ্ছে আল্লাহর নি'মাত। অতএব এগুলোকে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে ব্যবহার করতে হবে। কোনো অবস্থায়ই এগুলোকে তার অবাধ্যতায় ব্যবহার করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোনো এক মনিব তার ভৃত্যকে

www.amarboi.org

একটি অতি মূল্যবান ধারালো চাকু উপহার দিলো যাতে সে তা নিজের আত্মরক্ষার কাজে অথবা দৈনন্দিন অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার করে, কিন্তু ভৃত্য চাকুটি পেয়ে সেজন্য মনিবের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে কিংবা চাকুটি যেসব কাজে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তাকে দেয়া হয়েছে সেসব কাজে তা ব্যবহার না করে সোজা মনিবের পেটে ঢুকিয়ে দিল। আল্লাহ্ মানুষকে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেন তা ঐ মূল্যবান চাকুর ন্যায়ই বান্দার প্রতি মহান প্রভু আল্লাহ্ তাআলার এক একটি উপহার, এক একটি বিরাট নি'মাত। এই সমস্ত নি'মাতকে আল্লাহর অবাধ্যতায় ব্যবহার করা ঐ নির্বোধ ভৃত্য কর্তৃক তার মনিবের উপহৃত চাকুটি নিজের উপকারে না লাগিয়ে কিংবা সে জন্য মনিবের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে সোজা তার পেটে ঢুকিয়ে দেয়ারই নামান্তর।

মোটকথা, আল্লাহ্ যেসব নি'মাত মানুষকে দান করেছেন সেগুলোকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করা চাই এবং সেজন্য সর্বোতভাবে আল্লাহর শোক্‌র আদায় করা চাই।

এক্ষেত্রে মানুষের জন্য একটি বড় সুসংবাদ এই যে, আল্লাহ্ যে নি'মাত তাদেরকে দান করেন সেগুলোর জন্য শোক্‌র আদায় করলে শুধু তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বই পালন করা হয় না, সে জন্য তারা আল্লাহ তাআলার অতিরিক্ত পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য বলেও বিবেচিত হয়। যেমন আল্লাহ্ তাআলা পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন ঃ

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ -(ابرهيم : ٧)

"স্মরণ করো, তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দেব।"–(সূরা ইবরাহীম ঃ ৭)

রাসূলুল্লাহ (স) ঘোষণা করেছেন, পানাহার করে শোক্‌র আদায়কারীর মর্যাদা রোযা রেখে ধৈর্য ধারণকারীর অনুরূপ। অর্থাৎ খেয়ে দেয়ে আল্লাহর শোক্‌র আদায় করলে আল্লাহর সেই পুরস্কারের অধিকারী হওয়া যায়—যে পুরস্কারের অধিকারী হয় একজন মানুষ, ধৈর্যের সাথে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্ট সহ্য করে সারাদিন (নফল) রোযা রেখে।

২০. সব্‌র

মানুষের জীবনে যখন সেই অবস্থা আসে, যা সে মনে-প্রাণে কামনা করে তখন সেটাকে নি'মাত বলা হয়। এ অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার শোক্‌র আদায়

www.amarboi.org

করতে হয়। আর যখন মানুষ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়—অর্থাৎ তার জীবনে বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয় তখন মনে করতে হবে যে, এটা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে তার জন্য একটি পরীক্ষা ছাড়া কিছু নয়। এ অবস্থায় তাকে অবশ্যই সবর তথা ধৈর্যাবলম্বন করতে হবে। কেননা এর মধ্যেও অনেক গোপন রহস্য রয়েছে—রয়েছে তার জন্য অনেক শিক্ষণীয় বিষয়। আর এটা তো জানা কথা যে, মানুষ বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন না হলে আল্লাহর নি'মাত কত মূল্যমান এবং তা ভোগ করার মধ্যে কি স্বাদ রয়েছে তা সে সত্যিকার অর্থে উপলব্ধিই করতে পারে না। কিন্তু মানুষ যেহেতু সৃষ্টিগত-ভাবে ত্বরাপ্রবণ এবং একটুতেই সে হতাশ হয়ে পড়ে তাই বিরূপ পরিস্থিতিতে ধৈর্যাবলম্বন করা এবং যথাযথভাবে সে পরিস্থিতির মুকাবালা করা যাতে তার পক্ষে সহজ হয় সেজন্য সে যে মাঝে মধ্যে বিরূপ পরিস্থিতি তথা বিপদাপদের সম্মুখীন হবে সে ঘোষণা আল্লাহ্ তাআলা আগাম দিয়ে রেখেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۝ (البقرة : ١٥٥)

"আমি তোমাদেরকে ভয়, ক্ষুধা এবং ধন-সম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দ্বারা অবশ্য পরীক্ষা করবো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৫)

অর্থাৎ কখনো প্রাণের, কখনো ধন-সম্পদের, কখনো সন্তান-সন্ততির ক্ষতি দ্বারা, আবার কখনো ক্ষুধা, কখনো ভয়-ভীতি, কখনো দারিদ্র ও অভাব-অনটন, কখনো দুঃখ-কষ্ট, কখনো রোগব্যাধি, আবার কখনো মানসিক অশান্তি দ্বারা আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো, কিন্তু ঐসব অবস্থায় ধৈর্যধারণ করাই তোমাদের জন্য মংগলজনক। যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْآ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ۝ (البقرة : ١٥٥-١٥٦)

"(হে নবী,) তুমি শুভ সংবাদ দাও ধৈর্যশীলদেরকে, যারা তাদের উপর বিপদ আপতিত হলে বলে, 'আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৫-১৫৬)

প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানুষ কোনো কিছুরই প্রকৃত মালিক নয়। তার কাছে যা কিছু আছে তা আল্লাহ্ তাআলার দেয়া নি'মাত, যা চিরকালের জন্য নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাকে দেয়া হয়েছে ; এর প্রকৃত মালিক

www.amarboi.org

আল্লাহ ; মানুষের কাছে এটি আমানত স্বরূপ রাখা হয়েছে মাত্র। তিনি যখন ইচ্ছা তখন এটি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেবেন। খোদ মানুষের দেহে তথা অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ-প্রদত্ত যেসব নি'মাত রয়েছে তাও তিনি একদিন ফেরত নিয়ে নেবেন। কেননা তিনিই এগুলোর প্রকৃত মালিক। আমরা কোনো কিছুরই মালিক নই। যে সমস্ত বস্তুকে আমরা আমাদের বলে দাবী করি বাস্তবে সেগুলো আমাদের নয়, বরং আল্লাহর কাছ থেকে ধার করা—তাও আবার চিরদিনের জন্য নয়, বরং এমন একটি অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য যার কোনো নিশ্চিত জ্ঞান আমাদের নেই। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'ইন্না লিল্লাহ' (আমরা তো আল্লাহরই)-এর অর্থও তাই। অর্থাৎ আমাদের ধন-প্রাণ সবকিছুরই প্রকৃত মালিক আল্লাহ তাআলা। অতএব 'সবর' তথা ধৈর্যাবলম্বনের অর্থ হলো, বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্টে পতিত হলে কখনো আল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা চলবে না এবং একথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তার দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী। অর্থাৎ আমাদের কাছে যে ধন-সম্পদ ছিল তা তিনিই নিয়ে গেছেন এবং আমরাও একদিন তার কাছে ফিরে যাব।

উপরোক্ত আয়াতে দু'টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে সংক্ষেপে, অথচ অতি চমৎকারভাবে। এক ঃ এ সমস্ত নি'মাত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে বটে, তবে আমাদেরকেও তো একদিন ছিনিয়ে নেয়া হবে। অন্য কথায়, শুধু এ সমস্ত নি'মাতের নয় বরং আমাদেরও কোনো স্থায়িত্ব নেই। অতএব এগুলোর জন্য দুঃখ করে কী লাভ ? দুই ঃ আমরা যে কোনো মুহূর্তে যখন আল্লাহর দরবারে গিয়ে হাযির হব তখন তিনি এ সমস্ত বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তির বিনিময়ে আমাদেরকে পুরস্কৃত করবেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মানুষ যদি কোনো কষ্ট পায়, কোনো ব্যাধি, কোনো অশান্তি, কিংবা জ্বালাযন্ত্রণায় ভোগে—এমনকি তার দেহে কোনো কাঁটাও যদি বিধে তাহলে আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেন।-(বুখারী, মুসলিম)

তিনি (সাঃ) আরো বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন (দুনিয়ার) বিপন্ন লোকদেরকে পুরস্কার প্রদান করা হবে তখন (দুনিয়ার) সুখ-সম্পদের অধিকারী লোকেরা এ মর্মে আকাঙ্খা পোষণ করবে, হায় ! যদি (দুনিয়ায়) সুখ-সম্পদের পরিবর্তে (দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদের) কাঁচি দ্বারা আমাদের দেহের চামড়া ছিলে ফেলা হতো (তাহলে আমরাও তার বিনিময়ে আজ বড় বড় পুরস্কার লাভ করতাম)।

www.amarboi.org

এটা আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ ইহ্সান ও অনুগ্রহ যে, মুমিন বান্দা যখন কষ্টের মধ্যে নিপতিত হয় এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সে অবস্থায়ও ধৈর্যধারণ করে, কোনোরূপ প্রতিবাদ বা অভিযোগ করে না—তখন আল্লাহ্ তাআলা তার জন্য আপন ইনাম ও পুরস্কারের দরজা উন্মুক্ত করে দেন।

২১. হিতাকাঙ্খা

অন্যের প্রতি হিতাকাঙ্খা ও সুধারণা পোষণ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক গুণ। মুসলিম শরীফের একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দ্বীন হচ্ছে হিতাকাঙ্খা ও সুধারণা পোষণেরই নাম।

এ হিতাকাঙ্খা তথা সুধারণা পোষণ একটি ব্যাপক শব্দ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণের অর্থ হচ্ছে তার উপর ঈমান আনা, তাকে লা শরীক ও যাবতীয় পবিত্র গুণে গুণান্বিত মনে করা, তিনি যে সর্বপ্রকার দুর্বলতার উর্ধে একথা বিশ্বাস করা, তার নির্দেশাবলী মেনে চলা, তিনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে দূরে থাকা, যে তার আনুগত্য করে তার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা এবং যে তার অবাধ্যতা করে ও তার নি'মাতের না-শোক্রী করে তার সাথে সম্পর্ক না রাখা।

আর আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি সুধারণা পোষণের অর্থ হলো, এর প্রত্যেকটি বাণীকে সত্য বলে মানা এবং একথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করা যে, এটা আল্লাহ্রই কাছ থেকে অবতীর্ণ আল্লাহ্রই কালাম এবং এ ধরনের কালাম বা বাণী রচনা করা মানুষের সাধ্যের অতীত। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ্র কিতাবের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে হবে, অত্যন্ত পবিত্র মনে ও নিবিষ্ট চিত্তে তা তিলাওয়াত করতে হবে, এতে আল্লাহ্ তাআলার যে সমস্ত আদেশ-নির্দেশ রয়েছে তা মেনে চলতে হবে, এতে যে সমস্ত শিক্ষণীয় উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হয়েছে, যে সমস্ত ওয়ায-নসীহত করা হয়েছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে এবং অন্যের কাছে তা প্রচার করতে হবে।

আর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি সুধারণা পোষণের অর্থ হলো, তিনি যে আল্লাহ্র রাসূল তা মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে, তিনি যে আদেশ-নিষেধ নিয়ে এসেছেন সেগুলোর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে। তিনি যে সুন্নাত বা রীতিনীতি কায়েম করে গেছেন সেগুলোকে অনুসরণ করতে হবে। সেগুলোকে সর্বপ্রকার পরিবর্তন-পরিবর্ধন

www.amarboi.org

থেকে রক্ষা করতে হবে। যদি কেউ সেগুলোর সমালোচনা করে তাহলে সে সমালোচনা যথাসম্ভব প্রতিহত করতে হবে। যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখে তার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে শত্রুতা রাখে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে শরীআত্ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তার প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থা করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে হাদীস রেখে গেছেন কোনোরূপ স্পষ্ট দলীল-প্রমাণ ছাড়া সেগুলোর কোনো সমালোচনা করা চলবে না, বরং সেগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবন গড়ে তুলতে হবে। যারা বিদাতী অর্থাৎ যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাতের মধ্যে নিজেদের পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য নতুন নতুন কথা গড়ে নেয় তাদেরকে প্রতিহত করতে হবে এবং তা করা সম্ভব না হলে তাদের থেকে দূরে সরে থাকতে হবে।

আর সাধারণ মুসলমানদের প্রতি হিতাকাঙ্খা পোষণের অর্থ হলো, তাদেরকে এমন সব কাজের প্রতি পথ-প্রদর্শন করতে হবে, যা তাদের দুনিয়া-আখিরাতের সাফল্য বয়ে নিয়ে আসে। তাদেরকে কোনোরূপ কষ্ট দেয়া চলবে না। যদি তারা কোনো দ্বীনী বিষয় সম্পর্কে অনবহিত থাকে তাহলে সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করতে হবে। শিক্ষাদীক্ষা ও কাজেকর্মে তাদেরকে সাহায্য-সহায়তা করতে হবে, তাদের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দিতে হবে। নম্রভাবে ও সুকৌশলে তাদেরকে ভাল কাজের নির্দেশ দিতে হবে এবং খারাপ কাজ থেকে তাদেরকে রুখে রাখতে হবে। তাদের মধ্যে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে এবং যারা বয়োকনিষ্ঠ তাদেরকে স্নেহ করতে হবে এবং ভালো কাজের প্রতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। যে জিনিস নিজের জন্য পছন্দ করা হয় তা তাদের জন্যও পছন্দ করতে হবে। মানুষের জানমাল এবং সম্মান-মর্যাদার হিফাযত করতে হবে।

হযরত জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিবেদন করলাম ঃ হে আল্লাহর রাসূল, আমি ইসলামের উপর আপনার হাতে বাইয়াত করছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলেন, যেন আমি প্রত্যেকটি মুসলমানের প্রতি হিতাকাঙ্খা পোষণ করি।−(মুসলিম)

'দ্বীন হচ্ছে হিতাকাঙ্খা পোষণেরই নাম'−এটি হচ্ছে এমন একটি হাদীস যাকে ইসলামের সার-নির্যাস বলা চলে। আজ যখন আমাদের সমাজে পরের ক্ষতি করে হলেও নিজের স্বার্থ হাসিলের প্রবণতা প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে

www.amarboi.org

উঠেছে তখন রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর এ হাদীস মুসলিম সমাজ এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর পথ-প্রদর্শক হিসাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

২২. আত্মীয়তার বন্ধন

মানুষের সামাজিক জীবনে যে সমস্ত বিষয় অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ তার মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন হলো অন্যতম। এ আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখার জন্য আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল মুসলমানদেরকে বারবার সতর্ক করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায়, যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখে তাদেরকে যেমন পুরস্কারের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে তেমনি যারা এ সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে কঠিন শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। যেমন :

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ○

"আল্লাহ্কে ভয় কর, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে যাচ্না কর এবং সতর্ক থাক আত্মীয়তার বন্ধন সম্পর্কে। আল্লাহ্ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।"–(সূরা আন নিসা : ১)

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖۤ اَنْ
يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ لا اُولٰۤئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْۤءُ الدَّارِ ـ

"যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর তা ভঙ্গ করে, যে (আত্মীয়তার) সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আল্লাহ্ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য আছে অভিশাপ এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস।"–(সূরা আর রাদ : ২৫)

আত্মীয়তার বন্ধন যতো মজবুত হবে ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন হবে তত মধুর ও উপভোগ্য। এ কারণে সকল আত্মীয়-স্বজনের সাথেই সম্পর্ক অটুট রাখা চাই। তবে পিতা-মাতার সম্পর্ককে অটুট রাখার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং পবিত্র কুরআনে তার কারণও বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ط حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط
وَحَمْلُهٗ وَفِصٰلُهٗ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا ط حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهٗ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً لا

www.amarboi.org

قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْٓ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ

صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ ط اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَاِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি (বিশেষ করে মাতার সাথে আরো বেশী সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি) এজন্য যে, তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও স্তন ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হবার পর (যখন তার বিবেকবুদ্ধি পরিপক্ক হয় তখন) বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ দাও, যাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতামাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করেছ, তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা তুমি পছন্দ কর ; আমার জন্য আমার সন্তান-সন্ততিকে সৎকর্ম-পরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম।"–(সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫)

এ জাতীয় বান্দাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলা পরিষ্কার ঘোষণা করছেন ঃ

اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّاٰتِهِمْ فِىْٓ

اَصْحٰبِ الْجَنَّةِ ط وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ○(الاحقاف : ١٦)

"আমি এদেরই সুকৃতিগুলো গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে (তাদের সুকৃতির বিনিময়ে জান্নাত লাভের) যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে।"–(সূরা আল আহকাফ ঃ ১৬)

মাতাপিতার আনুগত্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করে পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ط وَاِنْ جَاهَدٰكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ

عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ○

"আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে; তবে ওরা যদি তোমার উপর বলপ্রয়োগ করে, আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে, যার সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তুমি তাদেরকে

www.amarboi.org

তাহলে প্রথমবার সালাম নিয়ে পুনঃ উত্তর দেবে না, বরং দ্বিতীয়বার সালাম কর। (আবু দাউদ)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি 'আসসালামু আলাইকুম' বলে না, তাকে ভিতরে আসার অনুমতি দিও না। (আহমদ, বায়হাকী)

একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যখন তোমরা নিজেদের ঘরে প্রবেশ কর তখন 'আসসালামু আলাইকুম' বল। কেননা এ সালাম তোমাদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনের কল্যাণ ও বরকতের কারণ হবে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে ঘরে প্রবেশ করে আল্লাহ তাআলা সেই ঘরের আলো-বাতাস, খাদ্য ও পরিবারের হিফাযতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির ঘরে ঝগড়া-ঝাটি ও অশান্তির সৃষ্টি হয় না। (তিরমিযী)

মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সালামের উপর এতই গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে, তা মুসলমানদের একটি জাতীয় বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ)-এর একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) কোনো কাজ না থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই বাজারে চলে যেতেন। একদা জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করে, এর পিছনে কি কারণ রয়েছে যে, আপনি কোনো কাজ ছাড়াই বাজারের মধ্যে ঘুরাঘুরি করেন? তিনি উত্তর দেন, আমি বাজারে ঘুরাঘুরি করি শুধু এজন্য যে, লোকদেরকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলবো। আর যদি কেউ আমাকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে তাহলে আমি তার জবাব দেব। আর এতে ভারী হবে আমার পুণ্যের পাল্লা। (আবু দাউদ)

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রথমে সালাম দেয়া সুন্নাত, আর সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য)। সালাম করার সময় মুসাফাহা বা করমর্দন করাও সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মুসাফাহা দ্বারা সালাম পরিপূর্ণতা লাভ করে। (তিরমিযী)

তিনি (সাঃ) আরো বলেন, যখন দু'জন মুসলমান পরস্পরের সাথে মুসাফাহা করে তখন একজনের হাত থেকে অপরজনের হাত ছাড়া পাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা তাদের উভয়ের গুনাহ মাফ করে দেন। (আহমদ, তিরমিযী)

সালাম দেয়ার সময় মাথা ঝুঁকানো উচিত নয়। যদি কোনো ব্যক্তি দূর-দূরান্ত থেকে আসে বা দীর্ঘদিন পর কারো সাথে দেখা হয় তাহলে সালাম,

www.amarboi.org

নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার নির্দেশ অনুসারে মজলিস থেকে উঠে আমার খালার কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখে ছিলেন। আমি যখন হঠাৎ তার সামনে গিয়ে হাযির হলাম তখন তিনি বললেন, আরে তুমি এসেছ। এভাবে আমাকে স্বাগত জানানোর কারণে আমি আল্লাহর কাছে খালার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করলাম এবং তার সাথে আমার সম্পর্ক স্বাভাবিক করে পুনরায় এখানে ফিরে এলাম। হুযুর (সাঃ) তখন বললেন, তুমি খুব ভাল কাজ করেছ, বসে পড়। ঐ জাতির উপর আল্লাহর কৃপা বর্ষিত হয় না যাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী কোনো ব্যক্তি থাকে।

মোটকথা, একে অপরকে 'আসসালামু আলাইকুম' বলা যেমন একটি ... সমাজে সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে হলে পারস্পরিক সম্পর্ক অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। এজন্য প্রথমে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে, অতঃপর পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে, অতঃপর বৃহত্তর সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ককে মধুর করে তুলতে হবে। একে অন্যের সাথে এমন কোনো আচরণ করা ঠিক নয় যাতে পরস্পরের সম্পর্কের মধ্যে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোনো মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে আপন (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে তিন দিনের চেয়ে অধিক সময় সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখবে। যদি সে তাই করে এবং এর মধ্যে মারা যায় তাহলে সে জাহান্নামে যাবে।

২৩. দু'আ

একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, বিশ্বের এ কর্মধারাটি আল্লাহরই হুকুমে পরিচালিত হচ্ছে এবং সবকিছু তাঁরই কব্জায় রয়েছে। অতএব ছোট-বড় যে কোনো প্রয়োজনে আল্লাহরই শরণাপন্ন হওয়া বান্দার জন্য একান্ত স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই দেখা যায়, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে দু'আ করে থাকে। ইসলাম তো দু'আর উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। খোদ আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন ঃ

اُدْعُوْنِیْۤ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ط (المؤمن : ٦٠)

"তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"

—(সূরা আল মুমিন ঃ ৬০)

তিনি আরো ঘোষণা করেছেন ঃ

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌ ط اُجِیْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ لا

www.amarboi.org

"আমার বান্দারা যখন আমার সম্বন্ধে (হে মুহাম্মদ) তোমাকে প্রশ্ন করে, (বলো,) আমি তো নিকটেই। আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই।"—(সূরা আল বাকারা : ১৮৬)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, দু'আ হচ্ছে একটি ইবাদাত। তিনি আরো বলেছেন, দু'আ হচ্ছে ইবাদাতের মস্তিষ্ক। একটি রেওয়ায়াতে আছে, আল্লাহর কাছে দু'আর চেয়ে অধিক মর্যাদা অন্য কোনো জিনিসের নেই। অপর একটি রেওয়ায়াতে আছে, আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হন, যে আপন অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনাদি পূরণের জন্য তার কাছে দু'আ না করে। লক্ষণীয় ব্যাপারই বটে। দুনিয়ায় আমরা সচরাচর দেখি যে, কোনো ব্যক্তি যদি তার প্রয়োজন পূরণের জন্য বার বার আপন অন্তরঙ্গ বন্ধু কিংবা একান্ত নিকট-জনেরও শরণাপন্ন হয় তাহলে তারা তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, এমনকি অসন্তুষ্ট হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি এতই দয়াশীল যে, তারা তার কাছে তাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য দু'আ না করলে বরং তিনি অসন্তুষ্ট হন। একটি রেওয়ায়াতে আছে, যে ব্যক্তির জন্য দু'আর দরজা খুলে গেছে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে আন্তরিকভাবে দু'আ করার সৌভাগ্য লাভ করেছে) তার জন্য খুলে গেছে আল্লাহর রহমতের দরজা।

মোটকথা, কোনো প্রয়োজন পূরণ কিংবা লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে দু'আ করা যেমন ঐ লক্ষ্য অর্জনের একটি প্রচেষ্টা বটে, তেমনি তা উচ্চ মর্যাদার একটি ইবাদাতও বটে। দু'আকারীর প্রতি আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং তার জন্য আপন রহমতের দরজা খুলে দেন। এ অবস্থা প্রত্যেক দুআর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—চাই তা কোনো দ্বীনী লক্ষ্য অর্জনের জন্য হোক অথবা পার্থিব। অবশ্য এক্ষেত্রে একটি শর্ত আছে। আর তা এই যে, দু'আ যেন কোনো খারাপ ও অবৈধ কাজের জন্য না হয়। অবৈধ কাজের জন্য দু'আ করাও অবৈধ এবং নিছক পাপাচার।

এক্ষেত্রে একটি কথা স্মরণ রাখা চাই যে, যতবেশী অভিনিবেশ সহকারে দু'আ করা হবে, নিজেকে অক্ষম ও অসহায় মনে করে তাতে যত বেশী বিনয় প্রকাশ করা হবে এবং আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার উপর যত বেশী বিশ্বাস ও আস্থা রাখা হবে ততবেশী আশা করা যাবে যে, ঐ দু'আ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা ঐ দু'আ কবুল করেন না, যে দু'আ অন্যমনস্কতার সাথে করা হয়।

আল্লাহ তাআলা বান্দার প্রতিটি মুহূর্তেরই দু'আ কবুল করেন। তবে হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, কোনো কোনো বিশেষ মুহূর্তে বান্দার দু'আ

www.amarboi.org

"বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়ম-তনয় (ঈসা) কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল—এটা এজন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যে সব গর্হিত কাজ করতো তা থেকে একে অন্যকে বারণ করতো না। তারা যা করতো নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট।

—(সূরা আল মায়েদা : ৭৮-৭৯)

اَلْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوْفِ وَيَقْبِضُوْنَ اَيْدِيَهُمْ ؕ نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ ؕ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ○ (التوبة : ٦٧)

"মুনাফিক নর ও নারী একে অপরের অনুরূপ। তারা অসৎ কর্মের নির্দেশ দেয়, সৎকর্ম থেকে বারণ করে এবং নিজেদের হাত বন্ধ রাখে দান থেকে। তারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে তিনিও তাদের বিস্মৃত হয়েছেন। মুনাফিকরা তো সত্যত্যাগী।"—(সূরা আত তাওবা : ৬৭)

وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَيُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ○ (التوبة : ٧١)

"বিশ্বাসী নরনারী একে অপরের বন্ধু তারা সৎকার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎকাজ থেকে বারণ করে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে ; আল্লাহ এসব লোকদের কৃপা করবেন, তিনি (আল্লাহ) পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"—(সূরা আত তাওবা : ৭১)

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ○ (الحج : ٤١)

"তারা (বিশ্বাসীরা) এরূপ লোক যে, যদি আমি তাদেরকে দুনিয়াতে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, সৎকর্মের আদেশ দেবে এবং অসৎকর্ম হতে বারণ করবে এবং সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহরই ইখতিয়ারে।"—(সূরা আল হাজ্জ : ৪১)

কুরআন ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় প্রতিরোধের উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, যারা কুরআনের সত্যিকার অনুসারী তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হবে

www.amarboi.org

ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপন। আর যারা এ দুটি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয় তারাই প্রকৃতপক্ষে মানুষের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে পারে। তারাই শ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠী—মানুষের মঙ্গলের জন্যই তাদের আবির্ভাব। কুরআন বলে :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ط (ال عمران : ١١٠)

"তোমরাই (কুরআনের সক্রিয় অনুসারীরাই) শ্রেষ্ঠ দল, মানব জাতির জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং অসৎকাজ থেকে বাধা দাও এবং আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখ।"

—(সূরা আলে ইমরান : ১১০)

৪. শান্তিশৃংখলা

বিশ্বে শান্তিশৃংখলা প্রতিষ্ঠা এবং তা অক্ষুণ্ন রাখার উপর কুরআন অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। কুরআন মানবজাতিকে শান্তির পথ অনুসরণ ও অশান্তির পথ পরিহার করতে বলেছে এবং বার বার সাবধান করে দিয়েছে অশান্তি সৃষ্টির অশুভ পরিণাম সম্পর্কে।

বিশ্বে অশান্তি সৃষ্টি হয় নানা কারণে। তবে মূল কারণ হলো, আল্লাহর অস্তিত্বে অবিশ্বাস এবং তার আদেশ-নির্দেশ পালনে অনীহা। মানুষ যদি আল্লাহ তাআলাকে সক্রিয়ভাবে বিশ্বাস করে, তার আদেশ-নির্দেশ পালন করে এবং তিনি মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের প্রতি যেরূপ সম্পর্ক রাখার আদেশ দিয়েছেন সেরূপ সম্পর্ক রাখে এবং যেরূপ আচরণ করার আদেশ দিয়েছেন সেরূপ আচরণ করে তাহলে বিশ্বে কোনো অশান্তি কিংবা বিশৃংখলা থাকে না—থাকে না জুলুম, অত্যাচার, প্রতারণা, খুন, রাহাজানি ইত্যাদি দুষ্কর্মের মাধ্যমে একে অন্যের উপর আধিপত্য বিস্তারের অপচেষ্টা। আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপনের অর্থই হলো তাঁকে একমাত্র প্রভু এবং উপাস্য বলে স্বীকার করা এবং তাঁরই প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী বিশ্বে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করা।

উপরোক্ত কারণেই কুরআন সর্বপ্রথম এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার উপর বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর আরাধনা এবং তাঁর আদেশ-নির্দেশ পালনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। অতঃপর দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি থেকে বিরত থাকার

www.amarboi.org

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কৃষি-কৃষ্টি-সংস্কৃতি

১. কৃষি

আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য বিশ্বজগতের আনাচে-কানাচে যেসব খাদ্যবস্তু ছড়িয়ে রেখেছেন সেগুলোর সংরক্ষণ, প্রতিপালন ও আহরণের নাম কৃষি। বিভিন্ন আহার্য দ্রব্য উৎপাদন ও আহরণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বিভিন্ন উপকরণকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোকেও আজকাল কৃষি নামে অভিহিত করা যেতে পারে। ফসল উৎপাদন, পশুপাখী পালন, মাছ চাষ, মৌমাছি চাষ, বৃক্ষ রোপণ — এসব কিছুই কৃষির অন্তর্ভুক্ত।

প্রধানতঃ কৃষির উন্নতি-অবনতির উপর মানুষের কৃষ্টি-সভ্যতার উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে। তাই ইসলাম স্বাভাবিকভাবেই কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

মনোনিবেশ সহকারে কুরআন অধ্যয়ন করলে বার বার মনে হয়, যেন ইসলামের আদেশ-নিষেধগুলো কোনো একটি কৃষি-পেশাদার জাতিকে কেন্দ্র করেই নাযিল হয়েছে। কুরআনকে বুঝতে হলে এবং আল্লাহ যে এক, সর্বশক্তিমান ও পরম দয়ালু তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে যেন কৃষক অথবা কৃষি-অনুরাগী হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা যারা কৃষি কাজ করেন এবং কৃষি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করেন তাদের চোখে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অতি সহজেই ধরা পড়ে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ءَإِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ (النمل ٦٠)

এবং তিনি যিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি, অতঃপর আমি তা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি যার বৃক্ষাদি উদগত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই।

www.amarboi.org

আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি ? তবুও ওরা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্যবিচ্যুত হয়।"—(সূরা আন নামল ঃ ৬০)

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝ (النحل: ٦٥)

"আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে তিনি ভূমিকে ওটার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন। অবশ্যই এতে নিদর্শন আছে, যে সম্প্রদায় কথা শুনে তাদের জন্য।"—(সূরা আন নাহল ঃ ৬৫)

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ۝

"ওদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত জমি, যাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে উৎপন্ন করি শস্য যা ওরা ভক্ষণ করে।"—(সূরা ইয়াসীন ঃ ৩৩)

আল্লাহ তা'আলা মানুষের উপকারার্থেই জমি সৃষ্টি করেছেন। মানুষ এ জমি থেকে তাদের উপজীবিকা ভোগ করুক—এটা আল্লাহরই নির্দেশ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ

"তিনিই তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম (ব্যবহার্য) করে দিয়েছেন ; অতএব তোমরা দিগ-দিগন্তে বিচরণ কর এবং তার প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ করো।"—(সূরা আল মুলক ঃ ১৫)

জমির উপর আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নি'মাত ছড়িয়ে রেখেছেন এবং মানুষের জন্য প্রধানত এগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা চাষাবাদ করলে এ জমি থেকে আল্লাহর নি'মাতগুলো অনায়াসে লাভ করতে পারে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۝ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۝ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝ (الرحمن: ١٠-١٣)

"তিনি ভূমিকে স্থাপন করেছেন (প্রধানত) মানব সমাজের জন্য ; এতে রয়েছে ফলমূল ও খেজুর গাছ যার ফল আবরণমুক্ত, আর খোসাবিশিষ্ট

www.amarboi.org

তোমার কাছ থেকে চলে যায় তখন পৃথিবীতে অশান্তির সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তুর বংশ নিপাতের চেষ্টা করে; কিন্তু আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। যখন তাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর' তখন তার আত্মাভিমান তাকে পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত করে। অতএব জাহান্নামই তার যোগ্য স্থান। নিশ্চয় ওটা নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল।"—(সূরা বাকারা ঃ ২০৪-২০৬)

যারা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত এবং দুনিয়ায় অশান্তি সৃষ্টি করে তারা প্রকৃতপক্ষে অমান্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত জীবনব্যবস্থাকে। তাদের আচরণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণারই শামিল। আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দুনিয়ায় ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়, কুরআন তাদের শাস্তি নির্ধারণ করতে গিয়ে বলেছে ঃ

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ○

"তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা ক্রুশবিদ্ধ করা হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় এটাই তাদের লাঞ্ছনা এবং পরকালে রয়েছে তাদের জন্য মহাশাস্তি।"—(সূরা আল মায়েদা ঃ ৩৩)

৫. আমানত প্রত্যর্পণ

ইসলামের দৃষ্টিতে আমানত একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এমন প্রত্যেকটি জিনিসকেই আমানত বলা হয় যার সাথে কারো না কারো হক সম্পৃক্ত রয়েছে এবং সে হক প্রত্যর্পণ করা অত্যন্ত জরুরী। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ۙ (النساء : ٥٨)

"আমানতসমূহ তার হকদারকে প্রত্যর্পণ করার জন্য আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন।"—(সূরা আন নিসা ঃ ৫৮)

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমানত প্রত্যর্পণ করে না তার ঈমান পরিপূর্ণ নয় এবং যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না তার দীন পরিপূর্ণ নয়।

আমানতের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সম্পত্তি, সম্মান, পদ, পদবী, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা—এসবই এক একটি আমানত। মানুষের প্রাণ, মানুষের সুস্থ ও অক্ষত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং তার ইন্দ্রিয়সমূহও এক একটি আমানত। যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে এ সমস্ত আমানতের অধিকারী করেছেন ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই এগুলোর ব্যবহার করতে হবে। অন্যথায় এটা 'আমানতের খিয়ানত' বলে গণ্য হবে এবং পরিণামে মহান দাতা আল্লাহ তায়ালার কাছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জবাবদিহি করতে হবে। এ কারণেই ইসলাম আত্মহত্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة : ١٩٥)

"তোমরা নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"-(সূরা আল বাকারা: ১৯৫)

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেই নিজেকে হত্যা করবে সে কিয়ামতের পরও অনুরূপভাবে নিজেই নিজেকে হত্যা করতে থাকবে। কোনো ব্যক্তি যদি নিজেই নিজেকে ধারালো ছুরি দ্বারা হত্যা করে ফেলে তাহলে কিয়ামতের পরও সে অনুরূপভাবে সর্বক্ষণ নিজেই নিজেকে হত্যা করতে থাকবে। কারণ, মানুষের প্রাণ তার কাছে আল্লাহ তায়ালার আমানত ছাড়া কিছু নয়। অতএব এটাকে ধ্বংস করার বা এর অপব্যয় করার কোনো অধিকার মানুষের নেই। বরং আল্লাহর এ দানের মধ্যে যার যে হক বা অধিকার রয়েছে তা যথাযথভাবে তাদের কাছে প্রত্যর্পণ করাই মানুষের কর্তব্য ও দায়িত্ব। অনুরূপভাবে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক, সন্তান, নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ইত্যাদিও এক একটি আমানত ছাড়া কিছু নয়।

অনুরূপভাবে বিদ্যাও একটি আমানত। এটা দানের সাথে বিশেষ সম্পৃক্ত—অর্থাৎ যিনি শিক্ষক তার ব্যক্তিসত্তাটিই তার কাছে এক একটি আমানত। ছাত্রদের প্রতিভাও শিক্ষকের কাছে একটি আমানত। ছাত্রদের সময়ও তার কাছে একটি আমানত। অতএব শিক্ষক যদি ছাত্রদের শিক্ষা-দীক্ষার সঠিক ব্যবস্থা না করেন, তাদের প্রতিভা এবং তাদের সময়কে যথাযথভাবে কাজে না লাগান তাহলে আল্লাহ তায়ালার কাছে তাকে এজন্য জবাবদিহি করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় পদ-পদবী তথা নেতৃত্ব, কর্তৃত্বও একটি বিরাট আমানত। যার হাতে আল্লাহ তায়ালা এ আমানত অর্পণ করেছেন তাকে যেন তিনি আপন বান্দাদের প্রতিপালনের জন্য এ দুনিয়ায় নিজের প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হবে আল্লাহর বান্দাদের

www.amarboi.org

তত্ত্বটির দিকে বার বার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ○ (السجدة : ٢٧)

"ওরা কি লক্ষ্য করে না, আমি উষর ভূমির উপর পানি প্রবাহিত করে ওর সাহায্যে উদগত করি শস্য, যা থেকে আহার্য গ্রহণ করে ওদের পশুগুলো এবং ওরা নিজেরাও ; ওরা কি তবুও লক্ষ্য করবে না ?"

(সূরা আস সাজদা ঃ ২৭)

গৃহপালিত পশু দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে ক্ষেত্রের ফসল বিনষ্ট করা একটি জঘন্য অপরাধ। এ অপরাধের শাস্তি কি হতে পারে, পবিত্র কুরআনে তারও পরোক্ষ উল্লেখ রয়েছে।

একদা রাতের বেলা কোনো এক ব্যক্তির মেষপাল অন্য ব্যক্তির আংগুর বা এ জাতীয় কোনো শস্য ক্ষেতে ঢুকে সমস্ত ফসল বিনষ্ট করে দেয়। ক্ষেতের মালিক, হযরত দাউদ (আঃ)-এর কাছে এর বিচার প্রার্থনা করলে তিনি ফসলের ক্ষতিপূরণ বাবদ মেষপালের মালিককে আর মেষগুলো অবিলম্বে ক্ষেতের মালিকের হাতে সোপর্দ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু বালক সুলাইমান (আঃ) পিতা দাউদ (আঃ)-এর এ রায়ের সাথে একমত হতে পারেননি। তিনি সুপারিশ করেন, যেন মেষপালটি ক্ষেতের মালিককে সাময়িকভাবে দিয়ে দেয়া হয়। এখন থেকে মেষপালের মালিক ক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, আর ক্ষেতের মালিক মেষপালের দুধ ইত্যাদি থেকে উপকৃত হতে থাকবে। মেষপালের মালিক ক্ষেতের মধ্যে পানি সিঞ্চন এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদি অবলম্বন করে ক্ষেতকে যখন পূর্বের মত সজীব সতেজ করে তুলবে, ঠিক তখনি সে ক্ষেতের মালিকের নিকট থেকে নিজের মেষগুলো ফেরত পাবে, এর আগে নয়। শেষ পর্যন্ত হযরত দাউদ (আঃ), পুত্র সুলাইমান (আঃ)-এর এ পরামর্শের সাথেই একমত হন (তফসীরে খাযেন)। পবিত্র কুরআনে এ ঘটনাটি যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ۚ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ○ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا

"এবং স্মরণ করো দাউদ ও সুলাইমানের কথা, যখন তারা বিচার করছিলো শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে ; ওতে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোনো সম্প্রদায়ের

www.amarboi.org

যেমন ঃ আমি প্রত্যক্ষ করছিলাম তাদের বিচার। অতঃপর আমি সুলাইমানকে এ বিষয়ের মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদের প্রত্যেককে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। (সূরা আম্বিয়া ঃ ৭৮-৭৯)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের কাছে পানি এবং মাটির প্রকৃত ব্যাখ্যা করেই ক্ষান্ত হননি, মাটি থেকে উৎপাদিত সব বস্তুই আমরা কিভাবে ভোগ করবো সে উপদেশও আমাদের দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا

اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ؕ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ

وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖ ؗ وَلَا تُسْرِفُوْا ؕ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○

"তিনিই লতা ও বৃক্ষ-উদ্যানসমূহ সৃষ্টি করেছেন এবং খেজুর বৃক্ষ, বিভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট খাদ্যশস্য, যায়তুন এবং ডালিমও সৃষ্টি করেছেন—এরা একে অন্যের সদৃশ এবং বিসদৃশও। যখন ওটা ফলবান হয় তখন ওর ফল খাবে আর ফসল কাটার সময় ওর হক (দেয়) প্রদান করবে, কিন্তু (এই ভোগ ব্যাপারে) অপচয় করবে না, নিশ্চয়ই অপব্যয়ীকে তিনি পছন্দ করেন না।" (সূরা আল-আনআম ঃ ১৪১)

আল্লাহ্ তা'আলা জমির মধ্যে যে খাদ্য-ভাণ্ডার লুকিয়ে রেখেছেন তা উদ্ধার করার দায়িত্ব মানুষেরই। অনুর্বর জমিকে উর্বর করার জন্য তিনি আকাশ থেকে যে বৃষ্টিধারা নাযিল করেন মানুষ যদি তার সদ্ব্যবহার না করে তবে এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে! প্রধানতঃ মানুষের আলস্য এবং অকর্মণ্যতাই দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমরা জমির লুক্কায়িত ভাণ্ডারে খাদ্যের অনুসন্ধান কর (তাবারানী)। তিনি আরো বলেছেন, এটা দুর্ভিক্ষ নয় যে, তোমরা বৃষ্টি পাও না; কিন্তু এটা দুর্ভিক্ষ যে, তোমরা বৃষ্টির উপর বৃষ্টি পাও, কিন্তু তোমাদের ভূমিতে কিছু জন্মায় না। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কৃষিকে একটি সওয়াবের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, যখনই কোনো মুসলিম গাছ লাগায় অথবা শস্য রোপণ করে এবং তা থেকে মানুষ, পাখি বা পশু তাদের আহার্য গ্রহণ করে তখন এটা রোপণকারীর পক্ষে একটা সদকা হিসাবে পরিগণিত হয় (বুখারী, মুসলিম)। জাবির (রাঃ) হতে মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, "এবং ওটা হতে যা চুরি যায় তাও রোপণকারীর পক্ষে একটি সদকা হিসাবে পরিগণিত হয়।"

www.amarboi.org

কাফির তার জীবনকালের মূল্যায়ন যেভাবেই করুক না কেন, কিন্তু মুমিনের কাছে তার জীবনকালের মূল্যায়ন এই যে, এটা হচ্ছে আখিরাত তথা পরকালের একটি কর্মক্ষেত্র। মানুষের আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত হলেও এর মধ্যেই তাকে যাবতীয় ঐ সব দায়িত্ব পালন করতে হয় যার মাধ্যমে সে আল্লাহর কৃপা, জান্নাত তথা ইহকাল-পরকালের প্রকৃত শান্তি ও মঙ্গলের অধিকারী হবে। অতএব কোনো সৎকর্ম সম্পাদনে একজন মুমিন কখনো অলস হয়ে বসে থাকতে পারে না। এ ক্ষেত্রে সে সবসময় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। আর এটাই হচ্ছে মুমিনের প্রতি তার প্রভুর নির্দেশ। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ط (البقرة : ١٤٨)

"তোমরা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা কর।"-(সূরা আল বাকারা : ১৪৮)

وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ لا اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ (ال عمران : ١٣٣)

"তোমরা ধাবমান হও আপন প্রতিপালকের ক্ষমার দিকে এবং সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের ন্যায়, যা প্রস্তুত করা হয়েছে মুত্তাকীদের জন্য।"-(সূরা আলে ইমরান : ১৩৩)

অর্থাৎ যখনই তোমাদের হাতে সৎকর্ম সম্পাদনের সুযোগ আসে অথবা তোমাদের মনে সৎকর্ম সম্পাদনের উৎসাহ-উদ্দীপনা বা প্রবৃত্তির সঞ্চার হয় তখন প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে সে কাজে আত্মনিয়োগ করো। কেননা এমনও হতে পারে যে, এই সৎকর্ম সম্পাদনের সুযোগ তুমি জীবনে আর কখনো পাবে না। কিংবা তোমার মনে এখন তা সম্পাদনের যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বা প্রবৃত্তির সঞ্চার হয়েছে, নানা প্রতিকূল পরিস্থিতির চাপে পড়ে তুমি তা চিরদিনের জন্য বিস্মৃত হয়ে যাবে।

ইসলামের স্বর্ণযুগে সৎকর্মে প্রতিযোগিতার যে সমস্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তার অনেকগুলোই সৎকর্মশীলদের কাছে চির স্মরণীয় ও চির অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। উদাহরণ স্বরূপ তাবুক অভিযানের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এমন একটি মুহূর্তে তাবুক অভিযানের ঘোষণা প্রদান করা হয় যখন ছিল ভরা গ্রীষ্ম মওসুম। গরমে মাটি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। আকাশ যেন বর্ষণ করছিল অগ্নিশিখা। পথের দৈর্ঘ্য দু'শ কিলোমিটার নয় বরং ছিল কম সে কম বারো শ কিলোমিটার। অপরদিকে এটা ছিল খেজুর পাকার ভরা মওসুম। গাছে গাছে খেজুর পেকে উঠেছিল। ঠিক সময়ে গাছ থেকে এই খেজুর তুলতে না পারলে

www.amarboi.org

সারা বছরের খোরাকী হিসেবে [illegible] কষ্টে নিপতিত হবার আশংকা ছিল। উদ্ভূত অবস্থার প্রেক্ষিতে তাবুক অভিযান ছিল মুসলমানদের জন্য এক কঠোর অগ্নি পরীক্ষা তুল্য। কিন্তু সে অগ্নি পরীক্ষায় তারা শুধু উত্তীর্ণই হননি, বরং সৎকর্মে প্রতিযোগিতার সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ কঠোর অভিযানে উদার হস্তে দান করার জন্য যখন মুসলমানদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান তখন তাদের মধ্যে এক অপরূপ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। হযরত উসমান (রাঃ) একাই সমগ্র মুসলিম বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ সৈন্যের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করেন, হযরত উমর (রাঃ) তার যাবতীয় সম্পদের অর্ধেক অংশ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাতে তুলে দেন, আর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) আল্লাহর রাস্তে উৎসর্গ করেন তার ঘরের সমুদয় মালামাল। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, ঘরে কি রেখে এসেছ? তখন তিনি উত্তরে বলেন, আল্লাহ ও তার রাসূলকে রেখে এসেছি।

এ ছিল স্বর্ণযুগের মুসলমানদের সৎকর্মে প্রতিযোগিতার দৃষ্টান্ত। অনুরূপ দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন বলেই তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র বিশ্বব্যাপী এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

৫. সদাচরণ

সদাশয়তা, সদ্ব্যবহার, পরোপকার ইত্যাদি গুণাবলী সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত। সদাচরণের মাধ্যমে অতি সহজেই শত্রুকে মিত্র এবং পরকে আপন করে নেয়া যায়। সদাচরণ মানুষের সামাজিক পরিবেশকে সুস্থ, সুন্দর ও উপভোগ্য করে তোলে। তাই অতি সঙ্গত কারণেই কুরআন সদাচরণের উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে তার উপাসনার সাথে সাথে সদাচরণেরও নির্দেশ দিয়েছেন; সদ্ব্যবহারের অঙ্গীকার নিয়েছেন তার নবী-রাসূলদের মাধ্যমে সকল উম্মতের কাছ থেকে।

কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে সম্মান এবং মর্যাদার অধিকারী হতে হলে মানুষের প্রতি সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার করতে হবে। যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের উপাসনা করে, যারা সদ্ব্যবহার, সদালাপ প্রভৃতি গুণাবলী থেকে বঞ্চিত, পার্থিব জীবনে রয়েছে তাদের জন্য শুধু দীনতা আর হীনতা এবং শেষ বিচারের দিন নিক্ষিপ্ত হবে তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে। কুরআন বলে:

www.amarboi.org

মতে, একমাত্র মিসরেই দীর্ঘ কয়েক বছর ব্যাপী এক লক্ষ বিশ হাজার শ্রমিক শুধু এ কাজে নিযুক্ত ছিল। এদের যাবতীয় খরচ "বায়তুল মাল" থেকেই বহন করা হতো।"-(আল ফারুক)

কৃষককে বাদ দিয়ে কৃষির উন্নতি হতে পারে না। তাই হযরত উমর (রাঃ) ভূমি বিলি বন্টনের ব্যাপারে স্থানীয় কৃষকদের সুযোগ-সুবিধার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেন এবং তাদের পরামর্শ গ্রহণ না করে এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতেন না।

ভূমি ব্যবস্থার ব্যাপারে হযরত উমর (রাঃ)-এর আর একটি উদার নীতি এই ছিল যে, তিনি সবসময় জমির বন্দোবস্ত দানের ব্যাপারে বিজিত প্রজাদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন এবং তাদের সব রকম আবেদন-নিবেদন অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেন।

চাষাবাদযোগ্য জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে সেগুলোকে যথাযথভাবে কাজে লাগাবার জন্য হযরত উমর (রাঃ) বিজিত দেশগুলোতে ভূমি জরীপের ব্যবস্থা করেন। তার খিলাফত আমলে হযরত উসমান বিন হানীফ, ভূমি জরীপের কাজে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দেন।

"কাপড়-বিক্রেতারা একখানি মূল্যবান কাপড় যেরূপ সতর্কতার সাথে মাপ দিয়ে থাকে, হযরত উসমান বিন হানীফ ঠিক সেরূপ সতর্কতার সাথে ইরাকের ভূমি জরীপ করেছিলেন।"-(কিতাবুল খিরাজ)

ইসলামী আইন অনুযায়ী, খাল খনন অথবা বাঁধ নির্মাণের ব্যয়ভার সরকারই বহন করবে। তবে এগুলো সংস্কারের জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হবে তা জনসাধারণের কাছ থেকে আদায় করা যেতে পারে।

ফসল উৎপাদনের ন্যায় পশুপাখী পালন, মৎস্য চাষ, মৌমাছি পালন, বৃক্ষ রোপণ এবং তা সংরক্ষণের উপরও ইসলাম গুরুত্ব আরোপ করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবী পাঠাননি যিনি মেষ চরাতেন না। তখন সাহাবীরা বললেন, এবং আপনিও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও কয়েক কিরাত মজুরীর বিনিময়ে মক্কাবাসীদের মেষ চরাতাম।-(বুখারী)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মহিলা সাহাবীদেরকেও ভেড়া-বকরী পালনের পরামর্শ দিতেন। তিনি একদা হযরত উম্মে হানী বিন আবু তালিবকে বলেন, তুমি বকরী পালন কর; কেননা এর মধ্যে কল্যাণ নিহিত আছে।-(ইবনে মাজা)

www.amarboi.org

একটি বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বিত্তশালীদেরকে বকরী পালন এবং বিত্তহীনদেরকে মুরগী পালনের নির্দেশ দিতেন। (ইবনে মাজা)

পবিত্র কুরআন পরোক্ষভাবে হলেও মৎস্য চাষের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। অনুরূপভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছে মৌমাছি পালনের উপরও। মৌমাছির নামে তো পবিত্র কুরআনের একটি সূরার নামকরণই করা হয়েছে।

–(সূরা আন নাহল)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সময়েও মৌমাছি পালন একটি পৃথক পেশায় পরিণত হয়।

"কোনো কোনো সাহাবী মৌমাছি পালন করে সেগুলো থেকে মধু আহরণ করতেন। কোনো একটি জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণ মৌমাছি ছিল। কোনো কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলে কয়ে সেটা নিজেদের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন। তারা ঐ জঙ্গলে মধু উৎপাদন করতেন এবং এর যাকাতও দিতেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর খিলাফত পর্যন্ত ঐ জঙ্গল তাদের অধিকারে ছিল। কোনো একটি গোত্রের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ ধরনের দু'টি জঙ্গল নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন এবং তারা এর যাকাত প্রদান করতেন।"–(আবু দাউদ)

বৃক্ষরোপণ এবং তা সংরক্ষণের উপরও ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বৃক্ষরোপণকে সাদকা-ই-জারিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এ প্রসংগে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রিয় সাহাবী হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একদা হযরত আবু দারদা (রাঃ) দামেশকে একটি বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন। এমন সময় একটি লোক তার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলো। সে আবু দারদা (রাঃ)-কে অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে বৃক্ষ রোপন করতে দেখে একটু অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো, আপনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একজন বিশ্বস্ত বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও এ (তুচ্ছ) কাজটি করছেন? হযরত আবু দারদা (রাঃ) উত্তরে বললেন, আপনি এমনটি বলবেন না; আমি খোদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তি যদি একটি বৃক্ষ চারা লাগায়, অতপর তা থেকে কোনো মানুষ কিংবা আল্লাহর যে কোনো সৃষ্টি খাদ্য গ্রহণ করে তখন এটা রোপণকারীর জন্য একটি সাদকা হিসাবেই পরিগণিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বন এবং বন্য পশু পাখী সংরক্ষণের উপরও বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি মক্কা ও মদীনার এক

www.amarboi.org

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ
فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۖ لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ
لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ
وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ
فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ
تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ
الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ
كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۝ (البقرة : ٢٦٤-٢٦٦)

"হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা প্রতিদান দাবী করে এবং কষ্ট দিয়ে ঐ ব্যক্তির ন্যায় আপন দানকে নিষ্ফল করো না যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। তার উপমা একটি মসৃণ পাথর যার উপরে কিছু মাটি থাকে, অতপর তার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত তাকে পরিষ্কার করে রেখে দেয়। যা তারা উপার্জন করেছে তার কিছুই তারা কাজে লাগাতে পারবে না। আল্লাহ্ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও নিজেদের আত্মা বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের উপমা, কোনো উচ্চভূমিতে অবস্থিত একটি উদ্যান, যাতে মুষলধারে বৃষ্টি হয়, ফলে তার ফলমূল দ্বিগুণ জন্মে। যদি মুষলধারে বৃষ্টি নাও হয়, তবে শিশিরই যথেষ্ট। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। তোমাদের কেউ কি চায় যে, তার খেজুর ও আঙ্গুরের একটি বাগান থাকুক, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং যাতে সর্বপ্রকার ফলমূল আছে, আর সে ব্যক্তি বার্ধক্যে উপনীত হয়, এবং তার সন্তান-সন্ততি দুর্বল, অতপর ঐ বাগানকে এক অগ্নিক্ষরা ঘূর্ণিঝড় আক্রমণ করে ও তা জ্বলে যায়? এভাবে আল্লাহ্ তার নিদর্শন তোমাদের জন্য ব্যক্ত করেন সুস্পষ্টভাবে যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার।"—(সূরা আল বাকারা : ২৬৪-২৬৬)

www.amarboi.org

ইতিহাসগ্রন্থাদিতে। তাতে দেখা যায়, তাদের এ পর্বগুলো যেমন ছিল সর্বপ্রকার অপব্যয়, অপকর্ম ও অশালীন ক্রিয়াকলাপ থেকে মুক্ত—তেমনি ছিল গাম্ভীর্য, সারল্য, ভ্রাতৃত্ব, পরস্পর সহানুভূতি, আল্লাহর হুকুমের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি সদগুণাবলী ও আচার-আচরণে উজ্জ্বল প্রজ্জ্বল।

এর কারণও পরিষ্কার। ঐ সব মহান ব্যক্তিদের জীবন ও আচার-আচরণে ছিল সেই শিক্ষার প্রতিফলন, যে শিক্ষা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে—প্রেরণা যোগায় তাদেরকে আল্লাহর যমীনে দ্বীনে হানীফ প্রতিষ্ঠার।

ঈদের দিন ভোরবেলা মুসলমানরা ঈদগাহ অভিমুখে রওয়ানা হতো। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের নামায সবসময়ই খোলা মাঠে আদায় করতেন। গোটা মাদানী জীবনে তিনি শুধুমাত্র একবার (বৃষ্টির কারণে) মসজিদে (নবভীতে) ঈদের নামায আদায় করেছিলেন। তাঁর নির্দেশ ছিল, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসলমানই যেন ঈদগাহে যায়। এতে যেমন মুসলমানদের শক্তি-পরাক্রম প্রকাশ পেত তেমনি সবাই সমষ্টিগতভাবে আল্লাহর দরবারে সিজদা করার ও ঈদের আনন্দে শরীক হওয়ার সুযোগ পেত।

ঈদগাহে যাবার সময় সবার মুখে লেগে থাকত আল্লাহর একত্ব, মাহাত্ম্য ও প্রশংসা-প্রশস্তির গান। রাস্তাঘাট, মাঠ-প্রান্তর সর্বত্রই উচ্চারিত হত 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ'—আল্লাহর মাহাত্ম্যের এ জয়ধ্বনি।

ঈদের খুতবা (ভাষণ) জুমআর খুতবার ন্যায় নামাযের প্রথমে নয় বরং শেষে দেয়া হতো। সকলে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খুতবা শুনতেন। ঐ সমস্ত খুতবায় উপদেশমূলক কথাবার্তা ছাড়াও মুসলমানরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সমস্ত মাসআলার সম্মুখীন হতেন সেগুলোর জবাব থাকতো। ঐ মুহূর্তে কোনো বাহিনী বা প্রতিনিধিদল কোথাও পাঠাবার থাকলে সে ব্যবস্থা ঈদগাহেই নেয়া হতো। সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন দেখা দিলে সে জন্য আল্লাহর রাহে দান করার আহ্বান সেখান থেকেই জানানো হতো এবং প্রত্যেক মুসলমানই নিজ নিজ সাধ্যমত সে আহ্বানে সাড়া দিতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তো মহিলারা নিজেদের গা থেকে অলংকার খুলে তা অকাতরে আল্লাহর রাহে দান করতেন।

অতপর মুসলমানরা হৈহুল্লোড় করে নয় বরং পুরোপুরি শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে নিজ নিজ গৃহ অভিমুখে রওয়ানা হতেন। ঐ সময়ও উপরে উল্লেখিত তাদের তাকবীর ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত হয়ে উঠতো।

www.amarboi.org

এ সমস্ত পর্বে লোকেরা ভাল খানা-পিনা এবং আনন্দ-আহ্লাদের ব্যবস্থাও করতো। কিন্তু তাদের ঐ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য নিছক আনন্দ-ফূর্তি কিংবা পেটপূর্তি ছিল না, বরং এগুলোর পিছনে কার্যকর ছিল পরোপকারের মনোবৃত্তি ও আল্লাহর শোক্‌র আদায়ের আকুতি। তারা ঐদিন নিজেদের পেটের কথা চিন্তা করার পূর্বে আর্থিক দিক দিয়ে তাদের যে সমস্ত ভাই অসচ্ছল তাদেরই কথা চিন্তা করতেন। ঈদুল ফিতরের দিন নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই তারা ফিতরারূপে কিছু অর্থ অথবা খাদ্য দান করে আপন অভাবী ভাইদেরকেও ঈদের আনন্দে শরীক করে নিতেন। আর ঈদুল আযহার দিন পশু কুরবানী করে তার একটি অংশ সর্বাগ্রে আপন গরীব ভাইদের ঘরে পাঠিয়ে দিতেন।

ঈদ পর্ব পালন করতে গিয়ে তারা আনন্দ-স্ফূর্তি করতেন বটে, তবে তা এতই সংযত-শালীন হতো যে, তা তাদেরকে মানব জীবনের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করার পরিবর্তে তা অর্জনে আরো আন্তরিক ও কর্মচঞ্চল করে তুলতো।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদের দিন বিশেষভাবে নিম্নের দু'আটি করতেন।

"হে আল্লাহ ! আমরা তোমার কাছে সুখময় জীবন ও যন্ত্রণাহীন মৃত্যু চাই। হে আল্লাহ ! যখন তোমার সমীপে হাযির হব তখন যেন আমাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হতে না হয়। --- হে আল্লাহ ! এমন আকস্মিকভাবে আমাদের উপর মৃত্যু যেন নেমে না আসে যাতে আমরা না অন্যের হক আদায় করতে পারি, আর না কোনো কিছুর অসীয়ত করে যেতে পারি। হে আল্লাহ! আমরা তোমার কাছে পবিত্রতা, সচ্ছলতা, তাকওয়া, হেদায়াত ও দুনিয়া-আখিরাতের মঙ্গল কামনা করি এবং সন্দেহ-সংশয় ও রিয়াকারী থেকে তোমার আশ্রয় চাই। হে অন্তরের মালিক! যখন তুমি আমাদেরকে একবার হেদায়াত দান করেছ তখন এ থেকে আমাদেরকে কখন বঞ্চিত করো না। হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তোমার রহমত ও কৃপা দ্বারা ধন্য করো ; নিশ্চয়ই তুমি করুণাময়, পরম দয়ালু।

৩. মুহাররম ও আশূরা

আরবী বছরের প্রথম মাস মুহাররম। আর আশূরা হচ্ছে মুহাররম মাসের দশম দিবস। হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনার ইয়াহুদীদের কাছ থেকে জানতে পারলেন, এ আশূরার দিন মূসা (আঃ) ফিরআউনের বন্দীশালা থেকে ইসরাঈল-সন্তানদের উদ্ধার করেছিলেন এবং এ দিনই ফিরআউন আপন সৈন্য-সামন্তসহ নীল নদে ডুবে মরেছিল। এরই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ মূসা (আঃ) এদিনে

www.amarboi.org

রোযা রেখেছিলেন। আর এ কারণে ইয়াহূদীরা আশূরার রোযা রাখে। (এ তথ্য জানার পর) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, 'তোমাদের (ইয়াহূদীদের) অপেক্ষা মূসা (আঃ)-এর সাথে আমাদের সম্পর্ক অগ্রগণ্য এবং নিকটতর।' প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন থেকেই আশূরার রোযা রাখতে শুরু করেন এবং আপন উম্মতকেও এদিনে রোযা রাখার উপদেশ দেন। আশূরা সম্পর্কে হাদীসে আরো কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদেরকে আশূরার রোযা রাখার উৎসাহ ও আদেশ দান করতেন।

(২) কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন, ইয়াহূদী এবং খ্রীস্টানরা আশূরাকে বড় মনে করে (এমতাবস্থায় আমরা কেন এ দিনটির উপর গুরুত্ব প্রদান করবো ?)। উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকলে আমি মুহাররমের নবম দিবসেও রোযা রাখবো। কিন্তু পরবর্তী আশুরার দিন আসার পূর্বেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইনতিকাল করেন।

(৩) রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পর হতে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবীদেরকে আর আশূরার রোযা রাখার আদেশ দিতেন না। কেউ রোযা রাখলে তাঁকে নিষেধও করতেন না।

(৪) তবে তিনি নিজে রযমানের রোযার অনুরূপ গুরুত্ব সহকারে সবসময়ই আশূরার রোযা রাখতেন।

(৫) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, রমযানের রোযার পর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মুহাররমের এ রোযা।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আশূরার দিনে মূসা (আঃ)-এর সাফল্যের কারণে শাশ্বত ইসলামের বিজয় সূচিত হয়েছিল। আর যেহেতু বিজয় আল্লাহর দান, আর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বান্দার কর্তব্য—তাই সকল নবীর প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধাশীল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আশূরার দিনটিকে মর্যাদাপূর্ণ মনে করতেন। আরো কথিত আছে যে, মহাপ্লাবনের পর এদিনেই নূহ (আঃ)-এর জাহাজ ভূমি স্পর্শ করেছিল। 'আল্লাহর নামে ও তাঁর নির্দেশে জীবনতরী অকূল পাথারে ভাসিয়ে দিলেও তাতে উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই, একদিন তা ঘাটের নাগাল পাবেই'—হযরত নূহের উপরোক্ত ঘটনা থেকে আমরা অনায়াসে এ মূল্যবান শিক্ষাটি লাভ করতে পারি। এদিক দিয়েও আশূরার দিনটি নিসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ।

তবে হ্যাঁ, এ আশূরার দিনেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রাঃ) কারবালা-প্রান্তরে ইয়াযীদ-বাহিনীর হাতে অত্যন্ত নির্মমভাবে শাহাদাত

www.amarboi.org

বরণ করেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে দিনটি সমগ্র মুসলমানের কাছে নিঃসন্দেহে চরম বিষাদপূর্ণ। তবে সত্যের পতাকাবাহী নির্ভীক মুজাহিদ হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর এ অপূর্ব আত্মত্যাগ ইসলামের ইতিহাসে এ দিনটিকে আরো গাম্ভীর্যপূর্ণ, আরো উজ্জ্বল-প্রজ্জ্বল করে তুলেছে। সুতরাং এ দিনিট নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে এদিনে এমন কোনো কাজ করা উচিত নয় যার দ্বারা এর গাম্ভীর্য ও পবিত্রতা নষ্ট হয়। এমন কোনো অনুষ্ঠান পালন করা উচিত নয়, যার সাথে ইসলামী অনুষ্ঠানাদির কোনো সঙ্গতি নেই।

তাসবীহ্, তাহমীদ, তাকদীস—বিশেষ করে সিয়াম পালনের মধ্যে দিয়ে এ দিনটিকে উদযাপন করা যেতে পারে। হযরত নূহ ও হযরত মূসা (আঃ)-এর মিশন এবং শহীদে কারবালা হযরত ইমাম হুসাইন (রাঃ)-এর, আল্লাহ্র পথে নির্ভীক চিত্তে প্রাণ দানের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও তাৎপর্য সম্পর্কে এ পবিত্র দিনে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হতে পারে এবং উপরোক্ত ঘটনাবলী থেকে মূল্যবান শিক্ষাগ্রহণ করে মুসলমান মাত্রেই নিজের ইহ-পরকালীন জীবনকে সত্যিকার অর্থে সার্থক করে তুলতে পারে।

৪. রাবীউল আউয়াল

রাবীউল আউয়াল মাসের আগমনের সাথে সাথে মুমিনের ঈমানরূপী জগতেও ঘটে বসন্তের সমাগম। সেখানে খোদাপ্রেমের বীজ অংকুরিত হয়, ভালোবাসার ফুল ফুটে, খুশীর ঢেউ বয়ে যায়, আর সমগ্র মাঠ-প্রান্তর আল্লাহ্র নূরে নূরান্বিত হয়ে উঠে। এক কথায়, আকাশ-পাতাল সর্বত্র যেন আনন্দের বান ডাকে। আর তা এজন্য যে, এ মাসেরই ১২ তারিখে এ ধরাধামে আগমন করেন দু' জাহানের বাদশাহ, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)।

অপরদিকে একাদশ হিজরীর ঐ একই দিনে ৬৩ বছর বয়সে তিনি এ দুনিয়া ছেড়ে আপন 'রফীকে আলা' তথা মহান বন্ধুর সান্নিধ্যে চলে যান। তার তিরোধানের সাথে সাথে বাহ্যতঃ বিশ্বের সর্ববৃহৎ ও সর্বশেষ রহমতটি বিশ্ববাসীর চোখের আড়ালে চলে যায়। আঁধারে ছেয়ে যায় সমগ্র দুনিয়া। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর তিরোধানের এ ঘটনাটি এতই হৃদয়বিদারক যে, এরূপ ঘটনা না অতীতে কখনো ঘটেছে, আর না ভবিষ্যতে কখনো ঘটবে। তাই তো ঐ দিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস (রাঃ) উচ্চস্বরে বলছিলেন, 'যেদিন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনায় আগমন করেন সেদিন এ বসুন্ধরার

www.amarboi.org

প্রত্যেকটি জিনিসই ঝলমলিয়ে উঠে, আর যেদিন তিনি এ দুনিয়া থেকে তিরোহিত হন সেদিন সব জিনিসই ধারণ করে ফিকে রং।-(তিরমিযী)

এ ১২ই রাবীউল আউয়ালেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কলিজার টুকরা হযরত ফাতেমাতুয্ যুহরা (রাঃ) ব্যথাজড়িত কণ্ঠে অনুচ্চ স্বরে এই বলে ক্রন্দন করছিলেন ঃ

"আহা বাবা! আপনি (আমাদের ছেড়ে) আপনার প্রভুর আহ্বানে সাড়া দিলেন। আহা বাবা! আপনি আমাদের ছেড়ে জান্নাতুল ফেরদাউসে চলে গেলেন। আহা বাবা! (আমাদের কপাল মন্দ যে,) আমরা (আজ) জিবরাঈল (আঃ)-কে আপনার তিরোধানের সংবাদ দিচ্ছি।"

তিনি ছন্দাকারে এও বলছিলেন, "(তাঁর ওফাতের কারণে) আমার উপর যে বিপদরাশি পতিত হয়েছে তা যদি কোনো দিনের উপর পতিত হতো তাহলে সেদিন নির্ঘাত রাতে পরিণত হতো।"

মোটকথা, এ বিশ্বজগতের সবচেয়ে বেশী আনন্দের আবার সবচেয়ে বেশী শোকের দিন হচ্ছে এই ১২ই রাবীউল আউয়াল। এর মধ্যে আল্লাহর যে হিকমত নিহিত রয়েছে তা খুব সম্ভবতঃ এই যে, তিনি তার এ কর্ম দ্বারা আমাদেরকে মধ্যপন্থা তথা সংযম ও মিতাচার শিক্ষা দিয়েছেন, যাতে আমরা এদিনে না আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠি, আর না শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ি। অতএব এটা কি বেমানান নয় যে, আমরা এদিন অত্যন্ত জাঁক-জমকের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্মের কথা স্মরণ করবো, কিন্তু একটি বারের মতও তার তিরোধানের কথা স্মরণ করবো না ; আর সেই সাথে বেমালুম ভুলে বসব আমাদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথাও?

প্রকৃতপক্ষে যে মহান ব্যক্তির অসীলায় ১২ই রাবীউল আউয়াল একটি পবিত্র দিনে পরিণত হয়েছে তিনি ছিলেন আপাদমস্তক মধ্যপন্থী তথা সংযমী ও মিতাচারী। তিনি মিতাচারী ছিলেন চলাফেরায়, কথাবার্তায়, উঠাবসায়, গঠনে আকৃতিতে এবং শরীআতে-তরীকাতে। এ কারণে তার উম্মতের উপাধি হচ্ছে 'উম্মতে ওয়াসাত' তথা মধ্যপন্থী জাতি। কুরআনের ভাষায়-

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا ـ(البقرة : ١٤٣)

"এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি।"

প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জীবনগ্রন্থের পাতাগুলো আপনি যতই উল্টাতে থাকবেন ততই আপনার নজরে পড়বে মধ্যপন্থা, সংযম আর মিতাচার।

www.amarboi.org

অতএব আমাদের কাছে ১২ই রাবীউল আউয়ালের দাবী এই যে, আমরা যেন সর্বাবস্থায় মধ্যপন্থা তথা সংযম ও মিতাচারকে ধরে রাখি। মধ্যপন্থা যেন থাকে আমাদের আকীদায়, আমাদের বিশ্বাসে, আমাদের ইবাদাতে, আমাদের সাধনায়, আমাদের আচার-ব্যবহারে, আমাদের স্বভাব-চরিত্রে, আমাদের প্রেম-ভালবাসায়, আমাদের শত্রুতা-মিত্রতায়, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষায় ও আমাদের তাবলীগে-তালীমে।

শুধু বর্তমান যুগের নয়, বরং সব যুগেই ফেতনা-ফাসাদ ও অশান্তি-বিশৃঙ্খলার মৌল কারণ হচ্ছে অসংযম, অমিতাচারিতা ও সীমালংঘন। আমরা যদি সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক তথা সব রকমের বিশৃঙ্খলা, অসাম্য ও অরাজকতা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাই তাহলে শুধুমাত্র একটি পন্থা আমাদের সামনে খোলা আছে। আর সে পন্থাটি হচ্ছে মধ্যপন্থা ও মিতাচারের পন্থা। আর এ পন্থার দিকেই অংগুলি নির্দেশ করছে ১২ই রাবীউল আউয়াল, শত শত বছর ধরে, প্রতি বছর অন্ততঃ একবার করে।

৫. ইসরা বা মিরাজ

নুবুওয়াতের দশ বছর অতিবাহিত হয়েছে। এমন কোনো কষ্ট ও যাতনা নেই, যা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ সময়কালে হাসিমুখে সহ্য করেননি। তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করা হয়েছে, তার চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখা হয়েছে, তার মাথার উপর ধূলোবালি নিক্ষেপ করা হয়েছে, তাকে পাথর মেরে মেরে রক্তাক্ত করা হয়েছে, সিজদারত অবস্থায় তার পিঠের উপর উটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র আঁটা হয়েছে। কিন্তু রহমতের নবী সেজন্য কাউকে বদ্‌দু'আ করেননি, বরং বলেছেন, 'হে করুণাময়, তুমি আমার জাতিকে হেদায়াত কর, কেননা ওরা বুঝে না।'

দশ বছরের ঐ তিক্ত সময়কাল যখন অতিবাহিত হলো তখন বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর সম্মানে এমন একটি মাহফিল সাজালেন, যা শুধুমাত্র একজন মানুষের জন্যই সাজানো হয়েছিলো। তখন সময়ের কাঁটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল, দরজার শিকল যে পর্যন্ত আন্দোলিত হয়েছিল সেখানেই থেমে গেল এবং পানির স্রোত যে পর্যন্ত ভেসে গিয়েছিল সেখানেই রুখে গেল।

ঠিক ঐ মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য সমগ্র আম্বিয়া (আঃ) মসজিদে আকসায় অবতরণ করলেন এবং তারই ইমামতীতে নামায

www.amarboi.org

পড়লেন। সেখান থেকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জিবরাঈল (আঃ) ও অন্যান্য সম্মানিত ফেরেশতাদের সাথে ঊর্ধ্বজগত অভিমুখে রওয়ানা হলেন। মাহবুবে খোদা (সাঃ) যখন সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করে এবং জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করে সম্মুখে এগিয়ে চললেন তখন তার সামনে থেকে সকল পর্দা সরে যেতে লাগলো এবং তিনি 'দীদারে ইলাহী' লাভে ধন্য হলেন।

এ-ই হলো মিরাজ। এ ঘটনা ঘটেছিল হিজরতের এক বছর পূর্বে রজব মাসের ২৭ তারিখে। এটি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। এর মাধ্যমে তিনি যে সম্মান ও মর্যাদা লাভ করলেন তা অন্য কোনো নবীর ভাগ্যে জোটেনি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার তুলনাহীন বিনয় ও 'আবদিয়াতে কামিলা' তথা পরিপূর্ণ বন্দেগীর বদৌলতে এ মর্যাদা লাভ করেছিলেন। এ কারণেই ইসরা বা মিরাজের ঘটনায় দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর অন্যান্য গুণাবলীর উল্লেখ না করে শুধুমাত্র তার 'আবদিয়াত' গুণটির উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, "পবিত্র ও মহিমাময় তিনি, যিনি তার 'আবদ' বা বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছিলেন।"

মক্কা মুআযযামা থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণকে 'ইসরা' এবং সেখান থেকে সিদরাতুল মুনতাহা ও তার পরবর্তী ভ্রমণকে 'মিরাজ' বলা হয়ে থাকে। পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলে ইসরার এবং সূরা নাজমে মিরাজের উল্লেখ করা হয়েছে। সূরা বনী ইসরাঈলে বলা হয়েছে ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا
الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ○

"পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার বান্দাকে রাতের বেলা ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায়, যার পরিবেশ আমি করেছিলাম বরকতময়, তাকে আমার নিদর্শন দেখাবার জন্য ; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"—(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১)

আর সূরা নাজমে বলা হয়েছে ঃ

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى○ ذُوْ مِرَّةٍ ط فَاسْتَوٰى○ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى○ ثُمَّ دَنَا
فَتَدَلّٰى○ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى○ فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى○ مَا
كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى○ اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى○ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى○

www.amarboi.org

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ○ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى ○ اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ○
مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ○ لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ○

"তাকে শিক্ষা দান করেন শক্তিশালী, প্রজ্ঞাসম্পন্ন, সে নিজ আকৃতিতে স্থির হয়েছিলো। তখন সে উর্ধদিগন্তে, অতপর সে তার নিকটবর্তী হলো, অতি নিকটবর্তী। ফলে তাদের মধ্যে দু ধনুকের ব্যবধান রইলো অথবা তারও কম। অতপর আল্লাহ্ তার বান্দার প্রতি যা অহী করবার তা অহী করলেন। যা সে দেখেছে তার অন্তঃকরণ তা অস্বীকার করেনি। সে যা দেখেছে তোমরা কি সে বিষয়ে তার সংগে বিতর্ক করবে ? নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল প্রান্তবর্তী বদরী বৃক্ষের নিকট, যার নিকট অবস্থিত বাসোদ্যান। যখন বৃক্ষটি, যদ্বারা আচ্ছাদিত হবার তদ্বারা ছিল আচ্ছাদিত। তার দৃষ্টি বিভ্রম হয়নি, দৃষ্টি লক্ষ্যচ্যুতও হয়নি। সে তো তার প্রতিপালকের মহান নিদর্শনাবলী দেখেছিল।"–(সূরা আন নাজম ঃ ৫-১৮)

জামহুর আহলে ইসলাম এ আকীদা পোষণ করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায়ই এ ভ্রমণ করানো হয়েছিল।

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আলোর গতি হচ্ছে প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল। আর সূর্য—যার ব্যাস হচ্ছে আট লক্ষ পয়ষট্টি হাজার মাইল এবং যা পৃথিবীর চেয়ে বারো লক্ষ গুণ বড়—নিজের সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহকে সংগে নিয়ে এক বিরাট ছায়াপথ-ব্যবস্থাপনার অধীন প্রতি ঘণ্টায় ছয় লক্ষ মাইল গতিতে পরিক্রমণরত রয়েছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রতি দৃষ্টি প্রদান করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। মানুষ আজ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে চোখের পলকে হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করতে পারে। মহাশূন্যযান কোনো কোনো ক্ষেত্রে গতি সেকেন্ডে হাজার হাজার মাইল গতিতে উড্ডয়ন করছে। আজ থেকে একশ বছর পূর্বে তো কেউ এটা চিন্তাও করতে পারতো না যে, ঘণ্টায় তিনশ মাইল পথ অতিক্রম করতে পারে এমন মোটরযানও তৈরী হয়ে যাবে কিংবা দশ হাজার ফুট উপর দিয়ে মানুষ উড়োজাহাজের মাধ্যমে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করবে। একশ দু' তলা বিশিষ্ট নিউইয়র্কের স্টেষ্ট ব্যাংক বিল্ডিং-এর উচ্চতা হচ্ছে বারশ পঞ্চাশ ফুট। অথচ লিফটের মাধ্যমে এর একেবারে নীচতলা থেকে শীর্ষতলায় পৌছতে মাত্র তিন মিনিট সময় লাগে। যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে এত বুদ্ধি ও কৌশল প্রদান করেছেন, তিনি কি আপন সম্মানিত বন্ধুর বাহন বুরাকের মধ্যে এমন বিদ্যুৎ গতির কলাকৌশল এবং সংরক্ষণমূলক আসবাব-সামগ্রী সম্পৃক্ত

www.amarboi.org

করতে পারেন না, যার মাধ্যমে তিনি [হুযুর (সাঃ)] অত্যন্ত আয়েশ-আরামের সাথে চোখের পলকে পৃথিবী থেকে ঊর্ধাকাশে যাতায়াত করতে পারেন?

মুসলিম শরীফে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমি যখন মক্কায় মুশরিকদেরকে মিরাজের ঘটনা বর্ণনা করলাম তখন তারা এটাকে অস্বীকার করলো এবং (আমাকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করার জন্য) বায়তুল মুকাদ্দাসের চিহ্নাদি সম্পর্কে আমাকে প্রশ্ন করতে শুরু করলো। তখন আল্লাহ তাআলা বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে তুলে ধরলেন এবং আমি তা দেখে দেখে মুশরিকদের যাবতীয় প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদান করতে লাগলাম।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশে মক্কা মুকাররমা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস এবং সেখান থেকে সপ্তাকাশ ভ্রমণ করে সে রাত্রেই পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন। আর তিনি গিয়েছিলেন সশরীরে এবং ফিরেও এসেছিলেন রূহ-সমেত, সশরীরে ও জাগ্রত অবস্থায়।

৬. শবে বরাত ও শবে কদর

শবে বরাত

পবিত্র শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাত এবং ১৫ই শাবানের দিবাপূর্ব রাতই হচ্ছে শবে বরাত। হাদীসে এটিকে "লাইলাতু নিসফে শাবান' বা অর্ধ শাবানের রাত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কুরআন করীমের সূরা দুখানে বর্ণিত, "লাইলাতুল মুবারকা"-এর তাফসীরে বিখ্যাত মুফাস্‌সির হযরত আকরামা বলেছেন, এটা হচ্ছে শবে বরাত।

কিন্তু অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে, "লাইলাতুল মুবারকা' বা বরকতময় রজনী হলো 'শবে কদর।' তাফসীরে আশরাফীতে আছে, শবে বরাতে কুরআন নাযিল হয়েছে বলে কোনো রেওয়ায়াত নেই এবং শবে কদরে তা নাযিল হয়েছে বলে খোদ কুরআনুল কারীমে উল্লেখ আছে। অতএব শবে বরাত দ্বারা 'লাইলাতুল মুবারকা'-এর তাফসীর করা ঠিক নয়।

শাবান মাস বা শবে বরাতের মর্যাদার কথা একাধিক হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। কোথাও এটাকে পবিত্র মাহে রমযানের 'আগমনী খোশখবরী রজনী' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বিশ্বনবী (সাঃ) শাবান মাসকে পবিত্র রমযানুল

www.amarboi.org

মুবারকের প্রস্তুতির মাস হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য রজব ও শাবান মাস শুরু হতেই তিনি যে দুআটি অধিক পাঠ করতেন, তা হচ্ছে—'হে আল্লাহ ! রজব ও শাবান মাসে আমাদের জন্য বরকত নাযিল করো এবং আমাদেরকে পবিত্র মাহে রমযানুল মুবারক পর্যন্ত পৌছে দাও।'-(বায়হাকী)

আবু দাউদ শরীফে উল্লেখিত একটি হাদীস হতে জানা যায় যে, মহানবী (সাঃ)-এর কাছে অন্যান্য মাসের চেয়ে শাবান মাসের নফল রোযা অধিকতর প্রিয় ছিল।

শাবান মাসের পনেরো তারিখে তথা শবে বরাতে জাগ্রত থেকে যিনি ইবাদাত করেন তাকে পরম সৌভাগ্যবান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহানবী (সাঃ) বলেছেন, যখন শাবান মাসের ১৫ তারিখ (অর্থাৎ ১৪ তারিখ দিবাগত) রাত আসে, তখন তোমরা জাগ্রত থেকে মহান আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তার পরবর্তী দিন রোযা রাখবে। কেননা আল্লাহ্ ঐ রাতে সর্বনিম্ন আসমানে নেমে আসেন এবং তাঁর বান্দাদেরকে ডেকে বলেন, "ওহে, কে আছো ক্ষমাপ্রার্থী, আমি তোমাকে ক্ষমা করবো। ওহে, কে আছো রিয্ক প্রার্থী, আমি তোমাকে রিয্ক দান করবো। ওহে কে আছো বিপদগ্রস্ত, আমি তোমাকে বিপদমুক্ত করবো। ওহে কে আছো তাওবাকারী, আমি তোমার তাওবা কবুল করবো। এভাবে সুবহে সাদিক পর্যন্ত তিনি আহ্বান করতে থাকেন।"-(ইবনে মাজা, বায়হাকী)

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) শবে বরাতে কবর যিয়ারত করতেন। সারারাত তিনি তাহাজ্জুদ ও নফল নামায পড়তেন—এ মর্মের হাদীসও রয়েছে। অতএব ইসলামের ইতিহাসে পবিত্র শবে বরাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

শাবানের মাঝামাঝি অর্থাৎ শবে বরাতের পবিত্র রজনীতে মহান আল্লাহর অগণিত ফিরিশতা তার অনুগ্রহ ও কল্যাণের বার্তা নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করেন। তাঁরা ইবাদাত ও তাসবীহ্ পাঠের মাধ্যমে পৃথিবীর তাবৎ মুসলমান তথা মানবকূলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

প্রতি বছর শবে বরাত মুসলমানদের জন্য আল্লাহর নিকট হতে পরবর্তী এক বছরের কল্যাণ, বরকত ও করুণা নিয়ে আসে। অতএব বিশেষ করে এ রাতে মুসলমানগণ পরম করুণাময়ের অধিক থেকে অধিকতর ইবাদাতের মাধ্যমে নিজেদের ও সমগ্র মানবতার সর্বাংগীন কল্যাণের পথ উন্মোচিত করতে পারে।

www.amarboi.org

মুসলমানদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উল্লাস, জীবন-মরণ সবকিছুই যে আল্লাহর সন্তোষ বিধানের জন্য হবে—এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। পবিত্র শবে বরাত আমাদের জন্য বিগত দিনের পাপরাশিকে দূর করে দিয়ে একটি অনাবিল সওয়াব ও শান্তিময় জীবনের সুযোগ নিয়ে আসে। এজন্যই ভাগ্যবান মুসলমানরা এ রাতে জাগ্রত থেকে আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগী করে এবং আল্লাহকে পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠে।

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেও শবে বরাত একটি বিরাট স্থান দখল করে আছে। মতপার্থক্য নির্বিশেষে পবিত্র শবে বরাতের বরকতময় রাতে সমগ্র মুসলমান ইবাদাতে মশগুল থাকে এবং পরবর্তী বছরের সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করে।

শবে বরাতে আতশবাজি, পটকাবাজি এবং বোমা ফাটানোর মাধ্যমে জনপদ কাঁপিয়ে তোলা; কবরে কবরে বাতি জ্বালানো ইত্যাদি কুসংস্কার। এসব কাজ সম্পূর্ণ অন্যায় ও গর্হিত। এসব কুসংস্কারপূর্ণ কার্যক্রম হতে অবশ্যই সকল মুসলমানকে বিরত থাকতে হবে এবং শবে বরাতের প্রকৃত শিক্ষা ও ভাবমূর্তি সবার সামনে তুলে ধরতে হবে।

শবে বরাতে করণীয় হলো, নফল নামায আদায়, কুরআন শরীফ তেলাওয়াত, দরূদ শরীফ পাঠ, তাওবা-ইস্তিগফার, বিশ্বের মজলুম মুসলিমদের জন্য দু'আ ইত্যাদি সওয়াবের কাজ।

শবে কদর

আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "শবে কদরের এক রাত এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" অন্য কথায় অন্যান্য সময় এক হাজার মাস ইবাদাত-বন্দেগী করে যত সওয়াব পাওয়া যাবে শবে কদরের এক রাতে ইবাদাত করলে তদপেক্ষা অধিক সওয়াব পাওয়া যাবে। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি এক হাজার মাস আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে কাটিয়েছিল। এটা শুনে মুসলমানরা বিস্মিত হলো এবং আক্ষেপ করে বলতে লাগলো, আমরা কিরূপে এমন নি'মাত হাসিল করতে পারি ? তখন উম্মতে মুহাম্মদীকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَٰهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ (القدر : ١-٣)

www.amarboi.org

"আমি এটা (কুরআন) নাযিল করেছি মহিমান্বিত রাতে ; আর মহিমান্বিত রাত সম্বন্ধে তুমি কি জান ? মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।"
−(সূরা আল কদর ঃ ১-৩)

অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি রাতের বেলা ভোর পর্যন্ত ইবাদাত করতো, আর সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধর্মের দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করতো। সে এক হাজার মাস এরূপ যুদ্ধ করেছিল। এ কাহিনী শুনে সাহাবা কিরাম (রাঃ) আক্ষেপ করতে থাকেন। তখনই এ আয়াত নাযিল হয়। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির হাজার মাস ইবাদাত ও জিহাদ করার চেয়ে শবে কদরের এক রাত ইবাদাত করা শ্রেষ্ঠ।

অতএব বুঝা গেল, এ মুবারক রাতে ইবাদাত করলে সামান্য পরিশ্রমেও অনেক বেশী সাওয়াব পাওয়া যায়। বিশেষ করে এ রাতে দু'আ কবুল হয়। হাদীস শরীফে হযরত নবী করীম (সাঃ) রমযান সম্বন্ধে বলেছেন ঃ তোমাদের নিকট এমন একটা মাস এসেছে যাতে এমন একটা রাত আছে যার মূল্য এক হাজার মাস হতেও অধিক। অতএব যে ব্যক্তি এ রাতের ফযীলত ও বরকত হাসিল না করবে সে যেন সমস্ত খায়ের-বরকত হতে বঞ্চিত থাকবে। হাদীস শরীফে আরো আছে, বিশেষ কোনো হিকমতের কারণে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে শবে কদরের রাতটিকে নির্দিষ্ট করে জানিয়ে দেননি। অতএব তোমরা রমযান শরীফের শেষের সাত রাতে শবে কদর তালাশ কর। অর্থাৎ এ রাতগুলোতে জেগে আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীতে মশগুল থাক। হাদীস শরীফে আরো আছে, প্রত্যেক রমযানেই শবে কদর হয়। এটাও আছে যে, রমযানের ২৭ তারিখ (অর্থাৎ ২৬ তারিখ দিবাগত রাতে) শবে কদর হয়।−(আবূ দাউদ)

শবে কদরের তারিখ সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। তবে ২৭ তারিখ রাতে শবে কদর হয় এ উক্তিটি সর্বাপেক্ষা মশহুর। শক্তি ও সদিচ্ছা থাকলে রমযানের শেষ দশটি রাতে বিশেষ করে বেজোড় রাতগুলোতে অধিক পরিমাণে ইবাদাত বন্দেগী করা এবং আল্লাহর দিকে রুজু হওয়া উচিত।

৭. ঈদুল আযহা

ঈদুল আযহা অর্থ কুরবানীর ঈদ। কুরবানীর ইতিহাস ততটা প্রাচীন যতটা প্রাচীন মানুষের ধর্ম ও ইতিহাস। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত প্রত্যেকটি শরীআতেই কুরবানীর হুকুম ছিল। অন্য কথায়, কুরবানী ছিল

www.amarboi.org

প্রত্যেকটি উম্মতের ইবাদাতের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ط فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا ط - (الحج : ٣٤)

"আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি, যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলোর উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ ; সুতরাং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর।"–(সূরা আল হাজ্জ : ৩৪)

অর্থাৎ কুরবানী প্রত্যেক শরীআতেরই ইবাদাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যদিও স্থান, কাল ও শরীআত ভেদে এর নিয়ম-পদ্ধতি ও খুঁটিনাটি বিষয়সমূহ ছিল কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন। তবে সব আসমানী শরীআতেই পশুর কুরবানীর ক্ষেত্রে এ মৌলনীতি বিদ্যমান ছিল যে, সেটাকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই কুরবানী করতে হবে এবং করতে হবে শুধুমাত্র তাঁরই নামে। যেমন পাক কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে :

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا - (الحج : ٣٦)

"তোমরা ওসব পশুর উপর আল্লাহর নাম লও।"–(সূরা আল হাজ্জ : ৩৬)

অর্থাৎ আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁরই সন্তুষ্টি হাসিলের জন্য পশু কুরবানী কর। কারণ তিনিই তোমাদেরকে এসব পশু দান করেছেন, তিনিই এদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন এবং তিনিই এদের মধ্যে তোমাদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের মঙ্গল নিহিত রেখেছেন।

কুরবানী প্রকৃতপক্ষে এমন এক সংকল্প, দৃঢ় বিশ্বাস, আত্মসমর্পণ ও জীবন উৎসর্গের বাস্তব বহিঃপ্রকাশ যে, মানুষের কাছে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর এবং সেসব কিছু আল্লাহরই পথে উৎসর্গীকৃত হওয়া উচিত। এটা সে সত্যেরই নিদর্শন যে, আল্লাহর ইংগিত পেলে বান্দা তার প্রাণ বিলিয়ে দিতেও দ্বিধা করে না। এ সংকল্প, আত্মসর্মপণ ও জীবন বিলিয়ে দেয়ার নামই ঈমান, ইসলাম ও ইহ্সান।

আজকাল বিশ্বের সর্বত্র মুসলমানরা যে কুরবানী করে তা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর মহান পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ফিদ্ইয়া (মুক্তিমূল্য)। আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করার যে মহান ঘটনাটি ঘটেছিল তা পবিত্র কুরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তাহলো :

www.amarboi.org

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِى الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ط قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ز سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ○ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ○ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ○ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ج اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ○ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ○ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ○ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى الْاٰخِرِيْنَ○ سَلٰمٌ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ○ كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ○ (الصفت : ١٠٢ - ١١٠)

"অতপর যখন সে (ইসমাঈল) তার পিতার সাথে কাজ করার মত বয়সে উপনীত হলো তখন ইবরাহীম বললো, বৎস, আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমি যবাহ্ করছি, এখন (এ ব্যাপারে) তোমার অভিমত কি বলো ? সে বললো, হে আমার পিতা, আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তাই করুন। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন। যখন তারা উভয়ে (পিতা, পুত্রকে কুরবানী করার এবং পুত্র, নিজে কুরবানী হওয়ার ব্যাপারে) আনুগত্য প্রকাশ করলো, ইবরাহীম আপন পুত্রকে (যবাহ্ করার জন্য) উপুড় করে শুইয়ে দিলো, তখন আমি তাকে সম্বোধন করে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। আমি তাকে (ইসমাঈলকে) মুক্ত করলাম এক মহান কুরবানীর (একটি দুম্বা, যা জান্নাত থেকে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল) বিনিময়ে। আমি (ঈদুল আযহার কুরবানীর রীতি প্রবর্তন করে) এটাকে পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। এভাবে আমি সৎকর্ম-পরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি।"–(সূরা আস সাফ্ফাত ঃ ১০২-১১০)

অর্থাৎ দুনিয়া যতদিন টিকে থাকবে ততদিন উম্মতে মুসলিমার মধ্যে কুরবানীর এ মহান স্মৃতি হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর ফিদইয়ারূপে জাগরূক থাকবে। আল্লাহ এ ফিদ্ইয়ার বিনিময়ে হযরত ইসমাঈলের জীবন রক্ষা করেন এ উদ্দেশ্যে যে, কিয়ামত পর্যন্ত যেন তাঁর জন্য কুরবানীকৃত বান্দারা ঠিক এদিনে দুনিয়া জুড়ে কুরবানী করতে পারে। আর এভাবে জাগ্রত রাখতে পারে তারা আনুগত্য ও জীবন দেয়ার এ মহান ঘটনার স্মৃতি।

www.amarboi.org

কুরবানীর এ মহান সুন্নাতের প্রবর্তক হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর মহান পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)। আর এ সুন্নাতকে কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখবে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতের জীবন-কুরবানীকৃত বান্দারা। এ কুরবানী ও জীবন দানের প্রেরণা ও চেতনা জীবনে জাগ্রত রাখার জন্য হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে যেভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাহলো ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۝ لَاشَرِيْكَ لَهٗ ۚ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ۝(١٦٢-١٦٣)

"বলো, আমার সালাত, আমার ইবাদাত (কুরবানী ও হাজ্জ) আমার জীবন ও আমার মরণ জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। তাঁর কোনো শরীক নেই এবং আমি এটাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম।"-(সূরা আল আনআম ঃ ১৬২-১৬৩)

আল্লাহর উপর পাকাপোক্ত ঈমান এবং তাঁর তাওহীদের উপর দৃঢ় বিশ্বাসের অর্থ এই যে, মানুষের সকল চেষ্টা-চরিত্র তারই সন্তুষ্টির জন্য কুরবানীকৃত হবে এবং সে সব কিছুকে তার পথে কুরবান করে তার ঈমান, ইসলাম, আনুগত্য ও জীবনদানের প্রমাণ পেশ করবে।

অন্য কথায়, কুরবানীকারী শুধুমাত্র পশুর গলায় ছুরি চালায় না, বরং তার সকল কুপ্রবৃত্তির গলায় ছুরি চালিয়ে সেগুলোকে নির্মূল করে। আর এ অনুভূতি ব্যতিরেকে যে কুরবানী করা হয় তা প্রকৃতপক্ষে হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর সুন্নাত নয়, বরং গতানুগতিক একটি জাতীয় রসম মাত্র। তাতে গোশতের ছড়াছড়ি থাকে বটে, তবে সেই তাক্ওয়া থাকে না, যা কুরবানীর প্রাণশক্তি। আর পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ ۭ

"আল্লাহর নিকট পৌঁছায় না কুরবানীকৃত পশুর গোশত এবং রক্ত বরং পৌঁছায় তোমাদের তাক্ওয়া।"-(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩৭)

৮. জন্ম বার্ষিকী পালন

আধুনিক সভ্যতা যেমন অনেক ভাল ভাল রীতি-পদ্ধতির প্রচলন করেছে তেমনি প্রচলন করেছে অনেক মূর্খতাপূর্ণ রসম-রেওয়াজেরও। আর এ মূর্খতাপূর্ণ রসম-রেওয়াজের একটি হলো, কারো—বিশেষ করে কোনো জীবিত ব্যক্তির

www.amarboi.org

জাঁকজমকপূর্ণ জন্মবার্ষিকী পালন। এতদঞ্চলে বিদেশীদের আগমনের পূর্বে আমাদের কাছে এ বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজরা যখন উপমহাদেশে তাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে তখন থেকেই এখানকার দাস-মনোবৃত্তির লোকেরা ওদের দেখাদেখি জন্মবার্ষিকী পালনের রীতিকে নিজেদের সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত করে নেয়।

এক্ষেত্রে সর্বাধিক লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কারো জীবনের একটি বর্ষ, তা শুরু হওয়ার সাথে নয় বরং শেষ হওয়ার পরই পালন করা হয়। অর্থাৎ যদি কারো জন্ম দিবস ১লা জানুয়ারী হয় তাহলে সে তার জন্ম দিবস পরবর্তী ১লা জানুয়ারীতেই উদযাপন করবে। এখন চিন্তার বিষয় হলো, একজনের মোট জীবনকালের একটি অতি মূল্যবান বছর হারিয়ে গেলে পর সেজন্য জাঁকজমকের সাথে আমোদস্ফূর্তি করাটা কী ধরনের বুদ্ধিমত্তার কাজ ?

আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো, যখন কারো জন্মবার্ষিকী পালন করা হয় তখন যত বছর তার বয়স হয়েছে ঠিক ততটি মোমবাতি একটি কেকের উপর প্রজ্জ্বলিত করা হয়। অতপর সে ফুঁক মেরে মেরে একের পর এক বাতিগুলো নেভাতে থাকে, আর সেই সাথে আনন্দের আতিশয্যে অনবরতঃ তালি বাজাতে থাকে উপস্থিত আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা। আর একথা কে না জানে যে, সব সমাজেই দু'টি মুহূর্তে তালি বাজানোর প্রচলন আছে। তার মধ্যে একটি হলো আনন্দের মুহূর্ত। অর্থাৎ কেউ কোনো কৃতিত্বপূর্ণ কাজ করলে হাত তালি দিয়ে তাকে অভিনন্দিত ও উৎসাহিত করা হয়। আর অপরটি হলো কারো কোনো মূর্খতা নিয়ে রসিকতার মুহূর্ত। এবার দেখুন, যেখানে এক ব্যক্তি আপন জীবনের মোমবাতিরূপী মূল্যবান বছরগুলোকে নিজেই ফুঁক মেরে মেরে খতম করে দিচ্ছে সেখানে এটা না তার জন্য আনন্দের বিষয় হতে পারে, আর না কোনো কৃতিত্বের বিষয়। অতএব একথা না বলে উপায় নেই যে, অনুরূপ মুহূর্তে হাত তালি দেয়া ঐ আহাম্মক জন্মগ্রহণকারীকে নিয়ে রসিকতা করা ছাড়া আর কী হতে পারে ?

এবার ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে জন্মবার্ষিকী পালনের বিষয়টি বিবেচনা করা যাক। ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়া হচ্ছে আখিরাতের শস্যক্ষেত্র। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর উম্মতকে একটি বিরাট উদ্দেশ্যে এ দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, যেন একজন বাদশাহ কিছু লোককে এই বলে তার কোষাগারে ঢুকিয়ে দিলেন যে, আমি যে কোনো মুহূর্তে তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে দেব। আর তখন যার কাছে যে জিনিসই থাকবে আমি তাকে সে জিনিসেরই মালিক বলে স্বীকার করে নেব। কোষাগারের একদিকে

www.amarboi.org

রয়েছে সোনারূপা—স্তুপের পর স্তুপ, আর অন্যদিকে রয়েছে হীরা-মোতি-চুনি-পান্না, আরো কত কিছু, ভারি-ভারি রাশি-রাশি। কোথাও রয়েছে অতি উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রীর স্তুপ, আবার কোথাও রয়েছে নরম কোমল দুগ্ধ ধবল শয্যারাশি। এমতাবস্থায় কিছু লোক চিন্তা করলো, বাদশাহ্ তো আমাদেরকে যে কোনো মুহূর্তে এখান থেকে বের করে দিতে পারেন। অতএব যত শীঘ্র সম্ভব এবং যত বেশী সম্ভব এখানকার বিষয়-সম্পদ, খাদ্য-পানীয়, বিছানাপত্র ইত্যাদি নিজেদের করায়ত্ব করা উচিত যাতে এখান থেকে বের হয়ে গেলেও আমরা নির্বিঘ্নে ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবন কাটাতে পারি। তারা বাস্তবে তা করলোও। কিন্তু অপর লোকেরা চিন্তা করলো, আমরা তো সবেমাত্র কোষাগারে ঢুকলাম। অতএব এত তাড়াহুড়ার কী আছে। প্রথমে খেয়ে নিই, খানিকটা বিশ্রাম করি। তারপর কোষাগার থেকে প্রয়োজনীয় সম্পদ নিয়ে গেলেই তো যথেষ্ট। এ চিন্তা করে তারা পেট ভরে খেল, তারপর শুয়ে শুয়ে সম্পদ আহরণের মুহূর্তগুলো বেকার কাটাতে লাগল। এমনি মুহূর্তে বাদশাহ্ হঠাৎ তাদের সবাইকে কোষাগার থেকে বের করে দিলেন। অতএব যারা কোষাগার থেকে হীরা-মণি-মুক্তা-আহার্য-পানীয় ইত্যাদি নিয়ে এসেছিলো তারা তাদের পরবর্তী জীবন অত্যন্ত আয়েশ-আরামের মধ্যে অতিবাহিত করলো, আর যারা পেট ভরে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল তারা সারা জীবন হাহুতাশ করতে থাকল।

এখানে আমাদের উদ্দেশ্য একথাটি বলা যে, এ দুনিয়ায় আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত মূল্যবান। কেননা এখান থেকেই পরকালের সুদীর্ঘ সীমাহীন জীবনের আরাম-আয়াশের আসবাব-সামগ্রী সংগ্রহ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশের পর দুনিয়ার ঐ মুহূর্তটি ছাড়া—যে মুহূর্তটি আল্লাহর যিকর ছাড়া কোনো না কোনো অনর্থক কাজে ব্যয় করা হয়েছে—অন্য কিছুর জন্যই আক্ষেপ করবে না।

অর্থাৎ মানুষের ইহজীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যাবন। এটাকে জন্মবার্ষিকী পালনের মত বাজে কাজে ব্যয় করার মধ্যে না কোনো যুক্তি আছে, আর না কোনো সার্থকতা। সর্বোপরি জন্মবার্ষিকী পালন একটি অপব্যয় ও অপচয় ছাড়া কিছু নয়। আর মানুষের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ হলো ঃ

وَلَا تُسْرِفُوْا ط اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ○(الانعام : ١٤١)

"তোমরা অপচয় করবে না ; কারণ তিনি (আল্লাহ্) অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১৪১)

www.amarboi.org

তাছাড়া জন্মবার্ষিকী পালনের একটি বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে জাঁকজমক প্রকাশ করা তথা কৃত্রিমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানো। আর এটা তো জানা কথা যে, ইসলাম একটি সহজ সরল ও স্বভাবসুলভ ধর্ম। ইসলাম বাহ্যিক জাঁকজমক ও কৃত্রিমতাকে পছন্দ করে না। কেননা এতে গরীবদের মধ্যে হীনমন্যতাবোধ ও ধনীদের মধ্যে উচ্চমন্যতাবোধ জাগ্রত হয়, যার ফলে সমাজের মধ্যে সৃষ্টি হয় ভেদাভেদ, রেষারেষি ও অন্যান্য যাবতীয় মানসিক ও চারিত্রিক ভ্রষ্টতা যা ক্রমে ক্রমে একটি দেশের, একটি জাতির তথা সমগ্র বিশ্ববাসীর সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।

৯. সংস্কৃতি

সংস্কৃতি অর্থ উৎকর্ষ বা অনুশীলন। একক ব্যবহারের ক্ষেত্রে এর বিশেষ অর্থ হচ্ছে মানব মনের উৎকর্ষ।

কুরআনের সংস্কৃতি শুধ ব্যক্তি-বিশেষ বা ব্যক্তি-সমষ্টির নয়, বরং সামগ্রিকভাবে গোটা মানব জাতির অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধন করে থাকে। আর এখানেই কুরআনের সংস্কৃতির সাথে বিশ্বের অন্যান্য অনেক সংস্কৃতির পার্থক্য।

ধর্ম হিসাবে ইসলাম ব্যাপক পর্যায়ে মানবীয় প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করে থাকে। উপরন্তু সার্বজনীন মানবিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই কুরআনী সংস্কৃতির চূড়ান্ত লক্ষ্য।

কুরআন যে সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে তা শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য ইত্যাদি মানুষের লক্ষ্যপথের সহায়ক উপকরণ কিংবা কোনো না কোনোভাবে পথ যাত্রীর শ্রান্তি অপনোদনের মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, কিন্তু এটা কোনোভাবেই পূজা বা প্রতীক-আশ্রয়িতার পর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। কুরআন মানব জাতিকে যেসব সাংস্কৃতিক উপাদানে ধন্য করেছে তার সবকিছুই এক নেতাকে স্বীকৃতি দান করে, এক পথ-নির্দেশ অনুসরণ করে এবং এক লক্ষ্যের প্রতি সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আর সেই নেতা হচ্ছেন মহানবী (সাঃ), সেই পথনির্দেশ হচ্ছে আল কুরআন এবং সেই অভিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছেন আল্লাহ।

কুরআন তার পথ-নির্দেশ অনুসরণকারী এবং তার বিধানসমূহ মান্যকারীদেরকে ইহজগত ও পরজগতের নিশ্চিত সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দান করেছে। কুরআনী শিক্ষার লক্ষ্য হচ্ছে সামগ্রিকভাবে গোটা মানবজাতির সাফল্য অর্জন। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, মানুষের সৃজনধর্মী অবদান ও

www.amarboi.org

মৌলিক গুণাবলীর বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের উপরই এ সাফল্য নির্ভর করে। তবে এ প্রসংগে ভুলে গেলে চলবে না যে, মানব-সমাজে গৃহীত কোনো কর্মপন্থা কুরআনের সুস্পষ্ট কোনো বিধির পরিপন্থী হলে এবং রাসূল (সাঃ)-এর শিক্ষা ও কার্যক্রমের বিরোধী হলে তা অবশ্যই ইসলাম বিরোধী। আর যা ইসলাম বিরোধী তা মূলতঃ সাফল্য ও অগ্রগতির পরিপন্থী। অতএব একজন মুসলিম বিশ্বাস করে যে, জীবনে চলার পথে কেউ অনুরূপ সৃজন-বিমুখ ও অগ্রগতি-বিরোধী কোনো কর্মপন্থা গ্রহণ করলে ওটা তার অধঃপতন ও অনিবার্য ধ্বংসের কারণে পরিণত হবে।

জাহিলিয়া যুগের আরবদের প্রতীকপূজা-কেন্দ্রিক শিল্পকলা পংকিলতা ও মত্ততাময় রূপ-বৈচিত্রের সাথে সম্পৃক্ত ছিল বলে ইসলাম সেগুলোর মূলোৎপাটন করেছিল। কেননা সামগ্রিক মানব জীবনকে সুন্দরতম, পবিত্রতম ও মহত্তম করে গড়ে তোলাই কুরআনী সংস্কৃতির লক্ষ্য।

মানব জাতির মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কুরআনী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তাওহীদই হচ্ছে মোক্ষম হাতিয়ার। 'সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা এক এবং একক, তার কোনো শরীক নেই, তিনি সকলের প্রভু এবং সকলেই তার দাস'–তাওহীদের এ শ্লোগানের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের এক অতুলনীয় বিপ্লবী আহ্বান যে লুকিয়ে রয়েছে তা যুগে যুগে স্বার্থান্ধ জালিমরা না বুঝলেও দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গ—বিশেষ করে মজলুম জনগোষ্ঠী তা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিল বলেই জালিমরা যেমন ইসলাম-বিরোধিতায় ছিল খড়গহস্ত তেমনি দূরদর্শী ব্যক্তিবর্গ ও মজলুম জনগোষ্ঠী ছিল ইসলাম প্রতিষ্ঠায় নিজেদের ধনপ্রাণ সবকিছুই বিসর্জন দিতে সদা-প্রস্তুত।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আসমান-যমীনে যাকিছু আছে তার সবই মানুষের উপকারার্থে সৃষ্টি করা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, যারা পৃথিবীতে আছে তাদের প্রতি তোমরা কৃপা কর, যিনি আসমানে আছেন তিনি (এর প্রতিদানে) তোমাদের প্রতি কৃপা করবেন। তিনি আরো বলেছেন, যে কৃপা করে না তার প্রতি কৃপা করা হয় না। এমতাবস্থায় এমন কোনো কার্যক্রমকে প্রশ্রয় দান করা নিসন্দেহে কুরআনের সংস্কৃতি বিরোধী, যাতে মানুষ, মনুষ্যত্ব এবং মানবতার অবমূল্যায়নের বাতিক রয়েছে।

শুধু মানুষ কেন, যে কোনো প্রাণীকে অযথা হত্যা করা, এমনকি কষ্ট দেয়া ইসলামের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। অতএব মানুষকে, এমনকি যে কোনো প্রাণীকে কৃপা করা ইসলামী সংস্কৃতির একটি অতি উল্লেখযোগ্য দিক।

www.amarboi.org

একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করা সহজতর হবে বলে মনে করি। দৃষ্টান্তটি হলো, বেশ কয়েক বছর পূর্বে একটি প্রশ্নের মীমাংসার্থে ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্র সমূহে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল! প্রশ্নটি ছিল ঃ মনে করুন, একটি ঘরে একটি মানব-শিশুর সাথে একটি সুবিখ্যাত অতি সুন্দর গ্রীক ভাস্কর-মূর্তি রয়েছে। এ জাতীয় মূর্তির মধ্যে এ মূর্তিটি নিসন্দেহে অসাধারণ। এবার ধরুন, ঘরটিতে হঠাৎ চতুর্দিক থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়লো এবং এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে, মূর্তি এবং শিশুটির মধ্যে কেবল একটিকেই রক্ষা করা সম্ভব। এখন কাকে রক্ষা করা হবে? অধিকাংশ সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবি ও উপরতলার লোকেরা এ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, অনুরূপ অবস্থায় মানব-শিশুকে ছেড়ে দিয়ে সেই অনুপম গ্রীক ভাস্কর-মূর্তিটিই রক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। তাদের যুক্তি ছিল ঃ প্রতিদিন লাখ লাখ শিশুর জন্ম হয়, অতএব ঐ শিশুর শূন্য স্থান অনায়াসে পূরণ করা সম্ভব। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যশিল্পের শ্রেষ্ঠতম ঐ নিদর্শনটির স্থান পূরণ কখনো সম্ভব নয়। কিন্তু কুরআনের একজন সত্যিকার অনুসারী কখনো অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করতে পারে না, এমন কি মনে মনে তা চিন্তাও করতে পারে না। কেননা অনুরূপ দৃষ্টিভংগি মানবতাবিরোধী এবং প্রতীকবাদিতা তথা প্রতিমা পূজার একেবারে উলংগ রূপ না হলেও একটি মার্জিত রূপ তো অবশ্যই বটে। তাছাড়া যুক্তিবাদিতাও এ দৃষ্টিভংগীর অসারতা প্রমাণ করে। কারণ একটি শিশুর মৃত্যু একটি মানবের মৃত্যু—একটি প্রতিভার মৃত্যু। আর এ জাতীয় একটি প্রতিভাই তো ঐ গ্রীক ভাস্কর মূর্তিটির জন্ম দিয়েছিল। হয়তো ঐ শিশুটি বেঁচে থাকলে ঐ রকম বা ওর চেয়েও উন্নত কোন ভাস্কর্যের জন্ম দিতো।

এ প্রসংগে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি মুসলিম, আল্লাহর নির্দেশ পালনে নিজের জীবনকে উৎসর্গীকৃত মনে করে এবং এটাকে মানবতার কাজ বলেই মনে করে। কিন্তু কোনো মানুষের জীবনকে—চাই সে মানুষ যত নগণ্যই হোক—সে কখনো মানুষেরই তৈরী কোনো জিনিসের বিনিময়ে উৎসর্গ করার কথা চিন্তাও করতে পারে না।

অন্যান্য ধর্মমত তার অনুসারীদেরকে পরজীবনে সাফল্য লাভের লক্ষ্যে, ইহজীবনে দুঃখ, দৈন্য, কৃচ্ছ্রতা তথা বৈরাগ্য বরণের শিক্ষা দেয় ; কিন্তু কুরআন সকল মানুষকে ইহ ও পর উভয় জীবনেই সাফল্য ও ফলভোগের প্রতিশ্রুতি দান করে। কুরআন বৈরাগ্যের বিরোধী। অতএব বৈরাগ্যভিত্তিক সংস্কৃতি ইসলামী সংস্কৃতি নয়। এক্ষেত্রে একটি বিষয় সর্বাধিক প্রনিধানযোগ্য যে, ইহকাল-পরকালের সাফল্যের জন্য একজন মানুষকে কেবলমাত্র কয়েকটি

www.amarboi.org

সাধারণ আইন ও সহজ সরল জীবন-বিধান মেনে চলতে হয়। একজন খাঁটি মুসলিমের ইহজীবন ও পরজীবনের মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। কেননা সে যে মহান প্রভু আল্লাহর ইচ্ছার উপর আত্মসমর্পণ করে তিনি একাধারে পৃথিবী, আকাশমণ্ডলী তথা স্বর্গমর্ত্যেরও প্রভু এবং তার ইহজীবন ও পরজীবনেরও সর্বময় ক্ষমতার মালিক।

এখানে একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআনী তথা ইসলামী সংস্কৃতি বলতে আমরা ইসলামের অনুসারীদের লব্ধ সংস্কৃতির কথা বলছি না, বরং এমন একটি ধর্মমত কর্তৃক স্বীকৃত সংস্কৃতির কথা বলছি, মানবিক অগ্রগতিই হচ্ছে যার নিশ্চিত ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য।

কথাটি তিক্ত হলেও সত্য যে, ভারতের আগ্রায় বেগম মমতাজ মহলের সমাধির উপর তাজমহল নামক যে কালজয়ী স্মৃতিসৌধটি নির্মিত হয়েছে, যে কোনো উৎস থেকে এর বিকাশ হোক না কেন, তা একজন ইসলাম-অনুসারী-লব্ধ সংস্কৃতি হতে পারে, তবে কুরআনী তথা ইসলামী সংস্কৃতি মোটেও নয়। কেননা বাদশাহ শাহজাহান তার সে যুগের, বিশ্বের সবচেয়ে সমৃদ্ধ শাহী ভাণ্ডারটি অকাতরে উজাড় করে দিয়ে বাইশ হাজার লোককে বিশ বছর খাঁটিয়ে একটি সমাধির উপর যে অভূতপূর্ব স্মৃতিসৌধটি নির্মাণ করেছিলেন তার পরিবর্তে তিনি এমন একটা কিছুও নিশ্চয়ই তৈরী করতে পারতেন, যা থেকে আপামর জনসাধারণ যুগের পর যুগ ধরে অশেষ কল্যাণ লাভ করতে পারতো। জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নয়নের ক্ষেত্রে তিনি তখন উল্লেখিত পরিমাণ অর্থ ও শ্রম তার বিরাট সাম্রাজ্যে নিয়োগ করলে আজ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কোনো দেশ নয় বরং এ উপমহাদেশই হত বিশ্বের তাবৎ জ্ঞানী-গুণীদের তীর্থক্ষেত্র। আর তখন বাদশাহ শাহজাহান-লব্ধ এ কর্মটি নিসন্দেহে ইসলামী সংস্কৃতির একটি অতুলনীয় নিদর্শন হিসাবে সর্ব মহলে স্বীকৃতি লাভ করতো।

প্রসঙ্গত বলা যায়, হাতীর দাঁত দু' প্রকারের। একটি খাদ্য চর্বণের জন্য এবং অপরটি প্রদর্শনের জন্য। খাদ্য চর্বণের দাঁত সহজে চোখে পড়ে না, কিন্তু প্রদর্শনের দাঁত সহজেই চোখে পড়ে। যদি প্রশ্ন করা হয়, এর মধ্যে কোন্‌টি আসল আর কোন্‌টি নকল—তাহলে যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশ্যই উত্তর দেবেন, চর্বণের দাঁত দেখা না গেলেও তা আসল, আর প্রদর্শনের-দাঁত দেখা গেলেও তা নকল। কারণ হাতীর দৈহিক কল্যাণ, প্রদর্শনী দাঁতের মধ্যে নয় বরং চর্বণের দাঁতের মধ্যেই নিহিত। অনুরূপভাবে কুরআনের দৃষ্টিতে সেই সংস্কৃতিই হচ্ছে আসল সংস্কৃতি, যার মধ্যে গোটা মানব জাতির মংগল নিহিত—চাই তাতে বাহ্যিক জাঁকজমক থাক অথবা না থাক। যে সংস্কৃতি মানব-জাতির

www.amarboi.org

দেহে বিশুদ্ধ রক্ত সঞ্চালন করে না, বরং তা থেকে রক্ত শোষণ করে নিয়ে স্বয়ং রূপে-লাবণ্যে বেড়ে উঠে এবং যুগে যুগে শুধু প্রদর্শনীর বস্তু হিসাবে বিরাজ করে সেটা আর যাই হোক, ইসলামী সংস্কৃতি হতে পারে না। যে ইট-সিমেন্ট-রড-বালু দিয়ে একটি আকাশচুম্বী মিনার তৈরী করা হয়েছে তা দিয়ে একটি বিরাট সেতু অথবা হাসপাতাল অথবা বিদ্যালয়ও তৈরী করা যেত। এ দু'টির মধ্যে কোন্‌টি কুরআন অনুমোদিত সংস্কৃতি ? এক কথায় উত্তর, নিসন্দেহে শেষেরটি। কেননা প্রথমটি তথা আকাশচুম্বী মিনারটি একটি প্রদর্শনীর বস্তু বটে, তবে এর মধ্যে সর্বসাধারণের—বিশেষ করে বঞ্চিতদের কোনো কল্যাণ নিহিত নেই।

কুরআন-নির্দেশিত প্রত্যেকটি কাজ তথা নামায, রোযা, যাকাত, হাজ্জ ইত্যাদির মুখ্য উদ্দেশ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ ও আত্মোৎসর্গ ছাড়া কিছু নয়। পবিত্র কুরআন বলে ঃ

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

"বলো, [হে মুহাম্মদ] আমার নামায (আরাধনা), আমার কুরবানী (উৎসর্গ), আমার জীবন, আমার মরণ (সবকিছুই) বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যে।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১৬২)

আর এ উৎসর্গ তখনই পুরোপুরিভাবে সার্থকতা লাভ করতে পারে যখন মানুষ আল্লাহর পরিবার তথা তার বান্দাদের কল্যাণ সাধনে তার যাবতীয় প্রচেষ্টা নিয়োজিত রাখে। তাই তো দেখা যায়, একজন মুমিন কুরআন-নির্দেশিত ইবাদাতসমূহ সম্পাদনের মাধ্যমে যেমন নিজের উৎকর্ষ সাধন করে তেমনি অন্যদের কল্যাণ সাধনের যোগ্যতা এবং অনুপ্রেরণাও লাভ করে।

রোযা মানুষকে অশ্লীল ও মন্দ কার্য থেকে বিরত রাখে এবং তাকে, তার রিপুর তাড়না নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রশিক্ষণ দেয়। এর মাধ্যমে বিত্তবানরা বিত্তহীন তথা নিরন্নদের দুঃখ-যাতনা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারে। ফলে তারা স্বাভাবিকভাবেই ওদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করার অনুপ্রেরণা পায়। যাকাতের মাল ধনীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে আদায় করা হয় এবং গরীবদের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। হাজ্জ একটি বিশ্ব-মুসলিম-সম্মেলন যার মাধ্যমে বিশ্ব-মুসলিমের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হয়।

পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় বলা হয়েছে, "যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকাজ করে" অর্থাৎ আস্থাবাদী ও সৎকর্মশীলরাই সফল জীবনের অধিকারী হয়। অতএব যারা অবিশ্বাসী, নৈরাশ্যবাদী এবং অলস ও কর্মবিমুখ—কুরআনের

www.amarboi.org

দৃষ্টিতে তারা অবাঞ্ছিত। এ কারণেই অন্যান্য সব ধর্মমতে সবরকম ধর্মীয় অধিকার ও কার্যক্রম অস্বাভাবিকভাবে পুরোহিত সম্প্রদায়ের উপর ন্যস্ত করা হলেও ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এসব অধিকার ও দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তি-মানুষের উপরই অর্পণ করা হয়েছে। আর এ প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গির ফলে মুসলিম সমাজে কোনো বিশেষ বর্ণ বা গোত্রের লোক নয় বরং কার্যতঃ বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী লোকেরাই স্বাভাবিকভাবে জাতি ও সমাজের নেতৃত্ব লাভ করে থাকে।

মহানবী (সাঃ) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেকটি মুসলিম নর-নারীর উপর ফরয বা অবশ্য কর্তব্য।

অতএব নর ও নারী উভয়ের জন্যই সার্বজনীন শিক্ষা, ইসলামের পবিত্র সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত। ইসলামের স্বর্ণযুগে মসজিদে, শুধু নামায নয় বরং কুরআন, হাদীস ও ফিক্‌হের উপর আলোচনার সাথে সাথে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, ভেষজ বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদির উপরও আলোচনা করা হতো। কেননা তখন মসজিদই ছিল ইসলামের বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের মত কোনো মতবাদের অস্তিত্ব নেই। কেননা ইসলাম মানুষের উদ্যম ও কর্মধারার সমগ্র পরিসরকেই তার অন্তর্ভুক্ত রাখে। এটি একটি যুক্তিবাদী ধর্ম। কুরআন ধর্মীয় ক্ষেত্রে যুক্তি ও সাধারণ বুদ্ধি প্রয়োগের জন্য মানুষের প্রতি বার বার আহ্বান জানিয়েছে। কেননা মানবিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্যভাবে ব্যাপক বিচারবুদ্ধির প্রয়োজন। তবে একথা নির্ঘাত সত্য যে, যেসব জাতি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস হারায় তাদের অধঃপতন অনিবার্য। একথার অর্থ আবার এই নয় যে, আল্লাহর প্রতি জাগ্রত বিশ্বাস ও প্রশস্ত মুক্তবুদ্ধি পরস্পর সংগতিবিহীন।

বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, ইসলাম পৃথিবীর উপরে কোনো কিছুকেই সমালোচনার উর্ধে মনে করে না। কেবল অসীম অলৌকিক শক্তিময় এমন একজন আছেন—যিনি অকল্পনীয় অদ্বিতীয় সত্তাময়, যার একত্বে একবার বিশ্বাস স্থাপনের পর আর কোনো আলোচনা-সমালোচনার অবকাশ থাকে না, তিনি সকলের জন্য এক, সকলের জন্য সার্বজনীনভাবে মংগলময় ও পরম দয়ালু। তিনি মানুষকে যুক্তি, প্রজ্ঞা ও কার্যকারণ নিরূপণের প্রতিভা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। যা শুভ ও কল্যাণকর তার অনুসরণ, আর যা মন্দ ও অকল্যাণকর তা বর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যাতে সম্পূর্ণ অবাধে আল্লাহর নামে ও তার যথাযথ নির্দেশ পালনে এ বিচারবুদ্ধি ও কার্যকারণ প্রয়োগ করতে পারে সে জন্যই আল্লাহ তাকে এ দক্ষতা দিয়েছেন।

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বিচার-বুদ্ধির চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো কিছুই সৃষ্টি করেননি। এর দ্বারাই আল্লাহ আমাদের কল্যাণ বিধান করেছেন, এর সাহায্যেই আমরা সবকিছু বুঝি ও অনুধাবন করি, এর জন্যই আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ ঘটে থাকে এবং এর মধ্যেই পুরস্কার ও শাস্তির কারণ নিহিত রয়েছে।

ইসলামী শিক্ষার দৃষ্টিতে অলৌকিকতা ঐশীশক্তি বা ধর্মের প্রাণবস্তুর প্রমাণ বা বৈশিষ্ট্য নয়। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, অলৌকিক শক্তি প্রাকৃতিক আইনকে অতি অল্পই লংঘন করে থাকে। কেননা প্রাকৃতিক আইন মূলতঃ ঐশীশক্তি-সঞ্জাত তথা খোদ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। আর অলৌকিকতা হচ্ছে, লক্ষ্যের পথে কোনো বিশেষ স্তরে মানবিক তথা মানুষের আত্মিক অগ্রগতির প্রকাশ-বৈশিষ্ট্যের এক বিশেষ নিদর্শন। আর আত্মিক অগ্রগতির এ স্তরে সাধারণ মানুষের সামনেও অপ্রকাশিত নিয়মধারা দৃশ্যমান হয়ে উঠে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের সাথেও বহু অলৌকিক ঘটনা সম্পৃক্ত রয়েছে। কিন্তু মুসলমান এগুলোকে তার নুবুওয়াতের মৌলিক প্রমাণ বা নিদর্শন বলে মনে করে না, বরং আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট বাণী (কুরআন) এবং অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে তার সফল বাস্তবায়নই হচ্ছে নবী (সাঃ)-এর নবুওয়াতের মূল প্রমাণ।

গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র কিংবা আধুনিক যুগের অন্য কোনো মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে সম্পূর্ণভাবে নীতি ও আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আধুনিক বিশ্বের এক শ্রেণীর লোক (তাদের মধ্যে মুসলিম নামধারী কিছু লোকও রয়েছে) ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। অন্য কথায়, তারা ধর্মীয় ও নৈতিক আদর্শের পরিবর্তে অন্য যে কোনো মতবাদের উপর ইসলামী সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়।

তাদের উদ্দেশ্যে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেকটি ঐশী ধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আদর্শ রয়েছে। পূর্ববর্তী অন্যান্য ধর্মের ন্যায় ইসলাম কেবল ধর্মের পরোক্ষ আদর্শকে গ্রহণ করতঃ এর মূল্যবোধের গণ্ডীকে সীমিত করে রাখেনি। শুধু উপাসনার সময় ধর্মকে স্মরণ করা হবে এবং অন্য সময়ে ভুলে যাওয়া হবে —ধর্ম সম্পর্কে এ ধরনের নিরাশক্তি এবং জীবন থেকে তাকে সরিয়ে রাখার এ মনোবৃত্তি, ইসলামে শুধু অর্থহীন নয়, হাস্যকরও বটে। প্রকৃতপক্ষে বাস্তব, কার্যকর ও পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় আদর্শবাদকেই ইসলাম স্বীকৃতি দেয় এবং সর্বদা এ আদর্শের অনুসরণ করে। ইসলামের ধর্মীয় আদর্শবাদ, যা স্বভাবধর্মী ও বাস্তবনির্ভর—একমাত্র তা-ই আধুনিক জীবনের আত্মঘাতী স্বার্থ-সর্বস্বতার গতিরোধ করতে পারে। এ হচ্ছে এমন একটি আদর্শ, যার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কিংবা মানুষের চিন্তার ব্যাপ্তির ফলে ধ্বসে যেতে পারে না। কেননা

www.amarboi.org

বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও মানুষের চিন্তার ফলাফল প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্নিহিত ; আর ইসলামী আদর্শও প্রকৃতিধর্মী। তাই বিজ্ঞানের প্রগতিমুখী প্রচেষ্টা, প্রাকৃতিক জগতের রহস্য যতবেশী উদঘাটন করবে ততবেশী স্পষ্ট হয়ে উঠবে প্রকৃত মুসলিমের কাছে আল্লাহর মহিমা, তাঁর লীলা, বৈচিত্র, তাঁর বিধান ও তাঁর সার্বভৌম শক্তির স্বরূপ।

সমাজতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, শ্রমিকতন্ত্র ও বলশেভিকবাদের বিকল্প হিসাবে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক জীবন ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দান করে। পক্ষান্তরে অন্য সব মতবাদ বিকল্প হিসাবে এমন একটি ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দান করে, অনিবার্য ধ্বংসই যার পরিণতি। এসব অন্তঃসারশূন্য ঠুনকো মতবাদগুলোর উপর ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এক বিরাট প্রাধান্য রয়েছে এবং অপরিসীম সাফল্যের সংগেই ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অনুশীলন হয়েছে। আর এ অনুশীলন যত বিরাট হবে তার বাস্তবায়নও হবে তত পূর্ণাঙ্গ। এ পটভূমিতে প্রতিটি মুসলমান বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীর সকল জাতি পারিভাষিক অর্থে মুসলমান বা অমুসলমান যে কোনো নামেই অভিহিত হোক না কেন, ইসলামের নির্যাস ও মর্মবাণীকে সে একদিন না একদিন গ্রহণ করবেই। কেননা ইসলামের আইন হচ্ছে প্রাকৃতিক (কিংবা ঐশী) বা স্বাভাবিক আইন, যা মানুষের অগ্রগতিকে পরিচালিত করবে। মানুষ অন্য সব পথের সন্ধান করে শেষ পর্যন্ত দারুণ ব্যর্থতা বরণ করতে করতে একদিন অবশ্যই ইসলামী জীবন বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তার আকাংখিত পথের সন্ধান খুঁজে পাবে। আমরা আজ যেখানে শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও জাতিতে জাতিতে বিভেদ দেখছি, আর যেখানে কোনো স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করছি না—ইসলাম সেখানে শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রতিশ্রুতি দান করে। এরপরও যদি শুধু আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতি এবং আল্লাহর প্রেরিত একজন বাণীবাহকের প্রত্যাদেশ-নির্ভর মতবাদের দাবীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলে এমন একটি জীবন ব্যবস্থার ভালমন্দ ও গুণাগুণ বিচার করতে কেউ অস্বীকার করে, তবে তার এ কাজকে নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই বলা যেতে পারে না। এটা তার নাস্তিকতাসুলভ গোড়ামির বহিঃপ্রকাশ ছাড়া কিছু নয়।

একথা সত্য যে, একমাত্র ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক বলেই মানব সংস্কৃতির ইসলামী ব্যবস্থাকে অবজ্ঞার চোখে দেখা হয় না। প্রকৃতপক্ষে আজকের দিনগুলোতে এবং সুদূর অতীতেও মুসলমানদের কিছু কিছু কার্যকলাপ ও আচার-আচরণ বিরুদ্ধবাদীদের এ অবজ্ঞার পিছনে প্রেরণা যুগিয়েছে। মধ্যযুগের খ্রীস্টানজগত, যাজকতন্ত্রের দাসানুদাসে পরিণত হয়েছিল বলে ইসলাম সম্পর্কে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার এবং এ সম্পর্কে কোনোরূপ স্থির সিদ্ধান্তে পৌছার

www.amarboi.org

কোনো সুযোগ তারা পায়নি। সে সময়ে আজকের মত বা আজকের চেয়েও অধিক জোরেসোরে ঐ ধর্মান্ধ যাজক শ্রেণী মহানবী (সাঃ)-কে 'ভুয়া নবী' বলে প্রচার করতো এবং তার অনুসৃত ধর্ম ইসলামে যে মানব জাতির কোনো কল্যাণ ও মঙ্গল নিহিত থাকতে পারে একথা চিন্তা করার সুযোগ পর্যন্ত তারা (যাজক শ্রেণী) আপন স্বধর্মীদের দিত না। উপরন্তু উভয় ধর্মানুসারীদের মধ্যে ধর্মকেন্দ্রিক এক স্থায়ী বিদ্বেষ ও শত্রুতা, সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত তাদের মধ্যে বিরাট বাধার দেয়াল সৃষ্টি করে রাখে। অধুনাকালে এ দেয়াল কার্যতঃ অপসারিত হলেও বিশ্ব মুসলিমের অবস্থা এমন নয় যে, তারা তাদের ধর্ম-বহির্ভূত লোকদের মনে এ ধারণার সৃষ্টি করতে পারে যে, ঠিক তাদের মত মানুষরাই মানবিক অগ্রগতির পথের রহস্য জানে। আজ মুসলিম সমাজের আচার-আচরণ ও হাল-হাকীকত ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে বহুলভাবে অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টান্ত। এসব দেখে যদি কেউ তাদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং মুসলমানদের অধঃগামিতার জন্য পবিত্র ইসলামকে দোষারোপ করার কথা চিন্তা করে তাহলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে আসল কথা হলো, এজন্যে তো ইসলামকে, ইসলামী আচার-আচরণ বা সংস্কৃতিকে দায়ী করা চলে না। খ্রীস্টান ধর্ম আজ পুরোপুরি যাজকতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণাধীন, কিন্তু ইসলামে কোনো পৌরহিত্যবাদের অস্তিত্ব নেই। তবে আজ মুসলিম সমাজের কোথাও কোথাও যাজকতন্ত্রের অনুরূপ পৌরহিত্যবাদ বা কুরআন-হাদীস-বিমুখ এক জাতীয় পীরতন্ত্র (আল কুরআনের ভাষায় যাকে বলা যায় 'আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে তাদের প্রভু হিসাবে গ্রহণ') ধর্মীয় কর্তব্য হিসাবে যে কোনো স্থান বা উৎস থেকে জ্ঞান আহরণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন, সুস্থ বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তিবাদিতার প্রতি অনাস্থা এবং এ জাতীয় আরো কিছু বাতিল প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যা নিসন্দেহে মুসলমানদের পতনের প্রধান কারণসমূহের অন্যতম। যে সময়ে মুসলমানরা তাদের শরীআতের সেই গুরুত্বপূর্ণ অংশকে সাধারণভাবে বাতিল করে দেয়, যাতে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল অনুধাবন ও উপলব্ধির উদ্দেশ্যে তাদের জ্ঞান ও শিক্ষার যথার্থ অনুশীলনের নির্দেশ রয়েছে, ঠিক সেই সময়ে পাশ্চাত্যের খ্রীস্টানরা মুসলমানদের পরিত্যক্ত শরীআতের ঐ অংশটির মর্মবাণীর অনুগমন শুরু করে—আর তাদের যাজক শ্রেণীর সবরকমের অভিসম্পাত সত্ত্বেও তারা এক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। অত্যন্ত আশার কথা যে, মানবতার বন্ধ্যাত্ব বা দাসত্ব নয় বরং মানবতার অগ্রগতি ও মুক্তি-সাধনাকেই পবিত্র কুরআনে খাঁটি ধর্মের লক্ষ্য হিসাবে বিবৃত করা হয়েছে এবং বিশ্বের সর্বত্র আজ মুসলমানরা এ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠতে শুরু করেছে। তারা বুঝতে পারছে তাদের অবনতি ও অবমাননার জন্য তারা নিজেরাই দায়ী এবং

www.amarboi.org

এটা তাদেরই কৃতকর্মের ফল। তারা আজ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারছে যে, একমাত্র নিবিষ্টচিত্তে ইসলামে প্রত্যাবর্তন ছাড়া তাদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের আর কোনো পথ নেই।

প্রশ্ন উঠতে পারে, সংস্কৃতির আলোচনা করতে গিয়ে এখানে ধর্মীয় আলোচনায় এভাবে ব্যাপৃত হওয়ার কারণ কি? এর উত্তর এই যে, প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সংস্কৃতি, ধর্মের সাথে এতই ওতপ্রোত এবং আল্লাহর বিশ্বজনীন সার্বভৌমত্বের ধারণার সাথে এমনি সম্পৃক্ত যে, অনুরূপ আলোচনা তথা কার্যকারণ ও প্রসঙ্গ-নির্দেশ ছাড়া বিষয়টিকে যথাযথভাবে তুলে ধরা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। উত্থানে হোক কিংবা পতনে হোক, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য কিংবা সমাজ কল্যাণের যে কোনো পরিসর এবং অংগনেই, সবসময় ইসলামী সংস্কৃতির এ ধর্মীয় অনুপ্রেরনার এবং এ বিশ্বজনীন ও পূর্ণাঙ্গ ধর্মীয় জীবন ব্যবস্থার সক্রিয়তা ব্যাপ্তিশীল রয়েছে। একথা সত্য যে, এর বিভিন্ন রূপ, সৃষ্টি ও প্রকাশের মধ্যে এমন কিছু আছে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হবে যা সাধারণ ধর্মীয় অংগন থেকে অনেক দূরে। কিন্তু মূলতঃ এ দৃষ্টিভঙ্গিই আন্তর্জাতিকতার ভাবরসে সম্পৃক্ত ইসলামী জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে। কেননা আল্লাহর বিশ্বজনীন সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি, তার উদ্দেশ্যের পরিপূরক বিশ্বজনীন মানবিক ভ্রাতৃত্বের স্বীকৃতিই ঘোষণা করে।

---

www.amarboi.org

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবিধ

১. ভয় ও দুঃখ

ভয় এবং দুঃখ এমন দু'টি বস্তু, যেগুলোকে কেন্দ্র করে মানুষের সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যের চাকা আবর্তিত-বিবর্তিত হয়। জীবনে মানুষ যা পাবার আশা রাখে কিন্তু এখনো পায়নি তা সে আদৌ পাবে কিনা সে ব্যাপারে ভীতিগ্রস্ত থাকে। আর যখন পেয়ে যায় তখন ভীতিগ্রস্ত থাকে এই ভেবে যে, কখন না আবার তা হারিয়ে যায়। যতক্ষণ মানুষ অর্থ, সম্পদ, ঐশ্বর্য, সম্মান, মর্যাদা, প্রভাব, প্রতিপত্তি ইত্যাদির অধিকারী না হয় ততক্ষণ তার ভয় থাকে হয়ত জীবনে কখনো সে এগুলোর অধিকারী হতে পারবে না। আবার এগুলো যখন তার আয়ত্বের মধ্যে চলে আসে তখন সর্বক্ষণ সে ভীতিগ্রস্ত থাকে এই ভেবে যে, কখন না আবার এগুলো হাতছাড়া হয়ে যায়।

মানুষ পার্থিব সম্পদকে কেন্দ্র করে যেমন ভীতিগ্রস্ত থাকে তেমনি ভীতিগ্রস্ত থাকে তার আয়ুষ্কালকে কেন্দ্র করেও। কেননা আয়ুষ্কালকে দীর্ঘায়িত বা চিরায়ত করার কোনো কৌশল বা বিদ্যা তার জানা নেই। অতএব এটা জানা কথা যে, যে কোনো মুহূর্তে মানুষের আয়ুষ্কালের পরিসমাপ্তি ঘটতে পারে। আর এটা নিসন্দেহে তার জন্য একটা ভয়ের ব্যাপার। তাছাড়া আয়ুষ্কালের পরিসমাপ্তি কিভাবে বা কি অবস্থায় ঘটবে, অতপর আবার কোন্ পরিস্থিতির মুকাবালা করতে হবে এসব চিন্তাও মানুষকে রাতদিন ভীতিগ্রস্ত করে রাখে। ফলে অনেক কিছু পাওয়া সত্ত্বেও 'কোনো কিছুই না পাওয়ার' কষ্টে সে ভোগে এবং সবসময় দুঃখ-ভারাক্রান্ত থাকে। মানুষের জীবনে এই যে ভয় ও দুঃখ তা দূর করতে পারলেই প্রকৃত শান্তি তথা সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যায়। কিন্তু কোন্ সে পথ, যে পথে চললে এ ভয় ও দুঃখ দূর হবে?

কুরআন বলে, এর একটি মাত্র পথ আছে। আর সে পথ হচ্ছে ঈমানের পথ। যারা মহান আল্লাহ্ তাআলাকে আপন প্রভু বলে বিশ্বাস করে, তার উপর ভরসা রাখে, তার সম্পর্কে সদা-সতর্ক থাকে, তাকে আপন প্রতিপালক বলে মানে এবং এ বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে তারা নিশ্চিতভাবে ভয় ও দুঃখ হতে পরিত্রাণ লাভ করে। কখনো দৃষ্টান্ত ও উপমার সাহায্যে, আবার কখনো অতীত যুগে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমে কুরআন মানবজাতির সামনে

www.amarboi.org

একথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যারাই আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সে বিশ্বাসের উপর সুদৃঢ় থাকে তাদের জীবনে কোনো ভয় ও দুঃখ থাকে না। কেননা যখন দরকার ও যতটুকু দরকার ঠিক তখন এবং ততটুকু সাহায্য-সহায়তা তারা আল্লাহর কাছ থেকে পেয়ে থাকে। উপরন্তু তারা লাভ করে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ তাদের পার্থিব, পারলৌকিক উভয় জীবনে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَٰتِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۝ (يونس : ٦٢-٦٤)

"জেনে রেখ, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা বিশ্বাস করে এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে এবং পারলৌকিক জীবনে, আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই ; এটাই মহা সাফল্য।"–(সূরা ইউনুস ঃ ৬২-৬৪)

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ نَحْنُ أَوْلِيَآؤُكُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ ۖ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ ۝ (حم السجدة : ٣٠-٣٢)

"যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ', অতপর অবিচলিত থাকে, তাদের কাছে অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে, তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে ; সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন।"

–(সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ঃ ৩০-৩২)

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَٰمُوا۟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ أُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝

www.amarboi.org

"যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক তো আল্লাহ' এবং এ বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। এরাই জান্নাতের অধিবাসী। সেখানে এরা স্থায়ী হবে, এটাই তাদের কর্মফল।"
–(সূরা আল আহকাফ ঃ ১৩-১৪)

قُلْ اَرَءَيْتَكُمْ اِنْ اَتٰكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ بَغْتَةً اَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الظّٰلِمُوْنَ ○ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۚ فَمَنْ اٰمَنَ وَاَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ (الانعام : ٤٧ ـ ٤٨)

"বলো, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ অথবা প্রকাশ্যে তোমাদের উপর আপতিত হলে জালিম সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ ধ্বংস হবে কি ? রাসূলগণকে তো শুধু সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারীরূপেই প্রেরণ করি ; কেউ ঈমান আনলে ও নিজেকে সংশোধন করলে তার কোনো ভয় নেই এবং সে দুঃখিতও হবে না।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৪৭-৪৮)

যারা আল্লাহর উপর ভরসা রাখে এবং তার সম্পর্কে সদা-সতর্ক থাকে তাদের সম্পর্কে কুরআনের ভাষ্য হলো ঃ

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ○ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۗ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ○ (الطلاق : ٢ ـ ٣)

"যে কেউ আল্লাহ সম্পর্কে সদা-সতর্ক থাকে (তাক্ওয়া অবলম্বন করে) আল্লাহ তার পথ (সমস্যাসমূহের সমাধান) করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে রিয্ক দান করবেন। যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা রাখে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, আল্লাহ তার ইচ্ছা পূরণ করবেনই, আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন নির্দিষ্ট মাত্রা।"–(তালাক ঃ ২-৩)

যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তার আদেশ-নির্দেশ পালন করে না, তার উপর ভরসা রাখে না তারা সারা জীবন ভয় ও দুঃখের মধ্যে কাটায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহকাল ও পরকালে। কিন্তু যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে, সৎকাজ করে তারা হয় সফল জীবনের অধিকারী, তারা লাভবান হয় ইহকাল-পরকালে। খোদ আল্লাহ তাআলার ঘোষণা ঃ

www.amarboi.org

وَالْعَصْرِ ۙ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۙ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (العصر : ١-٣)

"মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু ওরা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"-(সূরা আসর ঃ ১-৩)

২. ইল্‌ম ও আমল

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত—সৃষ্টির সেরা জীব। তবে তাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব ইল্‌ম (জ্ঞান) ও আমলের (সৎকর্মের) উপর নির্ভরশীল। আর প্রকৃত ইল্‌ম হচ্ছে, সঠিক আকীদা-বিশ্বাস এবং প্রকৃত আমল হচ্ছে আহকামে শরীআতের সঠিক অনুসরণ। কোনো ব্যক্তি যদি বৈষয়িক কিছু জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং কোনো সভ্য সমাজ থেকে কিছু ভদ্র আচার-আচরণও রপ্ত করে নেয়, অতপর ধারণা করে বসে যে, আমি সৃষ্টির সেরা জীব হয়ে গেছি তাহলে মনে করতে হবে, সে ব্যক্তি মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত অর্থই অনুধাবন করতে পারেনি। কেননা মনুষ্যত্ব বলতে শুধু কিছু বৈষয়িক জ্ঞান, বাহ্যিক আকার-আকৃতি বা কিছু ভদ্র আচার-আচরণকে বুঝায় না, বরং প্রধানত সেই বিচার-বিবেচনাকেও বুঝায়, যার সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে তার দুনিয়া-আখিরাতের সর্বাঙ্গীন শান্তি ও মঙ্গল। যদি মানুষ একথাটি যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে তাহলে সে শরীআতের আদেশ-নির্দেশ পালনের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ না করে পারে না।

মানুষ হলো আল্লাহর আব্‌দ, বান্দা বা দাস। শরীআতের পরিভাষায় এ দাসত্বকেই 'ইবাদাত' বলা হয়। অতএব ঐ মানুষই প্রকৃত মানুষ, যে যথাযথভাবে আল্লাহ তাআলার দাসত্ব তথা শরীয়াতের হুকুম-আহকাম মেনে চলে। কেননা স্রেফ আল্লাহ তাআলার ইবাদাতের জন্যই তো মানুষ ও জ্বিনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات : ٥٦)

"আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন এবং মানুষকে এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে।"-(সূরা আয যারিয়াত ঃ ৫৬)

একথা ভালভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, ইবাদাত হচ্ছে ইল্‌ম ও আমল উভয়েরই নাম। যেভাবে কোনো ইমারতের জন্য তার ভিত্তির প্রয়োজন তেমনি

www.amarboi.org

প্রয়োজন আমলের জন্য ইল্‌মের। আর যেভাবে ইমারত ছাড়া ভিত্তির কোনো মূল্য নেই তেমনি আমল ছাড়া ইল্‌মের কোনো সার্থকতা নেই। এ কারণেই কুরআন মজীদের বহু জায়গায় ঈমান ও আমলকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

অন্যভাবে বলতে গেলে ইল্‌ম দু' প্রকার। যথা নাযারী (দর্শন বা বিশ্বাসগত) ও আমলী (ক্রিয়াগত)। শুধুমাত্র আকীদাসমূহই নাযারী ইলমের অন্তর্গত। এগুলোর মধ্যে আমলের প্রয়োজন পড়ে না। যেমন তাওহীদ, রিসালাত, পুনরুত্থান ইত্যাদিতে বিশ্বাস স্থাপন। এ বিশ্বাস স্থাপন মানুষের জন্য ফরয। আর আমলী ইল্‌ম হচ্ছে কোনো বিষয়কে জেনে সেটাকে কার্যে পরিণত করা। যেমন—নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত, জিহাদ ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আমলই আসল বস্তু। তবে কিভাবে আমল করতে হবে তা পূর্বাহ্নে জেনে নেয়া বা তার উপর বিশ্বাস স্থাপন অপরিহার্য।

ইবাদাতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করা। মানুষের অন্তরে বিভিন্ন ধরনের যে সমস্ত কলুষতা রয়েছে, ইবাদাত ছাড়া অন্য কিছুতেই তা দূর করা সম্ভব নয়। মানুষ জন্মগ্রহণ করার পর থেকে যেমন তার দেহে নখ, চুল, ধূলোবালি, উকুন প্রভৃতি আকারে নানা ধরনের বাহ্যিক ময়লা এসে বাসা বাঁধে এবং সেগুলো সে অনবরতঃ হটাতে থাকে তেমনি করে মনের মধ্যেও অংশীবাদিতা, মূর্খতা, স্বার্থপরতা, লোভ, লালসা, হিংসা, বিদ্বেষ, কার্পণ্য ইত্যাদি আকারে বিভিন্ন ধরনের আভ্যন্তরীণ ময়লা এসে বাসা বাঁধে এবং সেগুলো দূর করা ছাড়া তার মন পবিত্র হয় না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, শেষোক্ত ধরনের ময়লা দূর করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। তাই আল্লাহ্ ও তার রাসূল এ জাতীয় ময়লা দূর করার জন্য বান্দাকে বিশেষভাবে তাকীদ দিয়েছেন। কেননা এগুলোকে দূর করা ছাড়া আত্মাকে পবিত্র করা সম্ভব নয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের আত্মা পবিত্র না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যিকার মানব জীবনের অধিকারী হতে পারে না। সে কোনো পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে না ন্যায়-অন্যায় তথা হক-বাতিলের মধ্যে।

আত্মসংশোধন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইবাদাতের মাধ্যমে মানুষ তার আত্মাকে বিশুদ্ধ ও পবিত্র করে। যে আল্লাহ্‌র ইবাদাত ও যিকর থেকে বঞ্চিত তার আত্মা অপবিত্র এবং সে শয়তানের দলভুক্ত। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইবাদাত ছাড়া অন্য কিছুর মাধ্যমে আত্মাকে পবিত্র করার কথা চিন্তাও করা যায় না।

উপরন্তু ইবাদাত হচ্ছে এমন একটি জিনিস, যার মাধ্যমে মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্তার মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষ লাভ করে তার

www.amarboi.org

সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য—এমনকি লাভ করে কাশ্‌ফ ও ইলহাম প্রাপ্তির লোভনীয় সুযোগও।

যারা বলে—শরীআতের আহকাম পালন জরুরী বটে, তবে শরীআতের দু'টি দিক রয়েছে, একটি যাহিরী (বাহ্যিক) এবং অন্যটি বাতিনী (গোপনীয়), আর যে ব্যক্তি যাহিরী দিকটি অতিক্রম করতে পেরেছে তার উপর শরীআতের হুকুম-আহকাম পালনের বাধ্য-বাধকতা বাকী থাকে না—তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের একটি মাত্র উক্তি এই যে, কেবলমাত্র সেই পথ অনুসরণ করেই আমরা ইহ-পরকালে সাফল্যের অধিকারী হতে পারি, যে পথ দেখিয়ে দিয়ে গেছেন সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ)। তিনি তার জীবনের শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে শরীআতের যাবতীয় হুকুম-আহকাম পালন করে গেছেন এবং এটাই হচ্ছে তার সুন্নাত। যে তার এ সুন্নাতকে ডিংগিয়ে নতুন কোনো কথা বলবে সে মাস্তান, দরবেশ, পাগলাবাবা, তরিকতী ইত্যাদি যে নামেই আখ্যায়িত হোক, সেই দ্বীন বা শরীআতের অনুসারী নিশ্চয়ই নয়, যার অনুসারী ছিলেন সরদারে দুজাঁহা আহমদ মুজতাবা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

৩. স্বাধীনতার মর্মকথা

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এটা বান্দার প্রতি তার সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠতম অবদান। ইসলাম মানুষকে অবশ্যই স্বাধীনতা প্রদান করে ; তবে সেই স্বাধীনতা, যার মাধ্যমে মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে পৃথিবীতে নিজের জীবন অতিবাহিত করতে পারে এবং ইহকাল-পরকালে অধিকারী হয় শান্তি ও মঙ্গলের। ইসলাম প্রদত্ত স্বাধীনতার লক্ষ্য হলো আকীদা-বিশ্বাস, আচার-আচরণ, কাজকর্ম ইত্যাদি ক্ষেত্রে 'ফিতরাত'-এর বিধান ও শরীআতের হুকুমের আলোকে মানব জীবনকে স্বাধীন সত্তায় রূপান্তরিত করা। মহান আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পাঠিয়েছেন মানুষকে সঠিক জীবন পদ্ধতি শিক্ষাদান, তাদের অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ ঘটানো এবং তাদের সামনে হক-বাতিল তথা ভাল-মন্দের প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরার জন্য। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর আবির্ভাবকালে তৎকালীন সমাজপতি ও তথাকথিত পণ্ডিত-পুরোহিতরা জনগণকে প্রবৃত্তির দাসত্ব ও 'নাফসানিয়াত' তথা রিপুর গোলামীতে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল। মহানবী (সাঃ) সেই দাসত্ব ও গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করে মানবতাকে মর্যাদার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেন—মানবাত্মার মুক্তি সনদ নিয়ে হাযির হন বিশ্ববাসীর

২৬—

www.amarboi.org

সামনে। তখন তার প্রতি যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল সেসব মুমিনদের প্রশংসা করে পবিত্র কুরআনে বলা হয় ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ ز يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِيْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهٖ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ اُنْزِلَ مَعَهٗٓ لا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○(الاعراف : ١٥٧)

"যারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যার উল্লেখ তাওরাত ও ইনজীল, যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে বাধা দেয়, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তু বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তু অবৈধ করে এবং যে মুক্ত করে তাদেরকে তাদের গুরুভার হতে ও শৃঙ্খল [কঠিন বিধানাবলী, যা পূর্ববর্তী শরীআতে ছিল অথবা পরাক্রমশালী শত্রুর অত্যাচার ও পরাধীনতার শৃঙ্খল] হতে, যা তাদের উপর ছিল। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে নূর তার সাথে অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।"–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৫৭)

ইসলাম মানুষের কর্ম ও বাক-স্বাধীনতা অবশ্যই সমর্থন করে, তবে সেই বাক-স্বাধীনতা, যা সুস্থ বিবেকের দৃষ্টিতে সত্য ও সুন্দর, যার মধ্যে নির্মল অন্তর শান্তি অনুভব করে, যা কল্যাণধর্মী এবং মানুষের সহজাত বৃত্তির পরিপন্থী নয়। আর সেইসব বিষয়বস্তুর উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে—যা সুস্থ বিবেকের বিরোধী, যা নির্মল অন্তঃকরণ ও অনাবিল অনুভূতির অস্বীকারকারী—অন্য কথায় যা অন্যায়, অশ্লীল ও ঘৃণ্য। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَآءَ سَبِيْلًا ○(بنی اسرائیل : ٣٢)

"অবৈধ যৌনসংযোগের নিকটবর্তী হয়ো না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩২)

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ○(بنی اسرائیل : ٣٥)

www.amarboi.org

"মেপে দেবার সময় পূর্ণ মেপে দেবে এবং ওজন করবে সঠিক দাড়িপাল্লায়; এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্ট।"-(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৫)

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ۝ كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهٗ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ۝ (بني اسرائيل : ٣٧-٣٨)

"ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না ; তুমি তো কখনই পদভরে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না। এ সমস্তের মধ্যে যেগুলো মন্দ সেগুলো তোমার প্রতিপালকের নিকট ঘৃন্য।"-(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৩৭-৩৮) ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইসলামী শরীআত মানব-খাদ্য রূপে সেসব আহার্যই কেবল অনুমোদন করে, যাকে পরিচ্ছন্ন জ্ঞান বিবেচনা করে সুখাদ্য হিসাবে এবং যাকে দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে স্বীকৃতি দেয় উপকারীরূপে। ইসলাম সে সম্পদই কেবল অনুমোদন করে—যা হকের ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক সম্মতিসূচক আদান-প্রদানের মাধ্যমে অর্জন করা হয়। অনুরূপভাবে ইসলামী শরীআত উপার্জনের কেবল সে পন্থাই নিষিদ্ধ করেছে, যা অন্যায়ভাবে ও অনৈসলামিক উপায়ে অর্জন করা হয়। যেমন চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা, ছিনতাই, ডাকাতি, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ ـ (البقرة : ١٨٨)

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিয়দংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের নিকট পেশ করো না।"-(সূরা বাকারা ঃ ১৮৮)

বস্তুত মানবজাতির প্রতি ইসলামের আহ্বান হলো তার মন-মানসিকতা হবে স্বচ্ছ পরিষ্কার, তার কথায় থাকবে সততা, তার কাজেকর্মে থাকবে নিষ্ঠা, কোনোরূপ বিপদ-বাধা, এমনকি মৃত্যুও তাকে ন্যায়চ্যুত করবে না, সে প্রভাবিত হবে না অলীক কল্পনা কিংবা মিথ্যা আকীদার প্রভাবে, সে পরওয়া করবে না তথাকথিত কোনো রেওয়াজ-রসমের—উপরন্তু সে কখনো শৃংখলিত করবে না নিজেকে প্রবৃত্তি ও লালসার গোলামীতে এবং সে কখনো নতি স্বীকার করবে না অন্যায়-অবিচারের সামনে। ইসলাম-ঘোষিত এ সার্থক ও অর্থবহ স্বাধীনতা বিশ্বের অন্য কোনো ধর্ম বা সমাজ-ব্যবস্থায় কল্পনাও করা যায়

www.amarboi.org

না। আর মানবতার খাতিরে প্রকৃতপক্ষে এ স্বাধীনতাই আমাদের একান্ত কাম্য হওয়া উচিত।

৪. মুমিন ও মুসলিম

মুমিন ও মুসলিম দু'টি গুণবাচক নাম। যার মধ্যে ঈমান আছে সে মুমিন এবং যার মধ্যে ইসলাম আছে সে মুসলিম। এগুলো কোনো বংশগত নাম বা উপাধি নয়। অতএব যার মধ্যে ঈমান ও ইসলাম তথা মুমিন ও মুসলিমের গুণাবলী থাকবে না তার পিতা বা পূর্বপুরুষ যত বড় মুমিন ও মুসলিম হোন না কেন, সে নিজেকে মুমিন ও মুসলিম বলে দাবী করতে পারে না। বরং কোনো ব্যক্তি কেবল তখনি নিজেকে মুমিন ও মুসলিম বলে দাবী করতে পারে যখন তার মধ্যে মুমিন ও মুসলিমের গুণাবলী থাকবে।

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় মুমিন ও মুসলিমের যেসব গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে তা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اُولٰۤئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ○ (الحجرت : ١٥)

"তারাই মুমিন যারা আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে ; তারাই সত্যনিষ্ঠ।"-(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১৫)

الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

"(তারাই মুমিন মুত্তাকী) যারা অদৃশ্যে (দৃষ্টির অন্তরালবর্তী ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত বস্তু ও সত্তা, যেমন আল্লাহ, ফিরিশতা, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি) বিশ্বাস করে, সালাত কায়েম করে (যথানিয়মে ও নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে) ও তাদেরকে যে রিয্‌ক (জীবনোপকরণ) দান করেছি তা হতে (শরীআতসম্মতভাবে নিজের ও অপরের জন্য) ব্যয় করে; এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরকালে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।"-(সূরা বাকারা ঃ ৩-৪)

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

www.amarboi.org

"(মুমিন ও মুসলিম তারাই) যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে নিশ্চিত বিশ্বাসী।"–(সূরা লুকমান ঃ ৪)

لَاتَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَ هُمْ اَوْ اَبْنَآءَ هُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ ط ـ(المجادلة : ٢٢)

"তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়, যারা ভালবাসে আল্লাহ্ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারিদেরকে–হোক না এ বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা এদের জ্ঞাতি গোত্র।"
–(সূরা আল মুজাদালা ঃ ২২)

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ○(الفرقان : ٦٣)

"রাহমানের বান্দা (মুমিন ও মুসলিম বান্দা) তারাই, যারা নম্রভাবে চলাফেরা করে পৃথিবীতে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে তখন তারা বলে 'সালাম' (তর্কে অবতীর্ণ না হয়ে শান্তি কামনা করে)।"
–(সূরা আল ফুরকান ঃ ৬৩)

وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَاغَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ○وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ص وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ص وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ○(الشورى : ٣٧ ـ ٣٨)

"(মুমিন তারাই) যারা গুরুতর পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকে এবং ক্রোধাবিষ্ট হয়েও ক্ষমা করে দেয়, যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে, পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিয্ক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে।"–(সূরা আশ শুরা ঃ ৩৭-৩৮)

اَلَّذِيْنَ يُوْفُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ○وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَآ اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْٓءَ الْحِسَابِ○ وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّيَدْرَءُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ○(الرعد : ٢٠ ـ ٢٢)

www.amarboi.org

"যারা আল্লাহকে প্রদত্ত অংগীকার রক্ষা করে এবং প্রতিজ্ঞা ভংগ করে না, আল্লাহ যে সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখতে আদেশ করেছেন যারা তা অক্ষুণ্ন রাখে, ভয় করে তাদের প্রতিপালককে এবং ভয় করে কঠোর হিসাবকে এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, সালাত কায়েম করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দ দূরীভূত করে।"

–(সূরা আর রাদ ঃ ২০-২২)

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ٥ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ٥ (الدهر : ٨ ـ ٩)

"আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা (মুমিনরা) অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে এবং বলে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে আহার্য দান করি, আমরা তোমাদের কাছ থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়।"–(সূরা আদ দাহর ঃ ৮-৯)

اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ٥ (المؤمنون : ٥٧)

"(মুমিন তারাই) যারা তাদের প্রতিপালকের ভয়ে সন্ত্রস্ত।"

–(সূরা আল মুমিনুন ঃ ৫৭)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ٥ (البقرة : ١٤٣)

"আমি (আল্লাহ) তোমাদেরকে (মুমিনদেরকে) এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানবজাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৩)

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ ٥

"তারা (মুমিনরা) ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত, ব্যয়কারী (দাতা) এবং উষাকালে ক্ষমাপ্রার্থী।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭)

اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ (ال عمران : ١٩١)

www.amarboi.org

"যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে।"-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯১)

رِجَالٌ لا لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ

"(মুমিনরা) সেইসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না।"-(সূরা আন নূর ঃ ৩৭)

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ○

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُوْنَ ○ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ○.........

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ○(المؤمنون : ٢ـ٨)

"যারা বিনয় নম্র নিজেদের সালাতে, যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, যারা নিজেদের যৌন অংগকে সংযত রাখে, ---------------------------- যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।"-(সূরা আল মুমিনূন ঃ ২-৮)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ

زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَّعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ○ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ

يُنْفِقُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ

كَرِيْمٌ ○(الانفال : ٢ـ٤)

"মুমিন তো তারাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তার (আল্লাহ্র) আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা ওদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা।"-(সূরা আল আনফাল ঃ ২-৪)

৫. হারাম ও হালাল

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে হালাল জীবিকা অর্জনের শিক্ষা দেয় এবং হারাম ও অবৈধ জীবিকা অর্জনে বাধা প্রদান করে। হারাম ও মন্দ বস্তুর আধিক্য

www.amarboi.org

মানুষকে যতই চমৎকৃত করুক না কেন, তা কখনো হালাল ও ভাল বস্তুর সমকক্ষ হতে পারে না। যাদের অন্তরে আল্লাহ-ভীতি আছে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সত্যিকার বোধশক্তি প্রদান করেছেন তারা ভাল ও পবিত্র বস্তুকে—চাই তা পরিমাণে যত কমই হোক, মন্দ ও অপবিত্র বস্তুর উপর—চাই তা পরিমাণে যত বেশীই হোক, সবসময় প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কেননা এর মধ্যেই যে মানব জীবনের সত্যিকার সাফল্য নিহিত তা তাদের দূর-দৃষ্টিতে ধরা পড়ে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰۤاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝ (المائدة : ١٠٠)

"মন্দ ও ভাল এক নয়, যদিও মন্দের আধিক্য তোমাকে চমৎকৃত করে। সুতরাং হে বোধশক্তি-সম্পন্নেরা, আল্লাহকে ভয় কর—যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"–(সূরা আল মায়েদা ঃ ১০০)

হালাল জীবিকা অর্জনের উপর ইসলাম এতই গুরুত্ব আরোপ করেছে যে, শুধু মুমিনদেরকে নয়, বরং রাসূলগণকেও এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহর সত্তা পবিত্র এবং তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া অন্য কিছু কবুল করেন না।

এক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে যে হুকুম দিয়েছেন, আম্বিয়া কিরাম (আঃ)-কেও সে হুকুমই দেয়া হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝ (البقرة : ١٧٢)

"হে মুমিনগণ, তোমাদেরকে আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে খাও এবং আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তোমরা শুধু তারই ইবাদাত করো।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৭২)

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا ۚ اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ۝

"হে রাসূলগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু হতে খাও ও সৎকাজ কর। তোমরা যা কর আমি সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।"–(সূরা মুমিনূন ঃ ৫১)

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইসলাম যেভাবে হালাল জীবিকা অর্জনের হুকুম দিয়ে সকলকে তার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছে তেমনি হারাম জীবিকা অর্জনে বাধা দিয়ে তার অপকারিতা সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)

www.amarboi.org

বলেছেন, ঐ মাংসখণ্ড জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যা হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত হয়েছে। আর প্রত্যেকটি মাংসখণ্ড, যা হারাম খাদ্য দ্বারা গঠিত হয়েছে, আগুন (জাহান্নাম) হচ্ছে তার সবচেয়ে বেশী হকদার।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অন্যত্র বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি হারাম সম্পদ অর্জন করে, অতপর তা থেকে সদকা (দান) করে, তার সে সদকা কবুল করা হয় না। আর সে তা থেকে, যা নিজের জন্য খরচ করে তাতেও কোনো বরকত পায় না। যে ব্যক্তি হারাম সম্পদ রেখে মারা যায় সে সম্পদ তার জাহান্নামের পাথেয় হয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা মন্দকে মন্দ দ্বারা নয়, বরং ভালো দ্বারাই দূর করেন। অপবিত্র বস্তু অপবিত্রতাকে দূর করতে পারে না।

হালাল ও বৈধ জীবিকা অর্জনের জন্য ইসলাম যে সমস্ত বস্তু বা মাধ্যমকে বৈধ ও শরীআতসম্মত ঘোষণা করেছে সে সমস্ত বস্তু বা মাধ্যম গ্রহণ করা প্রত্যেকটি মুসলমানের জন্য একান্ত জরুরী। ঐ সমস্ত বস্তু বা মাধ্যম হচ্ছে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরী ইত্যাদি। অনুরূপভাবে ঐ সমস্ত বস্তু বা মাধ্যম থেকে প্রত্যেকটি মুসলমানের নিরাপদ দূরত্বে থাকা একান্ত কর্তব্য যে সমস্ত বস্তু বা মাধ্যমকে ইসলাম হারাম ও অবৈধ ঘোষণা করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছু কিছু বস্তু বা মাধ্যম এমন আছে যেগুলো হারাম, না হালাল তা সহজে চেনা যায় না। ঐ সমস্ত বস্তুকে 'মুশতাবিহ' আখ্যা দেয়া হয়। দ্বীনের হিফাযতের জন্য ঐ সমস্ত বস্তু থেকেও দূরে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা যারা এ সমস্ত বস্তু থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে না তাদের, হারামের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এ বিষয়টিকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাহলো ঃ হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এগুলোর মাঝামাঝি কিছু জিনিস আছে যা মুশতাবিহ। মুশতাবিহ-এর শারয়ী হুকুম কি তা অনেকেই জানে না। অতএব যে ব্যক্তি এ সমস্ত মুশতাবিহ জিনিস থেকে দূরে থাকলো সে যেন নিজের দ্বীন ও সম্ভ্রম রক্ষা করলো। আর যে ব্যক্তি এ সমস্ত জিনিসের ফেরে পড়ে গেল সে ঐ রাখালের মত যে তার পশুগুলোকে সংরক্ষিত চারণভূমির আশেপাশে চরাতে লাগল। এমতাবস্থায় পুরাপুরি সম্ভাবনা থাকে যে, তার সামান্যতম অসতর্কতার কারণে তার পশুগুলো সংরক্ষিত চারণভূমিতে ঢুকে পড়বে। ভালভাবে শুনে রাখ যে, প্রত্যেক বাদশাহেরই একটি সংরক্ষিত চারণভূমি থাকে এবং এটাও জেনে রাখ যে, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর সংরক্ষিত চারণভূমি হচ্ছে তার হারামকৃত জিনিসসমূহ।-(বুখারী)

রাসূলুল্লাহ (সা) তার উপরোক্ত বাণী দ্বারা একটি সুন্দর দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেমন, কোনো বাদশাহ বা সরকার শুধু

www.amarboi.org

নিজের জন্য একটি চারনভূমি নির্দিষ্ট করে নিয়ে তার ব্যবহার জনসাধারণের জন্য নিষিদ্ধ করে দিল। এমতাবস্থায় সাধারণ রাখালদের জন্য নিরাপত্তা এর মধ্যেই রয়েছে যে, তারা তাদের পশুগুলোকে ঐ সরকারী চারণভূমি থেকে নিরাপদ দূরত্বে চরাবে। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করল না এবং নিজেদের পশুগুলোকে সরকারী চারণভূমির আশেপাশেই চরাতে লাগল। এমতাবস্থায় পুরাপুরি সম্ভাবনা রয়েছে যে, তাদের সামান্যতম অসতর্কতার কারণে তাদের পশুগুলো সরকারী চারণভূমিতে ঢুকে পড়বে এবং পরিণামে তারা আইন-অমান্যের অভিযোগে অভিযুক্ত হবে।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলার হারামকৃত জিনিসসমূহকে নিষিদ্ধ এলাকার সাথে তুলনা করা হয়েছে। আর মুশতাবিহ জিনিসসমূহের উদাহরণ হচ্ছে ঐ ভূমি যা নিষিদ্ধ এলাকার সাথে সংযুক্ত। যেহেতু মুশতাবিহ্ ও হারাম জিনিসসমূহের সীমানা একেবারে পাশাপাশি, তাই আশংকা রয়েছে যে, যে ব্যক্তি মুশতাবিহ্ জিনিসসমূহের মধ্যে লিপ্ত হবে সে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে আগে বেড়ে গিয়ে নিষিদ্ধ জিনিসসমূহের এলাকায়ই ঢুকে পড়বে।

অতএব মুশতাবিহ্ জিনিসসমূহ থেকেও নিরাপদ দূরত্বে থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে এটা তাক্ওয়ার একটি বড় নিদর্শন।

৬. একটি চমৎকার আচরণবিধি

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে এ মর্যাদা দিয়েছেন যে, সে আশরাফুল মাখলুকাত তথা সৃষ্টির সেরা জীব। এ প্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্য যে, সে নিজের ও প্রত্যেকটি মানুষের এ মর্যাদা ও প্রকৃষ্টতার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। সে তার কোনো কথা কিংবা কোনো কাজ দ্বারা এ মানবিক মর্যাদাকে কখনো ক্ষুণ্ন করবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর শিক্ষার বুনিয়াদী লক্ষ্য হলো, এমন একটি সুন্দর সমাজ গড়ে তোলা যেখানে ছোটরা তাদের বড়কে সম্মান ও মর্যাদা দেবে, তাদের সামনে শিষ্টতা ও শালীনতা বজায় রাখবে, আর বড়রা ছোটদেরকে ভালবাসবে এবং তাদের সাথে সদয় ব্যবহার করবে—চাই তারা তাদের নিকটাত্মীয় হোক অথবা না হোক। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, 'যে আমার ছোটদের প্রতি সদয় হবে না এবং আমার বড়দের সম্মান করবে না সে আমাদের (মুসলমানদের) মধ্যে (গণ্য) নয়।'–(তিরমিযী)

এ হাদীসের মাধ্যমে একটি চমৎকার আচরণ-বিধি শিক্ষা দেয়া হয়েছে। আর তাহলো, বড়কে সম্মান করা এবং ছোটকে স্নেহ করা। শিশুদেরকে স্নেহ করার অর্থ হলো তাদেরকে ভালবাসা এবং তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহার করা।

www.amarboi.org

আর বড়দেরকে সম্মান করার অর্থ হলো, যে ব্যক্তিই অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ তার সাথে শিষ্ট আচরণ করা এবং তাকে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া। মানবতার প্রতি এ সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শনের লক্ষ্য হলো, মানুষের প্রকৃতগত অধিকার সংরক্ষণ এবং এর মাধ্যমে বিশ্বশান্তিকে সুদৃঢ়করণ। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার উপরোক্ত বাণীর মাধ্যমে ঐ ব্যক্তিকে তার উম্মত থেকে বহিষ্কার করেছেন, যে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না এবং ছোটদেরকে আদর-স্নেহ করে না।

খোদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শিশুদেরকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং বড়দেরকে যারপরনেই সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতেন। তিনি আজীবন এ আচরণবিধি মেনে চলেছেন এবং সকলকে এটা অনুসরণ করার শিক্ষাও দিয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) শিশুদেরকে অত্যন্ত আদর করতেন। তাদের নিকট দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করার সময় তিনি তাদেরকে সালাম করতেন এবং কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তাদেরকে আদর করতেন।

একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপন নাতি শিশু হাসানকে আদর করছিলেন এমন সময় হযরত আকরা বিন হাবিস (রাঃ) যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন— নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, আমার দশটি ছেলে আছে, (কিন্তু) আমি তাদেরকে কখনো আদর করিনি।' তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হয় না।" তিনি আরো বলেন, "যারা যমীনে আছে তোমরা তাদের প্রতি দয়া করো, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।"

আদব, শিষ্টাচার, দয়া, করুণা ও ভালবাসা এমন সব আচরণবিধি, যেগুলো ব্যাপক ও বিস্তৃততর করার জন্যই যেন আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। মুসলমানদের প্রতি নবী (সাঃ)-এর এ মূল্যবান শিক্ষার দাবী এই যে, তারা এমন কাজ করবে না যার কারণে মানুষের মর্যাদাহানি ঘটে। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে, সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর প্রত্যেকটি ব্যক্তির হক বা অধিকার রয়েছে। হুযুর (সাঃ)-এর চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি তো এ বিশ্বজগতে নেই। অথচ দেখা যায়, যখনই তার মজলিসে কোনো গোত্রের নেতৃস্থানীয় লোক আসতো তিনি তাকে অত্যন্ত সম্মান করতেন এবং তার মর্যাদা অনুযায়ী তাকে আপন দরবারে স্থান করে দিতেন। বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। আর তা এই যে, কোনো যুবক যদি কোনো বৃদ্ধকে, তার বয়োজ্যেষ্ঠতার কারণে সম্মান করে তাহলে আল্লাহ তাআলা ঐ যুবকের জন্যও এমন লোক নিযুক্ত করে দেবেন, যে তার বার্ধক্যকালে তাকে সম্মান

www.amarboi.org

করবে (জামে তিরমিযী)। এর অর্থ হলো, সম্মান প্রদর্শনকারী আখিরাতে তো পুরস্কার পাবেই ; অধিকন্তু সে যখন বার্ধক্যের কারণে কৃপার পাত্রে পরিণত হবে এবং অন্যের মুখাপেক্ষী হবে তখন আল্লাহ তাআলা তার জন্য এমন সব লোক নিযুক্ত করে দেবেন, যারা তাকে তার বার্ধক্যকালে ইয্যত ও সম্মান করবে। এক হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, বৃদ্ধ মুসলমানকে সম্মান করা আল্লাহর মাহাত্ম্যকে স্বীকার করারই নামান্তর।

৭. ইবাদাতের উদ্দেশ্য

পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ○ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ○ (الشمس : ٩-١٠)

"সে-ই সফলকাম হবে, যে নিজের নাফ্সকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজের নাফসকে কলুষাচ্ছন্ন করবে।"-(সূরা শামস ঃ ৯-১০)

প্রকৃতপক্ষে ইবাদাতের উদ্দেশ্য এই যে, এর দ্বারা মানুষ নিজেকে পবিত্র করবে। ইবাদাত ছাড়া নানা ধরনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অপবিত্রতা থেকে মানুষ কখনো নিজেকে পবিত্র করতে পারে না। এর মাধ্যমেই মানুষ তার প্রকৃত খালিক ও মালিকের পরিচয় পায় এবং তার নৈকট্য লাভ করে। আর মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পরিচয় ও নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন্টা হক, কোন্টা বাতিল, কোন্টা ন্যায়, কোন্টা অন্যায়, কোন্টা ভাল, কোন্টা মন্দ তা সে নির্ণয় করতে পারে না। ফলে সে এক দারুণ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও হতাশার মধ্যে দিন কাটায়। প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সে প্রশান্তির নাগাল পায় না। বরং প্রায় ক্ষেত্রেই তার প্রাচুর্য তার মানসিক যন্ত্রণা ও অশান্তির কারণে পরিণত হয়। এর প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ ○ (التوبة : ٥٥)

"ওদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে, আল্লাহ তো এগুলো দ্বারাই ওদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি দিতে চান। ওরা কাফির থাকা অবস্থায় তাদের আত্মা দেহ ত্যাগ করবে।"-(সূরা তাওবা ঃ ৫৫)

নাফ্সকে সংশোধন তথা পবিত্রকরণ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উলামা ও মুহাক্কিকবৃন্দ এ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তবে এ ক্ষেত্রে একটি

www.amarboi.org

বিষয়ে তারা সকলেই একমত যে, নাফ্‌সকে পবিত্র করা প্রকৃতগতভাবেই মানুষের জন্য জরুরী এবং ইচ্ছা করলে সে এটা করতেও পারে। কেননা পবিত্র ও সংশোধিত হওয়ার যোগ্যতা তার সহজাত। এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন ঃ

إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (الدهر : ٣)

"আমি মানুষকে পথের নির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।"–(সূরা আদ দাহর ঃ ৩)

তিনি আরো ঘোষণা করেছেন ঃ

وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ (البلد : ١٠)

"আমি কি তাকে (মানুষকে) দুটি পথ (ভাল ও মন্দ) দেখাইনি ?"
–(সূরা আল-বালাদ ঃ ১০)

যেহেতু মানুষের প্রকৃতিতে ভাল অথবা মন্দ যে কোনো একটি পথ অনুসরণ করার যোগ্যতা রয়েছে, অতএব ইবাদাত ও তারবীয়তের মাধ্যমে সে অবশ্যই নিজেকে কলুষমুক্ত তথা ভাল পথের অনুসারী করে তোলার প্রচেষ্টা চালাবে।

ইবাদাত যেহেতু নাফ্‌সকে পবিত্র করার মাধ্যম অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত ও যিক্‌র থেকে দূরে পড়ে আছে, শরীআতের দৃষ্টিতে সে শয়তানের অনুসারী এবং তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। মুহাক্কিকদের পরিভাষায় সে জীবিত নয় বরং মৃত। কেননা ইবাদাত তথা আল্লাহর যিক্‌র হচ্ছে কাল্‌বকে সজীব সতেজ রাখার একমাত্র মাধ্যম। যিক্‌রের মাধ্যমেই মানুষ সত্যিকার প্রশান্তি লাভ করতে পারে—লাভ করতে পারে রূহানী জগতের উন্নতি এবং এ উন্নতির মাধ্যমে সে পৌঁছতে পারে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ স্তরে।

মোটকথা, ইবাদাত ভিন্ন নাফ্‌সকে পবিত্র করার আর কোনো পথ নেই। অতএব কোনো ব্যক্তি জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যতই উন্নতি করুক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর যিকর ও ইবাদাতে আত্মনিয়োগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে সফল জীবনের অধিকারী হতে পারবে না। আর এ কারণেই ইবাদাতের ফাযায়িল ও সুফল বর্ণনায় পবিত্র কুরআন ও হাদীস পরিপূর্ণ।

যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুন্নাত (তরীকা) অনুযায়ী যিক্‌র ও ইবাদাতে আত্মনিয়োগ করবে সে অবশ্যই এর সুফল পাবে দুনিয়া ও আখিরাতে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ইবাদাত বান্দাহ ও আল্লাহর মধ্যে সেই সম্বন্ধ সৃষ্টি করে, যার মধ্যে রয়েছে বান্দার ইহজীবনের সার্থকতা ও পরজীবনের সাফল্য।

www.amarboi.org

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যাহির (বাহ্যিক)-এর সাথে বাতিন (আভ্যন্তরীণ) ওতপ্রোত। যখন বাতিনের উপর যাহিরের প্রভাব পড়ে কেবল তখনই তা প্রস্ফুটিত ও আলোকিত হয়ে উঠে। অতএব তাসাওউফ বা অন্য কিছুর দোহাই দিয়ে যদি কেউ বলে—যাহির (শরীআত) এক বস্তু এবং বাতিন (মারিফাত) অন্য বস্তু, অতএব যে ব্যক্তি যাহির অতিক্রম করে বাতিনে পৌঁছে গেছে তার ইবাদাত তথা শরীআতের বাহ্যিক নিয়ম-কানুন পালন করার কোনো প্রয়োজন নেই—রাসূল (সাঃ)-এর অনুসারীদের সাথে তার কোনো সম্বন্ধ বাকি থাকে না। কেননা আকলী ও নকলী দলীল দ্বারা একথা সুপ্রমাণিত যে, আল্লাহর মারেফাত তথা পরিচয় লাভের একটি মাত্র পথই আছে। আর তাহলো রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ। আর এতে কোনো দ্বিমত নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার জীবনের একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইবাদাত তথা শরীআতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন। অতএব যে নিজেকে ইসলামের অনুসারী বা নবীর উম্মত বলে দাবী করবে তাকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবশ্যই আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল থাকতে হবে।

৮. জিসমানী ও রূহানী খাদ্য

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলারই প্রাপ্য। ভুপৃষ্ঠে বিচরণকারী সকলের জীবিকার দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۚ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ (العنكبوت : ٦٠)

"এমন কত জীবজন্তু আছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখে না ; আল্লাহই রিযক দান করেন ওদেরকে ও তোমাদেরকে এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"–(সূরা আল আনকাবূত ঃ ৬০)

রিযক (খাদ্য) সাধারণত দু' প্রকারের। একটি জিসমানী (দৈহিক) এবং অপরটি রূহানী (আধ্যাত্মিক)। মানুষ ছাড়া যত প্রাণী আছে তাদের শুধুমাত্র জিসমানী খাদ্যের প্রয়োজন ; কিন্তু মানুষের প্রয়োজন জিসমানী খাদ্যের সাথে সাথে রূহানী খাদ্যেরও। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা এ উভয় খাদ্যই সরবরাহ করে থাকেন। কিন্তু একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মানুষ বা অন্যান্য পশুর যে খাদ্যের প্রয়োজন যত বেশী সে খাদ্য তত সস্তা ও সহজলভ্য। বায়ু মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর জীবন রক্ষার জন্য একটি অপরিহার্য

www.amarboi.org

বস্তু। কিন্তু এটাকে যথায় তথায় এবং যখন তখন পাওয়া যায়। এজন্য কাউকে কোনো মূল্য দিতে হয় না।

অপরিহার্যতার দিক দিয়ে বায়ুর পর পানির স্থান। কথায় বলে পানির আর এক নাম জীবন। কিন্তু এ পানিও অত্যন্ত সস্তা। নদী-নালা, খাল-বিল, কুয়া-ইঁদারা, সর্বত্রই পানির ছড়াছড়ি। মানুষ যখন ইচ্ছা এবং যেখান থেকে ইচ্ছা পানি পান করতে পারে। এজন্য তাকে কোন মূল্য দিতে হয় না। আর যদি কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে দিতেও হয় তবে তা পরিমাণে অত্যন্ত কম।

অতপর আসে অন্যান্য খাদ্য-যেমন ঘাস-পাতা, গাছপালা, চাউল-গম, তরি-তরকারী ইত্যাদির কথা। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীর এ জাতীয় খাদ্য আপনা-আপনিই জুটে যায়। তবে মানুষের ক্ষেত্রেও তা খুব একটা আয়াসলব্ধ নয়। তারা একটু চেষ্টা করলে এগুলো অনায়াসে উৎপাদন করতে পারে অথবা অন্য যে কোনো বস্তুর বিনিময়ে উৎপাদনকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারে।

এবার রূহানী খাদ্যের কথায় আসা যাক। এ খাদ্যটি মানুষের জন্য একান্ত অপরিহার্য। কেননা এ খাদ্য ছাড়া মানুষ দুনিয়া-আখিরাত কোথাও শান্তি ও কল্যাণের নাগাল পায় না—পেতে পারে না। মানুষ রূহানী খাদ্য পায় আল্লাহর প্রেরিত আম্বিয়া কিরামের মাধ্যমে। আদি মানব ও আদি নবী হযরত আদম (আঃ) থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) পর্যন্ত শত সহস্র নবী মানবজাতিকে রূহানী খাদ্য দান করে গেছেন। কিন্তু এজন্য তারা কারো কাছ থেকে কোনো মূল্য তথা পারিশ্রমিক চাননি। বরং তাদের সকলেরই ঘোষণা ছিল ঃ

مَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ-(ص : ٨٦)

"আমি এজন্য (দুনিয়া-আখেরাতের শান্তি ও কল্যাণ তথা আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বানের জন্য) তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না।"

–(সূরা আস সুয়াদ ঃ ৮৬)

মানুষের প্রতি প্রেরিত সর্বশেষ নবী যেমন হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ), তেমনি মানুষের জন্য সর্বশেষ দ্বীন হচ্ছে তার আনীত 'ইসলাম'। ইসলাম মানেই শান্তি। অন্য কথায়, কিয়ামত পর্যন্ত সর্বযুগের ও সর্বকালের মানুষের দুনিয়া-আখেরাতের শান্তি ও মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায় হচ্ছে ইসলাম।

ইসলাম পাঁচটি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। যথা-ঈমান, নামায, রোযা, যাকাত ও হাজ্জ। ঈমান ইসলামের সর্বপ্রধান স্তম্ভ। এক কথায় বলতে গেলে, বিশ্বজগতের প্রতিপালক মহান আল্লাহ তাআলাকে মেনে নেয়ার নামই ঈমান। যারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে তথা একনিষ্ঠতা ও আন্তরিকতার সাথে তার

www.amarboi.org

আদেশ-নির্দেশ পালন করে তারা আল্লাহর বন্ধুতে পরিণত হয়। তাদের সম্পর্কেই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ (يونس : ٦٢-٦٤)

"জেনে রেখ, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা ঈমান আনে ও তাক্ওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে ; আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই ; ওটাই মহা সাফল্য।"–(সূরা ইউনুস ঃ ৬২-৬৪)

অতএব দেখা যাচ্ছে, ঈমান মানুষের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। অথচ এর চেয়ে সস্তা ও সহজলভ্য বস্তু আর কিছুই হতে পারে না। এটাকে লাভ করার জন্য কোনো কায়িক পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় না। যে কোনো লোক ইচ্ছা করলে যে কোনো অবস্থায় আল্লাহর উপর ঈমান আনতে পারে।

অতপর আসে নামাযের কথা। অশ্লীল ও মন্দ কার্যই হচ্ছে মানুষের যাবতীয় অমঙ্গল ও দুঃখ-যন্ত্রণার কারণ। আর "নামায মানুষকে বিরত রাখে যাবতীয় অশ্লীল ও মন্দ কার্য থেকে।"–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪৫)

অতএব মানব জীবনে নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু এটাও একটা সহজসাধ্য কাজ। কেননা এটা সম্পাদন করতে দিবারাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বড় জোর এক দেড় ঘন্টার প্রয়োজন হয়।

অতপর আসে রোযার কথা। রোযা বয়োপ্রাপ্ত সকল মুসলমানের উপরই ফরয। আর তা এজন্য যে, কুপ্রবৃত্তি হচ্ছে জীবন-সংগ্রামে মানুষের মহাশত্রু। আর এ শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে রোযা হচ্ছে একটি মোক্ষম হাতিয়ার। অথচ রোযা পালনে অর্থ ব্যয়ের কোনোই প্রয়োজন হয় না।

অতপর আসে যাকাতের কথা। এতে অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হয় সত্য, তবে এটা শুধু তাদের উপরই ফরয যাদের 'নিসাব' পরিমাণ মাল আছে এবং চান্দ্র মাসের হিসাবে সে মালের উপর এক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। যাকাতের অপরিহার্যতা এজন্য যে, এটা ইসলাম তথা শান্তির সেতু (তাবারানী)। অথচ এটাকে আল্লাহ তাআলা সামর্থবান মানুষের জন্যও অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছেন।

www.amarboi.org

ইসলামের পঞ্চম রুকন বা স্তম্ভ হচ্ছে হাজ্জ। হাজ্জ নিসন্দেহে একটি ব্যয়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য কাজ। তবে তা সকল মুসলমানদের উপর ফরয নয়। শুধু তাদের উপর ফরয, যাদের মক্কা শরীফ যাওয়ার এবং সেখান থেকে ফিরে আসার সামর্থ রয়েছে। হাজ্জ জীবনে মাত্র একবারই ফরয। এদিক দিয়ে নিসন্দেহে ধনাঢ্য ব্যক্তিদের জন্যও তা সহজসাধ্য। অথচ আত্মশুদ্ধির ক্ষেত্রে হাজ্জের কার্যকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, হাজ্জ পাপরাশিকে ঠিক তেমনভাবে ধুইয়ে ফেলে যেমন ধুইয়ে ফেলে পানি ময়লারাশিকে (তাবারানী)।

অতএব যাবতীয় প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্ তাআলারই প্রাপ্য যিনি অতি সস্তায় ও অতি সহজ পন্থায় যাবতীয় প্রাণীর জিসমানী এবং মানব জাতির জিসমানী-রূহানী উভয় প্রকার খাদ্যের সুব্যবস্থা করে রেখেছেন।

৯. বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী

বিশ্বাসী (মুমিন) ও অবিশ্বাসীর (কাফেরের) মধ্যে সচরাচর কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত না হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। আর এ পার্থক্য ইতিকাদ বা বিশ্বাসগত এবং তা তাদের জীবন-দর্শনে, চালচলনে, দৃষ্টিভঙ্গীতে এমনকি কখনো কখনো চেহারা-অবয়বেও ধরা পড়ে।

জীবন সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী দু' প্রকারের। একটি আশাবাদী (Optimistic) এবং অপরটি নৈরাশ্যবাদী (Pessimistic)। প্রথমোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রয়েছে আনন্দ ও সুখ এবং শেষোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রয়েছে ভীতি, দুঃখ ও নৈরাশ্য।

এবার প্রশ্ন, ইসলাম কোন্ দৃষ্টিভঙ্গির ধারক ও বাহক ? এর সহজ এবং একমাত্র উত্তর হচ্ছে, ইসলাম মানুষের সামনে সর্বাবস্থায় আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। যারা ইসলামের অনুসারী তথা মুমিন বা বিশ্বাসী তাদের ইহকাল-পরকালে কোথাও ভীতিগ্রস্ত বা নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে, তার উপর ভরসা করে তিনি (আল্লাহ) তার উত্তম জীবন যাপনের একটা ব্যবস্থা করে দেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ـ (الطلاق : ٢-٣)

"যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দেবেন (তার সমস্যার সমাধান করে দেবেন), এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে

www.amarboi.org

রিয্‌ক দান করবেন ; যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর নির্ভর করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।"–(সূরা তালাক ঃ ২-৩)

ইসলাম মানুষকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে এ শর্তে যে, সে যেন আল্লাহর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে এবং শিরক থেকে দূরে থাকে। কুরআন পরিষ্কার ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ○

"যারা আল্লাহর উপর ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে জুলুম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা তাদের জন্য এবং তারাই সৎপথ-প্রাপ্ত।"–(সূরা আল আনআম ঃ ৮২)

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط ـ

"যারা মুমিন বা বিশ্বাসী আল্লাহ তাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাদেরকে (হতাশার) অন্ধকার হতে বের করে (আশার) আলোকে নিয়ে যান।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৭)

মোটকথা, যেহেতু সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা মুমিনের বন্ধু ও অভিভাবক, তাই কোনো অবস্থায়ই তাকে নিরাশ হতে হয় না। সবসময়ই সে একটি আশার আলো দেখতে পায়।

জীবনের অন্ধকার দিকগুলোরই অপর নাম দুঃখ। আর ইসলাম, ঈমানরূপী মহামূল্যবান সম্পদের মাধ্যমে মুমিনের জীবনের সবক'টি দিকই আলোকিত তথা খুশীতে পরিপূর্ণ করে রাখে। যেমন সুহায়ব রূমী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মুমিনের আশ্চর্যজনক অবস্থা এই যে, তার জীবনের প্রত্যেকটি দিকই তার জন্য মঙ্গলজনক। আর এ মর্যাদা মুমিন ছাড়া অন্য কেউ-লাভ করতে পারে না। যদি তার সুখ অর্জিত হয় তাহলে সে আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করে এবং এটা তার জন্য হয় মঙ্গলজনক। আর যদি সে দুঃখের মধ্যে পতিত হয় তাহলে আল্লাহর নির্দেশ মুতাবিক ধৈর্য ধারণ করে এবং এটাও পরিণামে তার জন্য শান্তি ও মঙ্গল বয়ে আনে।

অপরদিকে কাফির বা অবিশ্বাসীর দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে নৈরাশ্যবাদী। তার অবস্থা হলো, সে সর্বশক্তিমান ও চিরবিদ্যমান আল্লাহ তাআলার পরিবর্তে কল্পিত দেব-দেবী ও জাগতিক উপায়-উপকরণের উপর নির্ভর করে যেগুলোর কোনো স্থায়িত্ব নেই, যেগুলোর উপর সত্যিকার অর্থে নির্ভর করা চলে না—অন্য কথায় যেগুলো ভঙ্গুর, অস্থায়ী এবং সত্যিকার অর্থে বিভ্রান্তিকর। যেহেতু অবিশ্বাসী এগুলোর উপর নির্ভর করে তাই সুখের অবস্থায় সে আনন্দিত হয় বটে, তবে

www.amarboi.org

বিপদ দেখা দিলেই মুষড়ে পড়ে, বঞ্চিত হয় আশার আলো থেকে এবং নিমজ্জিত হয় নিরাশার অন্ধকারে। কেননা তখন সে নির্ভরযোগ্য কোনো বন্ধু বা অভিভাবক খুঁজে পায় না। কাজে কাজেই সে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে, তার অন্তরে দুশ্চিন্তা, ভীতিগ্রস্ততা ও অশান্তির আগুন জ্বলতে থাকে, এমনকি সে আক্রান্ত হয় নানা দুরারোগ্য ব্যাধিতে।

সারকথা এই যে, সুখ এবং দুঃখ কালচক্রে ঘূর্ণায়মান সকল মানুষের জীবনে আসে। এ থেকে কেউই পলায়ন করতে পারে না। তবে এ দুই অবস্থায় বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বিরাট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কাফির বা অবিশ্বাসী সুখের অবস্থায় আনন্দে ফুলে উঠে, আর যখন বিপদ দেখা দেয় তখন হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু এক্ষেত্রে মুমিনের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্নতর। অবস্থা সুখের হোক অথবা দুঃখের, মুমিনের জন্য তাতে কিছু যায় আসে না। আল্লাহর উপর অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার কারণে যে সর্বাবস্থায়ই তার চলার পথে একটি আলোকোজ্জ্বল দিক খুঁজে পায়, যা তাকে হতাশার পরিবর্তে আশার দিকে, পিছনে হটার পরিবর্তে এগিয়ে চলার দিকে, নির্জীবতার পরিবর্তে সজীবতার দিকে—সর্বোপরি অবনতির পরিবর্তে উন্নতির দিকে চালিত করে।

প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে কাফির ও মুমিনের মধ্যে তফাত। আর এ তফাত শুধুমাত্র পার্থিব জীবনের ক্ষেত্রে নয়, বরং পারলৌকিক জীবনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১০. মানুষ ও পশু

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। খোদ আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ

وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًاO (بنى اسرائيل : ٧٠)

"আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি ; স্থলে ও সমুদ্রে ওদের চলাচলের বাহন দিয়েছি ; ওদেরকে উত্তম রিযক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের উপর ওদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।"
—(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭০)

মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের একটি বড় প্রমাণ এই যে, মানুষ ছাড়া আল্লাহ তাআলা যাকিছু সৃষ্টি করেছেন তার সবকিছুকে মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। অতএব এ সৃষ্টিজগতে যা কিছু আছে তার সবই মানুষের সেবাদাস। যেমন খোদ আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন ঃ

www.amarboi.org

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ـ(البقرة : ٢٩)

"তিনি (আল্লাহ) পৃথিবীর সবকিছুকে তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"

اَللّٰهُ الَّذِىْ سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِىَ الْفُلْكُ فِيْهِ بِاَمْرِهٖ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝(الجاثية : ١٢ - ١٣)

"আল্লাহই তো সমুদ্রকে তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তার আদেশে ওতে নৌযানসমূহ চলাচল করতে পারে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করতে পার ও তার প্রতি কৃতজ্ঞ হও; তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে তো রয়েছে নিদর্শন।"–(সূরা জাসিয়া ঃ ১২-১৩)

এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মানুষ আল্লাহর খলীফা। দুনিয়ায় তার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আদি মানব হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাদের কাছে একথাটি প্রকাশ করেছিলেন এই বলে ঃ

اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط ـ(البقرة : ٣٠)

"আমি পৃথিবীতে আমার খলীফা (প্রতিনিধি) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।"
–(সূরা আল বাকারা ঃ ৩০)

শেষ পর্যন্ত মানুষ যখন খলীফা হিসাবে দুনিয়ায় আবির্ভূত হলো তখন স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো এই বলে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ الْاَرْضِ ـ(الانعام : ١٦٥)

"তিনিই (আল্লাহই) তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছেন।"
–(সূরা আল আনআম ঃ ১৬৫)

আরো ঘোষণা দেয়া হলো যে ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝(التين : ٤)

"আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে।"–(সূরা তীন ঃ ৪)

www.amarboi.org

এর অর্থ এই যে, আমি মানুষকে এমন একটি সুন্দর গঠন ও অবয়ব দিয়েছি, যা অন্য কোনো সৃষ্টিকে দিইনি।

জ্ঞানবুদ্ধি, চিন্তাচেতনা, বিচার-বিবেচনা, যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ—এগুলো হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বিশেষ গুণাবলীর অন্যতম। মানুষ যেহেতু আল্লাহর খলীফা ও প্রতিনিধি তাই তিনি তাদেরকে এসব গুণ অকৃপণ হস্তে দান করেছেন। এগুলো প্রয়োগ করেই মানুষ যাবতীয় সৃষ্টিকে নিজের সেবায় নিয়োজিত করতে পারে। এগুলোর মাধ্যমেই সে বুঝতে পারে তার একজন স্রষ্টা ও মালিক আছেন, যার সন্তুষ্টি অর্জন এবং অসন্তুষ্টি থেকে বেঁচে থাকার উপরই তার ইহ-পরকালীন শান্তি ও মঙ্গল নির্ভর করে।

জ্ঞানবুদ্ধি, চিন্তা-চেতনা, বিচার-বিবেচনা, কামনা-বাসনা, রিপুর তাড়না ইত্যাদির অধিকারিত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে মানুষ অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। সাধারণ জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে কামনা-বাসনা ও রিপুর তাড়না আছে, কিন্তু জ্ঞানবুদ্ধি ও বিচারশক্তি নেই। কিন্তু মানুষের মধ্যে যেমন কামনা-বাসনা ও রিপুর তাড়না আছে, তেমনি আছে সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার মত জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বিচার-শক্তি। তবে রিপুর তাড়না ও বিচার-শক্তি তথা অনুকূল-প্রতিকূল উভয় শক্তির অধিকারী বলেই মানুষ সৃষ্টির সেরা নয়, বরং সে সৃষ্টির সেরা বিবেচিত হয় তখনই যখনই এই দুই শক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে চলার পারদর্শিতা তার থাকে। এক কথায় বলতে গেলে, এ যোগ্যতা ও পারদর্শিতা যে অর্জন করতে পেরেছে সেই প্রকৃত মানুষ—সেই আল্লাহর সার্থক খলীফা বা প্রতিনিধি। যার মধ্যে এই যোগ্যতা ও পারদর্শিতা নেই সে মানুষ নয়, পশু—বরং পশুর চেয়েও অধম। কেননা আল্লাহ তাআলা তাকে যে বিরাট ক্ষমতার অধিকারী করেছেন সে তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অযোগ্যতা, অপরিণামদর্শিতা—সর্বোপরি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে। এ জাতীয় মানুষ সম্পর্কেই আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ ز لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز
وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ
هُمْ اَضَلُّ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ○ (الاعراف : ١٧٩)

"আমি তো বহু জ্বিন ও মানবকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি ; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দিয়ে

www.amarboi.org

দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দিয়ে শুনে না ; এরা পশুর মত, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত, তারাই গাফিল।"–(সূরা আরাফ ঃ ১৭৯)

১১. শান্তির ঠিকানা

বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মুবারক বলেন, আমি আমার জীবন বিত্তশালীদের সাথে কাটাই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি বিত্তশালীদের সাথেই উঠাবসা করতাম। কিন্তু আমি যতদিন তাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে ছিলাম ততদিন আমার চেয়ে অধিক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। কেননা আমি যার কাছেই যেতাম, দেখতে পেতাম, তার ঘর আমার ঘরের চেয়ে অধিক জাঁক-জমকপূর্ণ, তার পোশাক-পরিচ্ছদ আমার পোশাক-পরিচ্ছদের চেয়ে অধিক দামী এবং তার ধন-সম্পদের পরিমাণ আমার ধন-সম্পদের চেয়ে অনেক বেশী। তাদের ঐ প্রাচুর্য দেখে আমার মন ব্যথায় ভরে উঠত। কেননা তাদের যা আছে দুর্ভাগ্যবশত আমার তা নেই।

কিন্তু আমি আমার পরবর্তী জীবন ঐ সমস্ত লোকদের সংস্পর্শে কাটাই যাদের অর্থবিত্ত ছিল অপেক্ষাকৃত কম। আর সত্যিকথা বলতে গেলে, যখন থেকে আমি ওদের সাথে উঠাবসা শুরু করি তখন থেকে ক্রমশঃ আমার মনের অশান্তি দূর হতে থাকে। কেননা আমি যার কাছেই যেতাম, দেখতে পেতাম, আমি তার চেয়ে অধিক সচ্ছল ; তার আহার্য-সামগ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ, ঘর-দরজা, সাজ-সজ্জা সবকিছুই আমার চেয়ে নিম্নমানের। আর এগুলো দেখতে দেখতে আমি আমার অন্তরে শান্তি ও স্বস্তি পুরোপুরি ফিরে পাই।

প্রকৃতপক্ষে শান্তি ও স্বস্তি এক বস্তু এবং শান্তির উপাদান তথা আয়েশ-সামগ্রী অন্য বস্তু। আয়েশ-সামগ্রী দ্বারা সবসময় আরাম ও শান্তি লাভ করা অপরিহার্য নয়। শান্তি, বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে একটি দান মাত্র। অথচ আমরা আজ শান্তির উপাদান বা আয়েশ-সামগ্রীকেই শান্তির একমাত্র কারণ বলে মনে করি। আর শান্তির উপাদান বা আয়েশ-সামগ্রী বলতে আমরা প্রধানতঃ অর্থকেই বুঝি। কিন্তু যখন ক্ষুধা লাগে এবং কোনো আহার্য বস্তু পাওয়া যায় না তখন ঐ অর্থ কি আমরা চিবিয়ে খেতে পারি ? গায়ে যখন শীত লাগে এবং কোনো কাপড়-চোপড় পাওয়া যায় না তখন এ অর্থ গায়ে দিয়ে কি আমরা শীত নিবারণ করতে পারি ? অতএব অর্থকে শান্তি আখ্যা দেয়া চলে না। এমনকি, এই অর্থ দিয়ে যদি আমরা প্রচুর আহার্য বস্তু, প্রচুর পোশাক-পরিচ্ছদ এবং প্রচুর আয়েশ-সামগ্রী কিনি তবুও যে প্রকৃত শান্তির অধিকারী হতে পারবো তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কেননা আমরা সচরাচর দেখি যে,

www.amarboi.org

এমন অনেক লোক আছে যারা প্রচুর আহার্য বস্তু, পোশাক-পরিচ্ছদ ও আয়েশ-সামগ্রীর অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সারারাত বিনিদ্র অবস্থায় অতিবাহিত করে। শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরের কোমল শয্যায়ও তাদের চোখে ঘুম আসে না। তাদের কাছে যাবতীয় শান্তি-উপাদান রয়েছে অথচ তারা প্রকৃত শান্তি থেকে বঞ্চিত।

এর বিপরীত, অপর একটি শ্রেণীর লোককে দেখুন, যারা দালানে নয় বরং কুঁড়েঘরে বাস করে। তাদের না আছে কোনো খাট-পালংক, আর না আছে আরামদায়ক কোনো বিছানাপত্র। বলতে গেলে তারা মেঝের উপরই শয়ন করে। অথচ এ অবস্থায়ও তারা এক ঘুমে সারা রাত কাটিয়ে দেয়। এবার দেখুন, যাবতীয় আয়েশ-সামগ্রী না থাকা সত্ত্বেও শেষোক্ত লোকেরা কতই না শান্তি ও স্বস্তির অধিকারী। এ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে গেল যে, যারা অধিক থেকে অধিকতর আয়েশ-সামগ্রী করায়ত্ত করার চিন্তায় রাতদিন বিভোর থাকে তারা হয়ত প্রচুর পরিমাণে তা করায়ত্ব করতে সক্ষমও হয়, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই প্রকৃত শান্তি ও স্বস্তির নাগাল পায় না।

মনে রাখা উচিত যে, অর্থবিত্ত ও আয়েশ-সামগ্রী, যা সংগ্রহ করার জন্য আমরা পাগলপারা হয়ে ছুটছি—সেগুলো প্রকৃতপক্ষে শান্তিদায়ক বস্তু নয়। কেননা অর্থ দিয়ে, আয়েশ-সামগ্রী দিয়ে শান্তি কেনা যায় না। এটা বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে একটি দান মাত্র। যতক্ষণ আত্মতৃপ্তি লাভ না হবে এবং যতক্ষণ মনের মধ্যে এ ধারণার সৃষ্টি না হবে যে, আল্লাহ্ তাআলা বৈধভাবে আমাকে যা দান করেছেন তা নিয়েই সন্তুষ্টচিত্তে জীবন-যাপন করতে হবে—ততক্ষণ কোনো মানুষই শান্তি ও স্বস্তি লাভ করতে পারে না। আর একারণেই অনেক বিত্তশালী লোক আছে, যারা কোনোদিনই শান্তি ও স্বস্তির নাগাল পায় না। অতৃপ্তি, হতাশা ও দুশ্চিন্তায় প্রায়শঃ তাদের দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এজন্যই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, পার্থিব সহায়-সম্পদের ক্ষেত্রে যে তোমার নীচে তুমি তার দিকে তাকাবে এবং তারই সঙ্গ নেবে। আর দ্বীনের ব্যাপারে যে তোমার উপরে তুমি তার দিকে তাকাবে এবং তারই সঙ্গ নেবে। এটা এ কারণে যে, যখন তুমি পার্থিব ক্ষেত্রে তোমার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের লোকের দিকে তাকাবে তখন বুঝতে পারবে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাকে এমন অনেক নি'মাত দিয়েছেন যা অন্যকে দেয়া হয়নি। এতে তুমি আত্মতৃপ্তি লাভ করবে, আল্লাহ্ তাআলার শোক্‌র আদায় করবে এবং অর্থবিত্তের পিছনে লাগামহীনভাবে ছুটাছুটি করে নিজের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলবে না। আর দ্বীনের ব্যাপারে যে তোমার উপরে, তুমি যখন তার দিকে তাকাবে তখন দ্বীনের কাজে অবহেলা প্রদর্শনের কারণে তোমার মনে অনুতাপের সৃষ্টি হবে এবং

www.amarboi.org

এ অনুতাপ তোমাকে অনবরত দ্বীনী কাজে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে থাকবে। আর এতে করে তুমি অধিকারী হবে দ্বীন-দুনিয়ার প্রকৃত শান্তি ও মঙ্গলের।

১২. সময়ের সদ্ব্যবহার

যদি প্রশ্ন করা হয়, মানব জীবনে কোন্ জিনিসটি সবচেয়ে মূল্যবান তাহলে এর একমাত্র উত্তর হবে কাল বা সময়।

মাওলানা রুমী বলেন, সময় এমন একটি বন্ধু, যা নিমিষে নিমিষে রূপ বদলায় এবং চমৎকার সব উপহার-উপঢৌকন নিয়ে হাযির হয় আমাদের সামনে। যদি আমরা তাকে সাদরে গ্রহণ করি তাহলে সে সানন্দে ঐ সব উপহার-উপঢৌকন তুলে দেয় আমাদের হাতে। আর যদি আমরা তাকে অবজ্ঞা করি তাহলে সে যাবতীয় উপহার-উপঢৌকনসহ চুপিসারে চলে যায় আমাদের কাছ থেকে।

সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়। কেননা যে সময় চলে যায় তা আর ফিরে আসে না। তাই ইমাম গাযযালী বলেন, সময়কে তার পিছন দিক থেকে নয়, বরং সামনের দিক থেকে ধর এবং কাবু করে ফেল। অন্যথায় সে তোমার হাতছাড়া হয়ে যাবে। তিনি আরো বলেন, সময় হচ্ছে কাচা নরম মাটির মতো। তুমি এর দ্বারা যা ইচ্ছা তাই তৈরী করতে পার।

সময়ের সদ্ব্যবহার করলে সে তোমার কপালে জয়টিকা পরিয়ে দেবে। আর যদি তুমি অলস বসে থাক তাহলে সে তোমার কপালে একটি ব্যর্থতার চিহ্ন এঁকে দিয়ে অত্যন্ত সঙ্গোপনে তোমার কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। তাই তো দার্শনিক প্লেটো বলেন, সময় হচ্ছে এমন একটি জমি, যেখানে পরিশ্রম ছাড়া কিছুই উৎপাদন করা যায় না। যদি পরিশ্রম কর তাহলে এ জমি থেকে তুমি প্রচুর ফসল উৎপাদন করতে পারবে। আর যদি এটাকে অমনি ফেলে রাখ তাহলে তা তোমার জন্য উৎপাদন করবে শুধু কাঁটা আর কাঁটা। এরিস্টোটল বলেন, যখন তুমি অযথা সময় নষ্ট কর তখন একথাটি মনে রেখ যে, সময় তোমাকে ক্রমাগত হজম করে চলেছে।

হারানো বিদ্যা, অধ্যয়নের মাধ্যমে অর্জন করা যেতে পারে, হারানো স্বাস্থ্য চিকিৎসার মাধ্যমে ফিরে পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু হারানো সময় কোন কিছুতেই ফিরে পাওয়া যায় না। চিরদিনের মত সে আমাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

মূলতঃ আমাদের জীবন হচ্ছে সময় বা কালের এক একটি ভগ্নাংশ মাত্র। অতএব সময় অতিবাহিত হয় না, বরং পলে পলে আমাদের জীবনেরই লয়প্রাপ্তি

www.amarboi.org

ঘটে। সময়ের সদ্ব্যবহার করার অর্থ নিজের জীবনকে দীর্ঘায়িত করা। কথায় বলে, মহাপুরুষরা দীর্ঘায়ু হন, আর অথর্বরা হয় স্বল্পায়ু। তার অর্থ মহাপুরুষরা এমনভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করেন যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বল্পায়ু হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের জীবনে অনেক কিছু করে যেতে পারেন। ফলে তারা হন চিরস্মরণীয়। অপরদিকে অথর্বরা সময়ের সদ্ব্যবহার করে না বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দীর্ঘায়ু হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের জীবনে কিছুই করে যেতে পারে না। ফলে মৃত্যুর সাথে সাথে তারা আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়—চলে যায় বিস্মৃতির অন্তরালে।

অযথা সময় নষ্ট করা আত্মহত্যারই নামান্তর। পার্থক্য শুধু এই যে, আত্মহত্যা, সংগে সংগে মানুষের জীবন কেড়ে নেয়। আর অযথা সময় নষ্ট করা, মানুষকে একটি নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত মৃতপ্রায় রেখে তারপর চিরকালের জন্য নির্জীব করে দেয়।

গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস বলেন, সময় হচ্ছে ক্ষেত থেকে সদ্য-আহরিত তূলার মত। তুমি পরিশ্রম করে এ থেকে তোমার মনমত পোশাক তৈরী করতে পার। যদি তা না কর তাহলে তোমার 'মূর্খতার ঘূর্ণিবায়ু', একে উড়িয়ে নিয়ে দূর-দূরান্তে নিক্ষেপ করবে।

ফ্রাংকলিন বলেন, সময় হচ্ছে এমন একটি সম্পদ, যা একবার হাতছাড়া হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না। স্মরণ রেখ, তুমি অনেক কিছুই করতে পার, কিন্তু সময়কে টেনে লম্বা করতে পার না।

যারা কাজের মধ্য দিয়ে সময় কাটায় তারা সর্বদা আমোদ-স্ফূর্তির মধ্যে থাকে। যারা অলস বসে থাকে তারা নানা দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার শিকারে পরিণত হয়। তাই তো নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেন, কষ্ট ও বিপদ থেকে তুমি একমাত্র তখনি নিরাপদ থাকবে যখন তোমার হাতে বাড়তি সময় থাকবে না।

কুরআন এবং হাদীসেও বিভিন্ন ভঙ্গিতে সময়ের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। সময়মত নামায পড়া, রোযা রাখা তথা প্রত্যেকটি ইবাদাত করার জন্য আল্লাহর রাসূল (সাঃ) কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। হুযূর (সাঃ) একদা বলেন, যখন একটি দিনের আগমন ঘটে তখন সে সবাইকে ডেকে ডেকে বলে, হে মানুষ ! আমি আল্লাহর একটি দুষ্প্রাপ্য সৃষ্টি এবং তোমার আমলের সাক্ষী। যদি তুমি আমা হতে কোনো উপকার নিতে চাও তাহলে অবিলম্বে নিয়ে নাও। কেননা আমি এখনি চলে যাব এবং কিয়ামত পর্যন্ত আর ফিরে আসব না। এ কারণেই হযরত উমর (রাঃ) সবসময় দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ ! আমার জীবনের

www.amarboi.org

প্রতিটি মুহূর্তকে বরকতময় কর এবং তা সঠিকভাবে কাজে লাগাবার শক্তি আমাকে দাও।'

সময় এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু যে, খোদ আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে সময়ের (মহাকালের) শপথ করে বলেছেন ঃ

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ (العصر : ١-٣)

'মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং অপরকে ন্যায়-সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।'–(সূরা আসর ঃ ১-৩)

আল্লাহ্ তাআলার এ পবিত্র বাণী থেকে এ ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে যে, যারা সময়ের সদ্ব্যবহার করে না তারা জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, আর যারা সময়কে সৎকাজে লাগায় তারা হয় সফল জীবনের অধিকারী।

১৩. প্রশ্নপত্র ফাঁস

যাবতীয় পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ নীতি অবলম্বন করা হয় যে, তাতে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ প্রথমে গোপন রাখা হয়, অতপর ঠিক পরীক্ষার মুহূর্তে তা প্রকাশ করা হয়—যাতে পরীক্ষার্থীদের যোগ্যতা সঠিকভাবে যাঁচাই করা যেতে পারে। অবশ্য এমন একটি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এ নীতি প্রয়োগ করা হয় না, যা মানুষের জন্য তার জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। উপরন্তু এর পরীক্ষক হচ্ছেন সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলা। এটা আল্লাহ্ তাআলারই অপার করুণা যে, তিনি এ পরীক্ষায় জিজ্ঞাসিত প্রশ্নসমূহ পরীক্ষা অনুষ্ঠানের অনেক পূর্বেই ফাঁস করে দিয়েছেন। তাই এ প্রশ্নপত্র আগেভাগে জেনে নেয়ার জন্য মানুষকে মোটেই বেগ পেতে হয় না। কেননা আল্লাহ তাআলা তার নবী ও রাসূলদের মাধ্যমে যুগের পর যুগ ধরে সর্বসাধারণ্যে একথা বলে আসছেন ঃ হে মানুষ! পৃথিবীর আয়ুষ্কাল শেষ হবার পর যখন তোমরা আমার সামনে হাযির হবে তখন আমি তোমাদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো। তোমরা যদি এগুলোর সন্তোষজনক জবাব দিতে পার তাহলে তোমাদের মানব জীবন হবে সফল, অন্যথায় ব্যর্থ।

শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) তার বাণীসমূহে এ সমস্ত প্রশ্নের বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। এ প্রসংগে তার একটি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আর তাহলো ঃ

www.amarboi.org

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন মানুষ তার অবস্থান থেকে এক পা-ও নড়তে পারবে না যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। আর এ পাঁচটি প্রশ্ন হলো ঃ

১. তাকে তার আয়ুষ্কাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে—কোথায় কিভাবে সে তা কাটিয়েছিল ?

অর্থাৎ প্রথম প্রশ্ন হবে মানুষের সেই আয়ুষ্কাল সম্পর্কে যা বরফের ন্যায় অনবরতঃ গলে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে—ঘড়ির প্রতিটি টিক্ টিক্ শব্দের ন্যায় ক্রমশঃ বিলীন হয়ে যাচ্ছে, অথচ মানুষ মনে করছে, এটা কখনো শেষ হবার মত নয়।

২. তাকে তার যৌবন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে—কোথায় কিভাবে সে এটাকে নিয়োজিত রেখেছিলো ?

অর্থাৎ একটি প্রশ্ন করা হবে সমগ্র আয়ুষ্কাল সম্পর্কে এবং অপর প্রশ্ন করা হবে বিশেষভাবে যৌবনকাল সম্পর্কে। যৌবনকাল যদিও সমগ্র আয়ুষ্কালের অন্তর্ভুক্ত—কিন্তু যেহেতু এটা মানুষের আয়ুষ্কালের শ্রেষ্ঠতম অংশ তাই এ সম্পর্কে পৃথকভাবে প্রশ্ন করা হবে। যেহেতু যৌবনকাল জ্ঞান অর্জন এবং সে জ্ঞানকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে সমগ্র জীবনকে সফল করে তোলার মোক্ষম সময় তাই এ সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রশ্ন করাটাই স্বাভাবিক।

৩. তাকে তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ সে কোথা থেকে এগুলো অর্জন করেছিল ?

অর্থাৎ তাকে এ প্রশ্ন করা হবে না যে, তুমি কি পরিমাণ ধন-সম্পদ অর্জন করেছ, তুমি লক্ষপতি ছিলে, না কোটিপতি ছিলে, তোমার ব্যাংক-ব্যালেন্স কত ছিল—বরং প্রশ্ন করা হবে, তুমি যা কিছু অর্জন করেছ তা কোথা থেকে কিভাবে অর্জন করেছ—বৈধ পন্থায় করেছ, না অবৈধ পন্থায় করেছ ?

৪. তাকে প্রশ্ন করা হবে—সে তার ধন-সম্পদ কোথায় খরচ করেছিল ?

অর্থাৎ ধন-সম্পদ সম্পর্কে দু'টি প্রশ্ন করা হবে। এক ঃ সে এগুলো কোথা থেকে অর্জন করেছিল, দুই ঃ সে এগুলো কোথায় খরচ করেছিল ? অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা প্রশ্ন করবেন ঃ ঐসব ধন-সম্পদ, যা আমানত হিসেবে আমি তোমার হাতে অর্পণ করেছিলাম এবং তোমাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম —এর মধ্যে তোমার, তোমার সন্তান-সন্ততির, আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীম ও বিধবাদের এবং প্রতিবেশী ও মুসাফিরদের এই এই পরিমাণ হক (প্রাপ্য)

www.amarboi.org

রয়েছে—তুমি কি এগুলো সঠিক খাতে ও সঠিকভাবে খরচ করেছিলে ? তুমি এগুলোকে আমার রক্ষিত আমানতের স্থলে নিজের অধিকারভুক্ত মনে করে যখন ইচ্ছা এবং যেমন ইচ্ছা খরচ করনি তো ?

৫. তাকে প্রশ্ন করা হবে—সে তার জ্ঞানমতে কি পরিমাণ আমল করেছিল?

অর্থাৎ তাকে আখিরাতে এ প্রশ্ন করা হবে না যে, সে কোন্ কোন্ কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কি কি ডিগ্রী হাসিল করেছিল বা কি কি বিষয়ে কি পরিমাণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিল—বরং তাকে প্রশ্ন করা হবে, কমবেশী তার যে জ্ঞান ছিল সে অনুযায়ী সে কি পরিমাণ আমল করেছিল ?

মোটকথা, এটি আল্লাহ্ তাআলার একটি পরম করুণা যে, আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তিনি আগেভাগে শুধু ফাঁস করে দেননি, বরং এ প্রশ্নপত্রের সন্তোষজনক জবাব যাতে আমরা তৈরী করে নিয়ে যেতে পারি সে জন্য হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর ন্যায় একজন মহান শিক্ষককেও আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর মহান শিক্ষা ও পথ-প্রদর্শনের আলোকে আমরা এ দুনিয়া থেকে উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব অনায়াসে তৈরী করে নিয়ে যেতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ্—যাবতীয় প্রশংসা মহান আল্লাহ্‌র।

১৪. আত্মহত্যা

কোনো মানুষই নিজের জীবনের মালিক-মুখতার নয়। কেননা এ জীবন সে সৃষ্টি করেনি। এটা করার মত ক্ষমতাও তার নেই। সে তার দেহের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এমনকি একটি জীবকোষও নিজে তৈরী করেনি। তার জীবন, তার প্রাণ একটি আমানত মাত্র। এ আমানত সে তার কাজে লাগাতে পারে, নিজ উপকারার্থে তা ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু এটাকে ধ্বংস করার কোনো অধিকার তার নেই—থাকতে পারে না। অতএব সে আত্মহত্যাও করতে পারে না। এ জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার তার এ ধরনের যে কোনো উদ্যোগ এক অমার্জনীয় অপরাধ ছাড়া কিছু নয়।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন ঃ

وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ۝ (النساء : ٢٩)

"তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না, আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"–(সূরা আন নিসা ঃ ২৯)

একজন মুমিন অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে জীবনের কঠোর বাস্তবতার মুকাবালা করবে, এটাই স্বাভাবিক। কোনো অবস্থায়ই জীবন থেকে

www.amarboi.org

পলায়ন করার কোনো অধিকার তার নেই। বিপদে আপতিত হলেই কিংবা কোনো সংকট ও সমস্যা দেখা দিলেই সে জীবনের পরিচ্ছদটি দেহরূপী মাটির কায়া থেকে খুলে ফেলে পালাতে শুরু করবে, কোনো আশায় ব্যর্থ-মনোরথ হলেই সে জীবনকে অবজ্ঞা করে বসবে—এ অধিকার তো তার থাকতে পারে না। মুমিনকে তো জিহাদ তথা প্রাণপণ চেষ্টা-সাধনা করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে, অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকার জন্যে নয়। সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হওয়াই তার কর্তব্য, পলায়ন বা পশ্চাদপসরণ তার জন্য অশোভন। তার ঈমান ও চরিত্রই তাকে জীবনের ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে পদে পদে বাধা দেয়। কেননা তার কাছে এমন হাতিয়ার রয়েছে যা কখনো পুরাতন হয় না, তার হাতে সম্পদের এমন ভাণ্ডার রয়েছে, যা কখনো ফুরিয়ে যায় না। আর সে হাতিয়ার হচ্ছে ঈমানের হাতিয়ার, যা খুবই দৃঢ় ও মজবুত এবং সে ভাণ্ডার হচ্ছে অনমনীয় নৈতিকতার ভাণ্ডার।

এতদসত্ত্বেও যে লোক আত্মহত্যার জঘন্য পথ অবলম্বন করবে সে আল্লাহ তাআলার রহমত থেকে বঞ্চিত হবে। হারাম করে দেয়া হবে তার জন্য জান্নাত। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে জনৈক ব্যক্তি আহত হলো এবং যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। অতপর সে একটি ছুরি দিয়ে নিজেই নিজের হাত কেটে ফেললো। তাতে তার দেহ থেকে এতবেশী রক্ত ঝরলো যে, তাতে তার মৃত্যু ঘটল। আল্লাহ তাআলা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেন, 'আমার এ বান্দা নিজের ব্যাপারে খুব বেশী তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। আর এ কারণে আমি তার প্রতি জান্নাত হারাম করে দিয়েছি।'

–(বুখারী, মুসলিম)

ক্ষতের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে নিজের হত্যাকাণ্ড নিজেই ঘটিয়েছিল বলে ঐ ব্যক্তির উপর জান্নাত হারাম হয়ে গেল। এই যখন অবস্থা, তখন যারা নিজেদের ব্যবসায়ে সামান্য ক্ষয়-ক্ষতির কারণে, চাকুরীতে উন্নতি না হওয়ার কারণে, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার কারণে, অথবা কোনো আশা ভঙ্গ হওয়ার কারণে আত্মহত্যা করে, তাদের অপরাধ তো আরো জঘন্য, আরো অমার্জনীয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন, যে লোক নিজেকে পর্বতের উপর থেকে ফেলে দিয়ে (আত্ম) হত্যা করলো, সে জাহান্নামের আগুনে চিরদিন পড়ে থাকবে—কখনো সেখান থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। যে লোক বিষপানে আত্মহত্যা করলো, সে জাহান্নামের আগুনের মধ্যে চিরকাল নিজ হাতে বিষপান করতে থাকবে। আর যে লোক কোনো লোহার অস্ত্রের সাহায্যে আত্মহত্যা করলো, সে জাহান্নামের মধ্যে চিরকাল ধরে ঐ অস্ত্র দিয়ে নিজেকে আঘাত করতে থাকবে।–(বুখারী, মুসলিম)

www.amarboi.org

১৫. অন্যায় সুপারিশ

দ্বীনে ইসলাম, দ্বীনে ফিতরাত তথা স্বভাব ধর্ম। ইসলাম মানুষের ব্যক্তিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে 'হুকুকুল্লাহ'র সাথে সাথে 'হুকুকুল ইবাদ'-এর সংরক্ষণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছে। সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, মাপ-ওজনে কম দেয়া ইত্যাদি ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে 'হুকুকুল ইবাদ' তথা বান্দার হক (অধিকার) নষ্ট করা হয় বলে ইসলাম এগুলোকে অবৈধ ঘোষণা করেছে।

অন্যায় ও অবৈধ সুপারিশও বান্দাকে তার হক ও প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত রাখে বলে ইসলামের দৃষ্টিতে একাজও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। অন্যায় সুপারিশ শুধু ব্যক্তি-বিশেষকে তার হক থেকে বঞ্চিত করে না, বরং গোটা সমাজকেই বঞ্চিত করে ইনসাফ ও ন্যায়-বিচার থেকে।

সুপারিশ দু' ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো নিজের ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য এবং অপরটি হলো অপরকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য। যদি কোনো ব্যক্তি নিজের বা অন্য কারো ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কারো কাছে সুপারিশ করে তাহলে তার এ কাজ নিসন্দেহে বৈধ। আর যদি কোনো ব্যক্তি অন্যকে তার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নিজেই তা হস্তগত করে নিতে চায় বা নিজের পছন্দমত অন্য কাউকে এর ভাগী করতে চায় এবং সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ করে তাহলে তার এ কাজ হারাম এবং অবৈধ। যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيبٌ مِّنْهَا ج وَمَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً

يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيْتًا ○ (النساء : ٨٥)

"কেউ কোনো ভাল কাজের সুপারিশ করলে ওতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোনো মন্দ কাজের সুপারিশ করলে ওতেও তার অংশ থাকবে। আল্লাহ সর্ববিষয়ে নজর রাখেন।"-(সূরা আন নিসা ঃ ৮৫)

অন্যায় সুপারিশ সমাজে শুধু জুলুম-অত্যাচারের বিস্তার ঘটাচ্ছে না, সমাজ-উন্নয়নের পথেও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলেছে। এ অন্যায় সুপারিশের ফলে অনেক প্রতিভাবান ছেলে ভাল স্কুল-কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায় না, অনেক সুযোগ্য ছেলে চাকুরী থেকে বঞ্চিত হয় এবং অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে

www.amarboi.org

বঞ্চিত থেকে যায়। অন্যায় সুপারিশের এ জাতীয় হস্তক্ষেপের ফলে শুধু ব্যক্তি-বিশেষই তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না, বরং গোটা সমাজও যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোকের সেবা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। অন্য কথায়, এ দুষ্কর্মের ফলে গোটা সমাজের উন্নয়নও ব্যাহত হয়।

এ কারণেই ইসলাম অন্যায় সুপারিশের ঘোর বিরোধী। বুখারী শরীফের একটি বর্ণনায় আছে, জনৈকা মাখযুমী স্ত্রীলোক চুরিতে ধরা পড়ে। তার নাম ছিল ফাতেমা। হযরত উসামা (রাঃ) তার দণ্ড মওকুফ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে সুপারিশ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার সে সুপারিশ অগ্রাহ্য করে ঐ স্ত্রীলোককে শুধু দণ্ড দান করেননি বরং মুসলিম জনসাধারণকে সম্বোধন করে একটি ভাষণও দেন। তিনি তাতে বলেন, "লোক সকল! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ এজন্য ধ্বংস হয়ে গেছে যে, যখন তাদের কোনো অভিজাত লোক চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিতো, আর যখন কোনো দরিদ্র লোক চুরি করতো তখন তারা তাকে দণ্ড দান করতো। আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও আজ চুরি করতো তাহলে মুহাম্মদ তার হাতও কেটে ফেলতো।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চাচা হযরত আব্বাস (রাঃ)-ও ছিলেন বদরের যুদ্ধ বন্দীদের অন্যতম। যেহেতু তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকটাত্মীয় তাই আনসাররা নিবেদন করলো ঃ হে আল্লাহর রাসূল, যদি আপনি অনুমতি দেন তাহলে আব্বাসের ফিদ্ইয়া মাফ করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আনসারদের ঐ অন্যায় সুপারিশ অগ্রাহ্য করে বলেন ঃ কখনো না। একটি দিরহামও মাফ করা যাবে না।

একজন অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করার জন্য লোকেরা হযরত যুবাইর (রাঃ)-এর কাছে গিয়ে নিবেদন করলো ঃ হে যুবাইর, আপনি খলীফা উসমান (রাঃ)-কে বলে এ ব্যক্তির পরিত্রাণের একটা ব্যবস্থা করুন। কিন্তু হযরত যুবাইর (রাঃ) তাদের সে সুপারিশ অগ্রাহ্য করে বললেন, যখন কোনো অভিযোগ খলীফা (আদালত) পর্যন্ত পৌঁছে যায় তখন আল্লাহ সুপারিশকারী এবং যার কাছে সুপারিশ করা হয় তাদের উভয়ের উপরই লানত প্রেরণ করেন।

আজ আমাদের সমাজের প্রায় সকল ফিতনা-ফাসাদ ও অশান্তির মূল হচ্ছে ঘুষ ও অন্যায় সুপারিশ। ঘুষকে সবাই অবৈধ মনে করলেও অন্যায় সুপারিশকে যেন কিছুটা বৈধ বলেই মনে করে। ফলে দেখা যায়, তারা অন্যান্য অবৈধ কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু অন্যের জন্য যে কোনো জায়গায় এবং যে কোনো ব্যাপারে অন্যায় সুপারিশ করতে মোটেই দ্বিধাবোধ করে না।

www.amarboi.org

কিন্তু একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন সে সম্পর্কে আমাদেরকে তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এজন্য করেননি যে, আমরা এর সাহায্যে এক ব্যক্তিকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে অন্য ব্যক্তিকে তার মালিক বানিয়ে দেব। এটা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি নিছক কৃতঘ্নতা ছাড়া কিছু নয়।

আমাদের সমাজে কিছু কিছু লোক এমনও আছে যারা বখশিশের আকারে অন্যের কাছ থেকে কিছু না কিছু গ্রহণ করে তার বিনিময়ে দাতার পক্ষে অন্যায় সুপারিশ করে থাকে। এদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কারো জন্য (অন্যায়) সুপারিশ করলো এবং তার বিনিময়ে ঐ ব্যক্তি তাকে কিছু বখশিশ দিলো এবং সে তা গ্রহণ করলো, সে (মূলত) ওর কাছ থেকে সবচেয়ে জঘন্য সুদটিই গ্রহণ করলো।

যে ব্যক্তি অন্যায় সুপারিশ করাকে নিজের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে তার উপদেশ গ্রহণের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর এ হাদীসটি যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি।

১৬. মিথ্যাচার

কেন যে আজকাল আমাদের অন্তরে একথা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, ইসলাম শুধুমাত্র নামায-রোযারই নাম। আমি যদি নামায পড়ি, রোযা রাখি তাহলেই কেল্লা ফতেহ। অতপর আমি বাজারে যাচ্ছি, অফিসে যাচ্ছি, কলেজে যাচ্ছি, মাদরাসায় যাচ্ছি এবং সর্বত্রই হালাল-হারামকে একাকার করে ছাড়ছি; কিন্তু তাতে আমার দীন-ধর্মের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কেননা মিথ্যা বলা যে জঘন্য অপরাধ সে কথা যেন আমার জানাই নেই।

মিথ্যার বেসাতি চলছে আজ বিশ্বের সর্বত্র। যারা নিজেদেরকে সভ্য বলে মনে করেন তারা যেমন মিথ্যা বলতে দ্বিধা করছেন না তেমনি যারা বাহ্যত ইসলামের জন্য উৎসর্গীকৃত-প্রাণ তাদের অনেকেও অনবরত মিথ্যা বলে যাচ্ছেন। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, তারা এসব মিথ্যাকে মিথ্যা বলে মনেই করছেন না। এতে তারা একাধারে দু'টি অপরাধ করছেন—একটি মিথ্যা বলার অপরাধ এবং অপরটি এ অপরাধকে অপরাধ মনে না করার অপরাধ।

উদাহরণস্বরূপ মিথ্যা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট, মিথ্যা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট, মিথ্যা সুপারিশপত্র ইত্যাদির কথা বলা যেতে পারে। যে ডাক্তার মিথ্যা

www.amarboi.org

মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিচ্ছেন তিনি যেমন ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি তথা নামায, রোযা, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নিয়মিত পালন করছেন তেমনি যিনি মিথ্যা সার্টিফিকেট নিচ্ছেন তিনিও কথাবার্তা ও কাজ কর্মে বাহ্যত একজন ধর্মপরায়ণ বলেই নিজেকে প্রতিপন্ন করছেন। কিন্তু দু'জনের একজন বলতে গেলে নিজের অজ্ঞাতেই মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছেন এবং অপরজন সেটাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটে চলেছে মিথ্যা সুপারিশের ক্ষেত্রেও। একজন যুবকের চাকুরীর দরকার। কিন্তু সেজন্য প্রয়োজন কারেক্টার সার্টিফিকেটের। সে এমন একজনের কাছে গেল যিনি তাকে চেনেন না, এমনকি জীবনেও দেখেননি। অমনি তিনি লিখে দিলেন, আমি এ প্রতিশ্রুতিশীল যুবককে দীর্ঘদিন যাবত চিনি, সে প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী ইত্যাদি ইত্যাদি। তিনি এ যুবককে অবশ্যই সার্টিফিকেট দেবেন। কেননা তার সার্টিফিকেটের দরকার। তবে সার্টিফিকেট দেবেন প্রয়োজনীয় খোঁজ-খবর নেয়ার পর। তিনি যাকে মোটেই চেনেন না তাকে দীর্ঘদিন যাবত চেনেন বলছেন, যার চরিত্র সম্পর্কে কিছুই জানেন না তাকে প্রশংসনীয় চরিত্রের অধিকারী বলছেন—অথচ এটা যে ডাহা মিথ্যা তা তার মস্তিষ্কে আসছে না। আর সবচেয়ে মারাত্মক কথা হলো, একজন চরিত্রহীনকে (যদি বাস্তবে তা হয়ে থাকে) চরিত্রবান বলে সার্টিফিকেট দিলে সমাজে যে এর মারাত্মক পরিণতি দেখা দিতে পারে সেদিকে ধর্মপরায়ণ সার্টিফিকেট-দাতা মোটেই ভ্রূক্ষেপ করছেন না।

কোর্ট-কাছারীতে মিথ্যা বলা যে একটি অপরাধ সে কথা আজ আমাদের অনেক ধর্মপরায়ণই জানেন না—অন্ততঃ তাদের কথাবার্তা ও কাজকর্ম দেখে তা-ই মনে হয়। তিনি নামায পড়ছেন, রোযা রাখছেন, হাজ্জ করছেন, ধর্মীয় বক্তৃতা-বিবৃতি দিচ্ছেন অথচ কোর্ট-কাছারীতে নির্দ্বিধায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি খুবই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে নিজের এলাকায় একটি স্কুল বা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু সেজন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই স্কুল বা মাদরাসা প্রতিষ্ঠার পূর্বেই শিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছে লিখলেন, 'আমি অমুক জায়গায় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছি। তাতে এতজন শিক্ষক ও এতজন ছাত্র রয়েছে। অতএব মাদরাসাটি অনুমোদন করে যথারীতি সরকারী সাহায্য প্রদান করতে মর্জি হয়।' বিষয়টি অনুসন্ধান করতে এলেন একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক। ধর্মকর্মেও তিনি অগ্রণী। কিন্তু ঐ নকল প্রতিষ্ঠাতার ফাঁদে পড়ে তিনিও এ মর্মে প্রতিবেদন পেশ করলেন, 'হ্যাঁ, মাদরাসাটি যথারীতি

২৮—

www.amarboi.org

চলছে এবং এতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক রয়েছে। অতএব এটিকে অনুমোদন করে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করা যেতে পারে।'

তিনি জ্ঞানী-গুণী ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। একটি ধর্মীয় পুস্তক লিখে তার উস্তাদের কাছে গেলেন এবং বইটির উপর একটি প্রশংসাপত্র লিখে দিতে অনুরোধ করলেন। অমনি উস্তাদ (বইটি না পড়েই) সংগে সংগে লিখে দিলেন, আমি আগাগোড়া বইটি পড়েছি। এটি নির্ভুল ও সুখপাঠ্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ ধরনের আরো কত মিথ্যার বেসাতি যে চলছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ দুনিয়ায় এমন কোনো ধর্ম নেই, এমন কোনো জাতি নেই, যেখানে মিথ্যা বলা হারাম বা নিষিদ্ধ নয়। বিশ্বের যে সমস্ত অঞ্চলের লোক আজো শিক্ষা ও সভ্যতা থেকে বঞ্চিত রয়েছে তাদের কাছেও মিথ্যা বলা একটি জঘন্য অপরাধ।

আর ইসলামের দৃষ্টিতে মিথ্যা বলা মুনাফিকের একটি চিহ্ন বিশেষ। অর্থাৎ মিথ্যাবাদী প্রকৃতপক্ষে মুসলিম নয়, বরং মুনাফিক।

পবিত্র কুরআনের একটি বাণীতে মিথ্যা কথনকে মূর্তিপূজার অপবিত্রতার সমপর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ(الحج : ٣٠)

"তোমরা বর্জন কর মূর্তিপূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথন থেকে।"–(সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩০)

যারা মিথ্যা মেডিক্যাল সার্টিফিকেট, মিথ্যা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট, মিথ্যা সুপারিশপত্র ইত্যাদি লিখে দিচ্ছেন তারা যে, কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছেন তা বলাই বাহুল্য। আর মিথ্যা সাক্ষ্য যে শিরকের মত একটি জঘন্য অপরাধ তা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর বিভিন্ন বাণী থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হেলান দিয়ে বসা অবস্থায় সাহাবা কিরাম (রাঃ)-কে বললেন, 'কোন্‌টি বড় গুনাহ্ তা কি আমি তোমাদেরকে বলবো ?' সাহাবা কিরাম (রাঃ) বললেন, 'অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল ! হুযূর (সাঃ) বললেন, 'বড় গুনাহ্ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া'—এটুকু বলা পর্যন্ত তিনি হেলান দিয়ে বসাছিলেন। অতপর তিনি সোজা হয়ে বসে বললেন, 'মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।' আর একথাটি তিনি তিন বার উচ্চারণ করলেন।"–(মুসলিম)

www.amarboi.org

গুপ্তচর বৃত্তির অস্তিত্ব ছিল সর্বযুগে এবং সর্বদেশে। অতীত যুগের ধর্মনেতারা ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যেও গুপ্তচর বৃত্তির আশ্রয় নিতেন বলে জানা যায়। বনী ইসরাঈলরা মিসর থেকে হিজরত করে যখন ফেলিস্তিনের নিকটবর্তী হয় তখন হযরত মূসা (আঃ)-কে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, যেন তিনি ফেলিস্তিনে প্রবেশের পূর্বে শত্রুদের শক্তি-সামর্থ সম্পর্কে পূর্বাহ্নে অবশ্যই ওয়াকিফহাল হন। ফেলিস্তিনীদের বিস্তারিত অবস্থা এবং বিশেষ করে তাদের সামরিক শক্তি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করার জন্য হযরত মূসা (আঃ) ১২জন গুপ্তচরকে ফেলিস্তিনে পাঠিয়েছিলেন বলে কথিত আছে।

মহানবী (সাঃ)-ও গুপ্তচরদের ভূমিকার গুরুত্ব অনুধাবন করেছিলেন। বিভিন্ন তথ্য সূত্রে জানা যায় যে, সকল অভিযানেই তিনি গুপ্তচরদেরকে কাজে লাগিয়েছিলেন। যতদূর জানা যায়, বদর যুদ্ধে গুপ্তচরকে প্রথম ব্যবহার করা হয়। তায়ম গোত্রের তালহা বিন উবায়দুল্লাহ এবং আদী গোত্রের সাঈদ ইবনে যায়দকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনরত মাক্কী কাফেলা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করা হয়েছিল। একই অভিযানকালে মহানবী (সাঃ) বদরের কাছে পৌঁছে আরো দু'জন গুপ্তচর জুহায়নাহ বাস্‌বাস্ ইবনে আমর ও আদী ইবনে আবী আল-জাগবাকে মাক্কী কাফেলার অবস্থান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য বদরের একটি পানির কূপের দিকে পাঠিয়েছিলেন। তারা সে কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করেন। মাক্কী বাহিনী এসে উপস্থিত হওয়ার পর মহানবী (সাঃ) আরো দু'জন গুপ্তচর প্রেরণ করেন। এরা ছিলেন মক্কার প্রথম দিকের মুসলমান আম্মার বিন ইয়াসির ও আবদুল্লাহ বিন মাসউদ। তারা মাক্কী বাহিনীর ধৃত পানি-বাহকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাঁচাইয়ের জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন।

এক বছর পর উহুদের যুদ্ধকালে খাযরাজের ফাযালার দুই পুত্র আনাস ও মুনসীকে গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল। আল আকীক পৌঁছে তারা কুরাইশ বাহিনীর সৈন্যদের সাথে মিশে যাওয়ার সুযোগ পান। তাদের সাথে থেকে তারা আল-বিলা নামক স্থানে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে চুপিসারে সরে পড়েন। তারা মহানবী (সাঃ)-এর কাছে পৌঁছে তাঁকে কুরাইশদের যুদ্ধ-পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করেন। কুরাইশরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছার আগেই এ ঘটনা ঘটে। মাক্কী বাহিনী উহুদে শিবির স্থাপন করার পর মহানবী (সাঃ) তাঁর অন্য একজন গুপ্তচর খাযরাজের আল-হুবার ইবনুল মুনযিরকে কুরাইশদের আঘাত হানার শক্তি নিরূপণ ও মূল্যায়নের জন্যে প্রেরণ করেন। আল-হুবার

www.amarboi.org

ইবনুল মুনযির ছিলেন একজন বিখ্যাত রণকৌশলবিদ ও সামরিক বিশেষজ্ঞ। মহানবী (সাঃ) তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তিনি ফিরে না আসা পর্যন্ত কোনো তথ্য যেন কারো কাছে প্রকাশ না করেন। কারণ তা মুসলিম বাহিনীর মনোবলের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারতো। তিনি গোপনে কুরাইশ বাহিনীর সামরিক শক্তির সঠিক পরিসংখ্যান নিয়ে আসেন। যুদ্ধের পর পশ্চাদপসরণরত মাক্কী বাহিনীর ভবিষ্যত-পরিকল্পনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্যে আলী বিন আবী তালিবকে নিয়োগ করা হয়।

'উসদ আল-গাবাহ' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, আর-রাজী'-এর মর্মান্তিক ঘটনার পর কুরাইশদের অভিসন্ধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য উমাইয়াহ ইবনে খুওয়ায়লিদ আল-যামূরীকে গুপ্তচর হিসাবে প্রেরণ করা হয়েছিল। একই মিশনে আমর ইবনে উমাইয়া আল-যামূরীকেও প্রেরণ করা হয়। মুরায়সীতে বনু আল-মুসতালিক গোত্রের সৈন্য সমাবেশের খবর মদীনায় এসে পৌছুলে মহানবী (সাঃ) তার সত্যতা যাঁচাইয়ের জন্য বুরাইদা ইবনুল হুসায়বকে প্রেরণ করেন। তিনি তাদের পানির উৎসস্থানে গিয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন। বিপক্ষদের সম্পর্কে প্রাপ্ত এ প্রাথমিক তথ্য ইসলামী বাহিনীকে শত্রুদের বিরুদ্ধে একটি সুবিধাজনক অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল। ফলে মুসলিম বাহিনীর আল-মুরায়সী অভিযানকালে তাদেরকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু খন্দকের যুদ্ধকালেই মুসলিম গুপ্তচরদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো সংঘটিত হয়। এ সময় মদীনা এক মাস যাবত অবরুদ্ধ ছিল।

রাজধানী শহর দীর্ঘ সময় অবরুদ্ধ থাকাকালে মুসলিম যোদ্ধারা শুধু শত্রুর আশু সম্মুখ-হামলার শিকারই ছিল না, পশ্চাৎ দিক থেকে তাদের উপর ইয়াহূদী গোত্র বনু কুরাইযার হামলারও আশংকা ছিল। এ দু'টি শত্রু দলের প্রকৃত অভিসন্ধি জানার জন্য মহানবী (সাঃ) খাওয়াত ইবনে জুবাইরকে প্রেরণ করলে তিনি সাফল্যের সাথে সে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে শত্রুদের, আহযাবের (খন্দকের) যুদ্ধে যোগদানের খবরের সত্যতা যাঁচাইয়ের জন্য মহানবী (সাঃ) আল যুবাইর ইবনুল আওয়ামকে দায়িত্ব প্রদান করেন। অবরোধের শেষে মহানবী (সাঃ) হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানকে তাঁর গুপ্তপর হিসেবে কুরাইশ শিবিরে প্রেরণ করেন। তিনি কুরাইশ শিবিরে ঢুকে আগুন জ্বালিয়ে চারপাশ ঘিরে বসে থাকা মক্কার লোকদের একটি দলের সাথে সহজেই মিশে যান। কেউ তাকে চিনতে পারেনি। তার প্রবেশের পর পরই কুরাইশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবূ সুফইয়ান সেখানে এসে হাযির হন এবং শত্রু বাহিনীর গুপ্তচরদের ব্যাপারে সাবধান থাকার জন্যে তার সৈন্যদের হুশিয়ার করে দেন। তিনি তাদেরকে স্বীয় সঙ্গীদের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার নির্দেশ দেন। যেহেতু মুসলিম গুপ্তচররা এভাবে

www.amarboi.org

ধরা পড়ার ব্যাপারে হুঁশিয়ার ছিলেন, তাই হুযাইফা তৎক্ষণাৎ তার পাশের প্রথম লোকটিকে দিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসার কাজ শুরু করেন। ফলে তাঁর উপর কারো সন্দেহ থাকলেও তার নিরসন হয়। অতপর তিনি তাদের বাহিনীর, প্রত্যাহারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে সক্ষম হন এবং পুরো বিষয়টি সম্পর্কে তিনি যথারীতি মহানবী (সাঃ)-কে অবহিত করেন।

অনুরূপভাবে হুদাইবিয়া অভিযানকালে বুসর ইবনে সুফইয়ান আল-খুযায়ী মহানবী (সাঃ)-কে মক্কায় প্রবেশে কুরাইশ বাহিনীর বাধা প্রদানের প্রস্তুতি সম্পর্কে খবর জানার লক্ষ্যে মক্কায় গমন করেন। একইভাবে হুনাইনের যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে আবী হাযরাদুল আসলামী মহানবী (সাঃ)-এর একজন গুপ্তচর হিসাবে কাজ করেন এবং শত্রুদের প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সংগ্রহ করেন। এছাড়াও বহু সংখ্যক অপরিজ্ঞাত গুপ্তচর ছিল যাদেরকে মহানবী (সাঃ) কাজে লাগিয়েছিলেন। বিভিন্ন অভিযানে তারা তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহ করে মুসলিম বাহিনীকে মূল্যবান সেবা প্রদান করেছিল। এক হিসাবে তারা মুসলিম বাহিনীর বিজয়ের মূল শক্তি ছিল। যেহেতু গুপ্তচরবৃত্তি একটি ঝুঁকিপূর্ণ ও বিপজ্জনক কাজ সে কারণে মহানবী (সাঃ) স্বল্প পরিচিত দক্ষ গুপ্তচরদের নিয়োগ করতেন। এজন্য তারা যখন শত্রুর সাথে মিশে যেতেন তখন সহজে তাদেরকে কেউ সনাক্ত করতে পারত না। বুরাইদা ইবনুল হুসাইব এবং হুযাইফা ইবনুল ইয়ামানের গুপ্তচর বৃত্তি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানা যায় যে, গুপ্তচর পদে পশ্চিমাঞ্চলীয় গোত্রসমূহই বেশির ভাগ নিয়োগ লাভ করতো। সম্ভবত এর কারণ এই ছিল যে, তারা কুরাইশদের কাছে সবচেয়ে কম পরিচিত ছিল। বিশিষ্ট গুপ্তচর হিসাবে খ্যাত ছিলেন আমর ইবনে উমাইয়া যামূরী (তিনি দু'বার নিয়োগ লাভ করেন), বাস্‌বাস্‌ ইবনে আমর জুহানী, বুরাইদাহ ইবনুল হুসাইব আল আসলামী ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান আল মাযহিজী। তারা সকলেই সামরিক গোয়েন্দা কর্মে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। মোট ষোলজন গুপ্তচরের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন একেবারে গোড়ার দিকের মুসলমান এবং পাঁচজন মক্কার শেষ দিকের বা মদীনা পর্বের প্রথম দিকের মুসলমান। আর অবশিষ্ট ছয়জন হুদায়বিয়ার সন্ধির কিছুকাল পূর্বে মুসলমান হন।

অবশেষে বুখারী শরীফে বর্ণিত গুপ্তচর বৃত্তির একটি ঘটনার উল্লেখ করা হচ্ছে।

বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে। উবাইদুল্লাহ ইবনে আবু রাফি (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি আলী (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি, "নবী (সাঃ) (মক্কা বিজয়ের

www.amarboi.org

পূর্বে) একদা আমাকে এবং যুবাইর ও মিকদাদকে 'রওযায়ে খাখ' নামক স্থানে যাবার নির্দেশ দিয়ে বললেন, তোমরা সেখানে গিয়ে দেখতে পাবে, উটের পিঠে হাওদায় বসে এক নারী (মক্কার দিকে) যাচ্ছে। তার কাছে একখানা পত্র আছে। ঐ পত্রখানা তার নিকট থেকে তোমরা ছিনিয়ে নিয়ে আসবে। আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমরা রওয়ানা হলাম ; আমাদের ঘোড়া আমাদেরকে নিয়ে দ্রুত ধাবিত হলো। আমরা রওযায়ে খাখে পৌঁছে গেলাম এবং (উটের পিঠে) হাওদায় বসা এক নারীকে দেখতে পেলাম। আমরা তাকে বললাম ঃ পত্রখানা আমাদেরকে দিয়ে দাও। সে বললো, আমার কাছে কোনো পত্র নেই। আমরা বললাম ঃ পত্র বের করো, অন্যথায় আমরা তোমার কাপড় খুলে তালাশ করবো। আলী (রাঃ) বলেন ঃ তখন সে তার চুলের ঝুটির মধ্য থেকে একটি পত্র বের করে আমাদেরকে দিলো। আমরা পত্রখানা নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে আসলাম। দেখা গেলো, এটা মক্কার কিছু মুশরিক ব্যক্তির নামে লেখা হাতিব ইবনে আবু বালতাআর পত্র। ওদের বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কিছু তৎপরতার খবর দিয়ে পত্রখানা লেখা। [হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতাআ (রাঃ) বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সময় মক্কা অভিযানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন এবং মক্কাবাসীরা যাতে এ সম্পর্কে পূর্বাহ্নে জানতে না পারে সেজন্য গোপনীয়তা রক্ষা করছিলেন ঠিক তখন হযরত হাতিব (রাঃ) মুশরিকদের কাছে এ পত্রটি লিখেছিলেন। হযরত হাতিব (রাঃ) মনে করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অকস্মাৎ মক্কার ওপর চড়াও হলে মক্কাবাসী কাফেররা মদীনার মুসলিমদের মক্কাস্থ আত্মীয়-স্বজন ও পরিবারবর্গকে হত্যা করে ফেলতে পারে। হযরত হাতিব (রাঃ)-এর পরিবারবর্গ ও সহায়-সম্পদ মক্কাতেই ছিলো। মক্কাতে তার এমন কোনো আত্মীয়-স্বজন ছিলো না, যারা তার পরিবার-পরিজনকে আশ্রয় দিতে সক্ষম। তাই তিনি কাফিরদের কাছে পত্র দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মক্কা আক্রমণের কথা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে এ উপকারের কথা মনে করে তারা তার পরিবার-পরিজনের কোনো ক্ষতি না করে]। উমর (রাঃ) তখন বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! সে (হাতিব) এ পত্র লিখে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সুতরাং আমাকে অনুমতি দিন আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উমরকে বললেন ঃ সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি ? নিশ্চয়ই আল্লাহ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজকর্ম দেখে বলে দিয়েছেন ঃ তোমরা যেমন ইচ্ছা আমল করো। আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। উমরের দু' চোখ তখন অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ ও তার রাসূলই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী।"-(বুখারী)

www.amarboi.org

এ ঘটনা ঘটেছিল হিজরী অষ্টম সালের রমযান মাসে (ইং ৬৩০ সালের জানুয়ারীতে)।

যাহোক, এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করতে পারে অথবা তাদের স্বার্থে আঘাত হানতে পারে এমন যে কোনো ষড়যন্ত্রের প্রতি নবী করীম (সাঃ)-এর সজাগ দৃষ্টি ছিল এবং তিনি যথাসময়ে সে ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেয়ার জন্য প্রয়োজনবোধে গুপ্তচর নিয়োগ করতেন।

এ ঘটনাকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করে ফকীহবৃন্দ অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, 'রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা, দ্বীনের হিফাযতের উদ্দেশ্যে খোদাদ্রোহী ও রাষ্ট্রদোহীদের গোপন ষড়যন্ত্র ফাঁস করার জন্য গুপ্তচর নিয়োগ করা হালাল বা বৈধ। তবে ফিতনা-ফাসাদের উদ্দেশ্যে কিংবা মুসলিম উম্মার ঐক্যে অথবা ইসলামী সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে গুপ্তচর নিয়োগ করা হারাম বা অবৈধ।'

হাফিয ইবনুল মুনীরের মতে, রাষ্ট্রীয় শাসন শৃঙ্খলা বহাল রাখার উদ্দেশ্যে গুপ্তচরবৃত্তি বৈধ। তবে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করণ, কাউকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য তার ব্যক্তিগত দোষত্রুটি অনুসন্ধান এবং এ ধরনের যে কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে গুপ্তচরবৃত্তি হারাম এবং অবৈধ। কেননা মুসলমানদের প্রতি আল্লাহ তাআলার একটি পরিষ্কার নির্দেশ হলো ঃ

وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ط (الحجرت : ١٢)

"তোমরা একে অপরের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না।"-(সূরা আল হুজুরাত ঃ ১২)

এক্ষেত্রে আল্লামা যারকাশীর অভিমত হলো, মুশরিকদের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার জন্য অথবা তাদেরকে দুর্বল করার জন্য গুপ্তচরের কাজ করা যে বৈধ, উল্লেখিত হাদীস দ্বারা এ ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছে। আর উল্লেখিত আয়াতটি শুধুমাত্র মুসলমানদের বেলায় এবং ঐসব লোকদের বেলায় প্রযোজ্য যারা পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ। অতএব উল্লেখিত হাদীস ও কুরআনের আয়াতের মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য বা বৈপরিত্য নেই।

১৮. শ্রমের মর্যাদা

মানুষ নিজ হাতে পরিশ্রম করে নিজের জীবিকা অর্জন করবে এবং কখনো অন্যের দ্বারস্থ হবে না—এটাই ইসলামের শিক্ষা। নিজের ও নিজের পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের জন্য মানুষ যে কোনো মেহনতের কাছ করতে পারে—এতে মর্যাদাহানি বা লোকভয়ের কিছু নেই।

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, কোনো ব্যক্তির জন্য উত্তম এবং ভাল থেকেও ভাল খাদ্য হলো, তার নিজের রোজগার। হযরত দাউদ (আঃ) নিজ হাতে রোজগার করে খেতেন।

হযরত খালিদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে একদা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, মানুষের কোন্ কাজ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, মানুষ নিজের হাতে যে কাজ করে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, মজুরের কাজই শ্রেষ্ঠ কাজ, যখন সে বিশ্বস্ততার সাথে তা সম্পাদন করে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি ভিক্ষা হতে বাঁচার, নিজের পরিজনকে প্রতিপালন করার এবং দুঃস্থ প্রতিবেশীর উপকার করার জন্য অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে, শেষ বিচারের দিন সে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে এমতাবস্থায় যে, তার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চাঁদের মত ঝলমল করতে থাকবে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, হালাল রুজী অন্বেষণ করা ফরযসমূহের মধ্যে একটি। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো, কোন্ প্রকারের রোজগার উত্তম ? তিনি বললেন ঃ নিজ হাতের রোজগার কিংবা ঐ অর্থ যা ব্যবসা বা তিজারতের মাধ্যমে অর্জন করা হয়।

কোদালী চালাতে চালাতে একজন সাহাবীর হাতে কালো দাগ পড়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার হাতগুলো দেখে বললেন ঃ তোমার হাতের মধ্যে কি কিছু লিখে রেখেছ ? সাহাবী বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল, এগুলো কালো দাগ ছাড়া কিছু নয়। আমি আমার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণের জন্য পাথুরে জমিতে কোদালী চালাই কি-না, তাই এ দাগগুলো পড়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একথা শুনে সাহাবীর হাতে চুমু খেলেন।

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তাআলা এমন কোনো নবীই পাঠাননি যিনি মেষ চরাতেন না। তখন সাহাবীরা বললেন, এবং আপনিও ? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমিও কয়েক কিরাত মজুরীতে মক্কাবাসীদের মেষ চরাতাম।

জনৈক সাহাবী একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! শিকার করা আমার পেশা। তাই জামাআতের সাথে নামায পড়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, "কী সুন্দর পেশা তোমার ! আমার পূর্ববর্তী সকল নবীই শিকার করতেন। যারা মুকীম (অর্থাৎ বাড়ীতে অবস্থান

www.amarboi.org

করে) তারাই জামাআতে নামায পড়বে। রুজীর তালাশে থাকার দরুন যদি জামাআতে হাযির হতে না পার তাহলে অন্ততঃ তোমার মনের মধ্যে জামাআতে নামায আদায়কারী এবং খোদাপ্রিয় লোকদের প্রতি ভালবাসা রাখ। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য বৈধভাবে রুজী অর্জন কর। কেননা এটা হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, আমি একদিন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) অভুক্ত রয়েছেন—এ সংবাদ শুনার সাথে সাথে মজুরীর তালাশে বেরিয়ে পড়লাম। আমার উদ্দেশ্য ছিল, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর জন্য কিছু রোজগার করে নিয়ে আসা। মদীনার একটি বাগানের নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পেলাম, একজন ইয়াহূদী সেখানে কিছু মাটির ঢেলা একত্রিত করে রেখেছে এবং জানতে পারলাম, সেগুলোতে পানি ঢালার জন্য সে মজুর খুঁজছে। অতএব আমি সংগে সংগে ঐ ইয়াহূদীর সাথে প্রতি বালতি পানির মজুরী 'এক খেজুর' নির্দিষ্ট করে নিলাম এবং সেই হিসাবে ১৭ বালতি পানি বাগানে ঢেলে ১৭টি খেজুর লাভ করলাম। ঘরে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে খেজুরগুলো পেশ করা হলে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়েই সেগুলো খেলেন।

ভিক্ষা বৃত্তি ঃ একটি জঘন্য পেশা

রাসূল জীবনকে মোটামুটিভাবে অধ্যয়ন করলে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তিনি তার অনুসারীদেরকে কর্মসংস্থানের বিভিন্ন পদ্ধতি বলে দিতেন। তার কার্যধারা থেকে এটাও বুঝা যায় যে, মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করাই যেন ছিল তার নবুওয়াতের অন্যতম উদ্দেশ্য।

একজন বেকার আনসারী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে সওয়াল করলো। তিনি বললেন, তোমার কাছে কোনো জিনিস আছে কি ? সে বললো, হ্যাঁ, একটি কম্বল আছে, যার কিছু অংশ আমি পরি, আর কিছু অংশ গায়ে জড়িয়ে রাখি। আর একটি পেয়ালাও আছে, যা দিয়ে আমি পানি পান করি। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, ঐগুলো নিয়ে এসো। সে জিনিসগুলো নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সেগুলোকে নিজ হাতে উঠিয়ে নিলামে চড়ালেন। জনৈক সাহাবী এক দিরহাম দাম হাঁকলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, এর চেয়ে বেশী দাম দেবে এমন কেউ আছে কি ? অন্য একজন সাহাবী দু দিরহাম দাম হাঁকলেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার হাতে জিনিসগুলো সোপর্দ করে দুটি দিরহাম নিজ হাতে গ্রহণ করলেন। অতপর বেকার আনসারীর হাতে দিরহামগুলো তুলে দিতে দিতে বললেন, 'এক দিরহাম দিয়ে একটি কুঠার খরিদ করে নিয়ে

www.amarboi.org

এসো।' সে কুঠার নিয়ে এলে দু'জাহানের বাদশাহ্ নিজ হাতেই সেটার মধ্যে এক টুকরা কাঠ (হাতল) লাগিয়ে দিয়ে বেকার আনসারীর হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন, যাও, জঙ্গলে গিয়ে এটা দিয়ে কাঠ কাট এবং আমি যেন পনেরো দিন পর্যন্ত তোমাকে আর না দেখি। আনসারী তাই করলো। সে পনেরো দিন পর রাসূল (সাঃ)-এর খিদমতে এলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বলো, তোমার সংবাদ কি ? সে নিবেদন করলো, এ কয়েক দিনে আমার দশ দিরহাম আমদানী হয়েছিল—তার মধ্য থেকে কয়েক দিরহাম দিয়ে কাপড় কিনেছি, আর কয়েক দিরহাম দিয়ে তরি-তরকারী। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন, এটা অনেক শ্রেষ্ঠ তা থেকে যে, তুমি সওয়াল করে বেড়াও এবং কিয়ামতের দিন অপমানিত হও।-(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা)

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ইচ্ছা করলে ঐ আনসারীর কম্বল-পেয়ালা নিলামে বিক্রি না করে কোনো সাহাবীর কাছ থেকে দু দিরহাম চেয়ে নিয়ে তাকে দিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি এজন্য যে, মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখুক এবং অন্যের উপর বোঝা হয়ে না দাঁড়াক—এটাই ছিল তাঁর একান্ত ইচ্ছা।

রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) আরো বলেছেন, সেই আল্লাহ্‌র কসম, যার মুঠোয় আমার প্রাণ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ, যে জঙ্গলে যায় এবং কাঠ কেটে তা পিঠের উপর বয়ে নিয়ে এসে বিক্রি করে—ঐ ব্যক্তি হতে, যে অন্যের কাছে গিয়ে সওয়াল করে—এমতাবস্থায় যে, সে তাকে কিছু দিতেও পারে কিংবা নাও দিতে পারে।-(বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)

উমর ফারূক (রাঃ)-এর খিলাফতকালে একটি বিরাটকায় যুবক মসজিদে প্রবেশ করে বললো, এমন কে আছে, যে জিহাদ করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করবে ? উমর ফারূক (রাঃ) ঐ লোকটিকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং তার হাত ধরে উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, নিজের জমিতে কাজ করানোর জন্য এ ব্যক্তিকে কে মজুর রাখবে ? জনৈক আনসারী বললেন, আমি রাখবো।

উমর (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একে মাসে কি পরিমাণ পারিশ্রমিক দেবে ? আনসারী পারিশ্রমিকের পরিমাণ উল্লেখ করলে উমর (রাঃ) বললেন, তাহলে তুমি একে মজুর রেখে দাও। শেষ পর্যন্ত যুবকটি মজুর নিযুক্ত হয়ে আনসারীর সাথে চলে গেল।

কয়েক মাস পর উমর (রাঃ) আনসারীকে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যে লোকটিকে তোমার চাকুরীতে নিয়োগ করেছিলাম তার খবর কি ? আনসারী

www.amarboi.org

নিবেদন করলেন, হে আমীরুল মুমিনীন ! সে ঠিকই আছে। উমর (রাঃ) বললেন, তাকে তার উপার্জিত মজুরীসহ যেন আমার কাছে নিয়ে আসা হয়। বর্ণনকারী বলছেন, লোকটি এমতাবস্থায় হাযির হলো যে, তার সাথে দিরহাম ভর্তি একটি থলে ছিল। উমর ফারূক (রাঃ) যুবকটিকে সম্বোধন করে বললেন, থলেটি হাতে নাও এবং যেখানে ইচ্ছা গিয়ে জিহাদ কর অথবা ঘরে বসে থাক।-(কানযুল উম্মাল)

ফারূকে আযম (রাঃ) প্রায়ই বলতেন, "যখন আমি কোনো ব্যক্তিকে দেখি এবং সে আমার চোখে ভাল ঠেকে তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, সে কোনো কাজ করে কি-না। যদি সে বলে, 'না, আমি বেকার আছি।' তাহলে আমার চোখ থেকে তার সমস্ত মর্যাদা উবে যায় (কানযুল উম্মাল)।" তিনি প্রায়ই উপদেশ দিতেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালনের বোঝা মুসলমানদের উপর চাপিয়ে দিও না।

আমেরিকান প্রফেসর 'কারোর'-এর ভাষায় এর কারণ শুনুন। তিনি বলেছেন, যদি সমাজের শুধু এক ভাগ লোক কাজ করে তাহলে হয় এদের উপর বেশী কাজের চাপ পড়বে কিংবা মোট উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দেশে সম্পদের ঘাটতি দেখা দেবে।-(কারোর এণ্ড কারমাইকেল ঃ এলিমেন্টস অব ইকনমিক্স)

মোটকথা, মুসলমানরা জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা-চরিত্র করুক, ইসলাম তাদেরকে সে শিক্ষাই দেয়। জীবিকার অন্বেষণ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।-(মাবসুতুস সারাখ্‌সী ঃ ৩০শ' খণ্ড)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সম্পদ অর্জনের যে পন্থা বলে দিয়েছেন সে অনুযায়ী কাজ করলে কোনো মুসলমানই বেকার বে-রোজগার বসে থাকতে পারে না। এ কারণেই হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) প্রায়ই বলতেন, আমি পছন্দ করি না যে, কোনো ব্যক্তিকে দেখতে পাব সে বেকার বসে আছে—না দুনিয়ার কাজ করছে, আর না আখিরাতের।-(তাবারানী)

ভিক্ষাবৃত্তি বিশ্বের কোনো কোনো ধর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গ, আর দান-দক্ষিণা পাওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সেই ব্যক্তি, যে ধর্মের সাথে বেশী সম্পর্কযুক্ত। আমাদের দেশের ব্রাহ্মণরাই এর জ্বলন্ত উদাহরণ।-(বিস্তারিত বিবরণের জন্য মনুস্মৃতির প্রথম অধ্যায় ঃ শ্লোক নং ৮৮ এবং গীতা দ্রষ্টব্য)

বৈরাগ্যবাদই হচ্ছে যে সমস্ত ধর্মের শিক্ষা, সেই সমস্ত ধর্মই মানব সমাজে ভিক্ষাবৃত্তি প্রচলনের ক্ষেত্রে প্রধানত দায়ী।

www.amarboi.org

ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় বৈরাগ্যবাদকে যেমন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তেমনি ভিক্ষাবৃত্তিকেও একটি জঘন্য পেশা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ভিক্ষা দ্বারা অর্জিত সম্পদকে 'জাহান্নামের উত্তপ্ত পাথর' আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তারা (ভিক্ষুকরা) জাহান্নামের 'অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত' পাথর চিবাবে।-(তিরমিযী)

তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ভিক্ষা করে সে যখন আল্লাহর সামনে যাবে তখন তার চেহারায় গোশতের একটি টুকরাও থাকবে না।

-(বুখারী)

হাকীম ইবনে হাযাম (রাঃ) বলেন, আমি একবার রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে কিছু সওয়াল করলাম। তিনি দিলেন। আমি আবার সওয়াল করলাম। তিনি আবার দিলেন। অতপর বললেন, হে হাকীম! এ মাল হচ্ছে একটা উপাদেয় সব্জী। যে ব্যক্তি এটাকে লোভ-লিপ্সা ছাড়া গ্রহণ করে সে এর মধ্যে বরকত পায়। আর যে লোভের বশবর্তী হয়ে এটাকে গ্রহণ করে সে এর মধ্যে বরকত পায় না এবং সে হয় ঐ ব্যক্তির মত যে খায় কিন্তু তৃপ্ত হয় না। আর উপরের (দাতার) হাত নীচের (গ্রহীতার) হাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হাকীম ইবনে হাযাম বলেন, আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! সেই আল্লাহর কসম, যে আপনাকে ন্যায়-সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি আপনার পর কোনো লোকের কাছ থেকেই কিছু গ্রহণ করবো না, এমনকি এ অবস্থায়ই দুনিয়া থেকে বিদায় নেব।

যখন হযরত আবু বকর (রাঃ) খলীফা হন তখন তিনি হাকীমকে কিছু অযীফা (ভাতা) দেয়ার জন্য বারবার ডেকে পাঠান। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন।

অতপর হযরত উমর (রাঃ) তাকে কিছু অযীফা দেয়ার জন্য ডেকে পাঠান। কিন্তু তিনি তা-ও গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তখন হযরত উমর (রাঃ) বলেছিলেন, "হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদের সাক্ষী রেখে বলছি, হাকীমের সামনে আমি তার প্রাপ্য পেশ করেছি, কিন্তু সে তার প্রাপ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করছে।' যাহোক, হাকীম রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পর কারো কাছ থেকেই কিছু গ্রহণ করেননি এবং সেই অবস্থায়ই তার মৃত্যু হয়েছে।-(বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি)

শুধু ভিক্ষাই নয়, সাহাবা কিরাম (রাঃ) যে কোনো ব্যাপারে, অন্যের কাছে কিছু চাওয়াকে নিজেদের জন্য মর্যাদাহানিকর মনে করতেন। হযরত আবু বকর

www.amarboi.org

(রাঃ)-এর ছড়ি কোনো সময় মাটিতে পড়ে গেলে তিনি নিজেই উটের উপর থেকে নেমে তা উঠিয়ে নিতেন (অন্য কাউকে তা উঠিয়ে দিতে বলতেন না)।-(মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, তারীখুল খুলাফা)

ইংল্যাণ্ডে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধের জন্য যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা হয়েছিল তার মোটামুটি উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে হয় না। "অষ্টম হেনরী ভিক্ষুকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। তার সময় মোটা-সোটা ও শক্ত-সামর্থ ভিক্ষুকদেরকে উলঙ্গ করে গাড়ীর সাথে বেঁধে দেয়া হতো। অতপর সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করিয়ে এমনভাবে বেত্রাঘাত করা হতো যে, তাদের সমস্ত দেহ রক্তাক্ত হয়ে যেত।"-(ইকনমিক হিষ্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড)

এক যুগে তো ভিক্ষাবৃত্তি প্রতিরোধের জন্য হেনরীর চেয়েও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হতো। ১৫৪৭ খ্রীস্টাব্দে প্রণীত আইনের মাধ্যমে ভিক্ষুকদের দেহে দাগ দেয়া হতো। আর আবশ্যকবোধে শিকল দিয়ে বেঁধে তাদের দ্বারা বিভিন্ন কাজ করানো হতো।-(ইকনমিক হিষ্ট্রি অব ইংল্যাণ্ড)

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সুশিক্ষার ফলে কোনো জুলুম-অত্যাচার ছাড়াই আরবে ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি (সাঃ) প্রায়ই বলতেন, 'সদকা (দান) মানুষের অন্তরকে মেরে ফেলে।' অভিজ্ঞতা দ্বারাও দেখা যায় যে, সদকা-খোররা সাধারণত আত্মসম্মান, দয়া-মায়া প্রভৃতি গুণ থেকে বঞ্চিত থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এও বলতেন, 'অন্যের কাছে সওয়াল করার চেয়ে নিজের পিঠের উপর বোঝা বহন করে উপার্জন করাই শ্রেয়।'-(বুখারী)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ইসলামী সমাজে পেশাদার ভিক্ষুকের কোনো স্থানই নেই। হ্যাঁ, ঘটনাচক্রে কোনো ব্যক্তি যদি একান্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে কারো কাছে কিছু সওয়াল করতে বাধ্য হয়, তবে শুধু তার সম্পর্কেই সুপারিশ করা হয়েছে ঃ

وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ـ(الضحى : ١٠)

"আর প্রার্থীকে (সওয়ালকারীকে) তুমি ধমকাবে না।"-(সূরা দোহা ঃ ১০)

সমাজে এমন লোক আছে, যাদেরকে বাহ্যতঃ সুখী-সচ্ছল বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে তারা সচ্ছল নয় ; আত্মসম্মানবোধের দরুনই তারা অন্যের কাছে কিছু চায় না ; ইসলাম এ জাতীয় লোকদের সাহায্য করার জন্য বিত্তশালীদেরকে এই বলে নির্দেশ দিচ্ছে ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز

www.amarboi.org

يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيمٰهُمْ ج لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○(البقرة : ٢٧٣)

"(এ দান-খয়রাত) সেই সকল নিঃস্ব লোকেরই প্রাপ্য, যারা আবদ্ধ হয়ে আছে আল্লাহর রাহে, তারা (রুজী-রোজগারের জন্য) দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে পারে না, (ভিক্ষা হতে) নিবৃত্ত থাকার ফলে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অবস্থাপন্ন বলে মনে করে, তাদের লক্ষণ দেখে তুমি তাদেরকে চিনতে পারবে, তারা মানুষের কাছে 'জড়িয়ে ধরে' সওয়াল করে না এবং (হে মুসলমানগণ!) যে কোনো অর্থ তোমরা ব্যয় করো না কেন, আল্লাহ হচ্ছেন সে সম্পর্কে সম্যক বিদিত।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৩)

বিভিন্ন হাদীসেও একথা বলা হয়েছে যে, সওয়ালকারীর বাহ্যিক সচ্ছলতা দেখে এ ভুল ধারণা করা উচিত নয় যে, অভাব না থাকা সত্ত্বেও সে সওয়াল করতে বের হয়েছে। কেননা এটা অসম্ভব নয় যে, সে হয়ত এমন কোনো বিপদে পড়েছে, যার দরুন সমস্ত আত্মসম্মান এবং লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে বাহ্যিক সচ্ছলতা নিয়েই সে অন্যের কাছে হাত পাততে বাধ্য হয়েছে। এমতাবস্থায় সকলের উচিত তাকে সাহায্য করা।

১৯. জীবিকা অর্জনের পন্থা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে তার অনুসারীদের পথ প্রদর্শন করে। আধ্যাত্মিক ও সামাজিক সমস্যাদির ন্যায় সে অর্থনৈতিক সমস্যাদির সমাধানও বাতলে দেয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সে তার অনুসারীদেরকে একথার অনুমতি দেয় না যে, তারা যা ইচ্ছা তা খাবে এবং যেভাবে ইচ্ছা জীবিকা অর্জন করবে। বরং সে তাদের জন্য জাতীয়, গোষ্ঠীগত ও ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে জীবিকা অর্জনের বৈধ ও অবৈধ পন্থা নির্দেশ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে জীবিকা অর্জনের ঐ সমস্ত পন্থা, যেগুলোর মাধ্যমে অন্যকে কষ্ট দিয়ে বা ক্ষতিগ্রস্ত করে ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করা হয় তা নাজায়িয ও অবৈধ। আর ঐ সমস্ত পন্থা জায়িয ও বৈধ, যেগুলোর মাধ্যমে ন্যায়ের ভিত্তিতে ও পরস্পর সম্মতিক্রমে মুনাফা অর্জন করা হয়। পবিত্র কুরআন বলে ঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ قف ـ(النساء : ٢٩)

www.amarboi.org

"হে মুমিনগণ, তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না ; কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসায় করা বৈধ।"–(সূরা নিসা ঃ ২৯)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'ঐ দেহ—যা হারাম মাল দ্বারা প্রতিপালিত হয়েছে তা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।' প্রকৃতপক্ষে হারাম রিয্‌ক বা জীবিকার মধ্যে কোনো বরকত ও কল্যাণ নেই। যারা হারাম রিয্‌ক খায় তারা এ দুনিয়ায় যেমন মানসিক তৃপ্তি ও প্রশান্তি থেকে বঞ্চিত থাকে তেমনি আখিরাতেও তাদের ঠিকানা হয় জাহান্নামে। হারামখোরী প্রকৃতপক্ষে এমন একটি অভিশাপ, যার কারণে সমাজে পরস্পর শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ দেখা দেয় এবং শান্তি ও কল্যাণের যাবতীয় পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এ হারামখোরীর কারণেই এক ভাই অন্য ভাইয়ের শত্রুতে পরিণত হয়। কেননা হারামখোরের মস্তিষ্কে একটি মাত্র চিন্তাই ঘুরপাক খায়—আর তাহলো, কিভাবে সে আপন ভাই-বন্ধু ও পাড়া-প্রতিবেশীদের পেট কেটে নিজের পেটকে দিনের পর দিন স্ফীত থেকে স্ফীততর করে তুলবে।

মানুষকে এ অভিশাপ থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলাম হালাল রিযক অর্জনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা আপন বান্দাদের উপর যে সমস্ত ফরয নির্ধারণ করেছেন, পাক ও হালাল পদ্ধতিতে জীবিকা অর্জন তার মধ্যে একটি।

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে হালাল রিয্‌ক সংগ্রহের জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করার নির্দেশ দেয়। সে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ আত্মসাৎ করতে নিষেধ করে। হালাল পদ্ধতিতে জীবিকা অর্জনের কোনো কাজ বা কোনো পেশাই ইসলামের দৃষ্টিতে হেয় নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে হেয় বা দোষণীয় কাজ হচ্ছে হারাম পদ্ধতিতে জীবিকা অর্জন। নিজে পরিশ্রম করে যে সম্পদ অর্জন করা হয় ইসলামের দৃষ্টিতে তাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম রিয্‌ক বা জীবিকা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, কোনো ব্যক্তির কাছে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতম খাদ্য আর কিছুই হতে পারে না, যে খাদ্য সে নিজের পরিশ্রম দ্বারা অর্জন করে।

ইসলাম হালাল রিয্‌ক অর্জনের উপর যেমন অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে তেমনি এ উদ্দেশ্যে যে কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো বৈধ পেশা গ্রহণের অবাধ স্বাধীনতাও দিয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, হযরত দাঊদ (আঃ) বর্ম তৈরী করে, হযরত আদম (আঃ) কৃষিকাজ করে, হযরত ইদরীস (আঃ) দর্জির কাজ করে এবং হযরত মূসা (আঃ) বকরী চরিয়ে নিজেদের জীবিকা অর্জন করতেন।

www.amarboi.org

একটি রেওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহর প্রত্যেক নবীই বকরী চরিয়েছেন।' সাহাবীরা তখন জিজ্ঞেস করলেন, 'এবং আপনিও?' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আমিও কয়েক কীরাত মজুরীতে মক্কাবাসীদের বকরী চরাতাম।

মোটকথা, অবৈধ পন্থায় জীবিকা অর্জনের চেয়ে যে কোনো বৈধ পন্থায়—চাই তা সাধারণের দৃষ্টিতে যতই নিম্নমানের হোক—নিজের জীবিকা অর্জন করা শ্রেয়। এটাই ইসলামের নির্দেশিত পন্থা এবং এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের যাবতীয় শান্তি ও মঙ্গল।

২০. তাসাওউফ

তাসাওউফ একটি ইসলামী পরিভাষা। তাবিয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের যুগ থেকে এর প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এ শব্দটি 'সাফা' (মতান্তরে 'সাফভুন', 'সাওফুন' ও 'সুফফা') ধাতু থেকে নির্গত হয়েছে। যে ইল্‌ম বা জ্ঞানের সাহায্যে মানুষের আত্মা ও বিবেককে সাফ বা পরিষ্কার রাখা যায় প্রচলিত অর্থে সেটাকেই ইলমে তাসাওউফ বলা হয়। আর যিনি এ ইল্‌মের চর্চা করেন তাঁকে বলা হয় সুফী।

মূলত ইল্‌মে ফিক্‌হ, ইলমে কালাম ইত্যাদির ন্যায় ইল্‌মে তাসাওউফেরও মূল উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও হাদীস। এ প্রসংগে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত একটি প্রসিদ্ধ হাদীসের উল্লেখ করা যেতে পারে। হাদীসটি হলো ঃ

হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে ছিলাম। এমন সময় সাদা ধবধবে কাপড় ও মিশমিশে কালো চুল-বিশিষ্ট জনৈক ব্যক্তি আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর মধ্যে (আগন্তুক-সুলভ) ভ্রমণের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছিলো না, অথচ আমাদের মধ্যে কেউ তাকে চিনতেও পারছিল না (স্থানীয় হলে আমরা তাকে নিশ্চয়ই চিনতাম)। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এসে বসলেন। অতপর হুযূর (সাঃ)-এর দুই জানুর সাথে নিজের দুই জানু মিশিয়ে এবং নিজের দুই হাত তাঁর দুই উরুর উপর রেখে বললেন, 'হে মুহাম্মদ! আমাকে বলুন, ইসলাম কি?' হুযুর (সাঃ) উত্তর দিলেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (সর্বময় কর্তা) নেই এবং মুহাম্মদ তাঁর রসূল—এ ঘোষণা করবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহর হজ্জ করবে, যদি তুমি সেখানে পৌঁছতে সমর্থ হও—এটাই হলো ইসলাম। তিনি (আগন্তুক) বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন।'

www.amarboi.org

তাঁর এ আচরণে আমরা বিস্মিত হলাম। কেননা (অজ্ঞ লোকের ন্যায়) তিনি প্রশ্নও করছেন, আবার (বিজ্ঞের ন্যায়) উত্তরদাতাকে সমর্থনও করছেন। অতপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বলুন, ঈমান কাকে বলে ? হুযুর (সাঃ) উত্তর দিলেন, 'আল্লাহতে বিশ্বাস করবে এবং তাঁর ফিরিশতাগণে, তাঁর কিতাবসমূহে, তাঁর নবী-রাসূলগণে ও পরকালে বিশ্বাস করবে এবং তাকদীরে —তার ভাল-মন্দে বিশ্বাস করবে।

আগন্তুক বললেন, 'হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। এখন আমাকে বলুন, ইহসান কাকে বলে ? হুযূর (সাঃ) উত্তর দিলেন, 'আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যে, তুমি তাকে দেখছ। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না-ও পাও, তাহলে মনে করবে তিনি তোমাকে দেখছেন।'

অতপর আগন্তুক জিজ্ঞেস করলেন, 'আমাকে বলুন, কিয়ামত কবে হবে ? হুযুর (সাঃ) উত্তর দিলেন, 'এ বিষয় জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসকারীর চেয়ে অধিক জানে না।'

আগন্তুক বললেন, 'তবে তার নিদর্শনসমূহ আমায় বলে দিন।' হুযুর (সাঃ) বললেন, 'তার নিদর্শন হচ্ছে, বাঁদী আপন মনিব প্রসব করবে এবং তুমি (এককালের) নাঙ্গা পা, নাঙ্গা দেহ, দরিদ্র মেষ রাখালদের (পরবর্তীকালে) দালান-কোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে।'

হযরত উমর (রাঃ) বলেন, অতপর ঐ ব্যক্তিটি চলে গেলেন। তারপর আমি দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করলাম। অতপর হুযুর (সাঃ) আমাকে বললেন, 'উমর, তুমি কি এ ব্যক্তটিকে চিনলে ?' আমি বললাম, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন।' হুযূর (সাঃ) বললেন, 'তিনি হচ্ছেন হযরত জিবরাঈল (আঃ)। তোমাদেরকে দ্বীন শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি তোমাদের কাছে এসেছিলেন।'-(সহীহ মুসলিম)

হযরত উমর এটা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনের সাথে এ ঘটনা হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-ও বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, 'যখন নাঙ্গা পা, নাঙ্গা দেহ ও মূক-বধিরদেরকে (অর্থাৎ অযোগ্য লোকদেরকে) দেশের রাজা বা শাসক হতে দেখবে। আর কিয়ামত সেই পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্গত, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।' অতপর হুযুর (সাঃ) প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন।

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِ ج وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ج ....(لقمان : ٣٤)

"আল্লাহ কিয়ামত সম্পর্কে সম্যক অবগত। (সেটা কবে হবে, কিরূপ হবে) এবং তিনিই বারি বর্ষণ করে থাকেন----।"-(সূরা লুকমান ঃ ৩৪)

www.amarboi.org

'হাদীসে জিবরাঈল' খ্যাত উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল হক দেহলভী বলেছেন, জেনে রাখুন, দ্বীন এবং এর পরিপূর্ণতা ফিক্‌হ, কালাম ও তাসাওউফের উপর নির্ভরশীল যেমন এ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এখানে 'ইসলাম' দ্বারা ফিক্‌হের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা শরীআতের যাবতীয় আহকাম ও আখলাককে অন্তর্ভুক্ত রাখে। আর 'ঈমান' দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে 'ইতিকাদাত'-এর দিকে, যা হচ্ছে ইল্‌মে কালামের বিষয়বস্তু। আর ইহ্‌সান দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে তাসাওউফের দিকে, যার অর্থ সত্যিকারভাবে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করা। তরীকাতের বুযুর্গগণ তাসাওউফের যেসব অর্থ ও তাৎপর্যের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, ইহ্‌সান তার সবই অন্তর্ভুক্ত রাখে। ফিক্‌হ, তাসাওউফ ও কালাম একে অপরের পরিপূরক। একটি ছাড়া অপরটির মধ্যে পরিপূর্ণতা আসতে পারে না। ফিক্‌হ ছাড়া তাসাওউফের নাগাল পাওয়া যায় না। কেননা, আল্লাহর নির্দেশ ফিক্‌হ ছাড়া জানা যায় না। আর তাসাওউফ ছাড়া ফিক্‌হ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কেননা, 'সিদকে তাওয়াজ্জুহ' তথা গভীর অভিনিবেশ ও একনিষ্ঠতা ছাড়া আমল পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আর ফিক্‌হ ও তাসাওউফের কোনোটিই ঈমান ছাড়া সহীহ্ বা বিশুদ্ধ হয় না—যেমন দেহ ও আত্মা একটি অপরটি ছাড়া পরিপূর্ণতা পায় না, এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত বজায় রাখতে পারে না। এ কারণেই ইমাম মালিক (রহঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি তাসাওউফ অবলম্বন করে এবং ফিকহ বর্জন করে সে যিনদীক (বেদ্বীন)। আর যে ফিক্‌হ অবলম্বন করে এবং তাসাওউফ বর্জন করে সে ফাসিক। আর যে উভয়টি অবলম্বন করে সেই হাকীক (সঠিক পথের অনুসারী)।

মোটকথা, পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 'তাসাওউফ' শব্দ হুবহু না থাকলেও তাতে বহুলভাবে ব্যবহৃত ইহ্‌সান, তাযকিয়া প্রভৃতি শব্দ তাসাওউফেরই সমার্থক।

পবিত্র কুরআনে যে 'অলী' বা 'আউলিয়া' শব্দের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়—কারো কারো মতে তা সূফী শব্দের সমার্থক।

তবে প্রকৃত ব্যাপার এই যে, 'অলী' শব্দ পবিত্র কুরআনে সাধারণভাবে অভিভাবক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ۗ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ (البقرة : ٢٥٧)

www.amarboi.org

'যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ্ তাদের 'অলী' (অভিভাবক), তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকে নিয়ে যান। আর যারা কুফরী করে 'তাগূত' (শয়তান, কল্পিত দেবদেবী অথবা বিভ্রান্তিকর যে কোনো উপায়-উপকরণ) তাদের অভিভাবক। এরা তাদেরকে আলোক হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারাই অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"

–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৭)

قُلْ اَغَيْرَ اللّٰهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ ط

قُلْ اِنِّيْٓ اُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَسْلَمَ وَلَا تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ○

"বলো, আমি কি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে 'অলী' (অভিভাবক) রূপে গ্রহণ করবো ? তিনিই জীবিকা দান করেন, কিন্তু তাকে কেউ জীবিকা দান করে না।' এবং বলো, 'আমি আদিষ্ট হয়েছি যেন আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি হই, আমাকে আরো আদেশ করা হয়েছে, তুমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

–(সূরা আল আনআম ঃ ১৪)

وَمَنْ يَّتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وَلِيًّا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِيْنًا ○

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطٰنُ اِلَّا غُرُوْرًا ○ (النساء : ١١٩-١٢٠)

"আল্লাহর পরিবর্তে কেউ শয়তানকে 'অলী' (অভিভাবক) রূপে গ্রহণ করলে সে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ; সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে এবং শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র।"–(সূরা আন নিসা ঃ ১১৯-১২০)

مَثَلُ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوْتِ ج اِتَّخَذَتْ بَيْتًا ط

وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوْتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوْتِ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

"যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে 'অলী' (অভিভাবক) রূপে গ্রহণ করে তাদের দৃষ্টান্ত মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায়, আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো দুর্বলতম, যদি ওরা জানত।"

–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৪১)

وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ ج وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ

www.amarboi.org

"তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো 'অলী' (অভিভাবক) নেই, সাহায্যকারীও নেই।"–(সূরা আশ শুরা ঃ ৩১)

পবিত্র কুরআনে 'অলী' শব্দ 'বন্ধু' অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○ نَحْنُ اَوْلِيٰؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ○ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ○ (حم السجدة : ٣٠-٣٢)

"যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক 'আল্লাহ' অতপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। আমরাই তোমাদের 'অলী' (বন্ধু) দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে, সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন।"
–(সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ঃ ৩০-৩১)

قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ (الجمعة : ٦)

"বলো, হে ইয়াহূদীগণ, যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর 'অলী' (বন্ধু), অন্য কোনো মানবগোষ্ঠী নয়, তবে তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"–(সূরা জুমুআ ঃ ৬)

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ط لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ (يونس : ٦٢-٦٤)

"জেনে রেখ, আল্লাহর 'অলীগণের' (বন্ধুদের) কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা বিশ্বাস করে এবং 'তাক্ওয়া' (পরহেযগারী)

www.amarboi.org

অবলম্বন করে তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে, আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই, এটাই মহাসাফল্য।"
–(সূরা ইউনুস ঃ ৬২-৬৪)

পবিত্র কুরআনে 'অলী' শব্দ অন্তরঙ্গ (সুহৃদ) এবং উত্তরাধিকারী অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ঃ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِ ؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

"হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতাগণ ও ভ্রাতাগণ যদি ঈমান অপেক্ষা কুফরীকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে ওদেরকে 'অলী' (অন্তরঙ্গ) রূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা ওদেরকে অন্তরঙ্গ রূপে গ্রহণ করে তারাই জালিম।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ২৩)

وَاِنِّىْ خِفْتُ الْمَوَالِىَ مِنْ وَّرَآءِىْ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا فَهَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ يَّرِثُنِىْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝

"(যাকারিয়া বললো,) হে আমার প্রতিপালক! আমি আশংকা করি আমার পর আমার গোত্রীয়দের সম্পর্কে, আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ; সুতরাং তুমি তোমার নিকট হতে আমাকে দান কর একজন 'অলী' (উত্তরাধিকারী), যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করবে ইয়াকূবের বংশের এবং হে প্রতিপালক! তাকে করো সন্তোষভাজন।"–(সূরা মারইয়াম ঃ ৫-৬)

আল্লাহর কাছে একজন 'অলী' (বন্ধু অর্থে) নিসন্দেহে অত্যন্ত মর্যাদাবান ব্যক্তি। উপরে উল্লেখিত একটি আয়াতে (সূরা ইউনুস ঃ ৬৩) 'অলী'-এর যে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হয়েছে তাহলো, যিনি আল্লাহকে বিশ্বাস করেন এবং তাক্ওয়া অবলম্বন করেন। আর প্রচলিত অর্থে সুফী হচ্ছেন তিনিই, যিনি 'সিদ্কে তাওয়াজ্জুহ' তথা গভীর অভিনিবেশ সহকারে আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীতে মশগুল থাকেন। অতএব শব্দগতভাবে 'অলী' এবং 'সুফী'-এর অর্থ এক না হলেও তাদের উভয়ের জীবনের লক্ষ্য মূলত এক। অতএব সুফীও আল্লাহর পুরস্কার লাভে ধন্য হবেন।

যেহেতু কারো কারো মতে, 'তাসাওউফ' শব্দটি 'আসহাবে সুফ্ফা'-এর 'সুফ্ফা' ধাতু থেকে নির্গত, তাই এখানে 'আসহাবে সুফফা' সম্পর্কে কিঞ্চিৎ

www.amarboi.org

আলোচনা করা হচ্ছে। সুফ্ফা অর্থ 'চবুতরা' (ছায়াঘেরা চত্বর, ছাপরা)। আসহাবে সুফ্ফা অর্থ চবুতরার বাসিন্দা। এরা হলেন ঐসব অভাবগ্রস্ত মুহাজির সাহাবী যারা মসজিদে নবভী সংলগ্ন একটি ছায়াঘেরা চত্বরে অবস্থান করতেন। 'কামুসে' আছে, আহলে সুফ্ফার সদস্যরা ছিলেন ইসলামের ঐসব মেহমান, যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মসজিদ সংলগ্ন সুফ্ফায় রাত্রি যাপন করতেন। সুয়ূতী বুখারীর যে টীকা লিখেছেন তাতে আছে, 'আবু নায়ীমের মতে, সুফ্ফার অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল একশয়ের অধিক, আর সুফ্ফা হচ্ছে মসজিদের শেষ প্রান্তের একটি ছাপরা ঘর, যা ঐ সমস্ত অভাবগ্রস্তদের বসবাসের জন্য তৈরী করা হয়েছিল, যাদের কোনো আশ্রয়স্থল ছিল না। তাঁরা ছিলেন 'মুকাতিল ফী সাবীলিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে জিহাদকারী। ইবনে হাজার-এর মতে, সুফ্ফা হচ্ছে মসজিদের শেষ প্রান্তের একটি ঘর, যা তৈরী করা হয়েছিল রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ঐ সমস্ত দরিদ্র সাহাবীদের জন্য যাদের কোনো পরিবার-পরিজন ছিল না। তাদের সংখ্যা কখনো বেড়ে যেত—এমনকি দুশয়ে গিয়ে পৌঁছতো। আবার কখনো কমে যেত। কেননা তাদেরকে কখনো জিহাদের জন্য, আবার কখনো কুরআন শিক্ষাদানের জন্য মদীনার বাইরে পাঠানো হতো।"–(মিরকাতঃ দ্বিতীয় খণ্ড)

মিরকাতের অন্যত্র বলা হয়েছে, 'আসহাবে সুফ্ফার সংখ্যা ছিল চারশ'। তাঁরা কুরআন শিক্ষাদানের জন্য এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য সদা-প্রস্তুত থাকতেন। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) ছিলেন তাঁদের নাযির বা রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাঁরা মসজিদে নবভীর শেষ প্রান্তের একটি সুফ্ফায় অবস্থান করতেন। তাঁদের সম্পর্কেই কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়েছিল ঃ

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِيْنَ اُحْصِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ ضَرْبًا فِى الْاَرْضِ ز يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ج تَعْرِفُهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ج لَايَسْئَلُوْنَ النَّاسَ اِلْحَافًا ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ○ (البقرة : ٢٧٣)

"সাদাকাহ ঐ সমস্ত লোকের প্রাপ্য, যারা অভাবগ্রস্ত, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত থাকে যে, দেশময় ঘোরাফেরা করতে পারে না, যাচ্না না করার জন্য অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত বলে মনে করে ; তুমি তাঁদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তাঁরা মানুষের কাছে নাছোড় হয়ে যাচ্না করে না। যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৩)

www.amarboi.org

সুফ্ফার অধিবাসীরা ছিলেন মুতাওয়াক্কিল তথা একমাত্র আল্লাহর উপর নির্ভরশীল।

আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি আসহাবে সুফ্ফার সত্তরজন লোককে এমনও দেখেছি, যাদের কারো গায়েই চাঁদর ছিল না। তাদের পরনে হয় ইযার ছিল, নয়ত শুধুমাত্র একটি কম্বল। তারা ঐ কম্বলটিকে নিজেদের ঘাড়ের উপরে লেপটে নিতেন। কোনো কোনো কম্বল এবং ইযার নিম্নদেশ পর্যন্ত, আবার কোনো কোনোটি পায়ের টাখনু পর্যন্ত পৌঁছে যেত। না জানি নিজেদের লজ্জাস্থান অন্যদের দৃষ্টিগোচর হয়ে পড়ে—এ ভয়ে তাঁরা সবসময় নিজেদের কম্বল বা ইযার হাত দিয়ে ধরে রাখতেন।–(বুখারী)

উপরে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে তাফসীরে 'রুহুল বয়ান'-এ উল্লেখ করা হয়েছে ঃ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আসহাবে সুফ্ফাদের কাছে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁদের অভাব, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য তাঁদের কঠোর সাধনা এবং তাঁদের অন্তরের উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করলেন। অতপর বললেন ঃ হে সুফ্ফার অধিবাসীরা, তোমরা এ মর্মে সুসংবাদ গ্রহণ কর যে, আমার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় মিলিত হবে, যে অবস্থায় তোমরা আছ এবং সে খুশি থাকবে এ বস্তু নিয়ে, যা এ পথে রয়েছে তাহলে নিসন্দেহে সে আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে হবে।

২১. জীবন-মৃত্যু-পরকাল

জীবন

কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষের জীবন অনর্থক বা লক্ষ্যহীন নয়, বরং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা পৃথিবীতে এসেছে।

মানুষ জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রয়োগে এবং সৃষ্টিকে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। কুরআন বলে ঃ

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ

لِّيَبْلُوَكُمْ فِىْ مَا اٰتٰكُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ز وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

"তিনিই তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদের দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক শাস্তি প্রদানে তৎপর এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।"–(সূরা আল আনআম ঃ ১৬৫)

www.amarboi.org

أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ط ءَ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ○ (النمل : ٦٢)

"বরং তিনি, যিনি আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ্ (উপাস্য) আছে কি ? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করো।"–(সূরা আন নামল ঃ ৬২)

উপরোক্ত কারণেই মানুষ সৃষ্টির সেরা। আর সৃষ্টির সেরা বলেই আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য পৃথিবীতে জীবন-যাপনের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন। কুরআনের ভাষায় পৃথিবীর সবকিছুই একমাত্র মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে যেতে পারে সেজন্যই এ বিরাট সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা। কুরআন বলে ঃ

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ○ (البقرة : ٢٩)

"তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, অতপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং সেটাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন ; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"–(সূরা আল বাকারা ঃ ২৯)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ (الجاثية : ١٣)

"তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সবকিছু নিজ অনুগ্রহে। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য তো এতে রয়েছে নিদর্শন।"

আর আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করতে হলে সর্বাগ্রে তার উপর বিশ্বাসস্থাপন করতে হবে, তাকে নিজের চালক ও পালক বলে স্বীকার করতে হবে। আল্লাহর প্রতি এই যে আনুগত্য, এই যে আত্মসমর্পণ এটাই মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর প্রকৃতপক্ষে এ গুণটি আল্লাহ্ তাআলা মানুষের প্রকৃতির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। ফলে দেখা যায়, আল্লাহকে চরম অস্বীকারকারীও কোনো না কোনো সময়ে আল্লাহতে বিশ্বাস করে বসে। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে আল্লাহ তাআলা যে এ গুণ নিহিত রেখেছেন, অতি অভিনব ধারায় অতি সুন্দরভাবে কুরআনে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ

www.amarboi.org

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِیْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ ۚ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى ۚ شَهِدْنَا ۚ اَنْ تَقُوْلُوْا یَوْمَ الْقِیٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِیْنَۙ۝ اَوْ تَقُوْلُوْۤا اِنَّمَاۤ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّیَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْ ۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ۝ وَكَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ وَلَعَلَّهُمْ یَرْجِعُوْنَ۝

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরদের বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই ? তারা বলে, 'নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী রইলাম।' এ স্বীকৃতি গ্রহণ এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমরা তো এ বিষয়ে গাফিল ছিলাম, কিংবা তোমরা যেন না বল, 'আমাদের পূর্বপুরুষরাই তো আমাদের পূর্বে শিরক করে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর ; তবে কি পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে ? এভাবে আমি নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।"

–(সূরা আল আরাফ ঃ ১৭২-১৭৪)

আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং তার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই মানব-জীবনের সার্থকতা নিহিত। প্রকৃতপক্ষে মানব-জীবন ক্ষণস্থায়ী। যারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক আল্লাহর সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা না করে এবং তার আদেশ-নির্দেশ না মেনে হেলায়-খেলায় জীবনটি কাটিয়ে দেয় তাদের মত হতভাগা আর নেই।

কুরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবী মানুষের জন্য একটি পরীক্ষাস্থল। কে উত্তম কাজ করে আর কে মন্দ কাজ করে তা দেখার জন্যই আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কুরআন বলে ঃ

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ لِیَبْلُوَكُمْ اَیُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ؕ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْغَفُوْرُ۝ (الملك : ٢)

"তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম ? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল।"

–(সূরা আল মুলক ঃ ২)

www.amarboi.org

আল্লাহ্ তাআলা যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে মানুষের এ জীবনকে সুন্দর ও কর্মক্ষম করে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু আসলে এ জীবন বড়ই ক্ষণস্থায়ী। কুরআন উপমার সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে মানুষের সামনে পার্থিব জীবনের ছবি তুলে ধরেছে। যেমন ঃ

إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ ط حَتّٰى إِذَآ أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَآ لا أَتٰهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَأَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ (يونس : ٢٤)

"পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত—যেমন আমি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয়, যা থেকে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করে থাকে। অতপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীরা মনে করে এটা তাদের আয়ত্বাধীন, তখন দিনের বেলা অথবা রাত্রে আমার নির্দেশ এসে পড়ে এবং আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন ইতিপূর্বে তার অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি নিদর্শনাদি বিশদভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"

–(সূরা ইউনুস ঃ ২৪)

দুনিয়ায় মানুষের মত প্রবল পরাক্রমশালী প্রাণী আর দ্বিতীয়টি নেই। আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে সুন্দর আকৃতি, সুঠাম দেহ ও উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এতই প্রখর ও সুসংগঠিত যে, তারা নিজেদের চাইতে শত গুণ বেশী শক্তিশালী প্রাণীকেও বশে আনতে পারে। তারা মাছের মত সাঁতার কাটতে পারে, পাখীর মত উড়তে পারে। কিন্তু হায় ! তাদের এ ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং জীবনীশক্তির কোনো স্থায়িত্ব নেই। যে কোনো মুহূর্তে তা লোপ পেতে পারে। নিজেদের জীবনকে টিকিয়ে রাখার মত কোনো কৌশলই তাদের জানা নেই। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, পরম পরাক্রমশালী মানুষও আসলে দুর্বল। একদিকে তাদের সবই আছে, অন্যদিকে আবার কিছুই নেই। কিন্তু কুরআনের মতে, এ শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য মানুষের নৈরাশ্যবাদী হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব আল্লাহ্ তাআলার সাথে তাদের এক মধুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যান। অতপর তাদের জীবনে নৈরাশ্য, দুশ্চিন্তা, হীনতা এবং

www.amarboi.org

দীনতা বলে কিছুই থাকে না। তারা যৌবনকালে ও সবল সুস্থ অবস্থায় যেমন সুখী থাকে তেমনি সুখী থাকে বৃদ্ধকালে এবং দুর্বল ও অসুস্থ অবস্থায়ও। কিন্তু যারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না, যারা সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে না, বরং মোহময় ও বিভ্রান্তিকর পার্থিব উপায়-উপকরণের উপর ভরসা করে বসে থাকে তারা এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন কাটায়। যতদিন শক্তি ও ঐশ্বর্য থাকে ততদিন তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে, আর যখন শক্তি ও ঐশ্বর্য থাকে না তখন তাদের চোখে সর্ষেফুল ফুটে, তারা নিমজ্জিত হয় ঘোর অন্ধকারে। মানুষের এ জীবন-দর্শনকে কুরআন অতি সুন্দর ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। যেমন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝ اِلَّا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ط

"আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে, অতপর আমি একে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি। কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ, এদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।"

–(সূরা আত-ত্বীন ঃ ৪-৫)

وَالْعَصْرِ ۝ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ۝ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝ (العصر : ١-٣)

"মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু ওরা নয়, যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ এবং (যারা) পরস্পর সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।"

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا ۝ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ

فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ۝ (الكهف : ١٠٣-١٠٥)

"বলো, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্তদের ? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে ওদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তার সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে ওদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায় ; সুতরাং কিয়ামতের দিন ওদের জন্য কোনো গুরুত্ব রাখব না।"–(সূরা আল কাহফ ঃ ১০৩-১০৫)

www.amarboi.org

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَا انْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَوْلِيٰئُهُمُ الطَّاغُوْتُ لا يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ○

"যে তাগূত (বিভ্রান্তিকর পার্থিব উপায়-উপকরণ)-কে অস্বীকার করবে ও আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাংগবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়। যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ্ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোতে নিয়ে যান। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে তাগূত তাদের অভিভাবক ; এরা তাদেরকে আলো হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়। ওরাই দোযখের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"-(সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬-২৫৭)

যারা আপন বিবেককে সজাগ রাখে, যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করে, যারা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে, তাঁকে স্মরণ করে এবং যথাযথভাবে তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে তারা অনায়াসে বুঝে নিতে পারে যে, এ আকাশ, এ বাতাস, এ সাগর, এ ভূমণ্ডল, এ ফল, এ জল, এ সূর্য, এ চন্দ্র, এ গ্রহ, এ নক্ষত্র—বিশ্ব চরাচরের এসব কিছু আল্লাহ্ তাআলা অযথা সৃষ্টি করেননি। প্রকৃতপক্ষে তিনি সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন মানুষের খিদমতের জন্য। কুরআন বলে ঃ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য, যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে এবং আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে। (তারা বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক ! তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে দোযখের শাস্তি হতে রক্ষা কর।"
-(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

www.amarboi.org

অতএব আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। কুরআন বলে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।"

-(সূরা আল বাইয়্যেনাহ ঃ ৭)

আর যারা বিবেকবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহকে বুঝে না, বুঝার চেষ্টাও করে না, বরং অন্যান্য বিবেকহীন পশু-পাখীর ন্যায় খাওয়া-দাওয়া ও আমোদ স্ফূর্তির মধ্যেই মগ্ন থাকে তারা মনুষ্যপদবাচ্য হওয়ার যোগ্য নয়। তাদের সম্পর্কে কুরআন বলে ঃ

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۫ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَ ۝

"তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে তা দিয়ে দেখে না এবং তাদের কান আছে তা দিয়ে শুনে না। এরা পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত ; তারাই গাফিল।"

-(সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৯)

ক্ষণস্থায়ী ইহজীবন যে চিরস্থায়ী পরজীবনের একটি পরীক্ষা ক্ষেত্র ছাড়া কিছু নয় তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ও সবিস্তারে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করবে এবং সৎকর্ম করবে তারা আল্লাহর বন্ধুতে পরিণত হয়। আর যারা আল্লাহর বন্ধুতে পরিণত হয় তাদের জীবনে কোনো ভয় বা দুঃখ থাকে না। তারা আল্লাহর নিকট হতে শান্তির সুসংবাদ লাভ করে। কুরআন বলে ঃ

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ؕ لَا تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ (يونس : ٦٢-٦٤)

"জেনে রেখ, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা বিশ্বাস করে এবং তাক্ওয়া (পরহেযগারী) অবলম্বন করে তাদের

www.amarboi.org

জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে ; আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই ; এটাই মহাসাফল্য।”–(ইউনুস ঃ ৬২-৬৪)

অতএব বুঝা যাচ্ছে, ইহজীবনই মানুষের সবকিছু নয়, বরং এটা হচ্ছে তাদের পরকাল তথা সেই অনন্ত জীবনের দ্বার স্বরূপ, যেখানে তাদেরকে এ জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি করতে হবে।

মৃত্যু

কুরআনের দৃষ্টিতে মৃত্যু এমন একটি ব্যাধি, যা থেকে নিরাময় লাভের কোনো উপায় নেই। প্রাণী মাত্রকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। কুরআন বলে ঃ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ قف ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ○(العنكبوت : ٥٧)

“জীব মাত্রই মরণশীল। অতপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।”–(সূরা আল আনকাবুত ঃ ৫৭)

কুরআন আরো বলে ঃ

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ ط –

“তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমনকি সুউচ্চ-সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও।”–(সূরা আন নিসা ঃ ৭৮)

قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ○ (الجمعة : ٨)

“বল, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন করতে চাও তোমাদেরকে সেই মৃত্যুর সম্মুখীন হতেই হবে। তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে।”–(সূরা জুমুআ ঃ ৮)

মৃত্যু একটি যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা। তবে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক নয়, যারা ইহ-জীবনে আল্লাহতে বিশ্বাস করেছে, তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছে এবং তার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। প্রাণ হরণ করার জন্য মৃত্যু পথযাত্রী মুমিনের সম্মুখে যখন আযরাঈল (মৃত্যুদূত) এসে উপস্থিত হয় তখন অসংখ্য মঙ্গলের (রহমতের) ফেরেশতাও তার চতুর্দিকে এসে ভীড় জমায়, তাকে অভয় দেয় ও জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করে। কুরআন বলে ঃ

www.amarboi.org

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ○ نَحْنُ أَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِيْٓ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ○ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ○ (حم السجدة : ٣٠-٣٢)

"যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্', অতপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে, 'তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু, সেথায় তোমাদের জন্য রয়ে গেছে সমস্ত কিছু—যা তোমাদের মন চায় এবং যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন।"–(সূরা হা-মীম-আস-সাজদা ঃ ৩০-৩২)

এ কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "মৃত্যু মুমিনের জন্য একটি উপঢৌকন বা তোহ্‌ফা।"–(আহমদ)

আর এ কারণেই মৃত্যু উপস্থিত হলে মুমিনরা মোটেই বিচলিত হয় না। তারা পরম প্রশান্তির সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। তাদের ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠে। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "মানুষের মৃত্যুবরণ করাটা ঠিক সেরূপ, যেরূপ বাচ্চা মাতৃগর্ভ (সংকীর্ণতা ও অন্ধকার) হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে উন্মুক্ত দুনিয়ার আয়েশ-আরামের মধ্যে পতিত হয়।"–(হাকিম, তিরমিযী)

মুমিনের মৃত্যুকালীন দৃশ্য সূফী-কবি আল্লামা ইকবালের ভাষায় কী সুন্দরভাবেই না ফুটে উঠেছে ঃ

"নিশানে মরদে মুমিন বা তো গুইয়েম,
চো মরগ্ আইয়েদ তাবাসসুম বর লবেউ।"
অর্থাৎ প্রকৃত মুমিন কেবা শুন তার পরিচয়,
মরণ আসিলে যার অধরেতে হাসি বয়।

আর যারা ইহজীবনে আল্লাহতে বিশ্বাস করেনি, তার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেনি এবং তার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেনি তারা যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হবে এবং তাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত হবে জীবনের যাবতীয় রহস্য তখন তারা

www.amarboi.org

পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসার কামনা করবে, কিন্তু তাদের সে কামনা কামনাই থেকে যাবে। কুরআন বলে ঃ

حَتّٰى اِذَا جَاۤءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ۝ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۗ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَاۤئِلُهَا ۗ وَمِنْ وَّرَاۤئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ۝

"যখন ওদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক, আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে পাঠাও, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি পূর্বে করিনি।' না, এটা হবার নয়। এতো ওর একটি উক্তি মাত্র। ওদের সম্মুখে পর্দা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"

–(সূরা মুমিনুন ঃ ৯৯-১০০)

পরকাল

কুরআনের মতে, মৃত্যুর সাথে সাথে মানবজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বরং সে অন্য আর একটি জগতে পদার্পণ করে। এর একটি বড় প্রমাণ হল, তার দৈনন্দিন নিদ্রা। মানুষ নিদ্রিত অবস্থায় যখন তার চেতনা হারিয়ে ফেলে তখন পার্থিব জগতের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না। সে চলে যায় আর এক জগতে এবং সেটাকেই আসল জগত বলে ভাবতে থাকে। কিন্তু যখন সে নিদ্রা থেকে চেতনা ফিরে পায় তখন আবার পার্থিব জগতে ফিরে আসে এবং অন্য জগতের কথা ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয়ে যায়। কিন্তু যখন সে নিদ্রিত অথবা অন্য কোনো অবস্থায় চিরতরে তার চেতনা হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পুনরায় আর চেতনা ফিরে পায় না, অর্থাৎ পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসে না তখন ঐ দ্বিতীয় জগতের সাথে সে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং তার কাছে তখন পার্থিব জগতের কোনো গুরুত্বই আর বাকী থাকে না। যারা চিন্তাশীল তারা মানুষের ইহজীবনের নিদ্রা হতে অনায়াসে পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারে। কুরআন বলে ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ۚ فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝ (الزمر : ٤٢)

"আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন মৃত্যুকালে এবং যারা জীবিত তাদেরও প্রাণ (চেতনা) হরণ করেন ওরা যখন নিদ্রিত থাকে। অতপর যার জন্য মৃত্যু

www.amarboi.org

অবধারিত করেছেন তিনি তার প্রাণ রেখে দেন এবং অন্যান্যদের প্রাণ (চেতনা) ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।"–(সূরা আয যুমার ঃ ৪২)

যারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে এবং পুনর্জীবন লাভকে অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলে মনে করে তাদের উদ্দেশ্যে কুরআনের উক্তি হলোঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ط إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرٌ ○ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ط إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ (العنكبوت : ١٩-٢٠)

"ওরা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতপর সেটাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন ? এটাতো আল্লাহর জন্য সহজ। বলো, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন ? অতপর আল্লাহ্ পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–(সূরা আনকাবুত ঃ ১৯-২০)

কুরআন আরো বলে ঃ

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُونَ ○ (الروم : ١٩)

"তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং তিনিই জীবন্ত হতে মৃতের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর সেটাকে পুনর্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।"–(সূরা আর রূম ঃ ১৯)

কুরআন আরো বলে ঃ

وَقَالُوا ءَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ○ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ○ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ ج فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا ط قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ج فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ

www.amarboi.org

وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ۖ قُلْ عَسٰى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ

بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ (بنى اسرائيل : ٤٩ - ٥٢)

"ওরা বলে, আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো ? বলো, তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লোহা অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন। তারা বলবে, 'কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে ?' বলো, 'তিনিই, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।' অতপর ওরা তোমার সম্মুখে মাথা নাড়বে ও বলবে, 'সেটা কবে ?' বলো, 'হবে সম্ভবতঃ শীঘ্রই, যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তার আহ্বানে সাড়া দেবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকাল অবস্থান করেছিলে।"–(সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৯-৫২)

কুরআন আরো বলে ঃ

اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۖ بَلٰى ق

وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ۝ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۝

فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ (يس : ٨١-٨٣)

"যিনি নিজ ক্ষমতাবলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি সেগুলোর অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন ? হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কোনো কিছু করতে ইচ্ছা করেন তখন কেবল বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি প্রত্যেক বিষয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তারই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"–(সূরা ইয়াসীন ঃ ৮১-৮৩)

কুরআন আরো বলে ঃ

وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا

لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۚ اِنْ هُمْ اِلَّا يَظُنُّوْنَ ۝ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا

www.amarboi.org

كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوْا ائْتُوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ○ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ

ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لاَرَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ

"ওরা বলে, একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই, কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে।' বস্তুতঃ এ ব্যাপারে ওদের কোনো জ্ঞান নেই, ওরা তো কেবল মনগড়া কথা বলে। ওদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন ওদের কোনো যুক্তি থাকে না, কেবল এই (যুক্তি) ছাড়া যে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর।' বলো, আল্লাহই তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"-(সূরা জাসিয়া ঃ ২৪-২৬)

পারলৌকিক জীবনই মানুষের প্রকৃত জীবন। স্থায়িত্ব ও দীর্ঘতার দিক দিয়ে পারলৌকিক জীবনের অনুপাতে পার্থিব জীবন একটি ক্রীড়া-কৌতুক-কাল ছাড়া কিছু নয়। মানুষকে যখন পুনর্জীবিত করা হবে এবং তাদের সম্মুখে পার্থিব জীবন এবং ইহলৌকিক জীবনের রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে তখন তারা পার্থিব জীবনকে একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ বলে মনে করবে। কুরআন বলে ঃ

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط

اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ○(الانعام : ٣٢)

'পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বৈ আর কিছু নয় এবং যারা সাবধানতা অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়। তোমরা কি অনুধাবন করো না ?"-(সূরা আল আনআম ঃ ৩২)

কুরআন আরো বলে ঃ

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ○ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ

فَسْئَلِ الْعَادِّيْنَ○ قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ○

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ○(المؤمنون : ١١٢-١١٥)

www.amarboi.org

"আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে ?' ওরা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন।' তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না ?"–(সূরা মুমিনূন ঃ ১১২-১১৫)

ইসলামের দৃষ্টিতে আখিরাত বা পরকাল দু ভাগে বিভক্ত। যথা ঃ (১) বারযাখ ও (২) কিয়ামত। মানুষ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন হতেই তার বারযাখ বা কবর-জীবনের সূচনা এবং কিয়ামত বা বিচারদিনে তার সমাপ্তি।

কবর জীবন বলতে একটি আত্মিক বা রূহানী জগতকে বুঝায়, যেখানে মৃতদের আত্মা অবস্থান করবে। যাদেরকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে বা যাদেরকে পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের সকলেরই আত্মা বারযাখে অবস্থান করবে। সেখান হতে তারা কোনোমতেই দুনিয়ায় ফিরে আসতে পারবে না।

কুরআন বলে ঃ

وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ○ (الانبياء : ٩٥)

"সম্ভব নয় যে, যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীরা (দুনিয়ায়) ফিরে আসবে।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯৫)

কুরআন আরো বলে ঃ

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ○

"ওরা কি লক্ষ্য করে না, ওদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা ওদের মধ্যে ফিরে আসবে না।"–(সূরা ইয়াসীন ঃ ৩১)

বারযাখ জীবনেও মানুষ তার পার্থিব জীবনের পাপ-পুণ্যের ফলাফল ভোগ করবে। তবে তা অনেকটা প্রাথমিক পর্যায়ের। কিয়ামত বা বিচার-দিবসের পরই সে প্রকাশ্যে এবং চূড়ান্তভাবে তার পাপ-পুণ্যের ফলাফল ভোগ করবে।

একটি বিকট আওয়াজের মাধ্যমে কিয়ামতের সূচনা হবে। সেদিন পর্বতসমূহকে উন্মূলিত করা হবে এবং পৃথিবী একটি শূন্য প্রান্তরে পরিণত হবে। মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় ছুটে আসবে এবং সারিবদ্ধভাবে আল্লাহ তাআলার সামনে হাযির হবে। তখন প্রত্যেকের সামনে তুলে ধরা হবে তার

www.amarboi.org

ইহজীবনের কর্মতালিকা (আমলনামা)। তখন যার নেকের পাল্লা ভারী হবে সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে সে প্রবেশ করবে উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডে।

কুরআন বলে ঃ

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ○قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا سكته هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ○اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ○فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَّلَا تُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ○(يس : ٥١ - ٥٤)

"যখন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে তখনই মানুষ কবর (বারযাখ) হতে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে। ওরা বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের ! কে আমাদেরকে সুপ্তোত্থিত করলো ? দয়াময় আল্লাহ তো এরই কথা বলেছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।' এটা হবে এক মহানাদ। তখনই ওদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সম্মুখে এবং বলা হবে 'আজ' কারো প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে।"–(সূরা ইয়াসীন ঃ ৫১-৫৪)

কুরআন আরো বলে ঃ

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً لا وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا○وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ط لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ز بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا○وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّا اَحْصٰهَا ج وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ط وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا○

"স্মরণ করো, সেদিন আমি পর্বতকে করবো সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে উন্মুক্ত প্রান্তর, সেদিন তাদের সকলকে আমি একত্র করবো এবং ওদের কাউকেও অব্যাহতি দেব না। আর ওদেরকে তোমার প্রতিপালকের কাছে উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধভাবে এবং বলা হবে, 'তোমাদেরকে

www.amarboi.org

প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার কাছে উপস্থিত হয়েছ ; অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি উপস্থিত করবো না। আর সেদিন উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং ওতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং ওরা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের ! এটা কেমন গ্রন্থ ! এটা তো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি, বরং সব হিসাবই রেখেছে।' ওরা ওদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে ; তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি জুলুম করেন না।"–(সূরা কাহাফ ঃ ৪৭-৪৯)

কুরআন আরো বলে ঃ

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلاَ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلاَ يَتَسَاءَ لُوْنَ ○ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ○ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ○ (المؤمنون : ١٠١-١٠٣)

"এবং যেদিন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজ-খবর নেবে না এবং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে ; ওরা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।"–(সূরা মুমিনূন ঃ ১০১-১০৩)

কুরআন আরো বলে ঃ

اَلْقَارِعَةُ ○ مَا الْقَارِعَةُ ○ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ○ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ○ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ○ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ○ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ○ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ○ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ○ وَمَآ اَدْرٰكَ مَاهِيَهْ ○ نَارٌ حَامِيَةٌ ○ (القارعة : ١ - ١١)

"মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কি ? মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কি জান ? সেদিন মানুষ হবে পতংগের মত এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রংগিন পশমের মত। তখন যার পাল্লা ভারী হবে সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন, কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে তার স্থান হবে 'হাভিয়া'। ওটা কি তা তুমি জান ? ওটা উত্তপ্ত অগ্নি।"–(সূরা আল কারিআহ্ ঃ ১-১১)

www.amarboi.org

মুমিনের চোখে ইহকাল-পরকাল

যারা আল্লাহতে বিশ্বাসী, যারা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তাদের চোখে মানব-জীবনের দু'টি স্তর অর্থাৎ ইহকাল ও পরকাল যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। দুনিয়ার দুঃখ-ব্যথা যেমন তাদেরকে বিচলিত করতে পারে না তেমনই পরকাল সম্পর্কেও তারা চিন্তান্বিত হয় না। তারা ইহকালে যেমন আল্লাহর নৈকট্য অনুভব করে তেমনই পরকালেও লাভ করে তার মধুর সান্নিধ্য। তারা আল্লাহর বন্ধু ইহকাল ও পরকালে। আর আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই, কোনো দুঃখও নেই।

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ط -(يونس : ٦٤)

"তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয় জীবনে।"
-(সূরা ইউনুস ঃ ৬৪)

তারা ইহকালেও আল্লাহর করুণারাশি নিরীক্ষণ করে এবং পরকালেও লাভ করে তার অবারিত করুণা—অসীম রহমত। তারা সফল মানব জীবনের অধিকারী।

সমাপ্ত

www.amarboi.org

পরিশিষ্ট-১

গ্রন্থপঞ্জী

এ পুস্তক রচনাকালে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে নিম্নলিখিত বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেয়া হয়েছে।

(ক) বই-পুস্তক

১. বিভিন্ন ভাষায় লিখিত পবিত্র কুরআনের প্রাচীন ও আধুনিক তাফসীরসমূহ।

২. সিহাহ্ সিত্তাহ্সহ বিভিন্ন হাদীসগ্রন্থ।

৩. মানাহিলুল ফুরকান ফী উলূমিল কুরআন ঃ আশ্ শায়খ আয যারকানী।

৪. কিতাবুল ইতকান ফী উলূমিল কুরআন ঃ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী।

৫. আল হালাল ওয়াল্ হারাম ফিল্ ইসলাম ঃ আল্লামা ইউসুফ আল কারযাভী

৬. দাকায়িকুল হাকায়িক ঃ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী

৭. শারহুস সুদূর ঃ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী

৮. হিসনে হাসীন ঃ ইমাম মুহাম্মদ আল জাযরী

৯. গুনিয়াতুত ত্বয়ালিবীন ঃ শায়খ আবদুল কাদীর জিলানী

১০. তাম্বীহুল গাফিলীন ঃ ইমাম ফকীহ আবু লায়ছ সামারকান্দী

১১. আসমার রিসালাত ঃ শায়খ আবদুল হামীদ আহমদ আল খতীব

১২. আখলাকুন নবী ঃ হাফিয আবুশ্ শায়খ ইসফাহানী

১৩. আল ইসলাম ওয়াল ইনসানিয়াত ঃ ডঃ মুস্তফা আস্ সাবায়ী

১৪. এহ্ইয়াউল উলূম ঃ ইমাম গায্যালী

১৫. আররূহ ঃ ইমাম শামসুদ্দীন আবি আবদিল্লাহ ইবনে কাইয়িম

১৬. যাদুল মাআদ ফী হাদয়ী খাইরিল ইবাদ ঃ আল্লামা ইবনে কাইয়িম আল হাম্বলী

১৭. আস সিরাতুন নবভীয়াহ ঃ মুফতী সাইয়িদ আহমদ দাহলান শাফিয়ী

১৮. আল বেদায়া ওয়ান নেহায়া ঃ হাফিয ইমামুদ্দীন আবিল ফিদা ইসমাঈল বিন উমর আদ দামেশ্কী।

১৯. হুজ্জাতিল্লাহিল বালিগাহ্ ঃ শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী

২০. হিল্ইয়াতুল আউলিয়া ওয়া তাব্কাতুল আসফিয়া ঃ আল হাফিয আবু নায়ীম আহমদ বিন আবদিল্লাহ আল ইসবাহানী

www.amarboi.org

২১. শারহু আইনিল ইল্‌ম ঃ মুল্লা আলী কারী

২২. বুসতানুল আরিফীন ঃ ফাকীর আবুল লায়ছ সামারকান্দী

২৩. তারীকাতুর রাশিদীন ওয়া হুজ্জাতুল মুসতারশিদীন ঃ মাওলানা মুহাম্মদ গাওছ নাক্‌শবন্দী

২৪. আকদিয়াতুর রাসূল ঃ ইমাম আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল কুরতুবী

২৫. ইসলাম আওর মাযাহিবে আলম ঃ ডঃ মাযহারুদ্দীন সিদ্দিকী

২৬. রাসূলে রহমত ঃ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও গোলাম রাসূল মেহ্‌র

২৭. দ্বীনে রহমত ঃ শাহ মুয়ীনুদ্দীন আহমদ নাদভী

২৮. আখলাকে নবভী ঃ ওয়াকিয়াআতকে আয়নে মেঁ ঃ মাওলানা হিফযুর রহমান কাসিমী

২৯. হুযূরে আকরাম কী সিয়াসী যিন্দেগী ঃ ডঃ মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ

৩০. ইল্‌মে জাদীদ কী চ্যালেঞ্জ ঃ ডঃ অহীদুদ্দীন খান

৩১. অরগেনাইজেশন অব গভর্নমেন্ট আনডার দি প্রফেট (সাঃ) ঃ ডঃ মুহাম্মদ ইয়াসীন মাযহার সিদ্দিকী

৩২. দি কুরআন এণ্ড দি মডার্ণ সায়েন্স ঃ ডঃ মরিস বুকাইলী

৩৩. দি বাইবেল দি কুরআন এণ্ড সায়েন্স ঃ ডঃ মরিস বুকাইলী

৩৪. দি ইকনমিক ডকট্রিন্‌স্‌ অব ইসলাম ঃ ডঃ মুহাম্মদ ইউসুফুদ্দীন

৩৫. হাউ ম্যান ওয়ারশিপ ঃ এফ. এইচ. হিলার্ড

৩৬. গড ইজ নো মউর ঃ ওয়ার্নার এণ্ড পীয

৩৭. ইসলামিক কালচার ঃ মার্মেডিউক মুহাম্মদ পিকথল

৩৮. হিস্ট্রি অব টার্কী ঃ প্রফেসর ল্যামার্টিন

৩৯. মুহাম্মাডেনিজম ঃ এইচ. এ. আর গিব

৪০. মুহাম্মদ এণ্ড টিচিং অব দি কুরআন ঃ জন ড্যাভেন পোর্ট

৪১. শর্ট স্টাডিজ ইন দি সায়েন্স অব কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন ঃ মেজর জেনারেল ফার্লভ

৪২. অটোবায়োগ্রাফী ঃ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

৪৩. মুহাম্মদ ঃ টর আন্দ্রো

৪৪. হিস্ট্রি অব ইসলামিক সিভিলাইজেশন ঃ ভন ক্রেমার

৪৫. দি ইন্টালেকচুয়াল ডেভেলপমেন্ট অব ইউরোপ এবাউট দি হোলি প্রফেট ঃ জন উইলিয়াম ড্রপার

www.amarboi.org

৪৬. ইসলাম-হার মরাল এণ্ড স্পিরিচুয়াল ভ্যালু ঃ মেজর আর্থার, জি লিউনার্ড

৪৭. এ্যাপলজি ফর মুহাম্মদ ঃ কাড্রফে হিগেন্স

৪৮. দি গ্রেট রিলিজিয়াস টিচারর্স অব দি ইস্ট ঃ আলফ্রেড মার্টিন

৪৯. কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন ঃ এ. সি. বুকেট

৫০. দি ম্যাসেঞ্জার ঃ আর. ভি. সি বড্লি

৫১. সিপটিং স্যাণ্ডস্ ঃ এন. এন. ব্রে

৫২. মুসলিম ইনস্টিটিউশন ঃ মরিস গডফ্রে

৫৩. লা ডি দ্য মুহামেড ঃ লা কোঁথে ডি বোলে ডিলার

৫৪. লাইফ অব মুহাম্মদ ঃ ওয়াশিংটন আরভিং

৫৫. হিষ্ট্রি অব এরাবিয়া ঃ ডি. জি. হোগার্থ

৫৬. বাইজেন্টাইন এম্পায়ার ঃ সি. ডব্লিউ. দি উম্যান

৫৭. হাফ আওয়ার উইথ মুহাম্মদ ঃ আর্থার এল. ওয়ালাস্টন

৫৮. এরাব কালচার ঃ ডঃ গেসটাউলী

৫৯. ইমুশান এজ দি বেসিস অব সিভিলাইজেশন ঃ ডঃ ডেনিসন

৬০. নিউ ইন্টারন্যাশনাল এনসাইক্লোপিডিয়া ঃ অধ্যাপক নাথানিয়েল্ স্মীড

৬১. হিষ্ট্রি অব মুহাম্মাডানিজম ঃ চার্লস স্টুয়ার্ট মিল

৬২. হিষ্ট্রি অব দি মুসলিম অব স্পেন ঃ রেইন হার্ড সেজী

৬৩. লাইফ অব মুহাম্মদ ঃ জি. এম. ড্রাইকোট

৬৪. মনোমেন্টাল হিষ্ট্রি অব দি মুরিশ এমপায়ার ইন ইউরোপ ঃ এস. পি. স্কট

৬৫. ইসলাম এণ্ড ইটস্ ফাউণ্ডার ঃ স্টুয়ার্ট

৬৬. এ জেনারেল হিষ্ট্রি অব ইউরোপ ঃ অধ্যাপক অলিভার জে. থেচার

৬৭. এরিয়ান রোল ইন ইণ্ডিয়া ঃ মিঃ হ্যাডেল

৬৮. দি হিস্টোরিক্যাল রোল অব ইসলাম ঃ মানবেন্দ্র নাথ রায়

৬৯. মুসলিম ওয়াল্ড টুডে ঃ অধ্যাপক স্নোক

৭০. ওয়ার্ল্ড এ্যাসেমব্লী অব মুসলিম ইয়থ ঃ ইসলামী সিরিজ, প্রচার পত্র নং-৪, ঢাকা।

৭১. দি গ্রেট রিলিজিয়ন অব দি ইষ্ট ঃ আলফ্রেড মার্টিন

৭২. দি হানড্রেড ঃ এ্যা রেংকিং অব দি মোষ্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পারসনস্ ইন হিষ্ট্রি ঃ মাইকেল এইচ হার্ট

৭৩. দি লাইফ এণ্ড টিচিংস অব মুহাম্মদ (মাদ্রাজ, ১৮৩২)

www.amarboi.org

৭৪. মুহাম্মদ এট্ মক্কা ঃ ডব্লিউ মন্টোগোমারী ওয়াট্

৭৫. গেটিং মেরিড ঃ জর্জ বানার্ড শ'

৭৬. কুরআনে বিজ্ঞান ঃ ডাঃ মুহাম্মদ গোলাম মুয়াযযাম

৭৭. হযরত রাসূলে করীম (সাঃ) ঃ জীবন ও শিক্ষা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

৭৮. ব্যাসেস অব ইসলাম (বঙ্গানুবাদ) ঃ ডঃ সাইয়েদ আবদুল লতীফ (অনুবাদক ঃ মুহাম্মদ ইলাহী বখ্শ)

৭৯. জীবন মৃত্যু পরকাল ঃ আবদুল মতীন জালালাবাদী

৮০. ইসলাম ও কৃষি ঃ ঐ

৮১. ইসলাম ও সমাজকল্যাণ ঃ ঐ

৮২. ইসলাম ও মানবতা ঃ ঐ

৮৩. সেরা গুপ্তচর কাহিনী ঃ ঐ

৮৪. মুহাম্মদ (সাঃ)-এর আমলে আরব সমাজ (বঙ্গানুবাদ) ঃ ফ্রিজিল কানী

৮৫. পরধর্ম গ্রন্থে শেষ নবী (সাঃ) ঃ মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা

৮৬. মুসলিম জাহান ও পাশ্চাত্য জগত ঃ আখতার-উল-আলম

৮৭. বিশ্বনবী ঃ গোলাম মোস্তফা

(খ) পত্র-পত্রিকা ও প্রবন্ধ

১. দৈনিক জং, করাচী, পাকিস্তান ঃ ২৬ এপ্রিল, ১৯৮৩ইং সংখ্যা (বিষয় ঃ মিসেস ইন্দ্রিরা গান্ধী)

২. সাপ্তাহিক আল হিলাল, কোলকাতা, ভারত ঃ সম্পাদক মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ঃ ১৯১২ইং সনের বিভিন্ন সংখ্যা

৩. সাপ্তাহিক খতমে নুবুওয়াত, করাচী, পাকিস্তান ঃ ১৯৯৭ইং থেকে ২০০০ইং পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা

৪. রাসূলে আকরাম কী সীরাত কা মুতালাআহ্ কিস্‌লিয়ে কিয়া জায় ? ঃ ডঃ মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ

৫. আরব আওর মক্কা কা ইনতিখাব-দাওয়াতে ইসলাম কে মারকাযকে ত্বাওর পর ঃ ডঃ মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ

৬. মাসিক দামাল, কোলকাতা, ভারত, ঈদ সংখ্যা ১৯৮২ইং

৭. মাসিক দ্বীনে হানীফ, ঢাকা ঃ ১৯৯১ইং থেকে ২০০০ইং পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা।

www.amarboi.org

লেখক-পরিচিতি

আবদুল মতীন জালালাবাদীর জন্ম ১৯৩১ সালের ২০ জানুয়ারী সিলেট জেলার কানাইঘাট থানার উপর ঝিংগাবাড়ী গ্রামে, এক ধর্মপরায়ণ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। পিতার নাম মরহুম মৌলভী সাজিদ আলী এবং মাতার নাম মরহুমা সুফিয়া খাতুন।

আপন শিক্ষক পিতার কাছেই প্রাইমারী শিক্ষার হাতেখড়ি। অতঃপর নিজ গ্রামেরই মাদ্রাসা থেকে মিড্‌ল স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট, আলিম, ফাযিল এবং সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্রাসা থেকে কামিল (আল মুহাদ্দিস) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ।

অতঃপর কিছুদিন শিক্ষকতা, তারপর সাংবাদিকতা। সেই সাথে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ক্রেডিটসহ বি, এ ও প্রথম শ্রেণীতে এম, এ ডিগ্রী লাভ।

পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেহাদে সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি। অতঃপর বাংলাদেশ সরকারের কৃষিতথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক কৃষিকথার সহকারী সম্পাদক, কৃষিতথ্য সংস্থার পাবলিকেশন অফিসার, ট্রেনিং এন্ড ইউটিলাইজেশন অফিসার, ম্যানেজার (প্রেস এন্ড পাবলিকেশন) ও রিজিন্যাল ফার্ম ব্রডকাস্টিং অফিসার পদে চাকুরী। ১৯৮৬ সালে সরকারী চাকুরী থেকে অবসরগ্রহণ।

এ যাবৎ ধর্ম দর্শন, কৃষি, সংস্কৃতি, পরাবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের উপর লিখিত অথবা অনূদিত কুড়িটি পুস্তক প্রকাশিত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ডজন খানেক পুস্তক প্রকাশের পথে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এরা অন্যতম সমীক্ষক, সম্পাদক, লেখক, অনুবাদক, ইসলামী বিশ্বকোষের প্রবন্ধকার, ইমাম ও মুবাল্লিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিশেষজ্ঞ বক্তা, আলোচক এবং আঞ্জুমানে দ্বীনে হানীফ কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক দ্বীনে হানীফ-এর সম্পাদক।

ইসলামী সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৯৫ সালে বি,এন,এস,এ (ইংল্যাণ্ড) পুরস্কার লাভ।